তরীকুল ইসলাম

দ্বিতীয় ভাগ

(অষ্টম – ষষ্ঠদশ অধ্যায়)

সংকলনেঃ

মাহবুবে ছোবহানী, কুতুবে রাব্বানী
মুহিয়ে সুন্নাত, দাফেয়ে বিদয়াত, রাহবারে মিল্লাত
মোজাদ্দিদে যামান, আমীরে শরীয়ত ও তরীকত
আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী
নেছারুদ্দীন আহ্মদ ছাহেব (রহঃ)

ছারছীনা

দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী

তরীকুল ইসলাম - ২

* প্রকাশক ঃ

ছারছীনা মাদরাসা মুসলিম ষ্টোর

* ত্রয়োদশ সংস্করণ: মে - ২০১১ইং

* প্রাপ্তিস্থানঃ

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী

পোঃ দারুচ্ছুন্নাত, উপজেলাঃ নেছারাবাদ,
জেলাঃ পিরোজপুর।

এছাড়া বাংলাদেশের সকল প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

মূল্য ঃ ২৭০ টাকা

দু'টি কথা

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে বিস্তারিত মাসয়ালা মাসায়েল সম্বলিত **"তরীকুল ইসলাম"** কিতাবখানি আজ বাংলাদেশের সর্বত্র পরিচিত। এই কিতাব হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া লক্ষ লক্ষ মুসলমান পূর্ণাংগভাবে নামায রোযা আদায় করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। এই কিতাবখানি এক দিকে যেমন দ্বীনদার মুসলমানগণের ঘরে ঘরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তেমনই অপর দিকে মাদ্রাসা, মসজিদ, পাবলিক লাইব্রেরী ও ইসলামী পাঠাগার এবং বিভিন্ন তা'লীমী জলসা সমূহেও ইহা ইসলামী মাসয়ালা মাসায়েলের নূর বিকিরণ করিতেছে। আলহামদুলিল্লাহ্!

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন বাংলার মুসলমানগণ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার শিকার হইয়া দিনে দিনে ইলম্ ও আমলে গরীব হইয়া পড়িতেছিল, দেশে শির্‌ক ও বিদয়াত প্রসারতা লাভ করিতেছিল তখন সেই সায়লাব হইতে মুসলমানগণকে রক্ষা করিবার জন্য আল্লাহর অলী ফুরফুরা শরীফের আলা কুতুবুল ইরশাদ, মোজাদ্দেদে যমান, পীরে কামেল **আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী** (রহঃ) এর দোয়া, এজাযত ও খিলাফত প্রাপ্তে ছারছীনা শরীফের মুজাদ্দেদে যমান পীরে কামেল **আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহঃ)** ইল্‌মে তরীকতের তালীমের জন্য খানকা এবং জাহিরী ইলমের তালীমের জন্য মাদ্রাসা সমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। তিনি ইসলামের জন্য মাদ্রাসা সমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিকের আলোচনাসহ কিতাব প্রণয়ন করার কাজেও হাত দেন। তাহার লিখিত সেই সকল কিতাবের মধ্যে এই **"তরীকুল ইসলাম"** একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। শিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত সকলেই যেন মাসয়ালাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারে এই জন্য প্রশ্নোত্তরে কিতাবখানি সংকলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এই কিতাবের এগারটি খন্ড প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার ইন্তেকালের পর পীরে কামেল **আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ্ (রহঃ)** কিতাবখানিকে পূর্ণতায় পৌছানোর কাজে হাত দেন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহার মোট ১৫টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ইন্তেকালের পর বর্তমান পীরে কামেল **আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ** আরো পূর্ণতায় পৌছানোর কাজে হাত দেন। তাই আল্লাহর মেহেরবাণীতে বর্তমানে ইহা ১৬টি খণ্ডে সাদা কাগজে আধুনিক পদ্ধতিতে মুদ্রণ করিয়া প্রকাশ করা হইল।

এই কিতাব সংকলনের সময় মরহুম পীর সাহেব দ্বয় ও বর্তমান পীর সাহেবের কতক পার্শ্ব সংগী ইহার পান্ডুলিপি তৈরি করনে ও মুদ্রণ-প্রকাশনের ব্যাপারে সহযোগী ছিলেন। আমরা তাহাদের এই নেক কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমান পাঠকগণের রুচির দিকে খেয়াল করিয়া আমরা উপরোক্ত ১৬টি খন্ডকে দুই ভাগে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার মাসয়ালাগুলিতে কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে পূর্বেকার খণ্ডগুলির পরিবর্তে 'অধ্যায়' শব্দ সংযোজন করিলাম।

এই সংস্করণে আমরা আগের কিছু কিছু ছাপার ভুল সংশোধন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গের সুপরামর্শ লইয়া ভবিষ্যতে আমরা এই কিতাবকে পূর্ণতায় পৌছাইবার ইচ্ছা পোষণ করি।

মরহুম দাদা পীর সাহেব এই কিতাবখানি সম্পাদন করিয়া ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর ভবিষ্যতেও এই কিতাবের সংযোজনগুলি উক্ত মাদ্রাসার জন্যই ওয়াক্‌ফ থাকিবে।

বিনীত-
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়	
জামায়াতে নামায পড়ার ফজীলত	১৪
ইমামের কর্তব্য	১৬
মোক্তাদির কর্তব্য	১৮
ইমামের সহিত মোক্তাদিগণের দাঁড়াইবার বিবরণ	১৯
কোন্ ইমামের পিছনে কে এক্তেদা করিবে	২১
ইমাম সম্পর্কীয় মাসয়ালা	২৩
ইমাম ও মোক্তাদির দাঁড়াইবার বিবরণ	২৫
ইমাম নির্বাচন করিবার বিবরণ	২৬
ইমামের তাবেদারীর বিবরণ	২৮
কিরূপ ওজরে জামায়াতে না গেলে গুনাহ হইবে না	২৯
স্ত্রীলোকের জামায়াত	৩১
পুরুষ ও স্ত্রীলোক জামায়াতে নামায পড়ার মাসয়ালা	৩২
মাসবুকের বিবরণ	৩৩
লাহেকের নামায আদায়ের বিবরণ	৩৬
নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইলে	৩৭
নামাযে সন্দেহ সম্পর্কে মাসয়ালা	৩৯
একা নামাযীর জামায়াতে শরীক হইবার মাসয়ালা	৪০
কাজা নামায আদায়ের বিবরণ	৪৪
ওমরী কাজা আদায়ের বিবরণ	৫১
বেতের নামাযের বিবরণ	৫২
বেতের নামাযের কতক মাসয়ালা	৫৩
তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ	৫৬
নাবেলেগ ব্যক্তি তারাবীহ নামাযের ইমাম হইতে পারে কি না	৬৩
তারাবীহ্ নামাযের মাসয়ালা	৬৪
নবম অধ্যায়	
পীড়িত লোকের নামায পড়িবার বিবরণ	৬৬
আনুষঙ্গিক প্রশ্নোত্তর	৭৪
নৌকা ও জাহাজে নামায পড়ার মাসয়ালা	৭৫
রেলগাড়ীতে নামায পড়ার মাসয়ালা	৭৮
চারপায়া জানোয়ারের উপর নামায পড়ার মাসয়ালা	৭৮
ঈদের নামাযের বিবরণ	৮৩
ঈদের নামাযের পূর্বে যে সমস্ত কাজ করা মুস্তাহাব	৮৫
ঈদের নামাযের তারতীব	৮৮
ঈদের নামাযের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা	৯০
যে সকল কারণে দ্বিতীয় দিন ঈদুল ফিতরের নামায পড়া জায়েয	৯২
ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া জায়েয কি না	৯৩
তাকবীরে তাশরীকের মাসয়ালা	৯৪
সুন্নাত নামাযের বিবরণ	৯৬
তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ	১০১
এশরাক নামাযের বিবরণ	১০৪
চাশত নামাযের বিবরণ	১০৪
আওয়াবীন নামাযের বিবরণ	১০৫
দুখুলুল মসজিদ নামায পড়িবার বিবরণ	১০৫
এস্তেখারা নামাযের নিয়ম	১০৬
এস্তেখারার অন্য নিয়ম	১০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশম অধ্যায়	
পীড়া হইলে কিরূপ প্রতিকার	১০৮
আয়াতে শেফা	১০৯
ছদকা দেওয়ার বিবরণ	১১১
মৃত্যুর বিবরণ	১১৩
মৃত্যুর পূর্বক্ষণের তওবার বিবরণ	১১৪
মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসিন পড়া	১১৪
মৃত্যু হইলে কি করিতে হইবে	১১৫
মৃত্যু সংবাদ দিবার বিবরণ	১১৫
বেঈমানের মৃত্যুর বিবরণ	১১৫
মুমিন লোকের মৃত্যুর বিবরণ	১১৬
মুর্দারের গোসলের বয়ান	১১৭
গোসলের নিয়ম	১১৭
স্ত্রীলোক পুরুষকে ও পুরুষ স্ত্রীলোককে গোসল করাইতে পারে কি না	১২৩
কাফনের বয়ান	১২৬
মুর্দারকে পাগড়ি দেওয়া যায় কি না	১২৭
মেয়েলোকের কাফন	১২৮
কি রকম কাপড় দ্বারা কাফন করিতে হয়	১২৯
পুরুষ মুর্দারের কাফন বিছাইবার নিয়ম	১২৯
মেয়েলোক মুর্দারের কাফন বিছাইবার নিয়ম	১২৯
জানাযা নামাযের বয়ান	১৩১
জানাযার আনুষঙ্গিক মাসয়ালা	১৩৩
জানাযা নামাযে দাড়াইবার নিয়ম	১৩৪
মোক্তাদীর কর্তব্য	১৩৬
একাধিক মুর্দারের একত্রে জানাযা পড়া	১৩৭
কোন্ কোন্ মৃত্যু ব্যক্তির জানাযাহ পড়া জায়েয বা নাজায়েয তাহার বিবরণ	১৩৮
কবরের বয়ান	১৩৯
মৃতদেহ কবরে রাখিবার বিবরণ	১৪০
দাফন করিতে নেওয়ার বিবরণ	১৪১
মৃত্যুস্থান হইতে কতদূরে নিয়া দাফন করা জায়েয	১৪৪
দাফন করিয়া কবরস্থানে দোয়া দরূদ পড়িবার বিবরণ	১৪৫
কবর যিয়ারত করা ও যিয়ারত অন্তে মুনাজাত করিবার নিয়ম	১৪৬
কবরস্থানের গাছ কাটা জায়েয কি না	১৪৮
মনকীর নকীরের সওয়ালের বয়ান	১৪৮
শিশুদের প্রতি জিজ্ঞাস্য বিষয়	১৪৯
কবরে কোন সময় জিজ্ঞাসিত হইবে	১৪৯
কিরূপভাবে মনকীর নকীর সওয়াল করিবে	১৫০
বেঈমানের কবরে কিরূপ সওয়াল জওয়াব হইবে	১৫১
মৃতদেহ দাফন করিবার পূর্বে ছদকার বয়ান	১৫১
কাফফারা দিবার বিবরণ	১৫২
একাদশ অধ্যায়	
হায়েজ নেফাস ও এস্তেহাজার পরিচয়	১৫৫
হায়েজের মাসয়ালা	১৫৫
নেফাসের বিবরণ	১৬০
তোহরে মোতাখাল্লাল বা অনিয়মিত পবিত্রতা	১৬২
নেফাসের তোহরে মোতাখাল্লাল বা অনিয়মিত পবিত্রতা	১৬৩
এস্তেহাজার বিবরণ	১৬৪
এস্তেহাজা চিনিবার কতিপয় সংক্ষিপ্ত উপায়	১৬৪
হায়েজ নেফাসের অবস্থায় রোযা নামায ও সহবাসের হুকুম	১৬৫
হায়েজ নেফাস ওয়ালী স্ত্রীলোকের পালনীয় কর্তব্য	১৬৯
মাযুরের মাসয়ালা	১৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বাদশ অধ্যায়	
রোযার হুকুম ও ফজীলত	১৭৪
রোযার ফজীলতের হাদীস সমূহ	১৭৬
রোযার পরিচয় ও শ্রেণী বিভাগ	১৮০
রোযা ফরজ হওয়ার কারণ	১৮১
রোযার সময়	১৮১
সাহ্‌রী কোন সময় খাইবে	১৮২
সন্দেহের সময় সাহ্‌রী খাওয়া	১৮৩
সময় অনুমান করিয়া সাহ্‌রী খাওয়া	১৮৪
কি কি দ্রব্য দ্বারা সাহ্‌রী খাইবে	১৮৪
রোযার শর্ত সমূহ	১৮৪
রোযার নিয়ত	১৮৪
নিয়তের সময়	১৮৫
রমযানের চাঁদ দেখা	১৮৮
ঈদের চাদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণ	১৯০
যে সকল কারণে রোযা কাজা হইবে	১৯২
যে সকল কাজে রোযার কাজা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক	১৯৭
যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয	১৯৮
রোগ ব্যধির কারণে রোযা ভঙ্গ করা	১৯৯
যে সকল কাজে রোযা মাকরূহ হয় তাহার বয়ান	২০৪
সন্দেহের দিবসের প্রমাণ ও রোযা রাখার হুকুম	২০৬
ছওমুল বেছাল শনিবার ও রবিবারের রোযা	২০৭
বৎসরের প্রথম দিন ও বে-দীনের পর্ব বিশেষে রোযা রাখা	২০৭
ছওমে ছামৎ বা নির্বাক রোযা	২০৭
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর রোযা রাখা	২০৭
শ্রমিকের নফল রোযা	২০৭
মান্নত রোযা সমূহের বয়ান	২০৮
এ'তেকাফের বয়ান ও শর্ত সমূহ	২১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
এ'তেকাফের আদব, সৌন্দর্য ও নষ্ট হইবার কারণ সমূহ	২১৬
এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাহির হইবার সঙ্গত কারণ সমূহ	২১৬
এ'তেকাফের অবস্থায় সহবাস ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্য সমূহ	২১৭
বেহুশ ও উম্মাদের এ'তেকাফ	২১৮
এ'তেকাফের সময় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ	২১৮
এ'তেকাফের সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা সমূহ	২১৯
ছদকাতুল ফিতর	২২০
বিবিধ মাসয়ালা	২২২
ফরজ রোযার শ্রেণী বিভাগ	২২৪
লাইলাতুল কদর	২২৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
যাকাতের ফজীলত	২২৫
যাকাত শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য	২২৮
যাকাত কাহাকে বলে	২৩০
যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত	২৩০
চরা পশুর যাকাত	২৪৫
উটের যাকাত	২৪৬
মহিষ ও গরুর যাকাত	২৪৭
সোনা-রূপা এবং তেজারতের মালের যাকাত	২৫১
আশের	২৫৯
খনি ও গুপ্তধন	২৬০
ফসল ও ফলের যাকাত	২৬২
ওশরী হওয়ার কারণ সমূহ	২৬২
খেরাজী হওয়ার কারণ সমূহ	২৬৩
যাকাতের মাল খরচ করার স্থান	১৬৫
যাকাত কাহাকে দেওয়া উত্তম	২৭৪
ভিক্ষা কার জন্য জায়েয	২৭৫
নফল ছদকা	২৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্দশ অধ্যায়	
ক্রয়-বিক্রয়ের মাসয়ালা	২৮৫
অত্যাবশ্যকীয় ফায়দা	২৮৯
মাসয়ালা সমূহ	২৯০
বেচা কেনার জন্য ৮টি শর্ত	২৯০
বায়ে তায়াতী	২৯৫
বিক্রিত বস্তু এবং মূল্য	২৯৬
বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত মুদ্রার হুকুম	২৯৮
তুলাদণ্ড এবং পাল্লা দ্বারা ওজন করা অথবা অনুমানের বেচাকেনা	২৯৮
বর্ণিত পরিমাণ হইতে কম অথবা বেশী পাওয়া গেলে	৩০০
কি কি বস্তু বিক্রির ভিতর শামিল হইবে এবং হইবে না	৩০১
ফসলওয়ালা জমি ক্রয় করা	৩০৩
খরিদা গাছ কিরূপে কাটিবে	৩০৩
গাছ খরিদের মাসয়ালা সমূহ	৩০৩
ফল এবং বাগান খরিদের মাসয়ালা	৩০৫
বিক্রিত বস্তুর কবজা বা দখলের মাসয়ালা	৩০৭
খিয়ারে শর্তের বয়ান	৩১৩
খিয়ারে শর্ত কাহাকে বলে এবং উহার প্রয়োজনীয়তা	৩১৪
এজাযতের শব্দ সমূহ	৩১৮
খেয়ারে তায়ীন এবং উহার শর্ত সমূহ	৩২১
খেয়ারে রুইয়াতের বর্ণনা	৩২৪
অন্ধের বেচা-কেনা এবং তাহার খেয়ার থাকিবে কি না	৩৩০
খেয়ারে আয়েবের বর্ণনা	৩৩১
আয়েব কাহাকে বলে	৩৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ অধ্যায়	
হজ্জের দাওয়াত	৩৪১
হজ্জের ফজীলত	৩৪১
হজ্জে মাবরূর	৩৪২
হজ্জ কাহার প্রতি ফরজ	৩৪৩
হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী	৩৪৩
হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত সমূহের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা	৩৪৩
হজ্জ আদায় করা ফরজ হওয়ার শর্তাবলী	৩৪৭
হজ্জ আদায় ফরজ হওয়ার শর্তাবলীর আনুষঙ্গিক মাসয়ালা	৩৪৭
ফরজ হজ্জ তরক করার অনিষ্ট	৩৫০
হজ্জ করা কাহার জন্য নিষিদ্ধ	৩৫০
হজ্জের আহকাম ও প্রকারভেদ	৩৫১
হজ্জের ফরজ, ওয়াজিব সমূহ	৩৫১
হজ্জের সুন্নাত সমূহ	৩৫১
ওমরার মাসায়েল	৩৫২
এহরাম ও ইয়ালমলম	৩৫৪
মীকাত	৩৫৫
মীকাতের মাসায়েল	৩৫৫
এহরাম শুদ্ধ হওয়ার ফরজ সমূহ	৩৫৭
এহরামের সুন্নাত সমূহ	৩৫৭
এহরামের মাসায়েল	৩৫৭
বেহুঁশ ও পীড়িত ব্যক্তির এহরাম	৩৫৮
নাবালেগ বালক বালিকার এহরাম	৩৫৯
পাগলের এহরাম	৩৬০
স্ত্রীলোকের এহরাম	৩৬০
এহরাম অবস্থায় মাকরূহ কার্যাবলী	৩৬১
এহরাম অবস্থায় জায়েয কার্যাবলী	৩৬১
এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী ও তাহার কাফফারা	৩৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্জে তামাত্তো	৩৭২
হজ্জে তামাত্তো ও ওমরার তাওয়াফ	৩৭৩
মাসায়েলে তাওয়াফ	৩৭৫
তাওয়াফের নামায	৩৭৭
তাওয়াফের নামাযের মাসায়েল	৩৭৭
যমযম কূপের পানির ফজীলত	৩৭৭
ওমরাহর সায়ী	৩৭৮
সায়ীর মাসায়েল	৩৭৯
হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকের এহরাম, হজ্জ ও ওমরাহর মাসায়েল	৩৮১
ওমরাহর পর হজ্জ পর্যন্ত কর্তব্য	৩৮২
দোয়া কবুল হইবার স্থান সমূহ	৩৮২
দিনওয়ারী হজ্জের কার্য সমূহ	৩৮২
৯ই জিলহজ্জের কার্যাবলী	৩৮৪
৯ই জিলহজ্জের জোহর ও আছরের নামায	৩৮৫
আরাফাতে অকুফ	৩৮৫
অকুফের সময়ের কার্যাবলী	৩৮৬
মোজদালাফায় রওয়ানা	৩৮৭
মোজদালাফায় রাত্রি যাপন	৩৮৮
১০ই জিলহজ্জের কার্য সমূহ	৩৮৮
মিনাতে জুমআ ও ঈদের নামায	৩৮৯
দমে শোকর ও রোযা	৩৯০
কুরবানীর পশু খরিদ	৩৯০
হজ্জের এহরাম খুলিতে মুণ্ডন করা	৩৯১
১১ই জিলহজ্জের কার্য সমূহ	৩৯২
১২ই জিলহজ্জের কার্য সমূহ	৩৯২
১৩ই জিলহজ্জের কার্য সমূহ	৩৯৩
রমীর কাফফারা	৩৯৩
তাওয়াফে যিয়ারত	৩৯৪
তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াক্ত	৩৯৪
তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের তরীকা	৩৯৫
তাওয়াফে যিয়ারত তরককারী	৩৯৬
জুনুব ও হায়েজ নেফাস ওয়ালীর তাওয়াফে যিয়ারত	৩৯৭
তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ	৩৯৮
তাওয়াফে বিদা দ্বারা তাওয়াফে যিয়ারতের ক্ষতিপূরণ	৩৯৮
তাওয়াফে বিদা আদায়ের নিয়ম	৩৯৯
হজ্জে তামাত্তোর সংক্ষিপ্ত সার	৩৯৯
হজ্জে তামাত্তোর তালিকা	৪০০
হজ্জে ক্বেরানের সংক্ষিপ্ত সার	৪০১
তাওয়াফে কুদুমের নিয়ম	৪০১
ক্বারেন কর্তৃক সংগঠিত নিষিদ্ধাবলীর কাফফারা	৪০২
হজ্জে ক্বেরানের তালিকা	৪০২
হজ্জে এফরাদের সংক্ষিপ্ত সার	৪০৩
হজ্জে এফরাদের তালিকা	৪০৩
ওমরাহর তালিকা	৪০৪
নফল তাওয়াফ	৪০৪
বদলী হজ্জ বা নায়েবী হজ্জ	৪০৪
ফরজ নায়েবী হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী	৪০৫
বদলী হজ্জের আনুষঙ্গিক মাসায়েল	৪০৮
যিয়ারতে রওজায়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)	৪১০
হুজুর পাকের মাজার যিয়ারতের ফজীলত	৪১০
রওজাপাকের ওস্তোয়ানা সমূহ	৪১১
রওজা মোবারক যিয়ারত	৪১২
মদীনা শরীফের যিয়ারতগাহ সমূহ	৪১৩
প্রত্যাবর্তন	৪১৪

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

কুরবানী শব্দের বিশ্লেষণ

কুরবানীর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪১৫

কুরবানীর ইতিকথা বা ঐতিহাসিক পটভূমি

কুরবানীর প্রচলন কাহার মাধ্যমে এবং কিভাবে হইয়াছে ৪১৫
কুরবানীর ঐতিহাসিক ঘটনা ৪১৫
সর্ব প্রথম কুরবানীর স্থান ৪১৭

কুরবানী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বিস্ময়কর ঘটনার অনুস্মরণে সুন্নাতে ইব্রাহীম (আঃ)

হযরত ঈসমাঈল (আঃ)-এর কুরবানীর ঘটনা ৪১৭
আমরা কাহার স্বরণে কুরবানী করিয়া থাকি? ৪২১

কুরবানীর ফজীলত সম্পর্কে

সংক্ষেপে কুরবানীর ফজীলত ৪২১

কুরবানীর হুকুম সম্পর্কে

কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ৪২৪
কোন সময় কুরবানী ওয়াজিব হয় ৪২৫
কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৪২৫
মালেকে নেছাব হওয়া ৪২৫
নেছাব পরিমাণ মাল মালিকের কাছে কত দিন থাকিবে? ৪২৫
স্বর্ণ রৌপ্য উভয় থাকিলে তাহার হুকুম ৪২৬
কম বেশী অর্থ ওয়ালা সব ধনীর জন্য কি একই হুকুম? ৪২৬
নেছাব পরিমাণ অর্থ হইতে যাকাত আদায় করার কারণে অর্থ কম হইলে উহার হুকুম ৪২৬
ধনী ব্যক্তি মাঝে মাঝে পাগলামী করিলে কুরবানীর হুকুম ৪২৬
গরীব ব্যক্তি কুরবানী করিলে উহার হুকুম ৪২৬
দেনাদার বা ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তির কুরবানী ৪২৭
কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু লোকটি কুরবানীর দিনগুলির মধ্যে মারা গেলে ৪২৭
ওয়াজিব কুরবানী, দাতার অনুমতি ব্যতিত হইলে উহার হুকুম ৪২৭
গরীব লোক কুরবানী করার নিয়তে পশু ক্রয় করিলে উহার হুকুম ৪২৭
গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়ত ছাড়া একটি আর নিয়ত করিয়া আর একটি পশু খরিদ করিলে উহার হুকুম ৪২৭
এক ব্যক্তির পশু অন্য ব্যক্তি জোর করিয়া কুরবানী করিলে তাহার হুকুম ৪২৮
কোন ব্যক্তি নিজের পশু অন্যের জন্য কুরবানী করিলে তাহার হুকুম ৪২৮
এক ব্যক্তির পশু অন্য ব্যক্তির কাছে আমানত ছিল সে উহা নিজের জন্য কুরবানী করিলে ৪২৮

দুই ব্যক্তি একটি পশুর মালিক, একজন ঐ পশুটি কুরবানী করিলে উহার হুকুম ৪২৮
পশু নির্দিষ্ট ছাড়াই নিজের সহ তাহার একাধিক সন্তানের নামে কুরবানী করিলে তাহার হুকুম ৪২৮
অশুদ্ধ ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করিলে উহার হুকুম ৪২৮
যাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব সে যদি কুরবানী না করিয়া উহার মূল্য সদকা করে ৪২৯
নিজের ওয়াজিব কুরবানী এক বৎসর নিজের নামে অন্য বৎসর স্ত্রী বা পরিবারের অন্য সদস্যের নামে এই ভাবে সাত বৎসর পরে আবার নিজের নামে কুরবানী করিলে ৪২৯
কোন ব্যক্তি কুরবানীর জন্য পশু খরিদ করিল এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন গুলির মধ্যেই সফরে যাত্রা করিলে উহার বিধান ৪২৯
কোন ব্যক্তি যদি পশু নির্ধারণ না করিয়া অন্যকে কুরবানী করার দায়িত্ব দেয় ৪২৯
আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলিতে কুরবানী দাতার করণীয় সম্পর্কে ৪২৯
মৃত্যু ব্যক্তির নামে কুরবানী প্রসংগে ৪৩০

কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয ও সে গুলির বয়স সীমা প্রসংগে

কোন কোন প্রকারের পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয ৪৩০
কোন শ্রেণীর পশুর বয়স কত হইবে ৪৩০
নর ও মাদীর মধ্যে কোন প্রকার পশু কুরবানী করা উত্তম ৪৩১
কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি পশুতে কয়জন শরীক হইতে পারিবে? ৪৩১
গরু, মহিষ বা উটের অংশীদার হওয়া উত্তম। না ছাগল, ভেড়া, দুম্বা কুরবানী করা উত্তম? ৪৩১
অংশীদারের মধ্যে গোস্ত খাওয়ার নিয়ত থাকিলে কুরবানী হইবে কি না ৪৩১
একটি গরুতে ছয়জন ছয় ভাগ আর সপ্তম ভাগ রাসূলে পাক (দঃ)-এর জন্য কুরবানী করিলে ৪৩১
সাত ভাগের পশুতে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য শরীক হওয়া যাইবে কি না ৪৩২
একাধিক শরীক ওয়ালা পশুতে অমুসলিম শরীক হইলে উহার হুকুম ৪৩২
বন্য ও গৃহপালিত পশুর মিলনের বাচ্চা দ্বারা কুরবানী প্রসংগে ৪৩২
কুরবানীর পশুর বাচ্চা হইলে বা কুরবানীর পরে পেটে বাচ্চা পাওয়া গেল ৪৩২
কুরবানীর পশুর দ্বারা কোন প্রকার পার্থিব উপকার লাভ করা যাইবে কি না ৪৩২
কুরবানীর উদ্দেশ্যে একব্যক্তি একটা গরু খরিদ করিয়া পরে অংশীদার যোগ করাইলে ৪৩২
ওয়াজিব কুরবানীর পশুতে আকীকা, নফল, নজর, অছীয় ইত্যাদি প্রসংগে ৪৩৩
এক ব্যক্তির একাধিক কুরবানী প্রসংগে ৪৩৩

ত্রুটি যুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী প্রসংগে

পাগল পশু দ্বারা কুরবানী করিলে হইবে কি না ৪৩৩
জন্মগতভাবে শিংবিহীন পশুর কুরবানী সম্পর্কে ৪৩৩
চর্মরোগ যুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী করা যাইবে কি না ৪৩৩
অন্ধ, কানা, অতিদুর্বল ও পঙ্গু পশু দ্বারা কুরবানীর হুকুম ৪৩৪
যে পশুর জন্মগতভাবে কান নাই বা সামান্য আছে উহার কুরবানী ৪৩৪

খাশী করা ও এক অন্ডোকোষ বিশিষ্ট পশু দ্বারা কুরবানী করার হুকুম ৪৩৪
যে সব পশুর দাঁত নাই বা কিছু কিছু আছে উহা দ্বারা কুরবানীর বিধান ৪৩৪
পুরুষাঙ্গ কাটা বা মাদী পশুর স্তনের বোটা কাটা পশু দ্বারা কুরবানী করা যাইবে কি না ৪৩৪
খোজা ও সমলিংগ ওয়ালা পশুর দ্বারা কুরবানীর হুকুম ৪৩৫
খরিদ করার পর পশু ক্রটিযুক্ত হইলে উহা দ্বারা কুরবানীর বিধান ৪৩৫
যেই পশুর জিহ্বা নাই বা কাটা গিয়াছে উহা কুরবানী করা যাইবে কি না ৪৩৫
কুরবানীব পূর্বে পশুর পশম লেজ কাটা প্রসংগে ৪৩৫
যে পশু বিষ্ঠা খায় উহা দ্বারা কুরবানী করার বিধান ৪৩৫

কুরবানীর জন্তু চুরি, হারান, বদলী হওয়া এবং কুরবানীর সময় অতিবাহিত হইলে উহার বিধান সম্পর্কে

কুরবানীর পশু চুরি বা হারান গেলে উহার বিধান ৪৩৬
কুরবানীর পশু মারা গেলে ৪৩৬
একাধিক ব্যক্তির একত্রিত করা কুরবানীর পশু হইতে একটি মারা গেলে উহার বিধান ৪৩৬
একাধিক ব্যক্তির কুরবানীর পশু এক স্থানে ছিল এমতাবস্থায় উহাদের একজন মালিক বা একাধিক মালিক মারা গেলে উহার বিধান ৪৩৬
কুরবানীর পশু বদলী প্রসংগে ৪৩৭
কোন ব্যক্তি দুইটি পশু খরিদ করিল অথচ একটিও কুরবানী করিল না ৪৩৭
ধনী ব্যক্তি পশু খরিদ করিল অথচ কুরবানী করে নাই এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি গরীব হইয়া গেলে ৪৩৭
ধনী ব্যক্তি পশু খরিদ করে নাই এবং কুরবানীও করে নাই এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন শেষ হইলে ৪৩৭
কুরবানীর দিন গুলির মধ্যে অন্য পশু জবাই করা প্রসংগে ৪৩৭
বিভিন্ন দামে কয়েকজন কুরবানীর জন্য পশু খরিদ করিয়া একই স্থানে রাখিল কিন্তু কোনটি কাহার ঠিক না থাকিলে ৪৩৭
রাখালী বা ভাগী দেওয়া পশু দ্বারা কুরবানী করা যাইবে কি না ৪৩৭
চলতি বৎসরের কুরবানীর সাথে বিগত বৎসরের কুরবানী করা ছহীহ হইবে কি না ৪৩৮

মান্নত কুরবানী প্রসংগে

মান্নত কুরবানীর পরিচয় ৪৩৮
মান্নত কুরবানীর হুকুম ৪৩৮
কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পশু মান্নতের নিয়ত করিল কিন্তু দিন শেষ হইয়া গেল উহার বিধান ৪৩৮
কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর মান্নত করিলে আর কুরবানীর দিন গুলির মধ্যে সে ধনী হইলে ৪৩৮
দাম বা পশু নির্ধারণ না করিয়া মান্নত করিলে উহার হুকুম ৪৩৯
যদি কেহ নিজের পুত্র কুরবানীর মান্নত করে ৪৩৯
গরু, মহিষ বা উট মান্নত করিয়া যদি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী করে ৪৩৯
কোন ব্যক্তি দশটি কুরবানীর মান্নত করিলে উহার হুকুম ৪৩৯
মান্নত কুরবানীর গোস্ত বন্টন প্রসংগে ৪৩৯

অছীয়ত কুরবানী সংক্রান্ত বিষয়

পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কুরবানী না করিয়া মারা গেল 8৪০
কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কুরবানীর দিন বাকী থাকা অবস্থায় লোকটি মারা গেল ৪৪০
অছীয়ত করিয়া মারা গেলে উহা আদায় করা প্রসংগে ৪৪০
অছীয়তকারীর সম্পদ না থাকিলে বা কম থাকিলে উহার বিধান ৪৪০
অছীয়ত করা কুরবানীর পশুর হুকুম ৪৪০
অছীয়ত করা কুরবানীর গোস্ত বন্টন ৪৪০

নফল কুরবানী প্রসংগে

নফল কুরবানী কাহাকে বলে ৪৪১
অছীয়ত, মান্নত ইত্যাদি ছাড়া নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানী করা ৪৪১
জীবিত ব্যক্তির নামে নফল কুরবানী প্রসংগে ৪৪১
নফল কুরবানীর গোস্ত বন্টন ৪৪১

কুরবানীর পশু জবাই করার সময় সংক্রান্ত বিষয়

গ্রাম ও শহর বাসীদের জন্য কুরবানীর পশু জবাইর সময় ৪৪১
রাত্রিতে কুরবানীর পশু জবাই করা যাইবে কি না ৪৪২
কুরবানীর দিন গুলির মধ্যে কোনদিন কুরবানী করা উত্তম ৪৪২
যে এলাকায় ঈদের নামায ওয়াজিব নহে সেইখানে কুরবানী করা প্রসংগে ৪৪২
যেইখানে একাধিক স্থানে ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় সেইখানে কুরবানী সম্পর্কে ৪৪২
ঈদের নামায শেষ হয় নাই বা নামায শেষ কিন্তু খুৎবা বাকী এমতাবস্থায় কুরবানী করার বিধান ৪৪২
ঈদের নামায আদায় করিতে ইমাম সাহেব দেরী করিলে কুরবানীর হুকুম ৪৪২
ঈদের নামায আদায়ের পর জানা গেল নামায হয় নাই তখন কুরবানীর হুকুম ৪৪২
ঈদের নামায আদায়ের পর প্রমাণিত হইল এইদিন আরাফার বা ৯-ই জিলহজ্জের দিন তবে নামায ও কুরবানীর হুকুম ৪৪৩

কুরবানীর পশু জবাই করা প্রসংগে

কুরবানীর পশু জবাই করার হুকুম ৪৪৩
কুরবানীর পশু জবাই করার শর্ত ৪৪৩
জবাইকারী বিস্‌মিল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছু বলিয়া জবাই করিলে শুদ্ধ হইবে কি না ৪৪৩
জবাইকারীর সাথে অংশগ্রহণ কারীদের বিস্‌মিল্লাহ পড়ার হুকুম ৪৪৩
জবাইর সময় বিস্‌মিল্লাহ বলার পর ছুরি পরিবর্তন বা পশু পালাইলে ৪৪৪
মহিলা, নেশাগ্রস্থ, বোবা, নাবালেগ ইত্যাদি ব্যক্তি দ্বারা কুরবানী করা যাইবে কি না ৪৪৪

জবাইকারীর জন্য দোয়া ও নিয়ত জরুরী কি না ৪৪৪
কুরবানী দাতার করণীয় সম্পর্কে ৪৪৪
জবাইকারীর করণীয় ৪৪৪
পশু জবাই করিবার নিয়ম ৪৪৪
উটের নহর করা প্রসংগে ৪৪৫
জবাইকারী ইচ্ছা করিয়া বিস্‌মিল্লাহ পরিত্যাগ করিলে উহার হুকুম ৪৪৫
ঘাড়ের উপর দিয়া জবাই করা জায়েয কি না ৪৪৫
জবাইকৃত পশুর চামড়া খোলার নিয়ম ৪৪৫

কুরবানীর গোস্ত বন্টন সম্পর্কে

একাধিক ব্যক্তি একটি পশুতে অংশী হইলে উহার গোস্ত বন্টন ৪৪৫
কুরবানীর গোস্ত অন্যকে দেওয়া সম্পর্কে ৪৪৫
কুরবানীর গোস্ত বিক্রয়, বিনিময় ও মজুরী দেওয়া যাইবে কি না ৪৪৬
কুরবানীর গোস্ত শুকাইয়া রাখা প্রসংগে ৪৪৬
মৃত্যু ব্যক্তির নামে কুরবানীর গোস্ত বন্টন ৪৪৬
কুরবানীর গোস্ত কর্মচারীকে খাওয়ানো যাইবে কি না ৪৪৬

কুরবানীর চামড়া, গদি, রশি, পোশাক ইত্যাদি প্রসংগে

কুরবানীর চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে ৪৪৬
কুরবানীর চামড়া বিক্রয় ও উহার অর্থ ব্যয় করার বিধান ৪৪৬
কুরবানীর চামড়ার টাকা ঈদগাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ, রাস্তা-পোল ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাইবে কি না ৪৪৭
কুরবানীর পশুর পোশাক, গদি, রশি ইত্যাদি ব্যবহার প্রসংগে ৪৪৭
কুরবানীর চামড়া দ্বারা কিতাব বাঁধানো ও পুরস্কার দেওয়া যাইবে কি না ৪৪৭
কুরবানীর চামড়া কোন সমিতি বা কোম্পানীকে দেওয়া জায়েয কি না ৪৪৭
কুরবানীর পশুর হাড়, শিং, খুর ইত্যাদি বিক্রয় করা যাইবে কি না ৪৪৭
কুরবানীর কুসংস্কার সম্পর্কে ৪৪৭
ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত কিতাব সমূহের তালিকা ৪৪৮

অষ্টম অধ্যায়

(জামায়াত, কাজা, বেতের ও তারাবীহর মাসয়ালা)

জামায়াতে নামায পড়ার ফজীলত

জামায়াতে নামায পড়া পুরুষের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কিন্তু জামায়াতের নেকী ওয়াজিবের ন্যায়। কারণ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা জামায়াতে নামায পড়িয়া গিয়াছেন। হাদীস শরীফে আছে একা নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামায পড়ায় পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

জাওহারাতুন নাইয়ারাহ কিতাবে আছে- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে স্থানে তিনজন মুসলমান থাকা সত্ত্বেও আযান না হয় এবং জামায়াতে নামায পড়া না হয়, সে স্থানের লোকের উপর শয়তান আশ্রয় স্থাপন করে। অতএব সকলের জামায়াতে নামায পড়া কর্তব্য।

উক্ত কিতাবে আরও আছে- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একা নামায পড়ার চেয়ে জামায়াতে নামায পড়ায় ২৭ গুণ বেশী ফজীলত। যে ব্যক্তি ইমামের সহিত তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা না ছুটে এরূপভাবে চল্লিশ দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে পড়িবে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা দুইটি জিনিস হইতে আজাদী দান করিবেন। (১) সে মুনাফেকী হইতে মুক্তি পাইবে, (২) দোজখের আযাব হইতে নাজাত পাইবে।

যেখানেই থাকুক না কেন যদি কেহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সহিত আদায় করে তবে সে ব্যক্তি প্রথমে বেহেশ্‌তে গমনকারীদের সহিত বিদ্যুতের ন্যায় পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে ও তাহার মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়াছে, এরূপ এক হাজার শহীদের ছওয়াব তাহার জীবিতকালের প্রত্যেক দিনের জন্য পাইবে। (খোলাছাতুল আখবার)

প্রকাশ থাকে যে, যে জামায়াতে ৯ জন লোক থাকে, সে জামায়াতে নামায পড়িলে এরূপ ফজীলত পাইবে। ইহার চেয়ে বেশী লোক থাকিলে অসীম ছওয়াব পাইবে, সে ছওয়াবের পরিমাণ আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

আনীসুল ওয়ায়েজীন কিতাবে আছে, একদা হযরত আবূ ইয়ামামা বাহেলী (রাঃ) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাহেলী! তোমাকে চিন্তাযুক্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি কেন? হযরত বাহেলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ডাকাতেরা আমার দশটি উটের বোঝাই মাল সম্পূর্ণ লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবূ ইয়ামামা! আমি মনে করিয়া ছিলাম, তুমি বুঝি জামায়াতের তাক্‌বীরে-তাহ্‌রীমা পাও নাই, তাই এত পেরেশান হইয়াছ। তখন আবূ ইয়ামামা

জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযুর! তাক্‌বীরে-তাহ্‌রীমা না পাইলে কি দশটি উটের মাল নষ্ট হওয়ার মত ক্ষতি হয়? হযরত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করিলেন, তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা না পাইলে তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হয়। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, যাহার হাতে আমার জীবন, সেই আল্লাহ তায়ালার কসম করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় মাল হইতে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার ছওয়াব অনেক বেশী।

কিতাবে লিখিত আছে- হে মুছল্লীগণ! পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সহিত আদায় করিতে যত্নবান হও। কারণ জামায়াত অতি উত্তম তেজারত ও অতি উৎকৃষ্ট সম্পত্তি। সাবধান! সাবধান! হেলায় জামায়াত তরক করিয়া এমন অমূল্য সম্পদ হাতছাড়া করিও না। প্রথম কাতারে দাঁড়ান বেশী ফজীলত। অতএব সকলের উচিত, ইমামের প্রথম তাক্‌বীরের সঙ্গে জামায়াতে দাখিল হওয়া। যেহেতু যে ব্যক্তি প্রথম কাতারে প্রথম তাক্‌বীরের সহিত জামায়াতে নামায আদায় করিবে, সে কিয়ামতের দিন উচ্চ মরতবা প্রাপ্ত হইবে।

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা জামায়াতে নামায আদায় করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচটি নেয়ামত দান করিবেন। যথা-(১) রিজিক বৃদ্ধি হইবে। (২) কবর আযাব মাফ হইবে। (৩) কিয়ামতে হিসাবের দিন ডান হাতে আমলনামা পাইবে। (৪) বিদ্যুতের ন্যায় পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে। (৫) বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া জামায়াত তরক করিবে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা নয়টি আযাবে গ্রেফতার করিবেন। তাহার মধ্যে তিনটি দুনিয়াতে, তিনটি কবরে ও তিনটি কিয়ামতে।

দুনিয়াতে তিনটি-(১) রুজি রোজগারে বরকত পাইবে না,(২) মুখমন্ডল হইতে নেকীর জ্যোতি উঠিয়া যাইবে,(৩) লোকে তাহাকে ভাল জানিবে না।

কবরে তিনটি-(১) মন্‌কির ও নাকীরের সওয়াল অতি কঠিন হইবে, (২) কবর অতি অন্ধকার হইবে,(৩) কবর অতি সংকীর্ণ হইবে।

কিয়ামতে তিনটি-(১) কঠিনভাবে হিসাব লওয়া হইবে, (২) অতিশয় ঘর্ম হইবে,(৩) পুলছিরাত পার হইতে অতি কষ্ট পাইবে।

গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- জানাযা ব্যতীত অন্যান্য সকল নামাযের দ্বিতীয় কাতার হইতে প্রথম কাতারে ছওয়াব বেশী, এরূপ তৃতীয় কাতার হইতে দ্বিতীয় কাতারে ছওয়াব বেশী। এরূপ পর পর পিছনের কাতারে ছওয়াব কমিয়া থাকে।

বাহ্‌রুর রায়েক কিতাবে ইহার কারণ দর্শাইয়া হাদীস শরীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- আল্লাহ তায়ালা যখন রহমত নাযিল করেন, তখন প্রথম ইমামের উপর, তারপর ইমামের বরাবর পিছনের কাতারের লোকের উপর যথাক্রমে রহমত নাযিল করিয়া থাকেন। কিন্তু জানাযা নামাযে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ পিছনের কাতারে প্রথম রহমত নাযিল হয়। কারণ, জানাযা নামাযে বেশী কাতার হওয়া উদ্দেশ্য। যদি জানাযায় প্রথম কাতারে ছওয়াব বেশী হইত, তবে সকলেই প্রথম কাতারে দাঁড়াইত।

ইমামের কর্তব্য

প্রশ্নঃ- কি কি বিষয়ের প্রতি ইমামের খেয়াল রাখিতে হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- ইমাম প্রথমেই মুক্তাদীগণকে বলিয়া দিবেন যেন সকলে কাতার সোজা করিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ফাঁক বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। তারপর ইমাম কাতারের সম্মুখে মধ্যভাগে দাঁড়াইবেন। একদিকে বেশী লোক রাখিয়া দাঁড়াইলে মাকরূহ হইবে। কাজেই মেহরাব বরাবর দাঁড়াইলে দুই দিকে সমান হইবে।

১। শামী কিতাবে আছে- একজন মুক্তাদী হইলে ইমাম তাহাকে ডান পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিবেন। যদি নামায শুরু করার পর একজন মুছল্লী আসে, তবে হাত ইশারা করিয়া ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিবেন।

২। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- জামায়াতে একজনের বেশী মুক্তাদী হইলে ইমাম তাহাদিগকে পিছনে কাতার করিয়া দাঁড়াইতে হুকুম করিবেন।

৩। উক্ত কিতাবে আরও আছে- প্রথম কাতারে বালেগ পুরুষগণ দাঁড়াইবে চাই আজাদ হউক বা গোলাম, তারপর ছেলেগণ দাঁড়াইবে। তৎপর নপুংসক খোজা, তৎপর স্ত্রী লোক দাঁড়াইবে। প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রী লোকেরা কাতারের পিছনে দাঁড়াইবে।

৪। কাতারের মধ্যে ফাঁক রাখিয়া দাঁড়াইবে না। সকলে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাতার সোজা করিয়া পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইবে।

৫। উক্ত কিতাবে আরও আছে- প্রথম কাতারে ফাঁক রাখিয়া দ্বিতীয় কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গেলেও ঐ সময় অন্য মুছল্লী আসিয়া দ্বিতীয় কাতারের লোক ফাঁক করিয়া সামনের কাতারে গিয়া ফাঁক বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলে জায়েয হইবে। তাহাতে গুনাহ্ হইবে না। কারণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- নামাযের কাতারে ফাঁক দেখিলে সেই ফাঁক বন্ধ করিয়া দাঁড়ান কর্তব্য। যদি সামনের কাতারে ফাঁক রাখিয়া পিছনের কাতারে লোক দাঁড়াইয়া যায় তবে মুছল্লীর উপর দিয়া গিয়া সেই ফাঁক বন্ধ করিয়া দাঁড়াইবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করিয়া দাঁড়াইবে তাহার গুনাহ্ মাফ হইবে।

মসজিদের মধ্যে জায়গা থাকা সত্ত্বেও বিনা ওজরে তাকের মধ্যে দাঁড়াইলে মাকরূহ হইবে, যেরূপ সামনের কাতারে জায়গা থাকিতে পিছনের কাতারে দাঁড়ান মাকরূহ্। যদি কোন ওজর বশতঃ দাঁড়ায় তবে মাকরূহ্ হইবে না। যেমন মুকাব্বির হইবার জন্য। হাদীস শরীফে আছে- যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করে, তাহাকে আল্লাহ ভঙ্গ করেন। এই হাদীসের মর্মে বুঝা যায়, ইহা মাকরূহ তাহ্রীম।

৬। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- ইমামের কর্তব্য যে, সুন্নাতের চেয়ে বেশী দীর্ঘ কিরাত পড়িবে না, পড়িলে মাকরূহ তাহ্রীম হইবে। কারণ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতে লম্বা কিরাত পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

বাহরুর রায়েক, গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- জামায়াতে লম্বা কিরাত না পড়া ইমামের জন্য ওয়াজিব। কারণ, জামায়াতের মধ্যে পীড়িত, বৃদ্ধ ও দুর্বল লোক থাকিতে পারে।

৭। শামী কিতাবে আছে- মুছল্লীর সংখ্যার অনুপাতে উচ্চঃস্বরে তাক্‌বীর বলা ইমামের কর্তব্য। তবে অতিরিক্ত উচ্চ শব্দে তাক্‌বীর বলা নীতি বিরুদ্ধ কিন্তু মাকরূহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম অন্যায়।

৮। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- রুকূ সিজদায় ইমাম পাঁচ তাসবীহ পড়িবে। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে, যদি মুক্তাদীগণ বিরক্ত না হয়, তবে পাঁচ তাসবীহের বেশী বলিতে পারে।

৯। বাহরুর রায়েক, মাজমাউল আন্‌হুর, শরাম্বালালিয়া, মারাকিল ফালাহ্ প্রভৃতি কিতাবে আছে- একামত বলা শেষ হইলে নামায আরম্ভ করিবে। দোররুল মোখতার, শামী গায়াতুল আওতার ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে আছে- ছহীহ কওল মতে একামতের পর ইমামের নামায আরম্ভ করা মুস্তাহাব।

১০। শামী কিতাবে আছে-যে নামাযের পরে সুন্নাত নাই, সেই নামাযের সালাম ফিরাইয়া ইমাম পূর্বদিকে ঘুরিয়া ডান বা বাম পার্শ্বে বসিবে(মুস্তাহাব)। উক্ত কিতাবে আরও আছে- একজন মুক্তাদি হইলে ইমামের ফিরিতে হইবে না। কারণ, একজন মুক্তাদি হইলে ইমামের পাশে থাকে।

১১। নূরুল ইজাহ কিতাবে আছে- অনুপযুক্ত মুক্তাদিকে ইমাম খলীফা নিযুক্ত করিবে না। করিলে নামাজ ফাছেদ হইবে।

১২। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- ইমাম মুখস্থ কিরাত পড়িতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সামনে কোন লেখা দেখিয়া কিরাত পড়িলে নামায ফাছেদ হইবে। যদি কেহ মুখস্থ কিরাত পড়িতে না পারে, তবে শুধু রুকূ সিজদাহ্ করিয়া নামায আদায় করিবে।

১৩। মুক্তাদী ব্যতীত অন্যের তালীমে ইমাম কিরাত সংশোধন করিয়া পড়িলে নামায ফাসেদ হইবে।

১৪। স্ত্রীলোক জামায়াতে আসিবার সম্ভাবনা থাকিলে স্ত্রীলোকের নিয়ত করাও ইমামের কর্তব্য। নচেৎ স্ত্রীলোকের নামায ছহীহ হইবে না। (আলমগীরী)

১৫। আলমগীরী কিতাবে আছে-ইমাম ইমামতির নিয়ত করিলে জামায়াতের ফজীলত পাইবে। হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী কিতাবে আছে- ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা মুস্তাহাব।

১৬। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- ইমাম রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ ও আমীন চুপে চুপে বলিবে।

১৭। ইমাম প্রথমে ডানদিকে ও পরে বামদিকে সালাম ফিরাইবে কিন্তু প্রথম সালামের চেয়ে দ্বিতীয় সালামের শব্দ কিছু ছোট আওয়াজে বলিবে।

৩—

মুক্তাদির কর্তব্য

প্রশ্নঃ- মুক্তাদীগণ ইমামের সহিত জামায়াতে কিরূপভাবে নামায পড়িবে তৎসম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- নিম্নে কতক মাসয়ালা বলিতেছি স্মরণ রাখিও

১। কা'বা গৃহের মধ্যে নামায পড়িবার সময় মুক্তাদীগণ ইমামের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া দাঁড়াইলে নামায ছহীহ হইবে।

২। ইমাম যে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছে ঐ ইমামের ডান ও বাম পার্শ্বের মুক্তাদী যদি ইমাম হইতে বেশী নিকটবর্তী হইয়া দাঁড়ায়, তবে মুক্তাদীর নামায ছহীহ হইবে না।

৩। নিয়ত করিয়া নামায আরম্ভ করিবে। (আলমগীরী)

৪। যদি কেহ ওজরে দেলে নিয়ত না করিয়া শুধু মুখে নিয়ত করিয়া নামায পড়ে তবে নামায ছহীহ হইবে।

৫। ইমামের তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলার পরই মুক্তাদীগণের এক্তেদা করা উত্তম। (কবীরী)

৬। জুম্‌আ, ঈদ, ও জানাযা নামাযে ইমামের প্রতি মুক্তাদীগণের জন্য এক্তেদা করা শর্ত নহে। কারণ, জুম্‌আ ও ঈদের জন্য জামায়াত হওয়া শর্ত। কাজেই এক্তেদা না করিলেও ছহীহ হইবে।

৭। মুক্তাদীগণ ইমামের এক্তেদা করিয়া নিয়ত করিবে। নচেৎ নামায ছহীহ হইবে না। (আলমগীরী)

৮। মুক্তাদী ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিবে। ইমামের পূর্বে মুক্তাদী 'বার' শব্দ বলিয়া শেষ করিলে মুক্তাদীর নামায ছহীহ্ হইবে না। (আলমগীরী)

৯। ইমাম রুকূ সিজদাহ্ হইতে মাথা উঠাইলে মুক্তাদীও সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঠাইবে। তিনবার তাসবীহ বলার জন্য গৌণ করিবে না। (শামী)

১০। ইমামের পূর্বে মুক্তাদী মাথা উঠাইলে সঙ্গে সঙ্গে রুকূতে যাইবে। নচেৎ মাকরূহ তাহ্‌রীমের গুনাহ হইবে। (আলমগীরী)

১১। মুকীম ইমামের ৪ রাকয়াত বিশিষ্ট ফরজ নামাযের সহিত মুসাফির অবস্থায় কাজা নামাযের এক্তেদা করিলে ছহীহ হইবে না। (মুনিয়া)

১২। মুক্তাদী ইমাম হইতে সামনে বাড়িয়া দাঁড়াইবে না।

১৩। ইমামের বিপরীতমুখী হইয়া মুক্তাদী দাঁড়াইবে না।

১৪। ইমামের কিরাত পাঠকালীন মুক্তাদীর চুপ থাকা ওয়াজিব।

১৫। ইমামের প্রথম বৈঠকের তাবেদারীর জন্য মাছবুকেরও বসা কর্তব্য।

১৬। শামী কিতাবে আছে ইমামের ওয়াজিব তরক হইলে ইমাম যদি উহার প্রতিকার না করে, তবে মুক্তাদীর পুনঃ দোহরাইয়া নামায পড়া ওয়াজিব।

১৭। মুক্তাদীর প্রথম তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই ইমাম দাঁড়াইয়া গেলে তাশাহহুদ পূর্ণ করিয়া দাঁড়ান মুক্তাদীর জন্য ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে আনকারাবী)

১৮। মুক্তাদী যদি ভুলে তাশাহ্হুদ না পড়িয়া ইমামের সহিত দাঁড়াইয়া যায় ও পরে তাহা মনে হয়, তাহা হইলে বসিয়া তাশাহ্হুদ পূর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে।

১৯। ইমামের সঙ্গে মুক্তাদী সালাম ফিরাইবে।

২০। ইমামের তাক্‌বীর শুনিতে না পাইলে মুক্তাদীগণের মধ্য হইতে একজনের মুকাব্বির হওয়া উচিত।

২১। ইমামের তাক্‌বীর মুক্তাদীগণ শুনিতে পাওয়া সত্ত্বেও কেহ মুকাব্বির হইলে তাহার মাকরূহ তাহ্‌রীমের গুনাহ হইবে। (দুররুল মোখতার)

২২। মুক্তাদীগণের সুবহানাকা পড়িতে হইবে।

২৩। অপ্রকাশ্য নামায যথা যোহর ও আছরের নামাযে যদি মুক্তাদী ইমামকে রূকু অবস্থায় পায়, তখন যদি তার এধারণা হয় যে, ছানা পড়ার পর ইমামকে রূকুতে পাইবে। তাহা হইলে ছানা পড়িবে নচেৎ পড়িবে না।

২৪। ইমামের সহিত নামায পড়িবার সময় মুক্তাদীর ছানা পড়িতে হইবে। মুক্তাদী যদি ইমামের ফাতিহা বা কিরাত পড়ার সময় জামাআতে দাখিল হয় তবে ছানা পড়িবে না। (কবীরী)

২৫। মুক্তাদীর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়িতে হইবে না। উহা কিরাতের সঙ্গীয় বিধায় একা নামাযী ও ইমামের পড়িতে হইবে।

২৬। মুক্তাদী ও মোনফারেদ (একা নামাযী) ফাতিহা পড়ার পর আমীন বলিবে। (গায়াতুল আওতার)

২৭। ইমামের সালামের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তাদীগণ চুপে সালাম বলিয়া ডানে বামে মুখমণ্ডল ফিরাইবে। (আলমগীরী)

২৮। যদি অন্য মাযহাবের ইমাম হানাফী মাযহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামায পড়ে, তাহা হইলে হানাফী মাযহাবের মুক্তাদী তাহার পিছনে এক্তেদা করিতে পারে। হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী কিতাবের মর্মে এরূপ জানা যায়।

ইমামের সহিত মুক্তাদীগণের দাঁড়াইবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- একজন মুক্তাদী হইলে ইমামের ডান পার্শ্বে কিরূপভাবে দাঁড়াইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- ইমামের পায়ের টাখ্‌নু মুক্তাদীর পায়ের টাখ্‌নু বরাবর রাখিয়া দাঁড়াইবে।

প্রশ্নঃ- ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ্ হইতে নাকি রেওয়ায়েত আছে যে, ইমামের টাখ্‌নু বরাবর মুক্তাদীর পায়ের অঙ্গুলী রাখিবে। এমতস্থলে আমরা কোন মত অবলম্বন করিব?

উত্তরঃ- উক্ত শামী কিতাবের মতানুযায়ী আমল করিও। কেননা হেদায়া কিতাবে ঐ নিয়মকে জাহের রেওয়ায়েত বলিয়া লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ এক পা টাখ্‌নু বরাবর ও অপর পা অগ্রবর্তী করিয়া দেয়, তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ এক পা অগ্রবতী করিয়া মুক্তাদী দাঁড়াইলে নামায হইবে কিনা তাহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু মুক্তাদীর নামায ছহীহ্ হইবে না, এই মতই শুদ্ধ। যদি এক পা ইমামের টাখ্‌নু বরাবর ও অপর পা পিছনে থাকে তাহা হইলে নামায হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি ইমামের চেয়ে মুক্তাদী লম্বা হয় কিংবা মুক্তাদীর পা ইমামের পায়ের চেয়ে লম্বা হয় তাহা হইলে কি হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- মুক্তাদীর টাখ্‌নু ইমামের টাখ্‌নু বরাবর থাকা সত্ত্বেও যদি পা লম্বা ও কদ দীর্ঘ থাকার দরুন পায়ের অঙ্গুলী ও মাথা অগ্রবর্তী হইয়া পড়ে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না, নামায শুদ্ধ হইবে। মুক্তাদী ছোট বড় কিংবা দীর্ঘ ও খাট হওয়া ধর্তব্য নহে। ইমামের টাখ্‌নু বরাবর থাকিলেই নামায হইবে। অথবা ইমামের চেয়ে মুক্তাদীর পা কিছু পিছে থাকিলেও নামায হইবে।

প্রশ্নঃ- ইমামের পা হইতে মুক্তাদীর পা যৎকিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হইয়া গেলেও কি মুক্তাদীর নামায নষ্ট হইবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- যদি উভয়ের টাখ্‌নু সমান রাখা সত্ত্বেও মুক্তাদীর পা যৎকিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী হয় তবে নামায হইবে। কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় মুক্তাদীর পা বড় হওয়ার দরুন ইমামের পায়ের অধিকাংশ ভাগের বেশী অগ্রবর্তী হইলে মুক্তাদীর নামায হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি মুক্তাদী বিকলাঙ্গ হয় ও নামাযে দাঁড়াইলে এক পা ইমামের চেয়ে অগ্রবর্তী হয় তাহা হইলে কি হুকুম?

উত্তরঃ- তাহা বিকলাঙ্গ ব্যক্তির ওজর বশতঃ হইয়াছে কিন্তু যে পায়ে ভর করিয়া নামাযে দাঁড়ায়, সেই পা ইমামের টাখ্‌নু বরাবর রাখিয়া দাঁড়াইলে নামায হইবে।

প্রশ্নঃ- ইশারায় নামায পড়িবার সময় মুক্তাদী লম্বা হওয়ার দরুন তাহার মাথা ইমামের মাথার অগ্রবর্তী হইলে নামায হইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়- ইশারায় নামায পড়িলে ইমামের মাথা ও মুক্তাদীর মাথা বরাবর হওয়া শর্ত। টাখ্‌নু অগ্র পশ্চাতের কোন শর্ত নাই, কাজেই ইশারায় নামায পড়িলে মুক্তাদীর মাথা যেন ইমামের মাথার অগ্রে না যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। নচেৎ নামায হইবে না।

প্রশ্নঃ- ইমাম রুকূ সিজদাহ্ করিয়া নামায পড়ে কিন্তু মুক্তাদী ইশারায় নামায পড়ে কিংবা ইমাম সুস্থ ও মুক্তাদী পীড়িত, এমতাবস্থায় কিরূপ ভাবে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- এমতাবস্থায় মুক্তাদী ইমামের বরাবর কিংবা কিছু পিছনে বসিবে।

প্রশ্নঃ- ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে বসিয়া ইশারায় কিংবা চিৎভাবে অথবা কাৎভাবে নামায পড়িলে কিরূপভাবে নামায আদায় করিবে।

উত্তরঃ- বসিয়া কিংবা চিৎভাবে কিবলার দিকে পা বিস্তার করিয়া নামায পড়িতে হইলে মুক্তাদীর মাথা ইমামের মাথার চেয়ে সম্মুখে বাড়িয়া গেলে নামায হইবে না। কিন্তু পা অগ্র পশ্চাৎ হওয়ায় দোষ নাই। আর যদি উভয়ে কাৎভাবে শয়ন করিয়া নামায পড়ে তবে মাথা অগ্র পশ্চাৎ হওয়ায় নামায বাতিল হইবে না। মাত্র মুক্তাদী ইমামের পিছনে থাকিলেই হইল।

কোন্ ইমামের পিছনে কে এক্তেদা করিবে

১। স্ত্রীলোক ও খোজা ইমামের পিছনে পুরুষ লোক এক্তেদা করিবে না এবং বালকের পিছনে বয়স্ক পুরুষ এক্তেদা করিবে না। করিলে নামায ফাসেদ হইবে।

২। পাগল ও বেহুঁশ লোকের পিছনে এক্তেদা করিলে নামায ফাসেদ হইবে। যেরূপ পাগল হউক না কেন।

৩। মাজুরের পিছনে সুস্থ লোকের এক্তেদা করা জায়েয নাই। কেননা মাযুরের অজু কামেল নহে।

৪। বালক বালকের পিছনে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের পিছনে এবং মাযুর মাযুরের পিছনে এক্তেদা করা জায়েয। ইহার বিপরীত জায়েয নাই।

৫। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- সমশ্রেণীর লোক সমশ্রেণীর লোকের এক্তেদা করিতে পারে বটে, কিন্তু চারি প্রকার লোক সমশ্রেণীর ইমামের পিছনে এক্তেদা করিতে পারে না। (১) খোনছায়ে-মোশকেল খোনছায়ে-মোশকেলার পিছনে, (২) যে স্ত্রীলোকদের সর্বদা রক্তস্রাব হয় তাহারা একে অপরের পিছনে এক্তেদা করিতে পারে না। (৩) হায়েজের নির্দিষ্ট দিনের পরও যাহার রক্তস্রাব হয় এরূপ স্ত্রীলোকের একে অপরের এক্তেদা করা জায়েয নাই। (৪) মাত্রই কিরাত জানেনা এমন ইমামের পিছনে, যে এক আয়াত পরিমাণ কিরাত জানে তাহার এক্তেদা করা জায়েয নাই।

৬। বোবা ও অশিক্ষিত লোক একত্র হইলে অশিক্ষিত ব্যক্তি ইমাম হইবে। বোবার ইমামতি করা জায়েয নাই। কিন্তু যে অশিক্ষিত লোক তাহ্রীমাও ঠিক রাখিতে পারে না, এরূপ অশিক্ষিত লোকের বোবার পিছনে এক্তেদা করা জায়েয আছে।

৭। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে উলঙ্গ ব্যক্তির এক্তেদা করা জায়েয আছে কিন্তু কাপড় পরিধানকারী উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে এক্তেদা করা জায়েয নাই। যদি উলঙ্গ ব্যক্তি ইমাম হয় ও কাপড়ওয়ালা এবং উলঙ্গ ব্যক্তি তাহার এক্তেদা করে, তবে উলঙ্গ ব্যক্তির নামায হইবে কিন্তু কাপড়ওয়ালা ব্যক্তির নামায হইবে না।

তদ্রূপ যখমওয়ালা ব্যক্তির পিছনে যখমওয়ালা ও ভাল লোক এক্তেদা করিলে ভাল লোকের নামায হইবে না। কিন্তু অশিক্ষিত লোক ইমাম হইলে, কারী এবং অশিক্ষিত লোক তাহার এক্তেদা করিলে সকলের নামায বাতিল হইবে। কারণ, হাদীসের মর্মে জানা যায় ইমামের কিরাতে মুক্তাদীর কিরাত হইয়া থাকে সে জন্য সকলের নামায বাতিল হয়। কিন্তু উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া তদ্রূপ নহে, যেহেতু ইমামের ছতর ঢাকায় মুক্তাদীর ছতর ঢাকার কার্য সারে না।

৮। নফল নামায পাঠকের পিছনে ফরজ পাঠকারীর এক্তেদা করা জায়েয নাই। এক ওয়াক্তের ফরজ পাঠকারীর পিছনে অপর ওয়াক্তের ফরজ পাঠকারীর এক্তেদা করা জায়েয নাই।

৯। ফরজ বা নফল নামায পাঠকারীর পিছনে মান্নত নামায পাঠকের এক্তেদা করা জায়েয নাই। কিন্তু দুই জনের একই মান্নত নামায হইলে একে অপরের এক্তেদা করিতে পারে। (দোররুল মোখতার)

একই মান্নতের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি কোন নামায পড়িবে বলিয়া মান্নত করিল। অপর ব্যক্তি বলিল, আমিও ঐ নামায মান্নত করিলাম। এমতাবস্থায় উভয়ে একত্রে নামায পড়িতে পারে। (শামী)

১০। কছমের নামাযীর পিছনে নজর (মান্নত) নামাযের এক্তেদা করা জায়েয নাই। কিন্তু ইহার বিপরীত জায়েয আছে। কছমের নামায পড়নেওয়ালার পিছনে নফল নামায পড়নে ওয়ালার এক্তেদা করা জায়েয আছে।

১১। তাওয়াফের নামায পড়নেওয়ালাদের একের পিছনে অপরের এক্তেদা করা জায়েয নাই। কিন্তু এই নামাযকে যাহারা সুন্নাত বলিয়াছেন, তাহাদের মতে জায়েয আছে।

১২। একই নফল নামায দুইজনে শুরু করিয়া ছাড়িয়া দিলে একে অন্যের এক্তেদা করিতে পারে। যেমন তারাবীহ নামায এক ইমামের পিছনে উভয় মুক্তাদী আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া পুনঃ তাহারা একে অপরের পিছনে পড়িতে পারে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামায ছাড়িয়া দিয়া একে অপরের পিছনে পড়িতে পারিবে না।

১৩। গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, দুইজনে একত্রে ইমামতীর নিয়তে নামায আরম্ভ করিয়া কেহ কাহারও এক্তেদা না করিয়া নামায আদায় করিলে উভয়ের নামায হইয়া গিয়াছে। যদি একে অন্যের এক্তেদা করতঃ নামায আদায় করিয়া থাকে তবে কাহারও নামায হয় নাই।

১৪। মুকীম ইমামের জোহর, আছর ও এশার সহিত মুসাফিরের কাজা কছরের এক্তেদা করা ছহীহ্ নহে।

১৫। ওয়াক্ত থাকিতে মুকীম ইমামের পিছনে মুসাফিরের এক্তেদা করা জায়েয নাই, যদিও মুকীম ইমামকে নামাযের মধ্যে পায় ও বাকী নামায আদায়ের ওয়াক্ত না

থাকে। এমতাবস্থায় এক্তেদা করা জায়েয কিন্তু ইমামের তাবেদারীর জন্য মুসাফির চারি রাকয়াত আদায় করিবে।

১৬। এক সওয়ারীতে একের অধিক লোক থাকিলে একে অন্যের এক্তেদা করা জায়েয আছে।

১৭। গায়াতুল আওতার কিতাবে ছহীহ্ কওল মতে জানা যায়, তোৎলা তোৎলার ইমামতী করিতে পারিবে বটে কিন্তু ভাল লোকের ইমামতী করিতে পারিবে না। যদি ভাল কিরাত জানা লোক থাকা সত্ত্বেও তোৎলা ইমামতী করে, তবে তোৎলা ইমামের নামায ফাসেদ হইবে। তোৎলার শেষ জীবন পর্যন্ত কোশেশ করা উচিৎ। ফরজ কিরাত আদায় করিতে সক্ষম হয় এই পরিমাণ পড়িতে পারিলে চেষ্টা না করিলে গুনাহ হইবে না।

১৮। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- এক্তেদাকারী মুক্তাদীর যদি কোন কারণে এক্তেদা বাতিল হইয়া যায়, তবে ঐ এক্তেদার নিয়তে নিজের নফল নামায আদায় করিলেও ছহীহ্ হইবে না।

১৯। পুরুষের পিছনে স্ত্রীলোক দাঁড়াইলে ও সেই স্ত্রীলোকের পিছনে পুরুষ দাঁড়াইলে পিছনের পুরুষের নামায বাতিল হইবে। যথা- একজন কি দুই জন স্ত্রীলোকের ঠিক পিছনের কাতারের দুইজন পুরুষের নামায বাতিল হইবে। পিছনের কাতারের বাকী সকলের কাহারও নামায বাতিল হইবে না। তিনজন স্ত্রীলোকের পিছনে দাঁড়াইলেও পিছনের কাতার সমূহের বরাবর তিনজন করিয়া সকলের নামায বাতিল হইবে। এক কাতারে সকল স্ত্রীলোক থাকিলে পিছনে পুরুষের যত কাতার থাকুক না কেন, সকলের নামায বাতিল হইবে। যদিও এই কথা যুক্তির বাহির বলিয়া মনে হয় কিন্তু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অবলম্বনে হযরত ওমর (রাঃ) এর মতে স্ত্রীলোকের কাতারের পিছনের সকল কাতারের পুরুষের নামায বাতিল হইবে। (গায়াতুল আওতার)

ইমাম সম্পর্কীয় মাসয়ালা

১। যদি সন্দেহ হয় যে, ইমাম মুক্তাদীর মায্হাবের প্রতি লক্ষ্য করে কিনা, তাহা হইলে এক্তেদা করা মাকরূহ্ হইবে।

২। যদি জানে যে, ইমাম মুক্তাদীর মাযহাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবে না, তাহা হইলে এক্তেদা করা জায়েয হইবে না। (গায়াতুল আওতার)

৩। যদি জানে যে, ভিন্ন মায্হাবের ইমাম মুক্তাদীর মায্হাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, তাহা হইলে এক্তেদা করা জায়েয হইবে।

৪। ইমাম নামাযের মধ্যে সুন্নাত কিরাতের চেয়ে দীর্ঘ কিরাত পড়িলে মাকরূহ্ হইবে।

৫। মজুরী লইয়া ইমামতী করা মাকরূহ্ কিন্তু বর্তমান যামানায় ওজর বশতঃ মাকরূহ্ হইবে না।

৬। কম আকেল ও দাড়িবিহীন অল্প বয়স্ক লোকের ইমামতী করা মাকরূহ।

৭। এরূপ ফাজেল অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ কিংবা যাহার শরীরের অধিকাংশ কাল বা সাদা দাগ বিশিষ্ট যাহাকে ফাফর বলে, এরূপ লোকের ইমামতী করা মাকরূহ্।

৮। শরাবখোর, সুদখোর, চোগলখোর, রিয়াকার ও মোতাকাল্লেফ (বানাওটি করনেওয়ালা) লোকের ইমামতী করা মাকরূহ।

৯। ফাসেক ব্যক্তি আলেম হইলেও তাহার ইমামতী করা মাকরূহ। কারণ ইমাম হইলে তাহার তাজিম করা আবশ্যক। অথচ কিতাব মতে ফাসেক তাজীমের যোগ্য নহে। এমতাবস্থায় তাহাকে ইমাম বানাইলে মাকরূহ্ হইবে। (গায়াতুল আওতার)

১০। বিদ্‌য়াতীর ইমামতী করা মাকরূহ্।

১১। হারামজাদার ইমামতী করা মাকরূহ্। জামেউর রমুজ, বাহ্‌রুর রায়েক, হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী প্রভৃতি কিতাবে ইহাকে মাকরূহ্ তান্‌জীহ লিখিয়াছে। হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী কিতাবে ইহার কারণ লিখিয়াছে যে, ঐরূপ লোকের মুরব্বি না থাকায় প্রায়ই জাহেল (অশিক্ষিত) ও বে-আদব হইয়া থাকে। নচেৎ ঐরূপ লোক যদি আবশ্যকীয় মাসয়ালা-মাসায়েল জানে ও স্বভাব চরিত্র ভাল হয় এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে পরহেজগার হয়, তাহা হইলে ইমামতী করা মাকরূহ্ নহে।

১২। গোলাম আজাদ হইলেও হোর অর্থাৎ স্বাধীন লোকের ইমামতী করা মাকরূহ্। ঐরূপ তুর্কমান, কুর্দ্দ (অসভ্য বর্ব্বর জাতীয় লোক) ও জাহেল লোকদেরও অন্যান্য লোকদের ইমামতী করা মাকরূহ।

১৩। (১) ফাসেক, (২) অন্ধ অথবা (৩) যে লোক দিনে ও রাত্রে ভালমত দেখিতে পায় না, এরূপ লোকের ইমাম হওয়া মাকরূহ্। তবে যদি উপস্থিত লোকের মধ্যে ফাসেক ব্যতীত উক্ত দুই ব্যক্তির কেহ বেশী আলেম হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে যে বেশী আলেম তাহারই ইমাম হওয়া উত্তম। ফাসেক ব্যক্তি আলেম হইলেও ইমামতী করা মাকরূহ্।

১৪। কোন ব্যক্তি কতক লোকের ইমাম হইলে তাহারা যদি ঐ ইমামের প্রতি কোন দোষারোপ করে, তবে দেখিতে হইবে যে, সেই ইমামের মধ্যে উক্ত দোষ আছে কিনা অথবা উপস্থিত লোকদের মধ্যে তাহার চেয়ে বেশী উপযুক্ত ইমাম হইবার যোগ্য লোক আছে কিনা, যদি থাকে তাহা হইলে তাহার ইমামতী করা মাকরূহ্ তাহ্‌রীম হইবে। যদি ইমামের ঐরূপ কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও মুক্তাদীগণ দোষারোপ করে, তাহা হইলে মুক্তাদীগণের মাকরূহের গুনাহ হইবে।

আবূ দাউদ শরীফে আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মুক্তাদীগণ আপত্তি করা সত্ত্বেও যদি দোষী ব্যক্তি ইমামতী করে, তবে তাহার নামায আল্লাহ তায়ালা কবুল করিবেন না।

ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়াইবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- ইমাম ও মুক্তাদী কিভাবে দাঁড়াইবে তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে চাই।

উত্তরঃ- জামায়াতে নামায পড়িবার সময় ইমাম ও মুক্তাদীর কিরূপভাবে দাঁড়াইতে হয় তৎসম্বন্ধে কতক মাসয়ালা নিম্নে লিখিত হইলঃ

১। গায়াতুল আওতার কিতাবে ছহীহ্ কওল মতে জানা যায়- একজন মুক্তাদী বালক হইলেও (আলমগীরীতে আছে, যে বালক নামায বুঝে এমন বালক) ইমামের বরাবর ডাহিন পাশে দাঁড়াইবে। একজন মুক্তাদী হইলে বাম পাশে দাঁড়াইলে মাকরূহ্ তানজীহ্ হইবে। এরূপ একজন মুক্তাদী পিছনে দাঁড়াইলে মাকরূহ তানজীহ হইবে কিন্তু স্ত্রীলোক হইলে ইমামের পিছনে দাঁড়াইবে। (শামী)

২। যদি একজনের বেশী মুক্তাদী হয় তাহা হইলে ইমামের পিছনে দাঁড়াইবে। দুইজন মুক্তাদীর মধ্যে দাঁড়াইলে মাকরূহ্ তান্‌জীহ্ হইবে। শামী কিতাবে আছে- ইমাম একজন মুক্তাদী সঙ্গে করিয়া দাঁড়াইলে পিছনের মুক্তাদীগণের নামায মাকরূহ্ হইবে, ইমামের মাকরূহ্ হইবে না।

৩। যদি দুইজনের বেশী মুক্তাদী হয়, এমতাবস্থায় ইমাম মধ্যে দাঁড়াইলে মাকরূহ্ তাহ্‌রীম হইবে। শামী কিতাব হইতে গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছেন দুইজনের বেশী মুক্তাদী হইলে ইমামের ওয়াজিব যে মুক্তাদীগণের সম্মুখে দাঁড়ায়।

৪। ইমামের পাশে যদি একজন নামাযে দাঁড়ায় ও বাকী বহু সংখ্যক লোক ইমামের পিছনের কাতারে নামায পড়ে তাহা হইলে মাকরূহ্ হইবে ইহাতে মতভেদ নাই।

(গায়াতুল আওতার)

৫। যদি একজন মুক্তাদী ইমামের এক পাশে দাঁড়ায় ও তৎপর আর একজন মুক্তাদী অপর পাশে দাঁড়ায়, কেহ কেহ বলেন, এমতাবস্থায় ইমাম এক পা সামনের দিকে বাড়িয়া যাইবে। কেহ কেহ বলেন, প্রথম মুক্তাদী পিছনের দিকে সরিয়া যাইবে। কেহ বলিয়াছেন, দ্বিতীয় মুক্তাদী নামাযের নিয়ত করিয়া প্রথম মুক্তাদীকে টানিয়া পিছনে আনিয়া দাঁড়াইবে। নিয়ত না করিয়া প্রথম মুক্তাদীকে টানিয়া লইলেও দোষ হইবে না। এরূপভাবে দুইজন ইমামের দুই পাশে দাঁড়াইয়া গেলে ইমাম দুইজনকে পিছনে সরিয়া যাইতে ইশারা করিবে। এই আমলটিই উত্তম। কারণ, ইমাম স্বাধীন ও মুক্তাদী অধীন। কাজেই মুক্তাদীর কর্তব্য ইমামের পিছনে দাঁড়ানো।

(গায়াতুল আওতার)

মুসলিম শরীফে আছে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন- আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে হুযুরের বাম পাশে নামাযে দাঁড়াইয়াছিলাম তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধরিয়া ডাহিন পার্শ্বে আনিলেন। তৎপরই ইবেন ওমর (রাঃ) আসিয়া হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাম পাশে দাঁড়াইলেন। অমনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দুইজনকে ধরিয়া পিছনে সরাইয়া দিলেন। (গায়াতুল আওতার)

ইমাম নির্বাচন করার বিবরণ

প্রশ্নঃ- অনেক লোক একস্থানে উপস্থিত থাকিলে কে ইমামতী করিবে?

উত্তরঃ- ইমাম নির্বাচন সম্বন্ধে বহু কথা জানা দরকার। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি নামাযের ফরজ আদায় হয় কমপক্ষে এই পরিমাণ কিরাত জানে; কেহ বলিয়াছেন- ওয়াজিব পরিমাণ কিরাত জানে; কেহ বলিয়াছেন- সুন্নাত পরিমাণ কিরাত জানে; এই শেষ কথার প্রতিই আমল। নামাযের মাসয়ালা সমূহ জানে ও প্রকাশ্য গুনাহ হইতে পরহেজ করে, এমন লোকের ইমাম হওয়া উচিৎ।

প্রশ্নঃ- যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি উল্লিখিত পরিমাণ কিরাত জানে, তবে কে ইমাম হইবেন?

উত্তরঃ- দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ইমামতী সম্বন্ধে যদি বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত বিষয় গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে-

১। কিরাত সম্বন্ধে দুইজন একরূপ হইলে যিনি তাজ্‌বীদ ভাল জানেন, তিনি ইমাম হইবেন।

২। যদি তাজ্‌বীদেও দুইজন বরাবর হন, তবে যিনি বেশী পরহেজগার তিনি ইমাম হইবেন।

৩। তাহাতেও সমান হইলে যিনি বেশী দিন যাবত পরেহজগারী অবলম্বন করিয়াছেন তিনি ইমাম হইবেন। যদি তাহাতেও সমতুল্য হন, তবে যিনি বয়স বিশিষ্ট অর্থাৎ বেশী দিন হয় মুসলমানী কবুল করিয়াছেন, বয়স কম হইলেও তিনি ইমাম হইবেন।

৪। যদি পরহেজগারীতে সমতুল্য হন, তবে যাহার স্বভাব ভাল (খোশ খাছলত) তিনি ইমাম হইবেন।

৫। যদি তাহাতেও বরাবর হন তবে যাহার চেহারা সুন্দর অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায পড়েন তিনি ইমাম হইবেন।

৬। যদি তাহাতেও সমান হয়, তাহা হইলে যাহার হাছব উচ্চ অর্থাৎ যাহার পিতা বুযুর্গী, দ্বীনদারী ও ছাখাওয়াতী কাজে মর্যাদা সম্পন্ন হইবেন, তিনি ইমাম হইবেন।

৭। তাহাতেও বরাবর হইলে যাহার খান্দান বা বংশ দ্বীনদারীতে উচ্চমর্যাদা বিশিষ্ট হইবে, তিনি ইমাম হইবেন।

৮। তাহাতেও সমপর্যায়ের হইলে যাহার গলার স্বর সুমিষ্ট তিনি ইমাম হইবেন।

৯। তাহাতেও সমপর্যায়ের হইলে যাহার স্ত্রী ভাল অর্থাৎ দ্বীনদার পরহেজগার হইবে, তিনি ইমাম হইবেন।

১০। যদি স্ত্রীও সমগুণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে যাহার হালাল মাল বেশী তিনি ইমামতী করিবেন।

১১। যদি হালাল মালেও সমান হয়, তবে সকলে যাহাকে বেশী মান্য করে তিনি ইমাম হইবেন।

১২। তাহাতেও সমান হইলে যাহার লেবাছ পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তিনি ইমাম

হইবেন।

১৩। তাহাতেও যদি সমান হয়, তাহা হইলে যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেয়ে মাথা অপেক্ষাকৃত বড়, তিনি ইমাম হইবেন।

১৪। তাহাতেও সমতুল্য হইলে যিনি মুকীম তিনি ইমাম হইবেন।

১৫। যদি মুকীমে মুকীমে ও মুসাফিরে মুসাফিরে সমান হয়, তাহা হইলে ভোট লইয়া যাহার প্রতি বেশী ভোট হয়, তিনি ইমাম হইবেন। হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে আছে- যে দিকে আলেম ভোটারের সংখ্যা বেশী হইবে। শামী, হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে, ঐরূপ আলেম যাহারা নামাযের মাসয়ালা ভাল জানে।

১৬। শামী, মারাকিল ফালাহ, তাহতাবী, মোলতাকাল আবহোর,শরহে বেকায়ার হাশিয়া প্রভৃতি কিতাবের ইমামতীর বয়ানের মর্মে জানা যায়, ভোটে বরাবর হইলে কোরআ ঢালিবে; অর্থাৎ লটারী করিবে। তাহাতে যাহার নাম উঠিবে, তিনি ইমাম হইবেন।

প্রশ্নঃ- যদি আছ্লী হোর (জন্মগত স্বাধীন) ও আজাদ (ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত) একত্র হয়, তবে কে ইমাম হইবে?

উত্তরঃ- হোর ইমাম হইবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ফরজ গোসলের হাজত থাকায় ওজর বশতঃ গোসল ও ওজুর বদলে তায়াম্মুম করিয়া থাকে এবং অন্য একজন অজুর বদলে তায়াম্মুম করিয়া থাকে, এমতাবস্থায় কে ইামাম হইবে?

উত্তরঃ- ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুমকারী ইমাম হইবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- বাড়ীওয়ালা ও অন্যলোক একত্রিত হইলে কে ইমাম হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- বাড়ীওয়ালা ইমামতীর উপযুক্ত হইলে অন্য লোক বেশী উপযুক্ত হইলেও বাড়ীওয়ালা ইমাম হইবেন। মসজিদের নির্দিষ্ট ইমামেরও এই হুকুম; কিন্তু বাদশাহ বা কাজী উপস্থিত থাকিলে বাদশাহ বা কাজী ইমাম হইবেন।

প্রশ্নঃ- মুক্তাদীগণ ভাল মন্দ বিচার না করিয়া উচ্চ দরজার লোক থাকা সত্ত্বেও নিম্ন দরজার লোককেই ইমাম বানাইলে দোষ হইবে কি না?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- উচ্চ শ্রেণীর লোক থাকা সত্ত্বেও নিম্ন শ্রেণীর লোককে ইমাম বানাইলে খারাবী হইবে। প্রকাশ থাকে যে, কতক লোকের অনুমতিতে কেহ ইমাম হইলে বাকী লোকে যদি ঐ ইমামের প্রতি কোন দোষারোপ করে তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, ইমামের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই দোষ আছে কি না, যদি থাকে, তবে তাহার ইমামতী করা মাকরূহ্ তাহ্রীম। অন্যথায় মুক্তাদীগণ অযথা দোষারোপ করিলে তাহাদের মাকরূহের গুনাহ হইবে।

প্রশ্নঃ- মসজিদের ভিতরে ও বাহিরে বহু লোক থাকাকালীন একামতের পর যদি ভিতরে ও বাহিরে দুইজনেই ইমামতের নিয়তে তাক্বীরে তাহ্রীমা বলে, তবে কাহার পিছনে নামাযের এক্তেদা করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ঐরূপ অবস্থায় যে প্রথম তাক্বীরে তাহ্রীমা বলিয়াছে তাহার এক্তেদা করিবে।

ইমামের তাবেদারীর বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন্ কোন্ কাজে ইমামের তাবেদারী করিতে হইবে ও কোন্ কোন্ কাজে করিতে হইবে না?

উত্তরঃ- নামাযের মধ্যস্থ যে সকল কাজ ইমাম ভুলে ছাড়িয়া দিলেও মুক্তাদীগণ তাহার তাবেদারী করিবে, গায়াতুল আওতার কিতাব হইতে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল-

১। ইমাম দোয়া কুনূত না পড়িয়া রুকূ করিলে মুক্তাদীগণও ইমামের সহিত রুকূ করিবে।

২। ইমাম কায়দায়ে উলা অর্থাৎ প্রথম বৈঠকে না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলে মুক্তাদীগণও দাঁড়াইয়া যাইবে।

৩। ইমাম ঈদের তাক্‌বীর না বলিলে মুক্তাদীও বলিবে না।

৪। ইমাম সিজদায়ে তেলাওয়াত ছাড়িয়া দিলে মুক্তাদীও ছাড়িয়া দিবে।

৫। ইমাম ছোহ-সিজদা ছাড়িয়া দিলে মুক্তাদীও ছাড়িয়া দিবে। পক্ষান্তরে মুক্তাদী ৪টি বিষয়ে ইমামের তাবেদারী করিবে না। যথা-

(ক) ইমাম ঈদের তাক্‌বীর বেশী বলিলে মুক্তাদী বেশী বলিবে না ও তিনবারের স্থানে চারিবার হাত উঠাইলে মুক্তাদী ইমামের সহিত হাত উঠাইবে না।

(খ) ইমাম জানাযায় চারি তাক্‌বীরের স্থলে পাঁচ তাক্‌বীর বলিলে মুক্তাদী তাহার তাবেদারী করিবে না।

(গ) ইমাম কোন রোকন বেশী করিলে মুক্তাদী তাহা করিবে না। যেমন- দুই রুকূ তিন সিজদাহ্ করিলে মুক্তাদী তাবেদারী করিবে না।

(ঘ) ইমাম ভুলে চারি রাকয়াতের পর পঞ্চম রাকয়াতের জন্য দাঁড়াইলে মুক্তাদী তাহার সহিত দাঁড়াইবে না।

ইহা ছাড়া গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- নিম্নের ৮ অবস্থায় ইমামের তাবেদারী করিবে না-

১। ইমাম তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া হাত না উঠাইলেও মুক্তাদী হাত উঠাইবে।

২। ইমাম সুবহানাকা না পড়িলেও মুক্তাদী সুবহানাকা পড়িবে।

৩। ইমাম রুকূর পর তাক্‌বীর না বলিলেও মুক্তাদী তাক্‌বীর বলিবে।

৪। ইমাম ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ না বলিলেও মুক্তাদী রাব্বানা লাকাল হামদ বলিবে।

৫। ইমাম রুকূ ও সিজদাহ্‌র তাসবীহ না বলিলেও মুক্তাদী বলিবে।

৬। ইমাম বসা অবস্থায় তাশাহ্‌হুদ না পড়িলেও মুক্তাদী পড়িবে।

৭। ইমাম ভুলে সালাম না ফিরাইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেলেও মুক্তাদী সালাম ফিরাইবে।

৮। ইমাম তাকবীরে তাশরীক না বলিলেও মুক্তাদীগণ বলিবে। আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, কোন অজ্ঞ মুক্তাদী যদি ইমামের রুকু সিজদাহর আগে রুকু সিজদা করিয়া থাকে, তবে তাহার কর্তব্য যে, ইমামের নামাযের বাদে এক রাকয়াত বিনা সূরা কিরাতে পড়িয়া নামায শেষ করে।

প্রশ্নঃ নফল নামায জামায়াতে পড়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- শরহে ইলিয়াছ, বাহরুর রায়েক, (২য় খন্ড) দুররুল-হেকাম কিতাবে তারাবীর বয়ানে আছে- আযান একামতের সহিত জামায়াতে নফল পড়া মাকরূহ। শামী কিতাবে তারাবীর বয়ানে উহাকে মাকরূহ তানজীহ বলিয়া লিখিয়াছেন। মুহীত কিতাব হইতে তাফসীরে রুহুল বয়ানে ইন্না আনজালনার তাফসীরে লিখিয়াছেন বিনা আযান একামতে নফল নামায জামায়াতে পড়া জায়েয আছে।

কিরূপ ওজরে জামায়াতে না গেলে গুনাহ্ হইবে না

প্রশ্নঃ- কি কি কারণে জামায়াতে হাজির না হইলে গুনাহ্গার হইবে না?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে-

১। পীড়িত ব্যক্তি জামায়াতে গেলে যদি ক্ষতির আশঙ্কা হয়।

২। লুলা বা কাটা বিধায় অক্ষম ব্যক্তি।

৩। অবশ লোক।

৪। অতিবৃদ্ধ যে হাঁটিয়া যাইতে অক্ষম।

৫। অন্ধ, যদি কেহ ধরিয়া নিলে জামায়াতে যাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও জামায়াতে যাওয়া ওয়াজিব নহে। হাশিয়ায়ে তাহতাবীতে আছে, এমতাবস্থায় জামায়াতে যাওয়া ছাহেবাইনের মতে ওয়াজিব। কাজেই কোন অসুবিধা না হইলে জামায়াতে যাওয়াই উত্তম।

৬। এত অন্ধকার যে রাস্তা দেখা যায় না, অথবা ঝড় বৃষ্টি বা পথে কাদা, কিংবা রাত্রে অতি শীতল বাতাসে ক্ষতির আশঙ্কা। শামী কিতাবে হযরত ইমাম ছাহেব হইতে রেওয়ায়েত আছে- বৃষ্টি-কাদা, অতি শীত, বরফ ইত্যাদিতে বিশেষ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে জামায়াত তরক করা জায়েয আছে।

৭। মাল অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে। হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে আছে, আমানতি মালেরও সেই হুকুম।

৮। কর্জদার, যাহাকে মহাজনে পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা হইলে। শামী কিতাবে আছে- যে গরীব কর্জ পরিশোধ করিতে অক্ষম, সে জামায়াত তরক করিতে পারে, নচেৎ না।

৯। জুলুমে পতিত হইবার আশঙ্কাস্থলে। শামী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে- শরীর ও মালের উপর জুলুম হইবার আশঙ্কা হইলে।

১০। বাহ্য-প্রস্রাবের হাজত হইলে। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- বাহ্য কি প্রসাব যে কোন হাজত। হাশিয়ায়ে তাহ্তাবীতে আছে- ঐরূপ বাহ্য-প্রস্রাবের বেগ লইয়া জামায়াতে যাওয়া মাকরূহ্ তাহ্রীম। তদ্রূপ বাদে গরমের বেগ লইয়া জামায়াতে যাওয়ার ঐ হুকুম।

১১। মুসাফিরিতে সঙ্গীয় কাফেলা চলিয়া যাইবার আশঙ্কা হইলে।

১২। পীড়িত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষাকারীর। হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে আছে- সেবা শুশ্রূষাকারীর অভাবে রোগীর বিশেষ কষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে। অন্যথায় জামায়াতে যাওয়া ওয়াজিব।

১৩। অতি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খানা প্রস্তুত থাকা সত্ত্বে জামায়াতে না গেলে গুনাহ্ হইবে না। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- যথা সময়ের পূর্বেও খানা উপস্থিত থাকিলে যদি খানা খাওয়ার দিকে মন বেশী আকর্ষণ করে, তবে জামায়াতে না গেলে গুনাহ্ হইবে না।

১৪। ফেকহী কোন জরুরী মাসয়ালা তালাশে ব্যস্ত থাকিলে কিন্তু আলস্য বশতঃ মাসয়ালা তালাশের অছিলা করিয়া জামায়াতে না গেলে গুনাহ্গার হইবে।

হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে আছে- আল্লাহর ওয়াস্তে শরীয়ত শিক্ষা দেওয়া ও কিতাব লেখার জন্য ব্যস্ত থাকিলে। তাহ্তাবী কিতাবে আছে মাসয়ালার কিতাবের আলোচনা ও কিতাব হইতে মাসয়ালা বাহির করার কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন জামায়াতে না গেলে গুনাহ্ হইবে না। ঐরূপ আকায়েদ তাফ্সীর হাদীস ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া ও আলোচনার ঐ হুকুম। শামী কেতাবে আছে- আলস্য বশতঃ ঐরূপ করিলে ওজরের মধ্যে গণ্য হইবে না ও জামায়াত তরক করিলে গুনাহ্ হইবে। উল্লিখিত যে সকল কারণে জামায়াত তরক করা জায়েয, উহা নিরপেক্ষ ও সদুদ্দেশ্যমূলক হওয়া চাই। নচেৎ কাহাকেও পরাজয় করিবার জন্য কি নিজের মত বজায় রাখার জন্য ঐরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে জামায়াত তরক করা সঙ্গত হইবে না।

১৫। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- কয়েদের আশঙ্কা স্থলে।

১৬। শামী কিতাবে আছে-বেশী গরমের সময় জামায়াত হইলে যদি জামায়াতে যাইতে বিশেষ কষ্ট হয়, তাহা হইলে জামায়াতে না গেলে গুনাহ্ হইবে না।

১৭। জামায়াত তরককারীর সাক্ষ্য মঞ্জুর হইবে না। কিন্তু ইমামের কোন বিদ্আত কাজের দরুন জামায়াত তরক করিলে ঐরূপ দোষী হইবে না।

১৮। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে-যে সকল কারণে জামায়াত তরক করা জায়েয ঐ সকল ওজর থাকা সত্ত্বেও যদি নিয়ত করে যে, আমার ওজর না থাকিলে জামায়াতে হাজির হইতাম, তাহাতেও জামায়াতের ফজীলত পাইবে। শামী কিতাবে আছে- পীড়া বশতঃ বা অতি বৃদ্ধাবস্থায় জামায়াতে যাইতে না পারিয়া ঐরূপ নিয়ত করিলে জামায়াতের ফজীলত পাইবে। কিন্তু অন্ধকার বা বৃষ্টি, কাদা ও শীতের দরুন জামায়াত তরক করিয়া ঐরূপ নিয়ত করিলে জামায়াতের ফজীলত পাইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ উক্ত কারণে জামায়াতে হাজির হইতে না পারিয়া নিজ পরিবারের সহিত একত্রে জামায়াতে নামায পড়ে, তাহাতে জামায়াতের ফজীলত পাইবে কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- ঐরূপ স্ত্রী সহ জামায়াত করিয়া নামায পড়িলেও জামায়াতের ফজীলত পাইবে। বাহ্রুর রায়েক ও আরকানে আরবা কিতাবের মর্মেও ঐরূপ জানা যায়। 'আরকানে আরবা' কিতাবে ইহাও লিখিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিজ স্ত্রীর সহিত জামায়াতে নামায পড়িয়াছেন।

স্ত্রীলোকের জামায়াত

প্রশ্নঃ- স্ত্রীলোকেরা কিরূপভাবে জামায়াতে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- পুরুষের জন্য নিরালা ঘরে অন্যান্য গায়ের মাহারেম স্ত্রীলোকের ইমাম হওয়া মাকরূহ্ তাহ্রীম। কিন্তু সেখানে যদি ইমামের মাহারেম (স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নি ইত্যাদি) থাকে তাহা হইলে মাকরূহ্ নহে। ঐরূপ নিরালা মসজিদে থাকিয়া মাকরূহ্ নহে। ঐ অবস্থায় মসজিদের কোন পার্শ্বে জামায়াত করিবে না।

উক্ত কিতাবে আছে- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায় স্ত্রীলোকেরা জামায়াতে নামায পড়িতেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর যামানায় স্ত্রীলোকগণকে জামায়াতে যাইতে নিষেধ করায় কতক স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর নিকট আপত্তি উত্থাপন করেন। তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বর্তমানে যাহা অবগত হইয়াছেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা অবগত থাকিলে অবশ্য তাহাদিগকে জামায়াতে যাইতে নিষেধ করিতেন। এতদমর্মে পরবর্তী যুগের ওলামাগণ স্ত্রীলোকের জামায়াতে হাজির হইতে নিষেধ করিয়া মাকরূহ্ তাহ্রীমের দলীল দিয়াছেন।

যদি স্ত্রীলোকেরা মাকরূহ তাহ্রীম সত্ত্বেও জামায়াতে নামায পড়ে তাহা হইলে যে স্ত্রীলোকটি ইমাম হইবে সে যেন মুক্তাদী স্ত্রীলোকদের সম্মুখে দাঁড়ায়। ইমাম মুক্তাদী বরাবর দাঁড়াইবে। খোজা ইমাম হইলে সামনের কাতারের মধ্যভাগে দাঁড়াইবে। যাহার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় লিঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু কোন্ জাতীয় তাহা নির্ণয় করা না যায়, তাহাকে খোনছায়ে মোশকেল বলে।

স্ত্রীলোকের জামায়াতে হাজির হওয়া মাকরূহ্ তাহ্রীম। চাই ঈদের জামায়াত হউক বা জুম্আর নামাযের অথবা ওয়াজের মজলিস হউক, দিনে হউক বা রাত্রে হউক। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরও ঐ হুকুম। কিন্তু স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কেহ কেহ মতভেদ করিয়া থাকিলেও দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- বর্তমান যামানায় ফেতনা প্রকাশ পাওয়ার দরুন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদেরও জামায়াতে যাওয়া মাকরূহ্ তাহ্রীম।

গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- যাবতীয় নামাযে স্ত্রীলোকের জামায়াত মাকরূহ্ তাহ্রীম। কিন্তু জানাযাহ নামাযে জামায়াত করা মাকরূহ্ হইবে না। কারণ, জানাযাহ নামায দুইবার পড়া মাকরূহ্ তাহ্রীম। এক একজন পৃথক পৃথক পড়িলেও মাকরূহ্ হইবে। কাজেই একজনে পড়িলে অন্যান্য সকলে ঐ ছওয়াব হইতে মাহ্রূম হয় বলিয়া স্ত্রীলোকের জামায়াত করিয়া জানাযাহ নামায পড়িলে মাকরূহ্ হইবে না। স্ত্রীলোক ইমাম হইলে পুরুষ মুক্তাদী হইলেও জানাযাহ হইবে, ঐ নামায পুনঃ দোহ্রাইতে হইবে না; কিন্তু পুরুষের নামায মাত্রই হদ নাই। যদি পুরুষ ইমাম হয় ও কোন কারণে স্ত্রীলোককে খলিফা করে তবে নামায জায়েয হইবে না। ঐ নামায পুনঃ পড়িতে হইবে। যেহেতু স্ত্রীলোকের পুরুষের ইমাম হওয়া জায়েয নাই। কাজেই পুরুষ ইমাম মুক্তাদী হওয়া মাত্রই নামায ফাসেদ হইয়াছে।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক জামায়াতে নামায পড়ার মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্রে নামায পড়িতে পারিবে কি না

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্রে নামায পড়িতে হইলে দশটি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। নয় কিংবা তদুৰ্দ্ধ বৎসরের মেয়ে মোটা তাজা কিংবা কৃশ হউক অথবা সাত আট বৎসরের মোটা তাজা মেয়ে কিংবা স্ত্রীলোক (বর্তমানে সহবাসের অনুপযুক্ত বৃদ্ধা হইলে) পুরুষের পাশে বিনা ছোতরায় দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে। মোট কথা সহবাসের উপযুক্ত স্ত্রীলোক বিনা ছোতরায় পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে নামায ফাসেদ হইবে।

২। নামাযী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে আড় না থাকিলে নামায ফাসেদ হইবে। এক অঙ্গুলী মোটা ও এক হাত আড় হওয়া চাই। কিংবা উভয়ের মধ্যে একজন দাঁড়াইতে পারে এরূপ ফাঁক থাকা চাই।

৩। যে নামাযে রুকূ সিজদা আছে সেই নামাযের মধ্যে শামিল হইলে নামায ফাসেদ হইবে। ছোতরা কিংবা ফাঁক না রাখিয়া দাঁড়াইলে ফাসেদ হইবে।

৪। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক একই নামাযের প্রথম হইতে আরম্ভ করুক বা ২/১ রাকয়াত পড়ার পর শামিল হউক, পুরুষ লাহেক হউক বা স্ত্রীলোক, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বাকী নামায আদায় করিলেও উভয়ের নামায ফাসেদ হইবে।

৫। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ে একই কিবলার দিকে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে নামায ফাসেদ হইবে।

৬। বালেগ বুদ্ধিমান পুরুষের পাশে স্ত্রীলোক দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে, নচেৎ হইবে না।

৭। ইমাম প্রথম হইতেই স্ত্রীলোকের ইমামতীর নিয়ত করতঃ নামায আরম্ভ করিয়া থাকিলে ঐ ইমাম বা মুক্তাদীর পাশে স্ত্রীলোক দাঁড়াইলে পাশের পুরুষের নামায ফাসেদ হইবে।

৮। স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতি হইলে পাশের পুরুষের নামায নষ্ট হইবে। পাগল স্ত্রীলোক দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

৯। স্ত্রীলোক ও পুরুষ একই সমান স্থানে দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে। একজন মানুষ পরিমাণ উচ্চ কি নিম্নস্থানে দাঁড়াইলে নামায ফাসেদ হইবে না। (ঘরে হউক কি বাহিরে)

১০। পূর্ণ এক রোকন যদি পুরুষের পাশে স্ত্রীলোক দাঁড়ায় তবে নামায ফাসেদ হইবে। শামী কিতাবে আছে- বেশীক্ষণ দাঁড়ায় কি অল্প দাঁড়ায় নামায ফাসেদ হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, একজন স্ত্রীলোক দ্বারা ৩ জন পুরুষের নামায নষ্ট হইতে পারে। স্ত্রীলোকের ডান পার্শ্বে, বাম পার্শ্বে ও পিছনে যে পুরুষ দাঁড়াইবে, তাহাদের নামায ফাসেদ হইবে।

মাসবুকের বিবরণ

প্রশ্নঃ- মাসবুক কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায় ইমামের এক রাকয়াত পড়ার পর যে কোন রাকয়াতে বা শেষ বৈঠকে নামাযে দাখিল হইলে তাহাকে মাসবুক বলে।

প্রশ্নঃ- মাসবুক সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে চাই।

উত্তরঃ- নিম্নে আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাব হইতে কতক মাসয়ালা লিখিত হইল-

১। ইমাম যখন সজোরে কিরাত পড়ে, এমতাবস্থায় নামাযে দাখিল হইলে মাসবুক মুক্তাদী ছানা পড়িবে না। যদি সে বধির (কানে না শোনে) হয় কিংবা ইমাম হইতে দূরে থাকার দরুন কিরাত শুনিতে না পায় তবুও ছানা পড়িবে না, ইহাই ছহীহ। যদি ইমাম চুপে কিরাত পড়ে তাহা হইলে ছানা পড়িয়া লইবে। (আলমগীরী)

২। চুপে কিরাতের নামায হউক কি প্রকাশ্য কিরাতের নামায হউক, ইমামকে যদি রুকূ কিংবা সিজদাতে পায় ও বিবেচনা করে যে, ছানা পড়িয়া ইমামকে রুকূ কিংবা সিজদাতে পাইবে, তাহা হইলে ছানা পড়িবে, নচেৎ ছানা না পড়িয়া ইমামের সহিত রুকূ কিংবা সিজদায় শামিল হইবে। এমনকি ইমামকে তাশাহ্‌হুদ পড়ার মধ্যে পাইলে ছানা পড়ার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দাঁড়ান অবস্থায় তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া নিয়ত করতঃ তাক্‌বীর বলিয়া ইমামের সহিত বসিয়া যাইবে।

৩। ইমামকে নামাযের মধ্যে দেখিয়া ইমামের যাহা পড়া হইয়াছে তাহা পূর্ণ করার মানষে যদি মাসবুক মুক্তাদী ঐ নামায পড়িয়া জামায়াতে শামিল হয় ও ইমামের সহিত বাকী নামায পড়িয়া শেষ করে, তাহা হইলে ছহীহ্ কওল মতে ঐ মাসবুকের নামায ফাসেদ হইবে।

৪। ইমামের তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর সালাম ফিরাইবার পূর্বে মাসবুক মুক্তাদীর বাকী নামায পড়ার জন্য দাঁড়াইয়া যাওয়া জায়েয নাই। কিন্তু মোযা মাছ্‌হের মুদ্দৎ শেষ হইবার

৫—

আশঙ্কায়, মাযুর ব্যক্তি ওয়াক্ত ফৌত হইবার ভয়ে, জুম্‌আর নামাযে আছরের ওয়াক্ত আসিয়া পড়ার আশঙ্কায়, ঈদের নামাযে জোহরের ওয়াক্ত আসিয়া পড়ার ভয়ে, ফজরের নামাযে সূর্য্য উদয় হইয়া পড়ার আশঙ্কায় কিংবা ওজু নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে দাঁড়াইয়া বাকী নামায আদায় করা জায়েয হইবে। উপরোক্ত কারণ সমূহ ব্যতীত ইমামের সালাম ফিরানের পূর্বে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলে মাকরূহ্ তাহ্‌রীম হইবে। (আলমগীরী)

৫। যদি কোন মাসবুক ইমামের সালামের পূর্বে দাঁড়াইয়া বাকী নামায আদায় করতঃ পুনঃ ইমামের সহিত দাখিল হইয়া সালাম ফিরায় তাহা হইলে নামায জায়েয হইবে কি না তাহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু ছহীহ্ কওল মতে নামায ফাসেদ হইবে না। (আলমগীরী)

৬। ইমাম দুই সালাম ফিরাইবা মাত্রই মাসবুক বাকী নামায আদায়ের জন্য দাঁড়াইয়া যাইবে না, সামান্য বিলম্ব করিবে যেন ছোহ-সিজদাহ্ থাকিলে আদায়ের সময় পায় বা মেহ্‌রাব হইতে বাহির হইয়া যায় কিংবা সুন্নাত পড়িতে দাঁড়ায় অথবা স্থান পরিবর্তন করে। এমতাবস্থা ঘটিলেই মাসবুক দাঁড়াইয়া বাকী নামায আদায় করিবে।

৭। তাশাহ্‌হুদের পর মাসবুক ইমামের সহিত দরূদ ও দোয়া পড়িবে না। তখন কি করিবে তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। এবনেশুজা বলিয়াছেন- ঐ সময় বার বার আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাকিবে। গিয়াছিয়া কিতাবে এই কথা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ওয়াজীয কারদারী, ফতোয়ায়ে কাজীখান, খোলাছা, ফতহুল কাদীর প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মাসবুক এমনভাবে পড়িবে যেন ইমামের সালাম ফিরাইবার পূর্বক্ষণে তাশাহ্‌হুদ পড়া শেষ হয়। (আলমগীরী)

৮। যদি কোন মাসবুক ইমামের সহিত কিংবা ইমামের পূর্বে ভুলে সালাম ফিরায় তাহা হইলে তজ্জন্য ছোহ্-সিজদাহ্ করিতে হইবে না। যদি ইমামের সালামের বাদে ভুলে সালাম ফিরায় তাহা হইলে ছোহ্-সিজদাহ্ করিতে হইবে। ইমামের সহিত সালাম ফিরান উচিত বিবেচনায় যদি সালাম ফিরায়, তাহা হইলে নামায ফাসেদ হইবে; কেননা ইচ্ছাপূর্বক সালাম ফিরাইয়াছে। ইমামের সহিত ভুলে সালাম ফিরাইয়া যদি মনে করে যে, নামায ফাসেদ হইয়াছে ও সেই ধারণায় নূতন ভাবে নামায আরম্ভ করে তাহা হইলে প্রথম নামায বেকার হইয়া যাইবে। যদি একা নামাযী ঐরূপ ভুলে সালাম ফিরাইয়া পুনঃ তাকবীর বলিয়া নূতন ভাবে আরম্ভ করে তাহা হইলে পূর্বের পঠিত নামায নষ্ট হইবে না। ঐ নামায জায়েয হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

৯। মাসবুক মুক্তাদী ইমামের সহিত শেষ রাকয়াত পাইলে অতঃপর যে রাকয়াত হইতে আরম্ভ করিবে সেই রাকয়াতই পহেলা নামায মনে করিতে হইবে। যে রাকয়াত পাইয়াছে উহা নামাযের শেষ রাকয়াত মনে করিবে। অর্থাৎ কিরাত প্রথম রাকয়াত হিসাবে পড়িবে কিন্তু তাশাহ্‌হুদের বেলায় প্রথম রাকয়াত গণনা করিয়া দ্বিতীয় রাকয়াতে বসিবে।

১০। মাগরিবের নামাযের শেষ রাকয়াত ইমামের সহিত পাইলে বাকী দুই রাকয়াতের প্রথম রাকয়াতে ফাতিহা ও সূরা পড়িয়া রুকূ সিজদাহ্ করতঃ বসিয়া তাশাহ্হুদ পড়িবে; পুনঃ দাঁড়াইয়া ঐরূপ ফাতিহা ও কিরাত পড়িয়া বসিয়া তাশাহ্হুদ ও দোয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

১১। চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযের শেষ রাকয়াতে ইমামের সহিত শামিল হইলে বাকী নামাযের প্রথম রাকয়াতে ফাতিহা ও কিরাত পড়িয়া রুকূ সিজদাহ্ করতঃ তাশাহ্হুদ পড়িয়া পুনঃ দাঁড়াইয়া তৃতীয় রাকয়াতেও ফাতিহা ও কিরাত পড়িবে। বাকী চতুর্থ রাকয়াতে ফাতিহা পড়া সম্বন্ধে দুইটি মত আছে- ১। ফাতিহা পড়া বা ২। ফাতিহা না পড়িলেও নামায জায়েয হইবে কিন্তু পড়াই উত্তম। (আলমগীরী)

১২। ইমামের সহিত দুই রাকয়াত পাইলে বাকী দুই রাকয়াত কিরাতের সহিত আদায় করিবে। যদি এক রাকয়াতেও কিরাত ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। যদি ইমাম প্রথম দুই রাকয়াতে কিরাত ছাড়িয়া দিয়া থাকে ও তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকয়াতে উহা পূর্ণ করে, এমতাবস্থায় মাসবুক বাকী নামায আদায়কালীন প্রত্যেক রাকয়াতে ফাতিহা ও কিরাত পড়িবে। নচেৎ মাসবুকের নামায ফাসেদ হইবে।

১৩। ইমাম ছোহ-সিজদাহ্ ওয়াজিব হইয়াছে মনে করিয়া এক সালামের পর ছোহ-সিজদাহ্ আদায় করিল। তৎসঙ্গে মাসবুকও ইমামের তাবেদারী করার পর উভয়ে জানিতে পারিল যে, ছোহ-সিজদাহ্ ওয়াজিব ছিল না। মাসবুক এরূপ ইমামের তাবেদারী করিলে প্রকাশ্য মতে মাসবুকের নামায বাতিল হইবে। ফকিহ আবূল লাইছ বলিয়াছেন- বর্তমান যামানায় ঐরূপ ছোহ-সিজদায় তাবেদারী করিলে মাসবুকের নামায বাতিল হইবে না। আর যদি মাসবুক না জানিয়া ছোহ-সিজদাহ্র তাবেদারী করে তবে সকল ইমামের মতে মাসবুকের নামায বাতিল হইবে না। (আলমগীরী)

১৪। ইমাম চারি রাকয়াত পড়িয়া শেষ রাকয়াতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসিয়া যদি পঞ্চম রাকয়াতের জন্য দাঁড়াইয়া যায় ও মাসবুক ঐ ইমামের তাবেদারী করে তাহা হইলে মাসবুকের নামায বাতিল হইবে। ইমাম তাশাহহুদ পরিমাণ না বসিয়া পঞ্চম রাকয়াতে দাঁড়াইলে, সিজদাহ্ না করা পর্যন্ত কাহারও নামায ফাসেদ হইবে না। যদি সিজদাহ্ করে তবে ইমাম, মুক্তাদী ও মাসবুকের সকলের নামায বাতিল হইবে। (আলমগীরী)

১৫। মাসবুক যদি ইমামের ছোহ-সিজদাহ্ ব্যতীত সালাম, তাক্বীর ও লাব্বায়েক বলার সময় ইমামের তাবেদারী করে,তবে মাসবুকের নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি নিজে মাসবুক একথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তাক্বীরের তাবেদারী করে তবে তাহার নামায ভঙ্গ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, উহা তাক্বীরে তাশ্রীক। (আলমগীরী)

১৬। ইমামের সিজদাহ্ তেলাওয়াত আদায়ের পূর্বে মাসবুক বাকী নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া গেলে ও সিজদাহ্ করার পূর্বে ইমামকে সিজদাহ্ করিতে দেখিলে, মাসবুক

ইমামের সঙ্গে তেলাওয়াতে সিজদাহ্ বা ছোহ-সিজদার তাবেদারী করিবে, নচেৎ মাসবুকের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। যদি বাকী নামাযের এক সিজদার পর ইমামের তাবেদারী করে, তাহা হইলে মাসবুকের নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ফতহুল কাদীর, বাদায়ে, তাতারখানিয়া, তাহ্তাবী, মোজমেরাত, শরহে মাবসুত, ছোরখছী, সিরাজুল-ওহ্হাজ, খোলাছা প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে-মাসবুক এক সিজদাহ্র পর ইমামকে ঐ সিজদাহ্ আদায় করিতে দেখিয়া ইমামের তাবেদারী না করিলেও নামায বাতিল হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

১৭। মাসবুক ও একা নামাযীর অবস্থা একই প্রকার কিন্তু চারটি মাসয়ালায় ব্যতিক্রম আছে, যথা-

(ক) মাসবুকের সহিত কাহারও এক্তেদা করা জায়েয নাই। সেও কাহারও সহিত এক্তেদা করিবে না। এমনকি এক মাসবুক অন্য মাসবুকের সহিত এক্তেদা করিবে না, যে এক্তেদা করিবে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে। যদি দুইজন লোক এক সময় মাসবুক হয় ও একজনের স্মরণ না থাকে যে কত রাকয়াত পড়িতে হইবে, তাহা হইলে ঐ লোকের দেখাদেখি বাকী নামায বিনা এক্তেদায় আদায় করিলে নামায ফাসেদ হইবে না।

(খ) মাসবুক নামাযের মধ্যে থাকিয়া যদি পুনঃ নামায আরম্ভের নিয়তে তাক্বীর বলে, তাহা হইলে পিছনের নামায বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু একা নামাযী নামাযের মধ্যে তাক্বীর বলিয়া পুনঃ নূতন ভাবে নামায আরম্ভ করিলে পিছনের নামায বাতিল হয় না।

(গ) ইমামের প্রতি ছোহ-সিজদাহ্ ওয়াজিব হওয়ার পর যদি মাসবুক নামাযে শরীক হয় ও ইমামের সালামের পর ছোহ-সিজদাহ্ আদায় করার পূর্বে বাকী নামায আদায়ের জন্য দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সিজদাহ্ করার পূর্বে ইমামের সহিত বসিয়া ছোহ-সিজদাহ্ আদায় করিবে। যদি তাহা না করে তবে নামায শেষ করিয়া ছোহ-সিজদাহ্ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু একা নামাযীকে অন্যের ছোহ-সিজদাহ্ আদায় করিতে হয় না। (আলমগীরী)

(ঘ) মাসবুক বাকী নামায আদায় করিয়া তাক্বীরে তাশ্রীক বলিবে, ইহাতে কোন ইমামের মতভেদ নাই। কিন্তু ইমাম সাহেবের মতে একা নামাযীরও প্রত্যেক নামাযের পর তাক্বীরে তাশ্রীক বলা ওয়াজিব। ছহীহ্ রেওয়ায়েত মতে একা নামাযী এমনকি স্ত্রীলোকেরও তাক্বীরে তাশ্রীক বলিতে হইবে। (তাহ্তাবী, আলমগীরী)

লাহেকের নামায আদায়ের বিবরণ

প্রশ্নঃ- লাহেক কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- ইমামের সহিত প্রথম হইতে নামাযে এক্তেদা করার পর মুক্তাদীর ওজু ভঙ্গ হওয়ার দরুন কিংবা ঘুমের দরুন অথবা লোকাধিক্য বশতঃ নামাযের কতকাংশ ইমামের সহিত আদায় করিতে না পারিয়া পরে আদায় করাকে লাহেক বলে। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ- লাহেকের বাকী নামায কিভাবে আদায় করিতে হইবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- লাহেক অজু করিয়া আসিয়া প্রথম বাকী নামায আদায় করিবে। বাকী নামায আদায়কালে কিরাত পড়িতে হইবে না। ইমাম যে পরিমাণ সময় কিয়াম ও রুকূতে ছিল তত পরিমাণ বিলম্ব না করিয়া বাকী নামায আদায় করিবে। কিয়াম ইত্যাদিতে ইমাম হইতে কম বা বেশী বিলম্ব করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ইমামের সহিত নামাযে দাঁড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়ে ও ইমাম কয়েক রাকয়াত পড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে মুক্তাদী বাকী নামায কিভাবে আদায় করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- হুঁশ হইয়া প্রথম তাহার বাকী নামায আদায় করিবে ও পরে ইমামের সহিত অবশিষ্ট নামায আদায় করিবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে হুঁশ হইয়া ইমামের নামাযের তাবেদারী করিয়া ফওত নামায শেষে আদায় করিবে।

প্রশ্নঃ- মাসবুক ও লাহেকের নামায আদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তরঃ- মাসবুক ও লাহেকের বাকী নামায আদায়ের মধ্যে ছয়টি বিশেষ পার্থক্য আছে-

১। মাসবুকের পার্শ্বে স্ত্রীলোক দাঁড়াইলে মাসবুকের নামায ভঙ্গ হইবে না কিন্তু লাহেকের পার্শ্বে স্ত্রীলোক দাঁড়াইলে লাহেকের নামায নষ্ট হইবে।

২। মাসবুকের বাকী নামায আদায় করিতে ছানা, তাআব্বুয ও সূরা কিরাত পড়িতে হইবে কিন্তু লাহেকের ঐ সমস্ত কিছুই পড়িতে হইবে না।

৩। ইমামের ছোহ-সিজদাহ্ থাকিলে মুক্তাদীরও ইমামের সঙ্গে ছোহ-সিজদাহ্র তাবেদারী করিতে হইবে। কিন্তু লাহেকের তাহা করিতে হইবে না।

৪। ইমাম পহেলা কায়দাহ্ ভুলিয়া গেলে মাসবুক তাহার তাবেদারী করিবে। কিন্তু লাহেক তাবেদারী করিবে না অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকয়াতে লাহেক কায়দাহ্ আদায় করিবে। মাসবুকের বাকী নামায আদায় করিতে ঐ কায়দাহ্ করিতে হইবে না।

৫। ইমাম ছালামের স্থলে উচ্চ হাস্য করিলে মাসবুকের নামায বাতিল হইবে কিন্তু লাহেকের নামায বাতিল হইবে না।

৬। মুসাফির ইমামের সহিত মুকিম মাসবুক এক্তেদা করিলে যদি উক্ত ইমাম নামাযের মধ্যে একামতের নিয়ত করে কিন্তু মাসবুক ইমামের তাবেদারী না করিয়া দাঁড়াইয়া যায় ও সিজদাহ্ করে, তাহা হইলে মাসবুকের নামায বাতিল হইবে। কিন্তু লাহেক ঐ ইমামের তাবেদারী না করিলে নামায ফাসেদ হইবে না।

নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইলে

প্রশ্নঃ- নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইয়া যায় তাহা হইলে অজু করিয়া আসিয়া ঐ নিয়তে বাকী নামায আদায় করিবে। স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের একই হুকুম। যে রোকনের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইয়াছে, সে রোকনও আদায় করিতে

হইবে। কিন্তু অজু ভঙ্গ হইলে পুনঃ অজু করিয়া নূতন নিয়তে পুরা নামায পড়াই ভাল। মাশায়েখদের মতে ইমাম, মুক্তাদী একা নামাযী সকলেরই এই নিয়ম পালন করা উত্তম। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন-কেবলমাত্র একা নামাযীর জন্য ঐ হুকুম। ইমাম ও মুক্তাদীর যদি অজু ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে অজু করিয়া আসিয়া বাকী নামায পড়া ভাল কিন্তু নূতন জামায়াত পাইলে তাহাদের সঙ্গে একত্রে নামায পড়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ- নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইলে পুনঃ নামায আদায়ের নিয়ম কিরূপ?

উত্তরঃ- নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হইলে পুনঃ অজু করিয়া ঐ নামায আদায়ের কয়েকটি শর্ত আছেঃ-

১। নামাযের মধ্যে আল্লাহর তরফের কারণে অজু ভঙ্গ হইলে, নূতন অজু করিয়া বাকী নামায পূর্ণ করিবে।

২। নিজের ইচ্ছায় অজু ভঙ্গ হইলে পুনঃ অজু করিয়া সম্পূর্ণ নামায আদায় করিবে।

৩। নামাযের মধ্যে অন্যের দ্বারা অজু ভঙ্গ হইলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহের মতে পুনঃ অজু করিয়া নূতন নিয়তে নামায আদায় করিবে।

প্রশ্নঃ- আল্লাহর তরফ হইতে কিরূপে অজু ভঙ্গ হয়?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- প্রস্রাব, পায়খানা, বাদেগরম, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মুখ ভরিয়া বমি হওয়া, ক্ষত স্থান হইতে নিজে নিজে রক্তপাত হওয়া, স্ত্রীলোকের ভিজা কুরছুপ আপন হইতে পতিত হওয়া ইত্যাদি কারণে অজু ভঙ্গ হইলে পুনঃ অজু করিয়া বাকী নামায আদায় করিবে। যদি বিনা কারণে ঢিলা,পাথর বা কোন দ্রব্য কিংবা গাছের নীচে অবস্থানকালে আপন হইতে ফল পতিত হইয়া অজু ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে বাকী নামায আদায় সম্বন্ধে কতক লোক বলিয়াছেন, অজু করতঃ নূতন নিয়ত করিয়া নামায আদায় করিবে। এমতস্থলে অজু করিয়া নূতন নিয়তে পুরা নামায আদায় করাই উত্তম।

প্রশ্নঃ- অন্যের দ্বারা অজু ভঙ্গের কারণ কিরূপ?

উত্তরঃ- অন্যের নিক্ষেপ করা ঢিলা, গুলি, পাথর, শরীরে লাগিয়া রক্তপাত হইলে ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহের মতে অজু করিয়া নূতন নিয়তে পুরা নামায আদায় করিবে। বোলতায় হুল ফুটাইলে (বল্লায় বা ভিমরুলে কামড়াইলে) যদি রক্তপাত হয়, তাহা হইলেও ঐ হুকুম।

প্রশ্নঃ- নিজের দ্বারা কিরূপে অজু ভঙ্গ হয়?

উত্তরঃ- পায়খানা,প্রস্রাব, মুখভরা বমি, উচ্চ হাস্য, ক্ষতস্থান হইতে রক্তপাত ইত্যাদি যে সকল কাজে অজু যায়, নিজ ইচ্ছায় এমত কাজ করিলে পুনঃ অজু করিয়া নূতন নিয়তে নামায আদায় করিবে। এরূপ নামায আদায়কালে সিজদাহ্ স্থানে বা পায়ে কাঁটা ফুটিয়া রক্তপাত হইলে কিংবা শরীরে চাপ লাগিয়া ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হওয়ার দরুন অজু নষ্ট হইলে পুনঃ অজু করিয়া নূতন নিয়তে নামায আদায় করিবে। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ- নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হওয়া মাত্রই কি নামায ছাড়িয়া অজু করিতে যাইতে হইবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- অজু ভঙ্গ হওয়া মাত্রই অজু করিতে যাইবে। যদি অজু করিতে যাইতে এক রোকন পরিমাণ সময় বিলম্ব করে, তাহা হইলে নামায ভঙ্গ হইবে। অজু করিতে যাইবার সময় কিরাত পড়িলেও নামায নষ্ট হইবে। কিন্তু অজু করিয়া আসিবার সময় কিরাত পড়িতে পড়িতে আসিলে নামায ভঙ্গ হইবে না। কেহ কেহ ইহার বিপরীত বলিয়াছেন। কিন্তু ছহীহ মত এই যে, উভয় অবস্থায় কিরাত পড়িলে নামায ভঙ্গ হইবে। স্মরণ রাখিবে যে, যাতায়াতকালে তাসবীহ তাহলীল অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিলে ছহীহ্ কওল মতে নামায নষ্ট হইবে না।

রুকূ কি সিজদাহ্র মধ্যে ইমামের অজু ভঙ্গ হইলে, ইমাম যদি অন্য রোকন আদায়ের নিয়তে তাক্বীর বলিয়া মাথা উঠায় ও দাঁড়ায়, তাহা হইলে সকলের নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

যদি কোন রোকন আদায়ের নিয়ত না করে, তাহা হইলে নামায ভঙ্গ হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে ইমাম ছাহেব হইতে দুইটি রেওয়ায়েত আছে- (১) রুকূ বা সিজদাহ্র মধ্যে যদি ইমামের অজু ভঙ্গ হয় ও তাক্বীর বলিতে বলিতে মাথা উঠায়, তাহা হইলে নামায ফাসেদ হইবে। (২) বিনা তাক্বীরে মাথা উঠাইলে নামায নষ্ট হইবে না। এমতাবস্থায় একজনকে খলীফা নিযুক্ত করিবে।

নামাযের সন্দেহ সম্পর্কে মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- নামায কয় রাকয়াত পড়া হইল, এ বিষয় সন্দেহ হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- নিম্নে কতক মাসয়ালা বলিতেছি স্মরণ রাখিবেঃ-

(১) কোন মুক্তাদী চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযের এক রাকয়াতের পর জামায়াতে শামিল হইয়া বাকী তিন রাকয়াতে ঘুমাইয়া থাকিলে জাগ্রত হওয়া মাত্রই ফওত নামায অর্থাৎ ঐ তিন রাকয়াত আদায় করিয়া তাশাহহুদ পরিমাণ বসিবে, কেননা ঐ মুক্তাদী তখন পর্যন্ত ইমামের অধিনস্থ মুক্তাদী বলিয়া ইমামের তাবেদারীর জন্য শেষ বৈঠকের স্থলে বসিবে। তৎপর দাঁড়াইয়া বাকী এক রাকয়াত যথারীতি সূরা কিরাতসহ আদায় করিবে।

(২) নামাযের শেষে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে যদি মতভেদ হয় ও ইমাম বলে যে, চারি রাকয়াত পড়া হইয়াছে, মুক্তাদীগণ বলে, তিন রাকয়াত পড়া হইয়াছে, এমতাবস্থায় ইমামের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে মুক্তাদীর কথায় নামায দোহরাইবে না। যদি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে পুনঃ নামায পড়িবে। মুক্তাদীগণ যদি দুই ভাগ হইয়া কতক বলে তিন রাকয়াত হইয়াছে, আর কতক বলে চারি রাকয়াত হইয়াছে; এমতাবস্থায় ইমামের অনুমান যে দলের মোতাবেক হইবে সেই দলের

মতানুযায়ী কাজ করিবে। যদি ঐ ইমামের বিশ্বাসের সহিত একজন মুক্তাদীও ঐক্য হয়, তাহা হইলে ইমামের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিবে। যদি ইমামের ধারণার সহিত একজন মুক্তাদীরও মতের মিল না হয় ও ইমাম পুনঃ নামায পড়ে, তাহা হইলে মুক্তাদীগণ এক্তেদা করিয়া পুনঃ নামায আদায় করিলে জায়েয হইবে। যদি এক ব্যক্তি বলে তিন রাকয়াত হইয়াছে, অন্য ব্যক্তি বলে চারি রাকয়াত হইয়াছে; এমতস্থলে ইমাম ও অন্যান্য মুক্তাদীর যদি উক্ত কথার প্রতি সন্দেহ হয় তাহা হইলে পুনঃ নামায না পড়িলে হইবে। এমতাবস্থায় যাহার তিন রাকয়াত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয় সে পুনঃ নামায পড়িবে।

৩। যদি ইমামের বিশ্বাস হয় যে, তিন রাকয়াত পড়া হইয়াছে কিন্তু মুক্তাদীগণের মধ্যে একজনের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, চারি রাকয়াত পড়া হইয়াছে; এমতাবস্থায় ইমাম অন্যান্য মুক্তাদীসহ পুনঃ ঐ নামায আদায় করিবে। যে মুক্তাদীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, চারি রাকয়াত হইয়াছে, ইমামের সহিত পুনঃ তাহার ঐ নামায পড়িতে হইবে না।

(আলমগীরী)

৪। যদি জামায়াতের মধ্যে একজনের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, নামায তিন রাকয়াত হইয়াছে ও তাহাতে ইমাম এবং মুক্তাদীগণের মনে সন্দেহ জন্মে, তাহা হইলে পুনঃ নামায পড়িতে পারে বা না পড়িলেও চলিবে। কিন্তু যদি দুইজন আদেল পরহেজগার লোকের তিন রাকয়াত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে পুনঃ নামায পড়িতে হইবে।

৫। ইমাম নামায পড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর মুক্তাদীগণের মধ্যে মতভেদ হইল। কতকে বলে আছরের ও কতকে বলে জোহরের নামায পড়া হইয়াছে। যদি আছরের ওয়াক্তে নামায পড়া হইয়া থাকে তবে যাহারা আছরের নিয়ত করিয়াছে তাহাদের নামায হইয়াছে। যদি জোহরের ওয়াক্তে নামায পড়া হইয়া থাকে, তবে যাহারা জোহরের নিয়ত করিয়াছে তাহাদের নামায হইয়াছে। আর যদি ওয়াক্ত ঠিক করিতে না পারে তবে উভয় নামায জায়েয হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

একা নামাযীর জামায়াতে শরীক হইবার মাসয়ালা

প্রশ্নঃ একা ফরজ পড়া আরম্ভ করার পর অন্য লোকে জামায়াতে নামায আরম্ভ করিলে কি করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ফজর কি মাগরিবের নামায একা আরম্ভ করিয়া যদি এক রাকয়াত পড়িয়া থাকে কিংবা দ্বিতীয় রাকয়াতে প্রথম সিজদাহ্ করার পূর্বে জামায়াত আরম্ভ হয়, তাহা হইলে নামায ছাড়িয়া দিয়া জামায়াতে শামিল হইয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকয়াতের প্রথম সিজদাহ্ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিয়ত না ছাড়িয়া

একাই নামায আদায় করিবে; জামায়াতে শরীক হইবে না। কারণ, ফরজ নামায একবার আদায় করিয়া পুনঃ জামায়াতে শরীক হইলে শেষের নামায নফলের মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু ফজরের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ্ তাহ্‌রীম। এরূপ মাগরিবের নামায একা আদায় করিয়া পুনঃ জামায়াতে শামিল হইলে দুইটি কারণ আবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। যথাঃ- (ক) জামায়াতের তাবেদারী করিলে অর্থাৎ ইমামের সহিত তিন রাকয়াত পড়িয়া সালাম ফিরাইলে সুন্নাতের খেলাফ হইবে। কেননা তিন রাকয়াত নফল পড়ার বিধান নাই। (২) ইমামের সঙ্গে সালাম না ফিরাইয়া চারি রাকয়াত পড়িলে ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এতদুভয়ই বিদ্‌য়াত।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ফজর ও মাগরিবের নামায একা পড়ার পর পুনঃ জামায়াতে শামিল হইয়া পড়ে তাহার কি হুকুম?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ফজরের নামায একবার পড়ার পর পুনঃ পড়া মাকরূহ্ তাহ্‌রীম। কারণ ফজরের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে নফল পড়া মাকরূহ্। কেননা একবার ফরজ পড়িয়া পুনঃ উহা জামায়াতে আদায় করিলে নফলের মধ্যে গণ্য হইবে।

২। মাগরিবের নামায একা আদায় করিয়া পুনঃ উহা জামায়াতে আদায় করিলে ইমামের তিন রাকয়াত আদায়ের পর দাঁড়াইয়া আরও এক রাকয়াত পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। কারণ পরের নামায নফল হইবে, অথচ তিন রাকয়াত নফল পড়ার বিধান নাই বলিয়া চারি রাকয়াত পূর্ণ করিতে হইবে। সুতরাং নফল নিয়ত করিয়াছে বলিয়া চারি রাকয়াত আদায় করা ওয়াজিব হইয়াছে। মুহীত কিতাবে আছে- ঐরূপ জামায়াতে শামিল হইলে গুনাহ্‌গার হইবে।

৩। আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি কেহ মাগরিবের নামায একা আদায় করিয়া পুনঃ উহা জামায়াতে পড়িতে আরম্ভ করে, তবে তাহার তৃতীয় রাকয়াতে কিরাত পড়িতে হইবে। যদি কিরাত না পড়িয়া ইমামের তাবেদারী করে, তবে তাহাতেও নামায হইয়া যাইবে। ঐ ইমাম যদি তাশাহ্‌হুদ পড়িয়া বা না পড়িয়া ভুলে চতুর্থ রাকয়াত পড়িবার জন্য দাঁড়াইয়া যায় ও ঐ মুক্তাদী ইমামের তাবেদারী করে, তাহা হইলে মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হইবে ও ইমামের চারি রাকয়াত নফল হইবে। মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হইবার কারণ এই যে, নফলের সহিত নফলের জামায়াত পড়া দুরস্ত নাই।

৪। আলমগীরী কিতাবে আরও আছে- একা ফরজ আদায় করিয়া যদি নফল আরম্ভ করে, চাই সিজদাহ্ করিয়া থাকুক বা না থাকুক, এমতাবস্থায় ঐ ফরজ নামায জামায়াতে আরম্ভ হইলে নফল ছাড়িয়া দিয়া জামায়াতে শামিল হইবে না। কারণ, নফল পড়িতে আরম্ভ করিলে ওয়াজিব হইয়া যায়। কাজেই নফলের জন্য ওয়াজিব তরক করা যায় না। মান্নতি কাজা আরম্ভ করিলেও ঐ হুকুম।

৫। উক্ত কিতাবে আরও লিখিত আছে- জোহরের ফরজ নামাযে দাঁড়ানোর পর যদি অন্য লোক ঐ নামায জামায়াতে পড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যদি একা নামাযী

প্রথম রাকয়াতের সিজদাহ্ না করিয়া থাকে তবে ঐ নামায ছাড়িয়া দিয়া জামায়াতে শামিল হইবে। প্রথম রাকয়াতের সিজদাহ্ করিয়া থাকিলে আর এক রাকয়াত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জামায়াতে শামিল হইবে। একা পড়া নামায নফল হইয়া যাইবে।

৬। ঐ কিতাবে আরও আছে- একা একস্থানে নামায আরম্ভ করিবার পর নিকটবর্তী কোন স্থানে ঐ নামায জামায়াতে আরম্ভ হইলে একা নামাযী নিয়ত ছাড়িয়া দিবে না। যেমন কেহ ঘরে নামায আরম্ভ করিয়াছে ও মসজিদে জামায়াত আরম্ভ হইয়াছে কিংবা এক মসজিদে একা নামায আরম্ভ করার পর নিকটবর্তী অন্য মসজিদে জামায়াতে নামায আরম্ভ করিয়াছে।

৭। যদি জোহরের তৃতীয় রাকয়াতে দাঁড়ানোর মধ্যে ঐ ওয়াক্তের জামায়াত আরম্ভ হয়, এমতাবস্থায় তৃতীয় রাকয়াতের প্রথম সিজদাহ্ করিয়া থাকিলে চারি রাকয়াত পূর্ণ করিয়া জামায়াতে শামিল হইবে। যদি তৃতীয় রাকয়াতে দাঁড়াইয়া থাকে ও প্রথম সিজদাহ্ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কাহারও কাহারও মতে বসিয়া সালাম ফিরাইয়া জামায়াতে দাখিল হইবে অথবা নামায ছাড়িয়া তাক্বীর বলিয়া জামায়াতে দাখিল হইবে। কাহারও মতে এক সালাম ফিরাইয়া জামায়াতে শামিল হইবে। কিন্তু দাঁড়াইয়া সালাম ফিরাইয়া জামায়াতে দাখিল হওয়ার মতই উত্তম। আছর ও এশার নামাযের ঐ হুকুম। কিন্তু আছরের তৃতীয় রাকয়াতের প্রথম সিজদাহ্ করিয়া থাকিলে ঐ নামায না ছাড়িয়া পূর্ণ করিবে ও তাহার পর আর পুনঃ জামায়াতে শামিল হইবে না। কারণ আছরের পর নফল পড়া মাকরূহ্ তাহ্রীম। কাজেই জামায়াতে দাখিল হইতে নাই।

৮। উক্ত কিতাবে আছে-চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নামায জামায়াতের সহিত তিন রাকয়াত পাইলে জামায়াত পাওয়া যাইবে। শেষ রাকয়াতে শামিল হইলে জামায়াত পাওয়া হইবে না, কিন্তু জামায়াতের ফজীলত পাইবে।

৯। ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ বলেন- যদি কেহ জোহরের চারি রাকয়াত সুন্নাত বা জুময়ার পূর্বের কাবলাল জুমা চারি রাকয়াত আরম্ভ করে ও সেই সময় অন্য লোক জামায়াত আরম্ভ করে বা ইমাম জুমার খুৎবা আরম্ভ করে, তাহা হইলে দুই রাকয়াত পড়িয়া জামায়াতে শামিল হইবে কিংবা খুৎবা শুনিবে। পক্ষান্তরে মুহীত, সিরাজুল ওহ্হাজ, হেদায়া প্রভৃতি কিতাবে আছে- ঐ সুন্নাত চারি রাকয়াত পূর্ণ করিয়া জামায়াতে দাখিল হইবে কিংবা খুৎবা শুনিবে, এই মতই ছহীহ্।

১০। ফজরের জামায়াত আরম্ভ হইয়া থাকিলে যদি মনে করে যে, সুন্নাত পড়িয়া এক রাকয়াত পাইবে, তাহা হইলে সুন্নাত পড়িয়া জামায়াতে শামিল হইবে। যদি জামায়াত না পাইবার আশঙ্কা হয় তাহা হইলে সুন্নাত না পড়িয়া জামায়াতে দাখিল হইবে। ইমাম যুফার ও ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ বলেন- যদি তাশাহ্হুদ পাইবারও আশা থাকে তাহা হইলে সুন্নাত পড়িয়া জামায়াতে দাখিল হইবে।

১১। ইমামকে যদি ফজরের নামাযের রুকূতে গিয়া পায় ও প্রথম কি শেষ রাকয়াত

তাহা ঠিক করিতে না পারে, তাহা হইলে সুন্নাত না পড়িয়া ঐ জামায়াতে শামিল হইবে। খোলাছা কিতাবে ইহা লিখিত আছে। (আলমগীরী)

১২। মসজিদের মধ্যে থাকাকালীন সময় মুয়ায্যিন আযান দিলে জামায়াত না পড়িয়া মসজিদ হইতে বাহির হওয়া মাকরূহ্ কিন্তু অন্য মসজিদের ইমাম বা মুয়ায্যিন যদি বাহির হইয়া না গেলে সেই মসজিদের জামায়াত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য বাহির হওয়া মাকরূহ্ নহে।

যদি একা নামায পড়িয়া থাকে ও আযানের পর বাহির হয় তাহা হইলে গুনাহ্ হইবে না কিন্তু একামতের সময় বাহির হইলে মাকরূহ্ হইবে। কাজেই জামায়াতে শামিল হইয়া নামায পড়িবে। মাত্র জোহর ও এশায় এই হুকুম। যদি ফজর, আছর ও মাগরিব একা পড়িয়া থাকে, তবে মসজিদে জামায়াতের একামতের সময় সেখানে থাকা মাকরূহ্।

১৩। যদি কেহ ইমামকে রুকূতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাক্‌বীর বলিয়া রুকূতে শামিল হইয়া এক তাসবীহ বলিতে পারে, এমত সময় না পায়, তাহা হইলে সেই রাকয়াত পাওয়া হইবে না। (আলমগীরী)

১৪। যদি কেহ ইমামকে কিয়াম অবস্থায় পাইয়া তাক্‌বীর বলিয়া এক্তেদা করে ও ইমাম রুকূ করিয়া পুনঃ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যায় ও মুক্তাদী যদি সে সময় রুকূ করে তাহা হইলে ঐ রাকয়াত পাওয়া হইবে না, ইহাতে কোন ইমামের মতভেদ নাই। যদি কেহ শামিল হয়, তাহা হইলে ঐ রাকয়াত পাওয়া হইবে না।

১৫। আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি কেহ ইমামকে রুকূর মধ্যে পায় ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তাক্‌বীর বলিয়া সুবহানাকা বা ঈদের তাক্‌বীর সমূহ বলিয়া ইমামকে রুকূর মধ্যেই পাইবে, তাহা হইলে তাহাই করিবে। রুকূতে না পাইবার আশঙ্কা হইলে শুধু তাক্‌বীর বলিয়া রুকূতে শামিল হইবে। কিন্তু ঈদের তাক্‌বীর চুপে চুপে রুকূর মধ্যে পড়িবে।

১৬। ইমামকে রুকূর মধ্যে পাইলে নিয়ত করতঃ তাক্‌বীর বলিয়াই রুকূতে যাইবে। দ্বিতীয়বার রুকূর তাক্‌বীর না বলিলেও চলিবে। কতকের মতে দুইবারই তাক্‌বীর বলিতে হইবে।

১৭। যদি কেহ ইমামকে রুকূতে পাইয়া রুকূর তাক্‌বীরের নিয়ত করতঃ ইমামের নামাযে শামিল হয়, তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমের নিয়ত না করিয়াও থাকে, তবে তাহাতেই নামায আদায় হইয়া যাইবে। রুকূর নিয়তেই তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমের কাজ হইবে। রুকূর নিয়ত অমূলক। (আলমগীরী)

১৮। যদি কেহ ইমামের সহিত এক্তেদা করিয়া সকল রাকয়াতেই ইমামের আগে আগেই রুকূ সিজদাহ্ করে, তাহা হইলে ঐ মুক্তাদীর জন্য ওয়াজিব যে, ইমামের সালামের পরক্ষণেই দাঁড়াইয়া বিনা সূরা কিরাতে শুধু রুকূ সিজদাহ্ করিয়া এক রাকয়াত

নামায আদায় করে। যদি ইমামের সঙ্গে সঙ্গে রুকূ করে ও ইমামের আগে আগে সিজদাহ্ করে তাহা হইলে মুক্তাদী বিনা সূরা কিরাতে দুই রাকয়াত নামায আদায় করিবে। আর যদি ইমামের সঙ্গে সঙ্গে সিজদাহ্ করে কিন্তু রুকূ ইমামের আগে আগে করে, তাহা হইলে ঐ মুক্তাদী বিনা সূরা কিরাতে চারি রাকয়াত নামায আদায় করিবে।

১৯। যদি কেহ মসজিদে গিয়া জানিতে পায় যে, জামায়াত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে যে কোন সুন্নাত নফল পড়িয়া ফরজ নামায আদায় করিতে পারে। যদি সময় কম থাকে তাহা হইলে নফল ছাড়িয়া শুধু ফরজ আদায় করিবে। কিন্তু ফজরের সুন্নাত জোহরের পূর্বে আদায় করিতে হইবে। ইহাতে সকল ইমামের মত একরূপ। কেফায়া কিতাবে আছে- যদি ফরজ ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহা হইলে যে কোন সুন্নাত ছাড়িয়া দিয়া আগে ফরজ নামায আদায় করিবে। (আলমগীরী)

কাজা নামায আদায়ের বিবরণ

প্রশ্নঃ- কাজা নামায কিভাবে আদায় করিতে হয়?

উত্তরঃ- কাজা নামায আদায় সম্বন্ধে বহু মাসয়ালা আছে। নিম্নে কতক মাসয়ালা লিখিত হইল, স্মরণ রাখিবে- যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া বা অনিচ্ছায় কিংবা ভুলে অথবা নিদ্রাতে থাকার দরুন ফরজ ওয়াজিব নামায ছাড়িয়া দেয় বা ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ নামায পুনঃ আদায় করিতে হইবে। ইহাকে কাজা নামায বলে। (আলমগীরী)

২। যদি কেহ কোন কারণে নামায না পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ঐ নামায কাজা আদায় করিতে হইবে। এক ওয়াক্ত হউক বা তার চেয়ে বেশী ওয়াক্ত হউক। (আলমগীরী)

৩। সুস্থ অবস্থায় নামায ফওত হইয়া থাকিলে মাজনুন অর্থাৎ পাগল হইয়া পড়িলে ঐ নামায কাজা আদায় করিতে হইবে না, যেরূপ মাজনুন অবস্থায় নামায ফওত হইয়া থাকিলে ভাল হইলেও ঐ নামাযের কাজা আদায় করিতে হয় না।

৪। যদি কেহ কাফের হইয়া যায় ও পুনঃ মুসলমান হয় তাহা হইলে কুফরী অবস্থায় ফওত নামাযের কাজা পড়িতে হইবে না।

৫। যদি কেহ দারুল হরবে মুসলমান হয় ও নামায পড়া যে ফরজ, তাহা না জানার দরুন নামায কাজা করিয়া থাকে, তাহা হইলে দারুল ইসলামে আসিয়া ঐ নামাযের কাজা আদায় করিতে হইবে না।

৬। যদি কেহ বেহুঁশ থাকার দরুন কিংবা এরূপ রোগাক্রান্ত হয় যে, ইশারায়ও নামায আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে ও এমতাবস্থায় একদিন এক রাত্রের বেশী নামায কাজা হইয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির হুঁশ হওয়ার পর বা রোগ আরোগ্যের পর ঐ নামায কাজা আদায় করিতে হইবে না। বিনা ওজরে নামায কাজা করিয়া থাকিলে উহা পুনঃ আদায় করিতে হয়। কিন্তু ওজর অবস্থায় এই হুকুম পরিবর্তন হয়। যেমন-

মুকীম অবস্থায় চারি রাকয়াত বিশিষ্ট ফরজ নামায ফওত হইয়া থাকিলে মুসাফিরিতে গেলেও ঐ চারি রাকয়াত কাজা আদায় করিতে হয়। কিন্তু মুসাফিরি অবস্থায় কাজা হইয়া থাকিলে মুকীম অবস্থায় চারি রাকয়াতের স্থলে দুই রাকয়াত কাজা আদায় করিতে হয়।

ফরজের কাজা আদায় করা ফরজ; ওয়াজিবের কাজা ওয়াজিব; সুন্নাতের কাজা সুন্নাত। কাজা আদায়ের জন্য কোন ওয়াক্ত ঠিক করা হয় নাই। মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত চির জীবনই কাজা আদায়ের সময়।

৭। কাফী কিতাবে আছে- যদি কেহ নামায পড়িয়া কাফের হয় ও পুনঃ ঐ ওয়াক্তের মধ্যেই মুসলমান হয়, তাহা হইলে ঐ নামায পুনঃ পড়িতে হইবে। (আলমগীরী)

৮। যদি কোন বালক এশার নামায পড়িয়া নিদ্রা যায় ও নিদ্রাযোগে এহ্তেলাম (স্বপ্নদোষ) হয়, তাহা হইলে এশার নামায কাজা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু বালিকা যদি এশা পড়িয়া ঘুমায় ও ঘুমের মধ্যে হায়েজ হয়, তাহা হইলে রাত্রে উহা জানিতে পারিলেও এশা কাজা পড়িতে হইবে না। অবশ্য যদি বালিকা বয়সের হিসাবে বালেগা হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অবস্থায় এশার নামায কাজা আদায় করিবে।

৯। যে নামাযে স্বশব্দে কিরাত পড়িতে হয় এরূপ নামায কাজা হইলে কাজা আদায়কালে জেহের অর্থাৎ স্বশব্দে কিরাত পড়া উত্তম। কিন্তু খফি নামায অর্থাৎ যে নামাযে চুপে চুপে কিরাত পড়িতে হয় সেই নামায ফওত হইলে কাজা আদায়কালে চুপে কিরাত পড়া ওয়াজিব।

১০। নফল নামায আরম্ভ করার পর যদি কাজা নামাযের কথা মনে পড়ে, তাহা হইলে নফল নামায নষ্ট হইবে না। কারণ ফরজ নামাযের জন্য তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব কিন্তু নফলের জন্য নহে।

১১। ফওত নামায ও বর্তমান ওয়াক্তের নামাযে যেরূপ তারতীব ঠিক রাখা ওয়াজিব, তদ্রূপ কাজা নামাযের তারতীব ঠিক রাখাও ওয়াজিব। যেমন-ফজরের নামায ফওত হইয়া থাকিলে জোহর পড়িবার পূর্বেই ফজরের কাজা আদায় করিয়া লইতে হয় অথবা বেতের কাজা হইয়া থাকিলে ফজরের নামাযের পূর্বেই কাজা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে কাজা নামায আদায়কালে তারতীব রক্ষা না করিলে নামায ফাসেদ হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, ছয় ওয়াক্তের বেশী নামায ফওত হইয়া থাকিলে কাজা আদায়কালে তারতীবের খেয়াল না রাখিলেও চলিবে।

১২। ইমামের সঙ্গে এক্তেদা করিয়া ঘুমাইয়া গেলে বা অজু ছুটিয়া গেলে পুনঃ অজু করিয়া আসিয়া ইমামের সঙ্গে শামিল হইয়া ইমামের তাবেদারী করিবে ও বাকী নামায আদায় করিবে। এই কওলের উপর তিন ইমামের একই মত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে জুম্‌আর নামাযের ইমামের এক্তেদা করিয়া লোকাধিক্য বশতঃ সিজদাহ করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে ইমামের সালাম ফিরাইবার পর ঐ নামায আদায় করিবে।

১৩। যদি আছরের নামাযের পর মনে হয় যে জোহরের নামায পড়া হয় নাই, তাহা হইলে তারতীবের প্রতি খেয়াল না রাখিলেও চলিবে। কারণ ভুলে এরূপ ঘটিয়াছে। যদি অজু আছে মনে করিয়া জোহরের নামায পড়ার পরে নূতন অজু করিয়া আছরের নামায আদায় করার পর স্মরণ হয় যে, জোহরের নামায বিনা অজুতে পড়া হইয়াছে তবে এমতাবস্থায় শুধু জোহরের নামায পড়িলেই চলিবে। ইহাতেও তারতীব ঠিক রাখিতে হইবে না। কেননা এই বিষয়টি ভুল না হইলেও ভুলের হুকুম রাখে। কিন্তু হজ্জের মওসুমে আরাফাতে যে জোহর আছর একত্রে পড়িতে হয় তাহাতে ঐরূপ ভুল হইলে তারতীব রক্ষা করিতে হইবে। যেহেতু ঐ তারিখে জোহর ও আছর আরাফাতে একত্রে পড়া বিধান বলিয়া ঐ হুকুম। (আলমগীরী)

১৪। ফজরের নামায ফওত হইয়াছে এই কথা মনে থাকা সত্ত্বেও জোহর আদায় করিয়া আছরের নামায পড়িলে, আছরের নামায ফাছেদ হইবে না। কারণ, তাহার ধারণা ছিল জোহরের নামায পড়িয়াছে। এমতস্থলে ফজরের কাজা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু তারতীব রক্ষা করিতে হইবে না।

১৫। ফজরের নামায ফওত থাকা সত্ত্বেও জোহর পড়িবার সময় সন্দেহ হইল আমি ফজর পড়িয়াছি কিনা, কিন্তু জোহর আদায় করার পর সন্দেহ দূর হইল যে, প্রকৃত পক্ষে ফজরের নামায পড়ি নাই। এমতস্থলে তারতীব অনুযায়ী ফজরের কাজা ও জোহর আদায় করিতে হইবে। (আলমগীরী)

১৬। নামায আরম্ভ করিয়া মনে হইল যে, কয়েক ওয়াক্তের (৬ ওয়াক্তের কম) ফওত আছে। এমতস্থলে ওয়াজিব এই যে, ২ রাকয়াত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া নামায ছাড়িয়া দেয় ও বাকী ফওত নামাযের (অল্পদিনের হউক বা বেশী দিনের) কাজা আদায় করিয়া ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে। কিন্তু পরিত্যক্ত নামায নফল ধারণায় দোহরাইতে পারে।

১৭। জুম্‌আর নামায আরম্ভ করিয়া যদি মুক্তাদীর স্মরণ হয় যে, ফজরের নামায ফওত হইয়াছে, তবে এমতাবস্থায় যদি ফজরের কাজা আদায় করিয়া জুময়ার নামায পাইবে বলিয়া ধারণা হয় তাহা হইলে জুম্‌আ ছাড়িয়া দিয়া ফজরের কাজা পড়িয়া পরে জুম্‌আর নামাযে শামিল হইবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহর মতে জোহরের ওয়াক্ত থাকিলে জুম্‌আর জামাআত না পাইলেও ফজরের কাজা আদায় করিয়া জোহরের নামায পড়িবে। ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহর মতে জুম্‌আ না ছাড়িয়া পরে ফজরের কাজা আদায় করিবে। (আলমগীরী)

১৮। যদি নামাযের ওয়াক্ত এত সংকীর্ণ হয় যে, কাজা আদায় করিলে ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় থাকে না, তাহা হইলে ওয়াক্তিয়া নামায আগে আদায় করিয়া পরে কাজা পড়িবে। যদি কাজা আদায় করিয়া ওয়াক্তিয়া নামায ফরজ কিরাত ও রোকনসহ আদায় করিতে পারে এরূপ সময় থাকে তাহা হইলেও কাজা আদায় করিয়া পরে ওয়াক্তিয়া নামায পড়িবে। (আলমগীরী)

১৯। প্রকৃত পক্ষে ওয়াক্তের সংকীর্ণতা ধরা যাইবে। মুছল্লির আনুমানিক সংকীর্ণতা ধরা যাইবে না। কারণ মুছল্লির এমত ঘটিয়া থাকে যে, যেমন এক ব্যক্তি ফওত নামায আদায় করিলে ফজরের ওয়াক্ত থাকিবে না ধারণায় ফজরের নামায পড়িয়া দেখিতে পাইল যে, এখনও ওয়াক্ত বাকী আছে, এমতস্থলে ফজরের নামায ফাসেদ হইবে। পুনঃ খেয়াল করিল কাজা আদায় করিলে ওয়াক্ত থাকিবে না। এই ধারণায় পুনঃ ফজরের ফরজ পড়ার পর দেখিল এখনও ওয়াক্ত বাকী আছে। এরূপ অনুমান করিতে করিতে ওয়াক্ত শেষ করিতে পারে।

২০। যদি ফওত নামাযের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া নামায আরম্ভ করিয়া এত লম্বা কিরাত পড়ে যে তাহাতে ওয়াক্ত শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ নামায ফাসেদ হইবে। যদি ঐ নামায ছাড়িয়া দিয়া সংকীর্ণ ওয়াক্তে পুনঃ শুরু করিয়া আদায় করে তবে নামায হইয়া যাইবে ও কাজা আদায় কালীন তারতীব রক্ষা করিলেও চলিবে। (আলমগীরী)

২১। যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত নামায কাজা থাকে ও ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়, এমতাবস্থায় যদি ২/১ ওয়াক্ত কাজা নামায আদায় করিয়া ওয়াক্তিয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে কতক কাজা আদায় করিয়া পরে ওয়াক্তিয়া পড়িবে। (আলমগীরী)

২২। যদি এশা ও বেতের নামায ফওত হইয়া থাকে ও ফজরের ওয়াক্তের এমন সময় থাকে যে, মাত্র পাঁচ রাকয়াত নামায পড়িতে পারে, তাহা হইলে বেতের ও ফজরের ফরজ আদায় করিবে। সূর্য্য উদয়ের পর এশার কাজা আদায় করিবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মত। (আলমগীরী)

২৩। ফজর ও জোহরের ফওত নামায স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি আছরের ওয়াক্ত এত সংকীর্ণ হয় যে, ঐ সময়ে মাত্র আট রাকয়াত নামায পড়িতে পারে, তাহা হইলে জোহর ও আছরের নামায পড়িবে। আর যদি ছয় রাকয়াত পড়িতে পারে এমন সময় থাকে, তাহা হইলে ফজরের ফরজ ও আছরের নামায পড়িবে। পরে জোহরের কাজা আদায় করিতে হইবে। (আলমগীরী)

২৪। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহর মতানুযায়ী আছরের শেষ ওয়াক্ত নির্ণয় করিতে হইবে। ইমাম ছোরখছী রাহেমাহুল্লাহ বলিয়াছেন- যদি সূর্যের রং পরিবর্তন হইবার পূর্বে জোহরের ফওত নামায আদায় করার মত সময় থাকে, তাহা হইলে জোহরের কাজা আদায় করিয়া আছরের নামায পড়িবে। কিন্তু হাসান ইবনে জিয়াদ বলিয়াছেন, সূর্য্যের রং পরিবর্তন হইলে আছরের ওয়াক্ত থাকে না।

২৫। যদি আছরের নামায প্রথম ওয়াক্তে আরম্ভ করিয়া উহা আদায় করিতে করিতে মাকরূহ ওয়াক্ত আসিয়া পড়ে ও তখন যদি মনে হয় যে জোহরের নামায পড়া বাকী আছে তাহা হইলে ঐ নামাযই আদায় করিবে, ছাড়িয়া দিবে না। (আলমগীরী)

২৬। ওয়াক্ত থাকিতে নামায পড়া আরম্ভ করিলে যদি নামায আদায়ের মধ্যে ওয়াক্ত

শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ছহীহ কওল মতে নামায আদায় হইয়া যাইবে কাজার মধ্যে গণ্য হইবে না।

২৭। যদি কাজা ভুলে আদায় না করিয়া ওয়াক্তের শেষ ভাগে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার সময় কাজা নামাযের কথা মনে পড়ে তাহা হইলে নামায ছাড়িয়া দিবে না। কিন্তু পূর্বের কাজা নামায পরবর্তী ওয়াক্তের আগে পড়িয়া লইবে।

২৮। একাদিক্রমে ছয় ওয়াক্ত নামায ফৌত হইলে উহা আদায়কালে তারতীব রাখার আবশ্যক হয় না। ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহর মতে একাদিক্রমে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফৌত হইয়া গেলে ছয় ওয়াক্তের সময়ের তারতীব রক্ষার আবশ্যক করে না। কিন্তু প্রথম কওলই এখানে গ্রহণীয়।

২৯। যেরূপ একাদিক্রমে ছয় ওয়াক্ত নামায ফৌত হইয়া গেলে উহার কাজা আদায়কালে তারতীব রক্ষা করা আবশ্যক করে না, তদ্রূপ তদপেক্ষা বেশী নামায ফৌত হইয়া থাকিলেই উহা আদায়কালে তারতীবের আবশ্যক করে না। যদি কাহারও এক মাসের নামায ফৌত হইয়া যায়, তবে ইচ্ছা করিলে এক মাসের ফজরের নামায এক সঙ্গেই আদায় করিতে পারে। ঐরূপ জোহর আছর ইত্যাদি পড়িতে হয়।

৩০। বহু সংখ্যক নামায ফওত হইয়া থাকিলে বিনা তারতীবে কাজা আদায় করিতে পারে। যদি কাজা আদায় করিতে করিতে ২/৪ ওয়াক্ত কিংবা এক ওয়াক্ত কাজা বাকী থাকে, তখনও তারতীব রক্ষা করা জরুরী নহে। ছহীহ রেওয়ায়েত মতে এই কথাই গ্রহণীয়।

৩১। ফৌত নামায দুই প্রকার-পুরাতন ও নূতন । যেমন এক ব্যক্তির একমাস বা তারও অধিক দিনের নামায ফৌত আছে, সে যদি ঐ কাজা আদায় করিয়া ওয়াক্তিয়া নামায পড়িতে থাকে ইতিমধ্যে ২/১ ওয়াক্তের নামায নূতন ভাবে ফৌত হইয়া যায় তাহা হইলে ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে কাজা আদায় না করিলে ওয়াক্তিয়া নামায ফাসেদ হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ আছে তবে ফাছেদ হইবে না এই কথার উপর ফতোয়া হইয়াছে। (আলমগীরী)

৩২। কাজা নামায যখন স্মরণ হয় তখনই আদায় করার ওয়াক্ত। যে নামাযে যে ওয়াক্ত, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ওয়াক্তে আদায় না করা মাকরূহ অর্থাৎ ফৌত নামায স্মরণ হওয়া মাত্র আদায় না করিলে মাকরূহ্ হইবে। এই কথার উপর সকলে একমত। (নামাযের ওয়াক্তের বিস্তারিত বিবরণ তরীকুল ইসলাম ৪র্থ অধ্যায় লিখিত আছে)

৩৩। কাজা নামায আদায় না করিয়া ওয়াক্তিয়া নামায পড়িলে ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে ওয়াক্তিয়া নামায ফাসেদ মওকুফ হইবে। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহর মতে ফাসেদ হইবে।

৩৪। যদি কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায কাজা করিয়া ভুলিয়া যায় এবং চিন্তা করিয়াও তাহা ঠিক করিতে না পারে যে, কোন ওয়াক্তের নামায কাজা হইয়াছে, তাহা

হইলে আহ্নাফদের অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে এক দিন এক রাত্রির সম্পূর্ণ নামায পুনঃ পড়িবে। এরূপ যদি পাঁচ দিনের পাঁচ ওয়াক্ত ফওত হইয়া থাকে ও কোন্ কোন্ ওয়াক্তের ফওত হইয়াছে তাহা ঠিক করিতে না পারে, তাহা হইলে পাঁচ দিবা রাত্রির সম্পূর্ণ নামায পুনঃ পড়িবে।

৩৫। যদি এক দিনের জোহর ও এক দিনের আছর না পড়িয়া থাকে ও এক দিনের জোহর পড়িয়া চিন্তা করে যে, কোন দিনের আছর ও কোন দিনের জোহর পড়া হয় নাই, তাহা হইলে আছর পড়িয়া পুনঃ জোহর পড়িবে। ছাহেবাইনের মতে যদি চিন্তা করিয়া ঐ নামায ঠিক করিতে না পারে, তবে পুনঃ দোহ্রানের আবশ্যক করে না। কারণ ভুলে বা চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে না পারিলে তারতীব ভঙ্গ হইয়া যায়।

৩৬। যদি আছরের নামায পড়িবার সময় মনে হয় যে, এই নামাযে কি জোহরের নামাযে একটি সিজদাহ্ করা হয় নাই, এরূপ চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে না পারিলে আছরের নামাযের সঙ্গে আর একটি সিজদাহ্ করিয়া পরে জোহরের নামায কাজা আদায় করিবে এবং পুনঃ আছরের নামায দোহ্রাইয়া পড়িবে। আছরের নামায না দোহ্রাইলে ক্ষতি হইবে না। (আলমগীরী)

৩৭। যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের নামায আরম্ভ করিয়া নামায শেষ করিতে করিতে সূর্যাস্ত হয়, এমতাবস্থায় যদি কোন মুসাফির ঐ সঙ্গে এক্তেদা করিয়া থাকে তবে তাহার এক্তেদা ছহীহ হইবে না। (আলমগীরী)

৩৮। শাফী মাযহাবে থাকাকালীন নামায ফওত হইয়া থাকিলে ও পরে হানাফী মাযহাব অবলম্বন করিলে ঐ কাজা নামায আদায়কালীন হানাফী মাযহাব মতে আদায় করিবে। (আলমগীরী)

৩৯। যদি কোন ব্যক্তি তায়াম্মুমে কব্জা পর্যন্ত মাসেহ্ করিতে হয় ও বেতের নামায মাত্র এক রাকয়াত, এরূপ জানিয়া নামায পড়িতে থাকে ও পরে বুঝিতে পারে যে, তায়াম্মুমে কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করিতে হয় বেতের নামায তিন রাকয়াত পড়াই বিধেয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পূর্বের নামায দোহ্রাইতে হইবে না। যদি কিছু না জানা বশতঃ ঐরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্বের নামায সমূহ কাজা পড়িতে হইবে।

(আলমগীরী)

৪০। কোন স্ত্রীলোকের এক ওয়াক্ত নামায কাজা হওয়ার পর হায়েজ হইয়া পুনঃ পাক হইল। এমতস্থলে কাজা নামাযের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও কাজা আগে আদায় না করিয়া ওয়াক্তিয়া নামায পড়িলে হইবে না। (আলমগীরী)

৪১। কেহ দারুল হরবে অবস্থানকালীন মুসলমান হইল। এমতাবস্থায় নামায রোযা ইত্যাদি শরীয়তের হুকুম, আহকাম না জানার দরুন নামায রোযা আদায় না করিয়া থাকিলে তাহার কাজা লাগিবে না। তজ্জন্য তাহার উপর আযাব হইবে না। যদি দারুল-হরবের মধ্যে কেহ তাহাকে শরীয়তের হুকুম আহকাম জানাইয়া থাকে, তাহা হইলে

৭—

কাজা আদায় করিতে হইবে। ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ হইতে হাছান (রহঃ) বলিয়াছেন- যদি ঐ ব্যক্তিকে দুই জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক শরীয়তের কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কাজা আদায় করিতে হইবে।

৪২। যদি জীবনে নামায ফওত না হইয়া থাকে কিন্তু নামাযে মাকরূহ্ ইত্যাদি ঘটিয়াছে ঐ ধারণায় নামায কাজা পড়ে তবে জায়েয হইবে। যদি মাকরূহ্ ইত্যাদি না-ও ঘটিয়া থাকে এবং তৎসত্ত্বেও কাজা পড়িতে থাকে, ছহীহ্ কওল মতে তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু ফজর ও আছরের পর পড়িবে না। ঐ নামায আদায় কালে প্রত্যেক রাকয়াতে ফাতিহা ও কিরাত উভয়ই পড়িবে।

৪৩। যদি বেতের ফওত হইয়াছে কিনা তাহাতে সন্দেহ জন্মে তাহা হইলে বেতের নামায পড়িতে হইবে। তৃতীয় রাকয়াতে যথারীতি কুনূত পড়িয়া তাশাহ্হুদ পড়িবে এবং চতুর্থ রাকয়াতে ফাতিহা ও সূরা মিলাইয়া পড়িয়া নামায শেষ করিবে। তাহা হইলে ঐ বেতের আদায় হইবে। যদি বেতের কাজা না থাকে তাহা হইলে ঐ নামায নফল হইয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, নফল নামাযে কুনূত পড়িলে নামায বাতিল হয় না।

(আলমগীরী)

৪৪। যদি পিতা পুত্রকে বলে- আমার নামায রোযা ফওত হইয়াছে, উহার কাজা আদায় করিয়া দিবে, তবে আমাদের মাযহাবে পুত্রের উহা আদায় করা জায়েয নাই।

(তাহ্তাবী)

প্রশ্নঃ- মাওলানা ইব্রাহীম ছাহেব প্রণীত ঈছালে ছওয়াব কিতাবে ৯ম পৃষ্ঠায় ছহীহ্ বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফ প্রভৃতি কিতাব হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তির অলী নামায রোযার কাজা আদায় করিবে। এখন আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- তাহ্তাবী ও মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে উক্ত মাওলানা ছাহেবের উল্লিখিত হাদীস মনসুখ বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির নামায রোযার ফেদিয়া দেওয়ার হুকুম।

৪৫। যদি কেহ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অছিয়ত করিয়া গিয়া থাকে যে, আমার নামায রোযার কাফ্ফারা দিবে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এক- তৃতীয়াংশ দ্বারা ঐ ফেদিয়া আদায় করিবে। যদি অছিয়ত করিয়া যায় কিন্তু মাল সম্পতি কিছুই না থাকে তাহা হইলে ওয়ারিসগণের মধ্যে কেহ অর্দ্ধছা (১৩৫ তোলা) ময়দা বা গেহুর মূল্য কর্জ লইয়া একজন মিসকীনকে দিবে। মিসকীন পুনঃ ওয়ারিসানকে দিবে। পুনঃ মিসকীনকে দিবে। (এই ভাবে যতবার দিলে কাফ্ফারা আদায় হইয়া যায়, ততবার দিবে) যদি অছিয়ত না করিয়া থাকে তবে ওয়ারিসগণ এইরূপ ভাবে কাফ্ফারা আদায় করিলে বিশেষ নেকী পাইবে। কিন্তু অছিয়ত না করিলে ওয়ারিসদের প্রতি কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব নহে। (আলমগীরী)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ একজনের কাফ্ফারা যত মণ হউক, একজনকে দিলেও আদায় হইবে। কিন্তু জেহার, কছম, রোযার কাফ্ফারা এইরূপ বেশী হইলেও একজনকে দিতে পারিবে না।

ফকীহ্ আবু লাইছ বলিয়াছেন- পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাজা হইলে দশ সের এক জনকে ও এক সের এক জনকে দিলে চারি ওয়াক্তের কাফ্ফারা আদায় হইবে। এক ওয়াক্তের আদায় হইবে না।

প্রশ্নঃ মৃত্যুরোগের নামাযের কাফ্ফারা দিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায়- মৃত্যুরোগে পতিত হইলে যদি ইশারায়ও নামায পড়িবার ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে ঐ নামাযের কাফ্ফারা দিতে হইবে না। রোযারও ঐ হুকুম।

প্রশ্নঃ আমরা মৃত ব্যক্তির পূর্বক্ষণের পর্যন্ত নামায রোযার কাফ্ফারা দিয়া থাকি। হুযুরের উল্লিখিত কিতাব মতে কি না দিলেও চলিবে?

উত্তরঃ- বর্তমান যামানায় লোকের ঈমান দুর্বল। কাজেই সামান্য অসুখেই নামায রোযা ত্যাগ করিয়া বসে। কে কিরূপ অসুখে নামায রোযা ছাড়ে তাহা জানা যায় না বলিয়া বেহেতরীর জন্য কাফ্ফারা দেওয়া উচিত মনে করিয়া মোতায়াখ্খেরীন ওলামাগণ কাফ্ফারা দেওয়ার বিধান করিয়াছেন। অতএব এরূপ অবস্থায় কাফ্ফারা দেওয়া উত্তম।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ্ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার পর সন্দেহ করে যে কোন ওয়াক্তের নামাযে কিরাত পড়ি নাই তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- যদি সন্দেহ করে যে, প্রথম দুই রাকয়াতে কিরাত পড়া হয় নাই, তাহা হইলে ফজর ও মাগরিবের নামায দোহ্রাইবে। যদি স্মরণ হয় যে, এক রাকয়াতে কিরাত পড়া হয় নাই তাহা হইলে ফজর ও বেতের নামায দোহরাইবে। আর যদি এই কথা মনে হয় যে, দুই রাকয়াতে কিরাত পড়া হয় নাই, তাহা হইলে ফজর, মাগরিব ও বেতের নামায দোহ্রাইবে। আর যদি মনে হয় যে, চারি রাকয়াতে কিরাত পড়া হয় নাই তাহা হইলে জোহর, আছর ও এশা দোহ্রাইবে।

ওমরী কাজা আদায়ের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ওমরী কাজা কাহাকে বলে?

উত্তরঃ- বালেগ অবস্থায় নামায কাজা ও ফাসেদ হইয়াছে কিনা, এই সন্দেহ দূর করার জন্য যে নামায পুনঃ পড়া হয় তাহাকে ওমরী কাজা বলে।

প্রকাশ থাকে যে, আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়- হাদীস শরীফে এশরাক, চাশত, আওয়াবীন ইত্যাদি যে সকল নফল নামাযের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল নফল ব্যতীত অন্যান্য নফল পড়ার চাইতে ওমরী কাজার নিয়ত করতঃ পিছনের ফরজ ও ওয়াজিব নামায আদায় করা উত্তম। সুন্নাতের কাজা পড়িতে হইবে না। কাজা নামায নিজ ঘরে পড়াই ভাল।

প্রশ্নঃ- তিন রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযের ওমরী কাজা কিরূপ ভাবে আদায় করিতে হয়?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে কাজার বয়ানে লিখিত আছে- বেতের নামায ওমরী কাজা আদায়কালে তিন রাকয়াত যথারীতি পড়িয়া শেষ রাকয়াতে সালাম না ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে এবং ফাতিহা ও তৎসঙ্গে কোন সূরা পড়িয়া তাশাহ্হুদ দরূদ ইত্যাদি পাঠ করতঃ সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে।

দুররুল মোখতার কিতাবে (১ম খন্ডে) আছে মাগরিবের নামাযেও এইরূপ তিন রাকয়াত পড়িয়া সালাম না ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে এবং ফাতিহা ও কোন সূরা মিলাইয়া যথারীতি বাকী এক রাকয়াত আদায় করিয়া সালাম ফিরাইবে।

বেতের নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- এই নামাযের নাম বেতের হইল কেন?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- বেতের শব্দের আভিধানিক (লোগাতী) অর্থ বেজোড়। শরীয়তের পরিভাষায় তিন রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযকে বেতের বলে।

প্রশ্নঃ- বেতের নামায প্রথম কে পড়ে ছিলেন ও কিরূপে তিন রাকয়াত হইল?

উত্তরঃ- তরীকুল ইসলাম ৪র্থ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই নামায প্রথম হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়া ছিলেন। তানবীরুল আবছার কিতাবে আছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়া আম্বিয়াদের রূহের সহিত সাক্ষাৎ কালে হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন সেই ওয়াদা পালনের নিয়তে ছিদরাতুল মোন্তাহায় গিয়া প্রথম এক রাকয়াত নামায আরম্ভ করেন। পরে ঐ সঙ্গে নিজের জন্য এক রাকয়াত পড়েন। তৎপর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে আর এক রাকয়াত পড়েন। পৃথক পৃথক নিয়তে পড়া হইয়াছে বলিয়া বেতের নাম হইয়াছে এবং প্রথম ওয়াজিব রক্ষার্থে পড়া আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ওয়াজিব বলিয়া ধরা হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- কোন সময় বেতের নামাযের ওয়াক্ত হয়?

উত্তরঃ- মাজমাউল আনহুর ও শরম্বালালিয়া কিতাবে আছে- এশার নামাযের পর হইতে ছোবহেছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত বেতের নামাযের সময়। এই সম্বন্ধে তরীকুল ইসলাম ৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে, সেখানে দেখিয়া লইবেন।

প্রশ্নঃ- কাহারও মতে বেতের নামায ওয়াজিব, কাহারও মতে ফরজ, কাহারও মতে সুন্নাত, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- আমলে ফরজ, এতেকাদে ওয়াজিব ও ছুবুতে সুন্নাত। আমলে ফরজ এই কথার তাৎপর্য এই যে, ফরজ তরক করিলে যেরূপ

গুনাহ হয়, বেতের ছাড়িলেও তদ্রূপ গুনাহ হয়। ফরজের কাজা আদায়কালে যেরূপ তারতীব রক্ষা করিতে হয়, বেতেরেও তদ্রূপ তারতীব রক্ষা করিতে হয়। ফরজের যেরূপ কাজা আদায় করিতে হয় বেতের নামাযেও তদ্রূপ কাজা আদায় করিতে হয়। কাজেই আমল হিসাবে বেতের ফরজের সমতুল্য। এতেকাদে ওয়াজিব অর্থাৎ এই নামাযকে ওয়াজিব বলিয়াই ধারণা করিতে হইবে। ছুবুতে সুন্নাতের তাৎপর্য এই যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই নামায পড়া প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ছুবুতে (প্রমাণে) সুন্নাত নামে অভিহিত হইয়াছে।

বেতের নামাযের কতক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ বেতের নামায কিরূপ ভাবে পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- বেতের নামায মাগরিবের ন্যায় তিন রাকয়াত পড়িবে। কিন্তু প্রত্যেক রাকয়াতে ফাতিহা ও যে কোন এক সূরা বা কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ পড়িবে। হাদীস শরীফে আছে- প্রথম রাকয়াতে "সাব্বিহিসমা" দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকয়াতে সূরা ইখলাছ পড়িয়া তাক্‌বীর বলিয়া কানে উলা দিয়া হাত বাঁধিয়া দোয়া কুনূত পড়িবে।

প্রশ্নঃ আমরা প্রথম রাকয়াতে ইন্না আন্‌যালনা পড়িয়া থাকি আপনি সাব্বিহিসমা পড়িতে বলিলেন, ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- বৎস! হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী, শামী মাজমাউল আনহুর, শরম্বালালিয়া, দুররুল হেকাম, তাবীনুল হাকায়েক, মারাকিল ফালাহ, তাহতাবী, ফতহুল কাদীর (১ম খন্ড) জামেউর রমুজ ইত্যাদি ফিকাহর কিতাব সমূহে ও মিশকাত, নাছায়ী শরীফ ইত্যাদি হাদীসের কিতাবে লিখিত আছে- বেতেরের ১ম রাকয়াতে 'সাব্বিহিসমা' ২য় রাকয়াতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকয়াতে সূরা ইখলাছ পড়িবে। শুধু শরহে বেকায়ার হাশিয়াতে লিখিত আছে, বেতের নামাযের ১ম রাকয়াতে ইন্না আন্‌যালনা বা ইযা যুলযিলাত কিংবা আলহাকু সূরা ও ২য় রাকয়াতে সূরা কাওসার কিংবা সূরা নাছর এবং তৃতীয় রাকয়াতে সূরা কাফিরূন বা সূরা লাহাব কিংবা সূরা ইখলাছ পড়িবে।

প্রশ্নঃ- এমতস্থলে আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- যখন বহু সংখ্যক কিতাবে সাব্বিহিসমা পড়িবার মত পাওয়া যায় তখন ঐ সূরা মুখস্থ করিতে পারিলে উহাই পড়া ভাল। অন্যথায় শরহে বেকায়ার হাশিয়ার মতানুযায়ী ইন্না আন্‌যালনা পড়িবে।

জামেউর রমুজ কিতাবে আছে- উক্ত নির্দিষ্ট সূরা ব্যতীত অন্য সূরা পড়িলেও জায়েয হইবে।

প্রশ্নঃ- নামাযের মধ্যে প্রত্যহ এক সূরা নির্দিষ্ট করিয়া পড়া ও সুন্নাত নফলের মধ্যে এক রাকয়াত হইতে অন্য রাকয়াতে তিন আয়াতের বেশী দীর্ঘ কিরাত

পড়া মাকরূহ্। বেতের নামাযে নির্দিষ্ট সূরা ও এক সূরা হইতে অন্য সূরা দীর্ঘ পড়ার হুকুম দেখা যায়। ইহাতেও মাকরূহ হইবে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে মাকরূহাতের বয়ানে লিখিত আছে- সুন্নাত ও নফল নামাযের এক রাকয়াতের চেয়ে অন্য রাকয়াতে বেশী দীর্ঘ কিরাত পড়া মাকরূহ। কিন্তু হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা ছাহাবীগণ হইতে কোন নির্দিষ্ট সূরা পড়ার হুকুম থাকিলে তাহাতে মাকরূহ্ হইবে না। যেরূপ বেতের নামাযের প্রথম রাকয়াতে সাব্বিহিসমা ও দ্বিতীয় রাকয়াতে কুলইয়া পড়ার বিধান আছে।

প্রশ্নঃ- আমরা বেতের নামাযে যে নির্দিষ্ট দোয়া কুনূত আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা পড়িয়া থাকি, ইহা ছাড়া অন্য কোন দোয়া কুনূত পড়ার বিধান আছে কি না?

উত্তরঃ- শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- বেতের নামাযে দোয়া কুনূত পড়া ওয়াজিব। তবে উক্ত নির্দিষ্ট দোয়া কুনূত পড়াতে ওয়াজিব ও সুন্নাত দুই-ই আদায় হয়। কেননা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ঐ দোয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাজেই সকলেই উহা পড়িয়া থাকে। ফতহুল কাদীর কিতাবে আছে- হযরত জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উক্ত দোয়া কুনূত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রশ্নঃ- আপনি বেতের নামাযে দোয়া কুনূতের পর দরূদ শরীফ পড়িতে বলিয়াছেন কিন্তু আলমগীরী কিতাবে নাকি দোয়া কুনূতের পর দরূদ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। এমতস্থলে আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- এখানে আলমগীরী কিতাবের মত আমল করা যায় না। কারণ নাছায়ী শরীফ ১ম খন্ডে বেতেরের বয়ানে আছে। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া কুনূতের পর দরূদ শরীফ পড়িতে বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কবিরী, তাহতাবী, শরম্বলালিয়া, মারাকিল ফালাহ, বাহরুর রায়েক (২য় খন্ড) প্রভৃতি কিতাবে দোয়া কুনূতের পর দরূদ পড়া সুন্নাত বলিয়াছেন। শামী, দুররুল মোখতার ও হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে কুনূত পড়ার পর দরূদ পড়া সুন্নাত বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- দোয়া কুনূতের পর কিরূপ দরূদ শরীফ পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে হলবী (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে- সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লিম' এই দরূদ শরীফ পড়িলে মুস্তাহাব আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ যদি কেহ দোয়া কুনূত না জানে তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- ছগীরী, কবীরী, শামী, মেরকাত, হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে বেতেরের বয়ানে আছে- দোয়া কুনূত শিক্ষা করিতে যত দিন লাগে ততদিন

আল্লাহুম্মাগফিরলী কিংবা ইয়া রাব্বি তিনবার পড়িবে অথবা "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্নার" পড়িবে।

প্রশ্নঃ বেতের শেষ করিয়া কোন দোয়া পড়িতে হয় কি না?

উত্তরঃ- মেশ্‌কাত শরীফে বেতেরের বয়ানে আবদুর রহমান ইবনে আরজী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, বেতেরের সালাম ফিরাইয়া তিনবার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ পড়িবে। শেষবারে কিছু জোরে বলিবে। মেরকাত (২য় খন্ডে) ও নাছায়ী শরীফেও এরূপ লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ- বেতের নামায জামায়াতে পড়া যায় কি না?

উত্তরঃ- রমজান ব্যতীত অন্য সময় বেতের নামায জামায়াতে পড়িবে না। হযরত ওমর (রাঃ) রমজান মাসে বেতের নামায জামায়াতে পড়ার প্রবর্তন করেন। এমন কি তিনি প্রথম ইমামতী করিয়া ছিলেন। কোন কারণে ঘরে একা পড়িলেও হইবে কিন্তু জামায়াতে পড়া অতি উত্তম । খানিয়া বাহ্‌রোর রায়েক ও আলমগীরী কিতাবে আছে- রোযার মাসে বেতের নামায জামায়াতে পড়া সম্বন্ধে সকল ফেকাহবিজ্ঞ ওলামাগণ একমত। অন্য সময়ে বেতের নামায জামায়াতে পড়িলে মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ- দোয়া কুনূত জেহের (শব্দ) করিয়া পড়িবে, না চুপে চুপে পড়িবে?

উত্তরঃ- চুপে পড়া ভাল। যদি কোন ইমাম জাহেল মুক্তাদীকে শিক্ষা দেওয়ার নিয়তে জেহের করিয়া পড়ে তাহাও জায়েয আছে । কেননা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে শিক্ষা দেওয়ার মানসে জেহের (শব্দ) করিয়া পড়িয়াছেন। (খানিয়া) উক্ত কারণ ব্যতীত ইমাম জেহের করিয়া দোয়া কুনূত পড়িলে বিদ্‌য়াতে পতিত হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি ১ম বা দ্বিতীয় রাকয়াতে ভুলে দোয়া কুনূত পড়িয়া থাকে তাহা হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে- ভুলে ঐরূপ দোয়া কুনূত পড়িয়া থাকিলে ৩য় রাকয়াতে পুনঃ পড়িবে না। কিন্তু গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায় এরূপাবস্থায় সোহ-সিজদাহ্‌ করিতে হইবে। কেননা বে-মহলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্যস্থানে পড়া হইয়াছে।

প্রশ্নঃ দোয়া কুনূত পড়িয়া নামাযের মধ্যেই যদি কাহারও সন্দেহ জন্মে যে, দোয়া কুনূত পড়ি নাই। এমতস্থলে কি করিবে?

উত্তরঃ- খানিয়া কিতাবে আছে- যদি ঐরূপ সন্দেহ জন্মে তাহা হইলে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবে। তাহাতেও যদি পড়া হইয়াছে কি না ঠিক করিতে না পারে, তবে পুনঃ দোয়া কুনূত পড়িবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- উপরোক্ত কিতাবের মর্মে আরো জানা যায়, শাফী মাযহাবের ইমাম ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়িয়া থাকেন। যদি আমাদের হানাফী মাযহাবের মুক্তাদী

সেই জামায়াতে এক্তেদা করে তবে হানাফীদের কুনূত পড়িতে হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি রমজান মাসে জামায়াতে বেতের পড়ার সময় শেষ রাকয়াতে মাসবুক আসিয়া শামিল হয় তাহা হইলে সে কোন সময় কুনূত পড়িবে?

উত্তরঃ- ফতহুল কাদীর কিতাবে আছে- জামায়াতে বেতের পড়ার সময় শেষ রাকয়াতে মাসবুক হইলে ইমামের সহিত দোয়া কুনূত পড়িবে। বাকী দুই রাকয়াতে কুনূত পড়িতে হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ যথাস্থানে দোয়া কুনূত না পড়িয়া অন্য স্থানে পড়ে বা একেবারে না পড়ে তবে কি হইবে?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- ঐ মাসয়ালা চারি প্রকার হইতে পারে- (১) রুকূতে পড়া, (২) রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া পুনঃ রুকূ করিয়া কুনূত পড়া, (৩) রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া রুকূ না করিয়া সিজদাহ করা, (৪) রুকূ হইতে খাড়া হইয়া কিংবা কোন স্থানে কুনূত না পড়িলে সোহ-সিজদাহ্ করিয়া নামায পূর্ণ করিতে হইবে।

তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ তারাবীহ নামায পড়া কি?

উত্তরঃ- শামী,মারাকিল ফালাহ ও দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- সকল ওলামার মতে রমজান মাসে স্ত্রী পুরুষ সকলের জন্যই তারাবীহ নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

প্রশ্নঃ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি মধ্যে মধ্যে তারাবীহ নামায পড়েন নাই। এমতস্থলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হইল কিরূপে?

উত্তরঃ- দুররুল হেকাম,মাজমাউল আনহুর ও শরহে বেকায়ার হাশিয়াতে আছে, উম্মতের উপরে ফরজ হইয়া পড়ে নাকি এই আশঙ্কায় হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তারাবীহ্ নামায পড়েন নাই।

কিন্তু শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) সর্বদা রোযার মাসে তারাবীহ নামায পড়িয়াছেন। কখনও তরক করেন নাই। তারপর হইতে ছাহাবায়ে কেরাম ও ওলামায়ে দ্বীন ঐ মত সমর্থন করতঃ রীতিমত তারাবীহ্ নামায আদায় করিয়া আসিতেছেন। এই কারণে হেদায়া কিতাবে ছহীহ্ কওল মতে তারাবীহকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কওলী (হুকমী) বলিয়াছেন। কেননা, হযরত নবীয়ে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আমার আছহাব ও সুপথ প্রাপ্ত খলীফাগণ যে কাজ করিবে তাহাও উম্মতের জন্য আমল করা সুন্নাত।

মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- হযরত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছহাবদের সঙ্গে জীবনে দুই কিংবা চারি রাত্র জামায়াতে তারাবীহ পড়িয়াছেন, উক্ত কিতাবে বুখারী শরীফ হইতে আরও লিখিয়াছেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর পর্যন্ত সকল আছহাব পৃথক পৃথক ভাবে তারাবীহ পড়িয়াছেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) যামানা হইতে পুনঃ জামায়াতে তারাবীহ পড়ার বিধান প্রচলিত হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- তারাবীহ নামায কখন পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে তারাবীহ নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধে তিনটি মত লিখিত আছে-(১) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হইতে ছোব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত। (২) এশার নামাযের পর হইতে বেতের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত (৩) এশার পর ছোবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত বেতের নামাযের পূর্বে বা পরে তারাবীহ নামাযের ওয়াক্ত।

প্রশ্নঃ- আমরা কোন মত আমল করিব?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- প্রথম মত কেহই গ্রহণ করেন নাই । খোলাছা কিতাবে দ্বিতীয় মত ছহীহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কাফী, শামী, খানিয়া, মুহীত, আলমগীরী, মারাকিল ফালাহ, দুররুল মোখতার বাহরুর রায়েক ও মাজালেসুল আবরার প্রভৃতি কিতাবে তৃতীয় মত সর্ববাদী সম্মত অর্থাৎ সকল আলেমদের মতে ছহীহ ও গ্রহণীয় বলিয়া লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- আমরা জানি বেতের নামাযের পর তারাবীহ পড়িতে নাই। আপনি বলিলেন বেতের নামাযের পরে বা পূর্বে তারাবীহ পড়িতে পারে। এখন আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- খানিয়া কিতাবের মতে বেতের নামাযের পর তারাবীহ পড়িলেও জায়েয হইবে। বেতেরের আগে পড়িলেও জায়েয হইবে। এই কথা উপরোক্ত কিতাব সমূহেও আছে। খানিয়া কিতাবে আরও আছে- এশার পূর্বে তারাবীহ পড়িলে জায়েয হইবে না। আরও লিখিত আছে- এশা না পড়িয়া জামায়াতে বেতের পড়িলে বেতেরের নামায ছহীহ হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদিও এশার নামাযের পর হইতে ছোবহে ছাদেক পর্যন্ত তারাবীহর ওয়াক্ত কিন্তু কোন সময় পড়া বেশী ভাল?

উত্তরঃ- নূরুল ইজাহ, খানিয়া, আলমগীরী, বাহরুর রায়েক, দুররুল মোখতার ও গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবে আছে- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে কিংবা দ্বিপ্রহর রাত্রের পূর্বে তারাবীহ নামায পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু দ্বিপ্রহর রাত্রে তারাবীহ পড়িলে মাকরূহ হইবে না। শামী ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- দ্বিপ্রহর রাত্রের পূর্বে পড়া ভাল। কারণ শেষ রাত্রের জন্য রাখিয়া দিলে নামায ফওত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

প্রশ্নঃ- তারাবীহ নামায কি জামায়াতে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ না একা পড়া?

উত্তরঃ- শামী, খানিয়া ও আলমগীরী প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায়, তারাবীহ নামায সকলের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কিন্তু জামায়াতে তারাবীহ পড়া সুন্নাতে কেফায়া। যদি মহল্লার কতক লোকে জামায়াত করিয়া তারাবীহ পড়ে তাহা হইলে মহল্লার বাকী লোক জামায়াতের সুন্নাতের জন্য দায়ী হইবে না। কিন্তু জামায়াতের ফজীলত হইতে বঞ্চিত হইবে, যেরূপ একা একা ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করিলে ফরজের দায় হইতে বাঁচিয়া যাইবে বটে কিন্তু জামায়াতের ফজীলত পাইবে না। খানিয়া, আলমগীরী, দুররুল হেকাম ও বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবে আছে- যদি মসজিদের জামায়াতে না গিয়া ঘরে জামায়াত করিয়া নামায পড়ে, তবে জামায়াতের ফজীলত পাইবে বটে কিন্তু মসজিদের ফজীলত পাইবে না।

প্রশ্নঃ তারাবীহ্ নামায কত রাকয়াত পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- শামী, নূরুল ইজাহ, দুররুল মোখতার ও বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবে আছে সুন্নাত অল-জামায়াতের সকল ওলামার গ্রহণীয় মত এই যে, দশ সালামে বিশ রাকয়াত তারাবীহ পড়িবে। এমন কি, পৃথিবীর সকল সুন্নাতঅল জামায়াতের লোকগণ বিশ রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া থাকেন। মুহীত কিতাব হইতে মোলতাকাল আবহোর কিতাবে লিখিয়াছেন, যদি কেহ দুই রাকয়াতের পর তাশাহ্হুদ পর্যন্ত বসিয়া পুনঃ দাঁড়াইয়া দুই রাকয়াত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া এরূপভাবে পাঁচ সালামে বিশ রাকয়াত তারাবীহ শেষ করে, তবে জায়েয হইবে। উক্ত কিতাবে আরো আছে- প্রতি দুই রাকয়াতের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসিয়া একেবারে বিশ রাকয়াত পড়িয়া শেষ সালাম ফিরাইলে মাকরূহের সহিত জায়েয হইবে। যদি কেহ দুই দুই রাকয়াতের পর না বসিয়া একেবারে বিশ রাকয়াত আদায় করিয়া সালাম ফিরায় তবে নামায জায়েয হইবে কিনা তাহাতে মতভেদ আছে। ছহীহ কওল মতে মাত্র দুই রাকয়াত আদায় হইবে, ইহার উপর ফতোয়া।

প্রশ্নঃ- চারি রাকয়াত তারাবীহ্ নামায পড়ার পর বসা কি? এবং সে সময় দোয়া পড়া কি?

উত্তরঃ- নূরুল ইজাহ, আলমগীরী, ও দুররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাবে আছে- চারি রাকয়াত তারাবীহ নামায পড়ার পর চারি রাকয়াত নফল নামায পড়িতে পারে এই পরিমাণ সময় বসিয়া তাসবীহ ইত্যাদি পড়া মুস্তাহাব। ঐরূপ তারাবীহ শেষ করিয়া বেতের নামাযের পূর্বেও চারি রাকয়াত পরিমাণ সময় বসা মুস্তাহাব। সিরাজিয়া কিতাব হইতে আলমগীরী কিতাবে লিখিয়াছেন- মুক্তাদীগণের কোন কষ্টের আশঙ্কা হইলে না বসিলেও চলিবে। শামী কিতাবে আছে, সামনের বাকী নামায আরামের সহিত আদায় করার উদ্দেশ্যেই চারি রাকয়াতের পর বসা মুস্তাহাব হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- ঐরূপ বসার সময় দোয়া না পড়িলে কি হইবে?

উত্তরঃ- উল্লিখিত কিতাব সমূহে আছে- যদি কেহ শুধু বসিয়া থাকে কিংবা তাসবীহ বা কিরাত পড়ে অথবা একাকী নফল নামায পড়ে, তাহাতেই মুস্তাহাব আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফেও কি ঐ নিয়মে তারাবীহ্ নামায পড়া হয়?

উত্তরঃ- আলমগীরী ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে- খাছ মক্কাবাসীগণ চারি রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন ও আরও ২ রাকয়াত তাওয়াফের নামায পড়েন, তৎপর চারি রাকয়াত তারাবীহ পড়েন। মদীনা শরীফে খাছ লোকগণ জামায়াতে চারি রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া পুনঃ নিজে নিজে চারি রাকয়াত নফল নামায পড়েন; তৎপর জামায়াতে চারি রাকয়াত তারাবীহ পড়েন। মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- মক্কা ও মদীনা ব্যতীত অন্য দেশের লোক একাকী বা জামায়াতে চারি রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া যে কোন দোয়া কালাম বা তাসবীহ তাহলীল পড়ুক কিংবা চুপ করিয়া থাকুক সকলই জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ- বর্তমান যামানায়ও কি মক্কা ও মদীনা শরীফে উক্ত নিয়মে তারাবীহ পড়া হয়?

উত্তরঃ-পূর্ব যামানায় মক্কা এবং মদীনা শরীফে যে নিয়মে তারাবীহ পড়া হইত তাহাই

কিতাবে লিখিত আছে। বর্তমান যামানার অবস্থা মক্কা ও মদীনা বাসীদের নিকট জানিয়া লইলেই হইবে।

প্রশ্নঃ- তারাবীহ নামাযে কিরূপ কিরাত পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে- সমস্ত ত্রিশ তারাবীতে কুরআন শরীফ এক খতম করা সুন্নাত। দুই খতম করা ভাল, তিন খতম করিতে পারিলে উত্তম। আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়ার মানসে- কুরআন খতম ত্যাগ করা ভাল নহে। শামী কিতাবে আছে, শবে কদর দেখিবার নিয়তে ঐ রাত্রে এক খতম করা মুস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- তারাবীহ্ নামাযে যদি ত্রিশ দিনে কুরআন খতম করিতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেক রাকয়াতে কি পরিমাণ কিরাত পড়িবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ হইতে হাসান (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক রাকয়াতে দশ আয়াত বা তদপেক্ষা কিছু বেশী পড়িলে একমাসে কুরআন শরীফ খতম হইবে, এই রেওয়ায়েত ছহীহ। কেননা কুরআন শরীফে মোট ছয় হাজারের বেশী আয়াত আছে। ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া মোট ছয় শত রাকয়াত তারাবীহ পড়িতে হয় কাজেই দশ আয়াতের কিছু বেশী পড়িলেই খতম শেষ হইবে। শামী ও আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি কোন কারী বা হাফেজ ত্রিশ দিনের পূর্বেই কুরআন খতম শেষ করিয়া ফেলে তাহা হইলে অন্যান্য সূরা বা আয়াত পড়িয়া ত্রিশ তারাবীহ পূর্ণ করিবে।

প্রশ্নঃ- কুরআন শরীফে আয়াত ও হরফ ইত্যাদির সংখ্যা কত তাহার কোন নির্দিষ্ট হিসাব আছে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে তারাবীর বয়ানে লিখিত আছে- কুরআন শরীফের মধ্যে মোট ৬৬৬৬ আয়াত আছে। তাহার ১ হাজার আয়াত ওয়াদা পূর্ণ, ১ হাজার আয়াত ভয়সূচক, ১ হাজার আয়াত হুকুমপূর্ণ, ১ হাজার আয়াত নিষেধ সূচক, ১ হাজার আয়াত কেচ্ছামূলক ও ১ হাজার আয়াত সুসংবাদ পূর্ণ, ৫ শত আয়াত হালাল হারাম সম্পর্কে, ১ শত আয়াত দোয়া ও তাসবীহ বিশিষ্ট ৬৬টি আয়াত নাসেখ মানসুখ। যে আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতের হুকুম রদ্ করা হইয়াছে তাহাকে নাসেখ ও যে আয়াতের হুকুম রদ্ হইয়াছে তাহাকে মানসুখ বলে।

দালায়েলুল খায়রাতের হাশিয়াতে মাতলাউল উলুম কিতাব হইতে লিখিত আছে- কুরআন শরীফে মোট ১১২ সূরা। কিন্তু ওয়াদ্দোহা ও আলামনাশরাহকে এক সূরা এবং সূরা ফীল ও লিইলাফি এই দুই সূরাকে এক সূরা ধরা হইয়াছে। কুরআন শরীফে মোট ৩২১১৮০ টি হরফ আছে। আলমগীরী কিতাবে তারাবীর বয়ানে আছে- কুরআন শরীফে মোট ৫৪০টি রুকূ আছে।

প্রশ্নঃ- বর্তমান যামানায় প্রায় স্থানেই তারাবীর জামায়াতে কুরআন খতম করে না, ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- এখতিয়ার কিতাব হইতে দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিয়াছেন যাহাতে সাধারণের কষ্ট না হয়, বর্তমান যামানায় এরূপ কিরাত পড়াই উত্তম। শামী কিতাবে আছে- লম্বা কিরাত পড়িলে যদি জামায়াতে লোক কম হয় ও ছোট কিরাত পড়িলে যদি বেশী লোক হয়, তাহা হইলে ছোট কিরাত পড়াই ভাল। আলমগীরী কিতাবে আছে- যেরূপ কিরাত পড়িলে

জামায়াতে লোক বেশী হয় ও ভাগিয়া না যায় এরূপ কিরাত পড়াই ভাল। বাহরুর রায়েক (২য় খন্ড) কিতাবে আছে- ছহীহ্ রেওয়ায়েত মতে রোযার মাসে তারাবীহতে কুরআন খতম করা সুন্নাত। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, কুরআন খতম ত্যাগ করিতে পারিবে না। যে সময় কুরআন খতম করিতে গেলে জামায়াতের লোক কমিয়া যায় সে সময় অর্থাৎ বর্তমান যামানায় কুরআন খতম না করিয়া ছোট কিরাত পড়া ভাল। মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায় রোযার মাসে তারাবীহ নামাযে এক খতম কুরআন শরীফ পড়া সুন্নাত। কিন্তু কুরআন খতম করিলে যদি জামায়াতের লোক কষ্ট পায় বা ভাগিয়া যায়, তাহা হইলে খতম না করিলেও চলিবে।

প্রশ্নঃ- যদি তারাবীতে কুরআন খতম করা না হয় তাহা হইলে কিরূপ কিরাত পড়িবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- (১) প্রত্যেক রাকয়াতে ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ (কুলহু ওয়াল্লাহ্) পড়িবে। অথবা-

(২) প্রথম রাকয়াতে ফাতিহার পর আল্হাকু ও ২য় রাকয়াতে সূরা ইখলাছ পড়িবে; ৩য় রাকয়াতে ওয়ালআছরে ও ৪র্থ রাকয়াতে সূরা ইখলাছ; এরূপভাবে ১৮ রাকয়াত আদায় করিয়া ১৯ রাকয়াতে সূরা লাহাব ও ২০ রাকয়াতে ইখলাছ পড়িয়া তারাবীহ্ খতম করিবে।

(৩) উক্ত কিতাবে আরও এক মত আছে- ১ম রাকয়াতে ফাতিহা ও আলহাকু ও ২য় রাকয়াতে ইখলাছ, এরূপভাবে ১৬শ রাকয়াত পড়িয়া ১৭শ রাকয়াতে ইযা জায়া, ১৮শ রাকয়াতে সূরা লাহাব পড়িয়া শেষ দুই রাকয়াতে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়িয়া তারাবীহ্ খতম করিবে।

(৪) আরও এক মত আছে- প্রত্যেক চারি রাকয়াতের ১ম রাকয়াতে ওয়ালআছরি ও ২য় রাকয়াতে ইখলাছ; ৩য় রাকয়াতে সূরা কাওসার ও ৪র্থ রাকয়াতে ইখলাছ। এইরূপ ভাবে পাঁচ তারবিয়ায় (ভাগে) বিশ রাকয়াত তারাবীহ্ পড়িবে।

(৫) শামী, আলমগীরী, জামেউর রমুজ, বাহরুর রায়েক ও মাজালেসুল আবরার প্রভৃতি কিতাবে আছে- সূরা ফীল হইতে সূরা নাস পর্যন্ত দুই বার পড়িয়া বিশ রাকয়াত তারাবীহ খতম করিবে। বর্তমান যামানায় এই মতই উত্তম। কারণ,হিসাব রাখার জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না, দুইবার পড়িলেই বিশ রাকয়াত হইয়া যায়।

আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়- বর্তমান যামানায় যদি ঐরূপ কিরাত পড়িলেও জামায়াতে লোক না আসিবার আশঙ্কা হয় ও পড়িতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করে, তাহা হইলে আরও ছোট আয়াত দ্বারা বিশ রাকয়াত তারাবীহ আদায় করিবে। লম্বা কিরাত পড়িয়া মসজিদ খালি করিবে না। কিন্তু সাবধান! সাধারণের কষ্ট না হইলেও অনর্থক হিলা বাহানা বা আলস্য করিয়া কুরআন শরীফ খতমের সুন্নাতটি যেন কেহ ছাড়িয়া না দেয়।

তাফসীরে রুহুল বয়ানে সূরা মু'মিনুনের তাফসীরে লিখিত আছে- মুক্তাদী কিরাত শুনিলে প্রত্যেক হরফের বদলে তাহাদের আমলনামায় বিশ নেকী লেখা হইবে। কাজেই এইরূপ নেকীর কাজ কিছুতেই ছাড়া উচিৎ নহে। শামী কিতাবে আরও আছে- যদি কেহ ছোট তিন আয়াত কিংবা বড় এক আয়াতের কম পড়িয়া তারাবীহ্ আদায় করে, তাহা হইলে মাকরূহ তাহ্রীমের গুনাহ হইবে।

প্রশ্নঃ কিতাবে এক রমজানে তিন খতম কুরআন শরীফ পড়ার বিধান আছে কিন্তু

এখন কমিতে কমিতে ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পড়ার বিধান হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। ইহার কারণ কি?

উত্তরঃ- পূর্ব যামানার লোকের ঈমান ও ধর্মভাব বড়ই প্রবল ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ মারাকিল ফালাহ কিতাবে তারাবীহর বয়ানে লিখিত আছে- ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ রোযার মাসে ত্রিশ দিনে ত্রিশ খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন। আর প্রত্যেক তারাবীহতে এক খতম পড়িতেন। কোন কোন সময় দুই রাকয়াত নফল নামাযে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন। এমন কি ৪০ বৎসর পর্যন্ত তিনি এশার সময় অজু করিয়া সেই অজুতে ফজরের নামায পড়িয়াছেন।

শামী কিতাবে আছে- যামানার পরিবর্তনে প্রয়োজন বশতঃ মাসয়ালার হুকুমও পরিবর্তন হইয়া থাকে। প্রমাণ-(১) পূর্ব যামানায় কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়া মজুরী লওয়া হারাম ছিল কিন্তু বর্তমান যামানায় কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়া মজুরী লওয়া জায়েয আছে। (২) পূর্ব যামানায় স্ত্রীলোকের জামায়াতে আসিয়া নামায পড়ার হুকুম ছিল, বর্তমানে তাহা রদ করা হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- অন্যান্য নামাযের ন্যায় তারাবীহ নামাযেও কি ইমাম মুক্তাদী সকলেরই ছানা তাআব্বুয ও তাসমিয়া পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- তারাবীহ নামাযের প্রত্যেক দুই রাকয়াতের প্রথমে ইমাম মুক্তাদী সকলেই ছানা পড়িবে। তৎপর ইমাম তা'আব্বুজ ও তাসমিয়া পাঠ করতঃ ফাতিহা ও কিরাত পড়িবে। ইমাম তাশাহুদ পড়ার পর দরূদ ও দোয়া পড়িবে। যদি মুক্তাদীগণ বিরক্ত হইয়া যায় তবে দোয়া পড়িতে বিলম্ব না করিয়া শুধু দরূদ পড়িবে। উক্ত কিতাবে আরও লিখিয়াছেন আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ পর্যন্ত দরূদ পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। ঐ কিতাবে আরও লিখিত আছে- ইমাম তাড়াতাড়ি কিরাত পড়িবে না। তা'দিলে আরকান আদায় করিবে ও চারি রাকয়াতের পর কিছুক্ষণ বসিবে। বাহরুর-রায়েক কিতাবেও ঐরূপ লিখিত আছে-

আলমগীরী কিতাবে আছে- ইমামের বেশী তাড়াতাড়ি কিরাত পড়া মাকরূহ। মাজালিসুল আবরার কিতাবে আছে- একা নামাযী ও ইমাম যদি কওমা, জালসা, রুকূ ও সিজদায় এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করে তাহা হইলে গুনাহগার হইবে। অর্থাৎ দোযখে যাওয়ার উপযুক্ত হইবে। আরও আছে সুন্নাতের চেয়ে বেশী তাসবীহ দোয়া ইত্যাদি পড়িলে যদি মুক্তাদীর কষ্টের আশঙ্কা হয় তাহা হইলে ঐরূপ বেশী পড়া মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ বসিয়া তারাবীহ নামায পড়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- শামী ও গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- বিনা ওজরে বসিয়া তারাবীহ নামায পড়া মাকরূহ তানযীহ। কিন্তু ওজর বশতঃ বসিয়া পড়িলে মাকরূহ হইবে না। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- বিশেষ তাকীদী সুন্নাত বলিয়া বিনা ওজরে বসিয়া তারাবীহ পড়া মাকরূহ।

প্রশ্নঃ- ইমাম যদি বসিয়া তারাবীহ পড়ে তবে মুক্তাদীগণ বসিয়া এক্তেদা করিলে জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ওজরে কিংবা বিনা ওজরে ইমাম বসিয়া তারাবীহ পড়িলেও মুক্তাদী দাঁড়াইয়া এক্তেদা করিলে জায়েয সম্বন্ধে মতভেদ আছে কিন্তু ছহীহ মত এই যে, জায়েয হইবে।

প্রশ্নঃ ইমাম প্রথম রাকয়াতে কিরাত পড়িবার সময় মুক্তাদী যদি আলস্য করিয়া বসিয়া থাকে ও রুকূ করিবার সময় হইলে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করে তাহা জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- মুক্তাদী যদি আলস্য বশতঃ বসিয়া থাকিয়া ইমামের রুকূতে যাওয়ার পূর্বক্ষণে দাঁড়াইয়া ইমামের সহিত রুকূ সিজদাহ্ করে তাহা হইলে মুক্তাদীর মাকরূহ হইবে। খানিয়া, আলমগীরী, বাহরুর রায়েক ও মাজালিসুল আবরার কিতাবেও ঐরূপ লিখিয়াছেন। শামী কিতাবে ইহাকে মাকরূহ তাহ্ রীম বলিয়া লিখিয়াছেন। গায়াতুল আওতার কিতাবে নামাযে ঐরূপ শঠতামি করাকে মুনাফিকের সহিত তুলনা করিয়া বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তারাবীহ্ পড়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া নামায পড়া মাকরূহ তাহ্রীম। মাজালিসুল আবরার কিতাবে আছে- ঐরূপ ঘুমের বেগ হইলে আগে ঘুমাইয়া লইবে ও পরে উঠিয়া তারাবীহ্ পড়িবে।

প্রশ্নঃ- এশার নামায জামায়াতে না পড়িয়া তারাবীহ জামায়াতে পড়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী, দুররুল হেকাম, দুররুল মোখতার, গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবে আছে- যদি এশার নামাযের জামায়াত না করিয়া শুধু তারাবীহ নামায জামায়াতে পড়ে তবে জায়েয হইবে না। কিন্তু পৃথক ভাবে একা এশা পড়িয়া জামায়াতে তারাবীহ পড়া জায়েয হইবে। দুররুল হেকাম কিতাবে আছে- রোযার মাসে একা একা এশা পড়িয়া জামায়াতে বেতের পড়িলে জায়েয হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি কেউ মসজিদে একবার তারাবীহ ও বেতের পড়িয়া থাকে, তবে পুনঃ তারাবীহ ও বেতের পড়িতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- মুক্তাদী এক মসজিদে একবার তারাবীহ পড়িয়া পুনঃ একা একা তারাবীহ পড়া জায়েয আছে কিন্তু বেতের দুইবার পড়িবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ এশা, তারাবীহ ও বেতের পড়িয়া পুনঃ অন্য কোন জামায়াতের তারাবীহ পড়ে, তবে জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ- যদি এশা, তারাবীহ ও বেতের পড়িয়া অন্য কোন জামায়াতের ইমামতী করে ইমামের জন্য মাকরূহ হইবে। কিন্তু মুক্তাদীগণের মাকরূহ হইবে না। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ- একই তারাবীহ দুই ইমামের সহিত পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে এক ইমামের সহিতই তারাবীহ পড়া ভাল। কিন্তু যদি কেহ দুই ইমামের সহিত পড়িতে চায় তাহা হইলে এক তারবিয়া (৪ রাকয়াত) পূর্ণ করিয়া অন্য ইমামের সঙ্গে শামিল হওয়া মুস্তাহাব। যদি দুই রাকয়াত পড়িয়া অন্য ইমামের সহিত শামিল হয় তবে মুস্তাহাব তরক হইবে। এরূপক্ষেত্রে এশা ও বেতের এক ইমামের সঙ্গে পড়িয়া তারাবীহ অন্য ইমামের সহিত পড়িলেও জায়েয হইবে। কেননা, হযরত ওমর (রাঃ) এশা ও বেতেরে ইমামতী করিয়াছেন। আর হযরত উবাই (রাঃ) তারাবীর ইমামতী করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- তারাবীহ নামায ফওত হইলে কাজা পড়িতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী, বাহরুর রায়েক, মারাকিল ফালাহ ও মাজালিসুল আবরার প্রভৃতি কিতাবে আছে-ছহীহ রেওয়ায়েত এই যে, তারাবীহ ফওত হইলে কাজা লাগিবে না। চাই জামায়াতে হউক কি একা।

প্রশ্নঃ- যদি কোন জামায়াতের লোক মনে করে যে, গত রাত্রে দুই রাকয়াত তারাবীহ নামায ফওত হইয়া গিয়াছে, তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে– যদি কোন জামায়াতের লোক ধারণা করে যে, গত রাত্রে ২ রাকয়াত তারাবীহ ফাসেদ হইয়াছে, তবে ঐ নামায পরবর্তী রাত্রে কাজা পড়িলে মাকরূহ হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি কোন জামায়াতের লোক বেতের পড়িয়া মনে করে যে, ২ রাকয়াত তারাবীহ ফওত হইয়াছে তাহা হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- যদি কোন জামায়াতের লোক বেতের পড়ার পর ধারণা করে যে, ২ রাকয়াত তারাবীহ ফওত হইয়াছে, এমতাবস্থায় মোহাম্মদ এবনে ফজল বলিয়াছেন, জামায়াতের সহিত কাজা পড়িবে না। ছদরে শহীদ (রঃ) বলিয়াছেন- জামায়াতের সহিত ঐ নামায আদায় করা জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ- ইমাম চারি রাকয়াত তারাবীহ পড়ার পর যদি কতক মুক্তাদী বলে ২ রাকয়াত ও কতকে বলে ৪ রাকয়াত পড়া হইয়াছে এমতস্থলে কি করিবে?

উত্তরঃ- এমতস্থলে যে মুক্তাদী ইমামের নিকটবর্তী তাহাদের মতানুযায়ী কার্য করিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ বলিয়াছেন- নিকটবর্তী মুক্তাদীর মধ্যে যে সত্যবাদী তাহার কথা গ্রহণ করিবে।

প্রশ্নঃ- তারাবীহ শেষ করার পর যদি মুক্তাদীগণের মনে সন্দেহ জন্মে যে, ১৬ রাকয়াত পড়া হইল কি ১৮ রাকয়াত তখন কি করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, এরূপ সন্দেহ মূলক তারাবীহ সম্বন্ধে ছহীহ রেওয়ায়েত এই যে, এরূপ নামায জামায়াতে না দোহরাইয়া একা একা পৃথকভাবে আদায় করিবে।

নাবালেগ ব্যক্তি তারাবীহ নামাযের ইমাম হইতে পারে কি না?

প্রশ্নঃ- নাবালেগ ছেলে তারাবীহ নামাযের ইমামতী করিলে জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ- নাবালেগ বালকের তারাবীহ নামাযের ইমাম হওয়া জায়েয নাই।

প্রশ্নঃ- বলখ শহরের কতক মাশায়েখ নাকি নাবালকের ইমামতী করা জায়েয বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন?

উত্তরঃ- খানিয়া, শরহে ইলিয়াছ, আরকানে আরবা, শামী, আলমগীরী, হেদায়া, এনায়া বাহরুর রায়েক, ফতহুল কাদীর, কাফী, ছগীরী, কবিরী, শরহে বেকায়া, জামেউর রমুজ প্রভৃতি কিতাবে তারাবীর বয়ানে আছে- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে তারাবীহ নামাযে

নাবালেগ বালকের ইমামতী করা জায়েয নাই। এমনকি ওয়াক্তিয়া নামাযেরও ইমামতী করা জায়েয নাই। এই কথাই ছহীহ ও এই মতের উপর ফতোয়া। খানিয়া ও বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- নাবালেগ বালকগণ মোকাল্লেফ নহে বিধায় উহাদের প্রতি শরীয়তের হুকুম আহকাম বয়স্ক ও বালেগ লোকের মত বর্তায় না। কাজেই নাবালেগের ইমামতী জায়েয হইবে না।

তারাবীহ্ নামাযের মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- তারাবীহ্ সম্বন্ধে আরও কতক মাসয়ালা জানিতে চাই?

উত্তরঃ- নিম্নে কতক মাসয়ালা লিখিত হইল, স্মরণ রাখিওঃ

১। আলমগীরী কিতাবে আছে, যদি কেহ ইমামের সহিত কতক রাকয়াত তারাবীহ পড়ে বা পড়িয়া থাকে, তবে উপস্থিত ইমামের সহিত তাহার বেতের পড়া জায়েয, এই মতই ছহীহ। যদি কেহ ইমামের সহিত ৪ কি ৮ রাকয়াত তারাবীহ না পাইয়া থাকে ও বাকী রাকয়াত পুরা করিতে গেলে ইমামের সঙ্গে বেতের না পাইবার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে ইমামের সহিত বেতের পড়িয়া বাকী তারাবীহ একা একা আদায় করিবে।

২। শামী কিতাবে আছে- যদি কেহ ইমামের সহিত তারাবীহ না পড়িয়া থাকে, একাকী কিংবা অন্যের সহিত পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে উপস্থিত ইমামের সহিত তাহার বেতের পড়া জায়েয হইবে।

৩। শামী কিতাব হইতে গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে- যদি কেহই তারাবীহ নামায জামায়াতে না পড়ে তবে বেতের নামায জামায়াতে পড়িবে না।

৪। বিনা অজুতে এশার নামায পড়িয়া যদি অজু করতঃ তারাবীহ ও বেতের পড়ে, তাহা হইলে এশা ও তারাবীহ দোহরাইয়া পড়িবে। কারণ তারাবীহ এশার তাবে। ইমাম আবু হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে বেতের নামায ছহীহ হইয়াছে। (আলমগীরী)

৫। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে রমজান ব্যতীত অন্য সময় আযান একামত বলিয়া বেতের বা নফল জামায়াতে পড়া মাকরূহ।

৬। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে, রমজান মাসে জামায়াতে তারাবীহ পড়ার পর বেতের নামায মসজিদে জামাআতে পড়ুক কি ঘরে গিয়া পড়ুক, উভয় জায়েয আছে। শরহে মুনিয়া হইতে শামী কিতাবে লিখিয়াছেন- রমজান মাসে বেতের নামায জামায়াতে পড়াই উত্তম। খায়ের রামালীল কিতাবে আছে- বর্তমান যামানায় সকলেই জামায়াতে বেতের নামায পড়া উত্তম হওয়ার পক্ষপাতি। সিরাজুল ওহ্হাজ কিতাব হইতে আলমগীরী কিতাবে লিখিয়াছেন, রমজান মাসে ঘরে বেতের পড়ার চেয়ে জামায়াতে বেতের পড়া ছহীহ রেওয়ায়েত মতে উত্তম।

৭। খানিয়া ও আলমগীরী কিতাবে আছে- উপযুক্ত আলেম ও কারী লোকের তারাবীহ নামাযে ইমামতী করা ভাল। কারণ, তাহা হইলে জামায়াতে বেশী লোক

হইবে। আলমগীরী কিতাবে আরও আছে- দুইজন ইমাম হইলে যদি উভয়েই কিরাত শুদ্ধ পড়ে ও তন্মধ্যে একজনের মিষ্টস্বর শুনাইবার জন্য ভাব-ভঙ্গির সহিত কিরাত পড়ে, তবে তাহাকে ইমাম করিবে না। কারণ, তাহাতে মুক্তাদীর মন অর্থের দিকে না গিয়া ভাব-ভঙ্গির দিকে যাইবে কাজেই ছহীহ পড়নেওয়ালাকে ইমাম বানাইবে।

৮। আলমগীরী কিতাবে আছে- পূর্ব যামানার ওলামাদের মতে তারাবীর জন্য বেতন দিয়া ইমাম রাখা মাকরূহ। উক্ত কিতাবের হাশিয়াতে লিখিত আছে- বর্তমান যামানার ওলামাদের মতে বেতন দিয়া ইমাম রাখা মাকরূহ হইবে না। এই মতের উপরই ফতোয়া।

৯। আলমগীরী কিতাবে আছে- মসজিদে একবার তারাবীহর জামায়াত হইয়া গেলে তথায় পুনঃ জামায়াতে তারাবীহ পড়া মাকরূহ এবং একই ইমামের দুই মসজিদে এক দিন দুই বার জামায়াতের ইমামতী করা মাকরূহ।

১০। মাজালিসুল আবরার কিতাবে আছে- নিকটবর্তী মসজিদের ইমাম যদি তারাবীহ পড়িতে কিরাতের মধ্যে কিছু ত্রুটি করে, তাহা হইলে দূরবর্তী অন্য মসজিদে গিয়া তারাবীহ পড়িলে গুনাহ হইবে না।

১১। আলমগীরী কিতাবে আছে- ইমামকে নামায পড়িতে দেখিয়া মুক্তাদী নিয়ত করিল যে, এশার নামায হইলে এক্তেদা করি, তারাবীহ হইলে এক্তেদা করি না অথবা এরূপ নিয়ত করিল যে, তারাবীহ হইলে এক্তেদা করি, এশা হইলে এক্তেদা করি না। মোট কথা ইমাম যে নামাযই পড়ুক, এরূপ নিয়তে এক্তেদা ছহীহ হইবে না। যদি এরূপ নিয়ত করে যে, ইমাম এশা কি তারাবীহ পড়ুক আমিও সেই নামাযের নিয়ত করিলাম, তাহা হইলে ইমাম যে নামায পড়ুক মুক্তাদীরও সেই নামায হইবে।

১২। খানিয়া কিতাবে আরও আছে– ইমাম তারাবীহ নামায পড়িতেছে দেখিয়া যদি কোন মুক্তাদী আসিয়া শুধু ইমামের এক্তেদা করে, ইমামের তারাবীহ নামাযের নিয়ত না করে তাহা হইলে মুক্তাদীর নামায ছহীহ হইবে না।

১৩। উক্ত কিতাবে আরও আছে– ইমাম তারাবীহ নামাযের ৪র্থ রাকয়াত পড়ুক বা বিংশতি রাকয়াত পড়ুক, মুক্তাদী আসিয়া ১ম রাকয়াত কিংবা ৫ম রাকয়াতের নিয়ত করতঃ এক্তেদা করিলে ইমামের সহিত যত রাকয়াত পড়া হইয়াছে তাহা ছহীহ হইবে না।

১৪। উক্ত কিতাবে আরও আছে– ইমাম বেতের কি নফল নামায পড়িতে থাকা কালীন মুক্তাদী তারাবীহ কি নফলের নিয়তে এক্তেদা করিলে ছহীহ হইবে না।

১৫। আলমগীরী কিতাবে আছে– এশার নামাযের সুন্নাত বাকী থাকা অবস্থায় তারাবীহ্ জামায়াতে শামিল হইয়া ঐ সুন্নাতের নিয়ত করিলে সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে।

১৬। কাজী খান, আলমগীরী ও মাজালিসুল আবরার কিতাবে লিখিত আছে– একবার নিয়ত করতঃ বিশ রাকয়াত তারাবীহ আদায় করিলে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে নামায শুদ্ধ হইবে। কারণ, সকল নামাযই এক তারাবীহ। খোলাছা কিতাব হইতে উক্ত কিতাবের হাশিয়াতে লিখিত আছে- প্রত্যেক দুই রাকয়াতের নিয়ত করাই উত্তম।

নবম অধ্যায়

[পীড়িতাবস্থায়, নৌকায়, জাহাজে, রেলে ও চারপায়া জানোয়ারের উপর নামায পড়ার মাসয়ালা, দুই ঈদ, সুন্নাত, নফল, তাহাজ্জুদ ও এস্তেখারা নামাযের মাসয়ালা।]

পীড়িত লোকের নামায পড়িবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- পীড়িত অবস্থায় কিরূপ ভাবে নামায আদায় করিতে হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- পীড়িত লোক সক্ষম হইলে সুস্থলোকের ন্যায় দাঁড়াইয়া কেয়াম, রুকূ, সিজ্‌দাহ ইত্যাদি যথারীতি আদায় করিয়া নামায পড়িবে। যদি কোন রোগের দরুন দাঁড়াইতে অক্ষম হয়, তবে না দাঁড়াইয়া বসিয়া রুকূ সিজ্‌দার সহিত নামায আদায় করিবে। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ- কিরূপ পীড়িত হইলে বসিয়া নামায পড়িতে পারিবে?

উত্তরঃ-এ বিষয় নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাহ্‌রুর রায়েক কিতাবে আছে- কেহ বলিয়াছেন, যে পীড়ায় রোযা রাখিতে অক্ষম হয়; কেহ বলিয়াছেন, যে রোগে তায়াম্মুম জায়েয হয়; কেহ বলিয়াছেন, দাঁড়াইলে পড়িয়া যায়; আবার কেহ বলিয়াছেন, দাঁড়াইতে অক্ষম হয়; উপরোক্ত অবস্থায় না দাঁড়াইয়া বসিয়া রুকূ সিজ্‌দাহ করতঃ নামায পড়িলে জায়েয হইবে। বাহরুর রায়েক কিতাবে উক্ত মত সমূহের মীমাংসা করতঃ লিখিয়াছেন, ছহীহ রেওয়ায়েত মতে যেরূপ রোগে দাঁড়াইলে পীড়া বৃদ্ধি ও অনিষ্টের আশঙ্কা হয়, এমন রোগ হইলে বসিয়া নামায আদায় করা জায়েয হইবে। আলমগীরী কিতাবে ঐ মতের উপর ফতোয়া দিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- পীড়া বৃদ্ধি হইবে কি না তাহা কিরূপে জানিবে?

উত্তরঃ- পীড়া বৃদ্ধি হইবে কি না তাহা জানার দুইটি উপায় আছে-

(১) যদি নিজের অভিজ্ঞতায় জানা থাকে যে, দাঁড়াইলে পীড়া বৃদ্ধি হইবে।

(২) ঈমানদার পারদর্শী চিকিৎসক (যাহার মধ্যে কোনরূপ ফাসেকি নাই) যদি বলে যে, দাঁড়াইলে পীড়া বৃদ্ধি হইবে। এমতাবস্থায় না দাঁড়াইয়া বসিয়া নামায আদায় করিবে। (তাহ্‌তাবী)

প্রশ্নঃ- কি কি কারণে পীড়িত ব্যক্তি বসিয়া নামায পড়িতে পারে?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার, তাবীনুল হাকায়েক ও আলমগীরী প্রভৃতি কিতাবে আছে- (১) দাঁড়াইলে পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা হইলে অথবা(২) দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে যদি রোগ আরাম হইতে গৌণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় কিংবা (৩) দাঁড়াইলে মাথা ঘুরিয়া যায়,

এমতাবস্থায় না দাঁড়াইয়া বসিয়া নামায পড়িলে জায়েয হইবে। দাঁড়াইলে যদি বিশেষ কোন স্থানে বেদনা অনুভব করে অথবা প্রস্রাব বাহির হইবার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে বসিয়া নামায পড়া জায়েয আছে। শামী কিতাবে আছে- দাঁড়াইলে যদি ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ও পুঁজ বাহির হয় কিংবা প্রস্রাব পতিত হয়, তবে বসিয়া নামায আদায় করিবে।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ধরিয়া দাঁড়া করাইলে অথবা অন্য কোন জিনিসে ঠেক লাগাইয়া নামায পড়িতে পারে, এমতাবস্থায়ও কি বসিয়া নামায পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবের মর্মে জানা যায়- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে যদি পীড়িত ব্যক্তি লাঠি কিংবা দেওয়ালের সহিত ঠেক লাগাইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয় অথবা কেহ ধরিয়া দাঁড়া করাইয়া দিলে মানুষের শরীরে ঠেক লাগাইয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে সক্ষম হয় ও তাহাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে।

শামী কিতাবে আছে- যদি পীড়িত লোকের কোন খাদেম থাকে অথবা এরূপ অন্য কোন লোক থাকে যে, তাহাকে দাঁড়া করাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিতে হইবে। আলমগীরী কিতাবে আছে- এরূপ অবস্থায় বসিয়া নামায জায়েয হইবে না। ঐ কিতাবে আরও আছে- সামান্য কষ্টের ভয়ে যদি না দাঁড়াইয়া বসিয়া নামায পড়ে, তবে তাহার নামায হইবে না।

আলমগীরী কিতাবে ঐ সম্বন্ধে মতভেদ দর্শাইয়া এরূপ অবস্থায় জামায়াতে না যাইয়া নিজ ঘরে দাঁড়াইয়া একা নামায পড়া ছহীহ বলিয়া লিখিয়াছেন। শামী কিতাবেও আছে- ঐরূপ অবস্থায় ঘরে থাকিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। কারণ, জামায়াতে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কিন্তু কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামায পড়া ফরজ। অধিকন্তু বাহরুর রায়েক কিতাবে ওয়াল ওয়ালেজিয়া কিতাব হইতে লিখিয়াছেন যে, ঐরূপ অবস্থায় জামায়াতে যাওয়ার মত জঈফ (দুর্বল), দাঁড়াইয়া নামায পড়া সম্বন্ধে তরীকুল ইসলাম ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দেখিয়া লইবে।

প্রশ্নঃ- যদি নামাযের কায়দা অনুযায়ী বসিতে না পারে তাহা হইলে কিরূপ ভাবে বসিবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে লিখিত আছে- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়, যেরূপভাবে বসিলে কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে সেরূপ ভাবে বসিবে। চার জানু হউক কি অন্য কোন প্রকারে বসুক নামায হইবে। নূরুল ইজা, বাদায়ে, শরহে মাজমাউল বাহার, নাহরুল ফায়েক প্রভৃতি কিতাবে উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। বাহরুর রায়েক ও দুররুল মোখতার কিতাবের মর্মে জানা যায়- পীড়া বশতঃ নামাযের রোকন (ফরজ) মাফ হইলে, নামাযে বসার নিয়মের ব্যতিক্রম মাফ হইবে না কেন? অবশ্যই হইবে।

প্রশ্নঃ- পীড়িত ব্যক্তি যদি অল্প সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে সক্ষম হয় ও সম্পূর্ণ নামায দাঁড়াইয়া পড়িলে বিশেষ কষ্ট হয়, এমতাবস্থায় বসিয়া নামায পড়িতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়, পীড়িত ব্যক্তি যদি দাঁড়াইয়া কিরাতের কতকাংশ পাঠ করিতে সক্ষম হয় অথবা তাকবীরে তাহরীমা বলিতে পারে এরূপ শক্তি থাকে তাহা হইলে যতক্ষণ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে কিংবা দাঁড়াইয়া তাকবীর বলিতে সক্ষম হইবে ততটুকু সময় দাঁড়াইয়া পরে বসিয়া নামায পড়িবে। নচেৎ তাহার নামায হইবে না। দুররুল মোখতার কিতাবেও ঐরূপ লিখিত আছে। এমনকি শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়- কিছুর সহিত ঠেক লাগাইয়া সরলভাবে দাঁড়াইতে সক্ষম হইলে এমতাবস্থায় ঠেক লাগাইয়া সোজা ভাবে না দাঁড়াইয়া কোবরা (সঙ্কুচিত) ভাবে নামায পড়িলে নামায হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ পীড়িত অবস্থায় শুধুমাত্র নামাযের কেয়াম করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু রুকূ সিজ্‌দাহ করিতে সক্ষম না হয়, এমনকি বসিয়াও রুকূ সিজ্‌দাহ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে কিরূপ ভাবে নামায আদায় করিবে?

উত্তরঃ- কানযুদ্দাকায়েক কিতাবে আছে- ঐরূপ অবস্থায় না দাঁড়াইয়া বসিয়া ইশারায় নামায পড়িবে। আলমগীরী ও বাহ্‌রুর রায়েক কিতাবে আছে- ঐরূপ অবস্থায় বসিয়া ইশারায় নামায পড়া মুস্তাহাব। দাঁড়াইয়া ইশারায় নামায পড়িলেও আমাদের হানাফী মাযহাব মতে নামায হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ বসিয়া নামায পড়িতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও শয়ন করিয়া নামায পড়ে তবে তাহার নামায হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- মানুষ বা দেওয়ালের সহিত ঠেক লাগাইয়া সরলভাবে বসিয়া নামায পড়িতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও শয়ন করিয়া নামায পড়িলে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে নামায হইবে না। শামী কিতাবে আছে কিছুর সহিত ঠেক লাগাইয়া সরলভাবে বসিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ঠেক লাগাইয়া কোবরা (সঙ্কুচিত) হইয়া নামায পড়িলে হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি দাঁড়াইবার , কিরাত পড়িবার ও রুকূ করিবার ক্ষমতা থাকে কিন্তু সিজ্‌দাহর সময় গলা হইতে রক্ত পড়ে, এমতাবস্থায় কিরূপভাবে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে-

১। যদি কেহ দাঁড়াইয়া কিরাত পড়িতে ও রুকূ করিতে সক্ষম হয়,কিন্তু সিজ্‌দাহ করিলে গলা হইতে রক্ত পতিত হয়, তাহা হইলে বসিয়া ইশারায় নামায পড়িবে। যদি দাঁড়াইয়া রুকূ করে ও বসিয়া ইশারায় সিজ্‌দাহ করে তাহা হইলেও নামায হইবে। কিন্তু প্রথম প্রকারে নামায পড়াই উত্তম।

২। আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি পীড়িত ব্যক্তি দাঁড়াইতে, রুকূ করিতে ও সিজ্‌দাহ করিতে সক্ষম না হয় কিন্তু বসিয়া পড়িতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বসিয়া ইশারায় নামায পড়িবে ও সিজ্‌দাহর সময় রুকূ হইতে মাথা কিছু বেশী নীচু করিবে।

৩। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- ঐ অবস্থায় রুকূ হইতে সিজ্‌দায় মাথা বেশী

নীচু করিতে হইবে। যদি রুকূ ও সিজ্‌দায় সমান সমান হয় তবে নামায হইবে না।

৪। আলমগীরী কিতাবে আছে- ইশারায় নামাযে সোহ হইলেও ইশারায় সোহ-সিজ্‌দাহ আদায় করা জায়েয আছে।

৫। ইশারায় নামায পড়িবার সময় কোন জিনিস সম্মুখে রাখিয়া তাহার উপর সিজ্‌দাহ করিবে না। যদি করে তবে যেন রুকূ ও সিজ্‌দাতে মাথা নীচু করা হয়। নচেৎ নামায হইবে না। কান্‌য ও বাহ্‌রুর রায়েক কিতাবে আছে- যদি সম্মুখে কোন জিনিস রাখিয়া থাকে আর মাথা নীচু না করে, তবে নামায শুদ্ধ হইবে না। মাথা নীচু করিয়া রুকূ সিজ্‌দাহ করিয়া নামায পড়িলে জায়েয হইবে।

আলমগীরী কিতাবে আরও আছে- যদি সিজ্‌দার জায়গায় নামাযের পূর্বে কোন জিনিস রাখা থাকে এবং তাহার উপর ইশারা অনুপাতে মাথা নীচু করতঃ রুকূ সিজ্‌দাহ করিয়া নামায পড়ে তবে নামায জায়েয হইবে। মাকরূহ হইবে না।

৬। আলমগীরী কিতাবে আরও লিখিত আছে- যদি কাহারও কপালে ঘা থাকে ও তজ্জন্য সিজ্‌দাহ করিতে অক্ষম হয়, তবে সিজ্‌দাহ স্থানে নাসিকা লাগাইয়া নামায পড়িবে। যদি নাসিকা না লাগাইয়া ইশারায় নামায পড়ে তবে নামায হইবে না।

৭। আলমগীরী কিতাবে আছে- পীড়িত ব্যক্তি যদি বসিয়া রুকূ সিজ্‌দাহ করিয়া নামায আদায় করিতে সক্ষম না হয়,তবে শয়ন করিয়া ইশারায় নামায পড়িবে।

৮। দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করার পর এমন কোন রোগ দেখা দিল যে, দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে অক্ষম হয়। এমতাবস্থায় বসিয়া রুকূ সিজ্‌দাহ করিয়া নামায আদায় করিবে। তাহাতেও অক্ষম হইলে শয়ন করিয়া ইশারায় নামায পড়িবে। (আলমগীরী)

কিন্তু চক্ষু বা ভ্রুর ইশারায় নামায কিংবা মনের ইশারায় নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে না।

৯। পীড়িত অবস্থায় বসিয়া নামায আরম্ভ করার পর কতকাংশ রোগ দূরীভূত হইলে ও দাঁড়াইতে সক্ষম হইলে দাঁড়াইয়া বাকী নামায আদায় করিবে। (আলমগীরী)

১০। পীড়িত ব্যক্তি বসিয়া ইশারায় নামাযের কিছু অংশ আদায় করার পর রুকূ সিজ্‌দাহ করিতে পারে এমন সক্ষম হইলে সম্পূর্ণ নামায প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া আদায় করিবে।

১১। দাঁড়াইয়া রুকূ, সিজ্‌দাহ আদায় করিয়া নামায পড়িলে যদি ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইবার আশঙ্কা হয়, তবে দাঁড়াইয়া ইশারায় রুকূ করতঃ বসিয়া ইশারায় সিজ্‌দাহ করিয়া নামায পড়িবে। তাহা না করিয়া যদি দাঁড়ান অবস্থায় ইশারায় রুকূ, সিজ্‌দাহ করে, তবে নামায হইবে না। (বাহরুর রায়েক)

১২। পীড়িত ব্যক্তি যদি বসিয়া নামায পড়িলে রোযা রাখিতে সমর্থ হয় কিন্তু দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে গেলে রোযা ভঙ্গ করিতে হয়, তবে না দাঁড়াইয়া বসিয়া বসিয়া নামায পড়িবে, তবু রোযা ভঙ্গ করিবে না। (আলমগীরী ও বাহরুর রায়েক)

১৩। পীড়িত ব্যক্তি যদি আশঙ্কা করে যে, নামাযের ওয়াক্ত হইলে আমার পীড়া বৃদ্ধি

হইবে ও নামায পড়িতে পারিবে না- এই ধারণায় ওয়াক্তের পূর্বে নামায পড়িলে নামায আদায় হইবে না। ওয়াক্তের পূর্বে পীড়ার আশঙ্কায়ই হউক অথবা ইচ্ছা করিয়া পড়ুক তাহাতে নামায আদায় হইবে না।

১৪। পীড়িত ব্যক্তি পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিনা অজুতে কিংবা বিনা কিরাতে নামায পড়িলে তাহার নামায হইবে না। (আলমগীরী)

১৫। পীড়িত ব্যক্তি নামাযের কোন এক রোকন আদায় করিতে গেলে অজু ভঙ্গ হয়, এরূপ আশঙ্কা স্থলে ঐ রোকন আদায় না করিয়া নামায পড়িবে। (আলমগীরী)

১৬। পীড়িত ব্যক্তি ফওত নামায সুস্থ অবস্থায় আদায় করিলে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া কেয়াম, রুকূ,সিজ্‌দাহ ইত্যাদি করিয়া আদায় করিবে। এরূপভাবে সুস্থ অবস্থার ফওত নামায পীড়িত অবস্থায় পড়িতে হইলে বসিয়া বা ইশারায় যেরূপভাবে পারে, সেরূপ ভাবে পড়িলেই হইবে। (আলমগীরী)

১৭। রুকূ, সিজ্‌দাহ করিয়া নামায আদায়ের ক্ষমতা থাকিলে ইশারায় নামায পড়িলে হইবে না। (তাহ্‌তাবী)

১৮। পীড়িত ব্যক্তির নামায আদায়কালে যদি ভুল হয় ও অন্যে বলিয়া দেওয়া ব্যতীত নামায আদায় করিতে না পারে, তবে অন্যের বাতানো মতে নামায আদায় করিলে জায়েয হইবে।

১৯। গোলাম পীড়িত অবস্থায় অজু করিতে অক্ষম হইলে গোলামকে অজু করাইয়া দেওয়া মনিবের প্রতি ওয়াজিব। কিন্তু স্ত্রী অজু করিতে অসমর্থ হইলে স্বামীর অজু করাইয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে। (আলমগীরী)

২০। পীড়িত ব্যক্তির জুমআর দিন এরূপ বিলম্ব করিয়া নামায পড়া মুস্তাহাব, যেন ইমামের জুম্‌আর ফরজ নামায শেষ হইয়া যায়। অন্যথায় ছহীহ রেওয়ায়েত মতে মাকরূহ হইবে।

২১। পীড়িত ব্যক্তি নাপাক কাপড়ে শায়িত আছে, ঐ কাপড় পরিবর্তন করিলেই পুনঃ পাক কাপড় নাপাক হয়, এমতাবস্থায় ঐ কাপড়ে নামায পড়িলে জায়েয হইবে। যদি নাপাক কাপড় পরিবর্তন করিতে গেলে রোগী বিশেষ কষ্ট পায়, তাহা হইলে কাপড় পরিবর্তন না করিলে নামায শুদ্ধ হইবে। আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, বিছানা পরিবর্তনেরও ঐ হুকুম।

২২। পীড়িত ব্যক্তি কিবলা জানা সত্ত্বেও যদি কিবলার দিকে ফিরিতে না পারে অথবা এমন কোন লোক নাই যে, কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিবে, তবে যে দিকে পারে সেদিকে ফিরিয়া নামায পড়িবে। ঐ নামায পুনঃ দোহরাইয়া পড়িতে হইবে না। নিকটে কোন লোক থাকিলে কিবলার দিকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে বলিতে হইবে। না বলিয়া কিবলার বিপরীত দিকে নামায পড়িলে জায়েয হইবে না। এইরূপ নাপাক বিছানায় থাকিয়াও বিছানা পরিবর্তন করিতে অক্ষম হইয়া নিকটবর্তী লোকের নিকট

বিছানা পরিবর্তনের কথা না বলিয়া নাপাক বিছানায় নামায পড়িলে নামায শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরী)

২৩। পীড়িত ব্যক্তি (বসিয়া নামায পড়ার সময়) চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযের শেষ রাকয়াত পড়িবার পর তাশাহহুদ পড়িবার স্থলে ভুলে কিরাত পড়িয়া ও রুকূ করিয়া মনে হইলে তাশাহহুদ পড়িয়া সোহ-সিজ্‌দাহ করতঃ নামায আদায় করিলে জায়েয হইবে। (আলমগীরী)

২৪। চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযের ২য় রাকয়াতে তাশাহহুদ পড়িবার স্থলে ভুলে কিয়ামের নিয়ত করিয়া কিরাত আরম্ভ করিবার পূর্বেই মনে হইল যে. ইহা তাশাহহুদ পড়িবার সময়। তাহা হইলে তখনই তাশাহহুদ পড়িবে। বাকী দুই রাকয়াত যথারীতি আদায় করিলে নামায হইয়া যাইবে। সোহ-সিজ্‌দাহ লাগিবে না।

২৫। পীড়িত ব্যক্তি বসিয়া নামায পড়িবার অবস্থায় চতুর্থ রাকয়াতে সিজ্‌দাহ হইতে মাথা উঠাইবার পর মনে করিল যে, এই তাহার ২য় রাকয়াত, ইহা মনে করিয়া কিরাত ও রুকূ আদায়ের পর ইশারায় সিজ্‌দাহ করিলে এমতাবস্থায় নামায বাতিল হইবে। (আলমগীরী)

২৬। পীড়িত ব্যক্তির নামায পড়ার মধ্যে পীড়ার দরুন রাকয়াত ও সিজ্‌দাহ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে নামায দোহরাইতে হইবে না। (বাহরুর রায়েক)

২৭। পীড়িত ব্যক্তি বসিয়া নামায পড়ার অবস্থায় চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযে ৩য় রাকয়াতের সময় ২য় রাকয়াত মনে করিয়া কিরাত পড়ার পর তাহার মনে হইল যে, এই তাহার ৩য় রাকয়াত; এমতাবস্থায় রুকূ, সিজ্‌দাহ করতঃ যথারীতি নামায আদায় করিলে হইবে। ৩য় রাকয়াতের পর তাশাহহুদ পড়িতে হইবে না। কিন্তু নামাযের শেষে সোহ-সিজ্‌দাহ করিতে হইবে। (আলমগীরী)

২৮। যদি কোন স্ত্রীলোকের নামাযের ওয়াক্তে সন্তান প্রসবের আসন্নকাল উপস্থিত হয়, তবে অজু করিয়া নামায পড়িবে। ওজু করিতে অক্ষম হইলে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে। যদি সন্তানের মাথা বাহির হয়, তবে মাটিতে গর্ত কাটিয়া তাহাতে সন্তানের মাথা রাখিয়া রুকূ সিজ্‌দাহ সহ নামায আদায় করিবে। যদি তাহাতেও অক্ষম হয়, তবে ইশারায় নামায পড়িবে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন নামায কি জিনিস। (মুনিয়া)

২৯। পীড়িত ব্যক্তি বসিয়া ইশারায় নামায পড়িতে অক্ষম হইলে শয়ন করিয়া নামায পড়িবে। এ সম্বন্ধে দুইটি মত আছে- (১) রোগী চিৎভাবে শয়ন করিয়া কিবলার দিকে পা রাখিয়া পিঠের নীচে বালিশ বা অন্য কোন জিনিসে ঠেস দিয়া মাথা কিছু উচ্চ করতঃ বসার ন্যায় রাখিয়া ইশারায় নামায পড়িবে। (ফতহুল কাদীর) দুররুল মোক্তাকা কিতাবে আছে- (২) কিবলার দিকে পা বিস্তার করিয়া রাখা মাকরূহ। অতএব পা কিছু গুটাইয়া রাখিবে। শামী কিতাবে ইহাকে মাকরূহ তানযীহ বলিয়া লিখিয়াছেন।

৩০। শামী কিতাবে কাৎভাবে নামায পড়ার দুইটি নিয়ম লিখিত আছে- ডান কাৎ

কিংবা বাম কাৎ হইয়া নামায পড়িলে জায়েয হইবে। কিন্তু ডান কাৎ হইয়া পড়া উত্তম। বরজাঞ্জী কিতাবে আছে- মৃত ব্যক্তিকে যে ভাবে ডান কাতে কবরে শয়ন করায় তদ্রূপ ভাবে শয়ন করিয়া ইশারায় নামায পড়িবে।

৩১। বাহ্‌রুর রায়েক কিতাবে আছে- দাঁড়াইয়া ইশারায় রুকূ, সিজ্‌দাহ্‌ করতঃ নামায পড়িতে পারিলেও বসিয়া ইশারায় রুকূ, সিজ্‌দাহ করিয়া পড়া ভাল। কিন্তু জানাযা নামাযে ইহার বিপরীত করিবে অর্থাৎ দাঁড়াইয়া পড়িবে। কেননা জানাযা মূলে দোয়া।

৩২। বাহরুর রায়েকের হাশিয়ায় ও মিন্‌হুল খালেক কিতাবে আছে- নামায পড়িতে অক্ষম অবস্থায় যদি পীড়িত ব্যক্তি মৃত্যু ঘটে, তবে যতদিন অক্ষম অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছে ততদিনের নামাযের ফেদিয়া দিতে হইবে না। কারণ, অক্ষমতার পর সক্ষম হয় নাই। কাজেই কাজা আদায়ের সময় পায় নাই। বাহরুর রায়েক কিতাবে আরও আছে- যেরূপ অক্ষম অবস্থায় ফওত নামাযের ফেদিয়া দেওয়ার অসিয়ত করা ওয়াজিব নহে, তদ্রূপ মুসাফিরীর মধ্যে রোযা ভঙ্গ হইলেও সেই অবস্থায় মৃত্যু হইলেও ফওত রোযার ফেদিয়া দেওয়ার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব নহে।

৩৩। আলমগীরী কিতাবে আছে- পীড়িত ব্যক্তি নামায আরম্ভ করিয়া বসিয়া কিছু অংশ পড়ার পর পীড়া দূর হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইলে বাকী অংশ দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে। আর যদি বসিয়া ইশারায় নামায পড়া আরম্ভ করিয়া রুকূ, সিজ্‌দাহর পর রোগ আরোগ্য হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয়, তবে প্রথম হইতে সম্পূর্ণ নামায দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে। যদি রুকূ সিজ্‌দাহর পূর্বেই পীড়া দূর হইয়া যায় তবে আর নূতন নিয়ত না করিয়া পূর্বের নিয়তেই দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিবে।

৩৪। ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়, বেহুঁশ কিংবা পাগল হওয়ার দরুন যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফওত হইয়া যায়, তবে তাহার কাজা আদায় করিতে হইবে। যদি বেহুঁশ বা পাগল অবস্থায় ছয় ওয়াক্ত কিংবা তদপেক্ষা বেশী নামায ফওত হয় তবে তাহার কাজা পড়িতে হইবে না। যদি বেহুঁশ ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে হুঁশ অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া থাকে, তবে তাহার ফওত নামাযের কাজা পড়িতে হইবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় মত হুঁশ না হইয়া থাকে তবে ঐ ফওত নামাযের কাজা পড়িতে হইবে না। (আলমগীরী, বাহরুর রায়েক ও ফতহুল কাদীর)

৩৫। কোন হিংস্র প্রাণীর গর্জনে বা মানুষের উচ্চ হাঁকে বেহুঁশ হইয়া ছয় ওয়াক্তের পর হুঁশ হইলে তাহার কাজা পড়িতে হইবে না। যদি মদ, ভাং গাজা ইত্যাদি নেশার জিনিস ব্যবহার করিয়া বেহুঁশ হয়, তবে যত ওয়াক্তেই বেহুঁশ অবস্থায় থাকুক না কেন, সমস্ত নামায কাজা পড়িতে হইবে। নিদ্রার কারণে বেহুঁশ থাকিলেও সকল নামায কাজা পড়িতে হইবে। (আলমগীরী)

৩৬। ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়, কপালে ক্ষত থাকার দরুন অজু বা তায়াম্মুম করিতে না পারিলে বিনা অজু ও তায়াম্মুমে নামায পড়িয়া থাকিলে সুস্থ হওয়ার

পর নামায দোহরাইতে হইবে না। (আলমগীরী)

৩৭। যদি দুই হাত কনুই পর্যন্ত বা দুই পা টাখনু পর্যন্ত কাটা থাকে অথবা কপালে ঘা থাকে, তবে এমতাবস্থায় বিনা অজু ও তায়াম্মুমে নামায পড়িলে ঐ নামায দোহরাইতে হইবে না।

শামী কিতাবে আছে- নিকটে লোক থাকিলে বাকী স্থান সমূহ ধৌত বা তায়াম্মুম করাইয়া নামায আদায় করিবে। লোক না থাকিলে সম্ভব হইলে মুখমন্ডল অজুর নিয়তে পানির মধ্যে ডুবাইয়া নামায আদায় করিবে। তাহাও না পারিলে বিনা অজুতে নামায পড়িবে। (দুররুল মোখতার)

৩৮। যদি কেহ পানির মধ্যে পতিত হয় ও এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত অতীত হইতে থাকে, তবে আমলে কাছীর না হয় এমন ভাবে ইশারায় নামায পড়িতে পারিলে নামায ছাড়িবে না। আমলে কাছীরের বিস্তারিত বর্ণনা তরীকুল ইসলাম ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ ভাগে লিখিত আছে।

৩৯। পীড়িত ব্যক্তির দাঁড়াইয়া নফল নামায পড়িতে কষ্ট হইলে দেওয়ালে কিংবা লাঠির সহিত ঠেক লাগাইয়া রুকূ, সিজ্‌দাহ করিয়া নামায পড়িলে ইহাতে নামায মাকরূহ হইবে না, এই মতই ছহীহ। কষ্ট না হইলেও যদি ঐরূপ ঠেক লাগাইয়া নামায পড়ে তবে মাকরূহ হইবে। নামায আরম্ভ করিয়া দাঁড়াইতে কষ্ট হইলে বসিয়া নফল আদায় করিলে মাকরূহ হইবে না। (দুররুল মোখতার)

৪০। দাঁড়াইয়া নফল নামায আরম্ভ করিয়া ক্লান্তি বোধ করিলে বসিয়া পড়া জায়েয আছে; অথবা দেওয়াল কিংবা লাঠিতে ঠেক লাগাইয়া পড়িতে পারে। ইহাতে কাহারও মতে মাকরূহ হইবে না। বিনা ক্লান্তিতে বসিয়া নফল পড়াও মাকরূহ নহে। কিন্তু বিনা ক্লান্তিতে খুঁটি কিংবা কিছুতে ঠেক লাগাইলে সকলের মতে মাকরূহ হইবে। যেহেতু বিনা ওজরে ঠেক লাগান আদবের খেলাফ।

ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিয়া বিনা ওজরে বসিয়া পড়িলে মাকরূহ হইবে। পক্ষান্তরে ফখ্‌রুল ইসলাম (রহঃ) বলিয়াছেন- ইহাতে মাকরূহ হইবে না এবং এই মতই শুদ্ধ বলিয়া যুক্তি দিয়াছেন। কেননা যখন নফল নামায বসিয়া আরম্ভ করতঃ দাঁড়াইয়া পড়িলে মাকরূহ হয় না। তখন ঐরূপ পড়া মাকরূহ হইবে কেন? সুতরাং মাকরূহ হইবে না। (কবিরী)

শামী কিতাবে লিখিয়াছেন- ফরজ নামাযে এরূপ ক্লান্তি ঘটে না, নফল বা তারাবীহ নামাযে এরূপ ক্লান্তি জন্মিয়া থাকে। উক্ত কিতাবে আরও আছে- ছাহেবাইন বলিয়াছেন- দুই রাকয়াত নামাযের প্রথম রাকয়াতে দাঁড়াইয়া শুরু করতঃ বিনা ওজরে দ্বিতীয় রাকয়াতে বসিয়া পড়া জায়েয হইবে না। কিন্তু চারি রাকয়াত বিশিষ্ট নফল নামায এক নিয়তে দাঁড়াইয়া আরম্ভ করতঃ দুই রাকয়াত পড়িয়া বাকী দুই রাকয়াত বসিয়া পড়িলে মাকরূহ হইবে না। চারি রাকয়াত বিশিষ্ট সুন্নাত নামায এরূপভাবে পড়িলে জায়েয হইবে

না। যেমন জোহরের সুন্নাত ও জুম্‌আর সুন্নাত।

৪১। পীড়িত ব্যক্তি নামায পড়িবার সময় অনিচ্ছায় আহ্ উহ্ ইত্যাদি শব্দ করিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় নামায ছাড়িয়া দিবে না। নামায পড়িতে হইবে। (তাহ্তাবী)

৪২। পীড়া বশতঃ বোবা লোকের ন্যায় মুখ বন্ধ করিয়া থাকিলেও বোবার ন্যায় ওষ্ঠদ্বয় সঞ্চালন করিয়া একদিন এক রাত পর্যন্ত ঐরূপ ভাবে নামায পড়িয়া থাকিলেও পরে ভাল হইয়া গেলে ঐ নামায কাজা করিতে হইবে না। (তাহ্তাবী)

আনুষঙ্গিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নঃ- মদ, গাঁজা ব্যবহারে কিংবা নিদ্রায় বেহুঁশ হইলে সেই নামাযের কাজা পড়িতে হইবে অথচ মানুষ বা হিংস্র প্রাণীর গর্জনে বেহুঁশ হইলে কাজা পড়িতে হইবে না কেন?

উত্তরঃ- মানব বা হিংস্র প্রাণীর গর্জনে বেহুঁশ হইলে উহার জন্য নিজে দায়ী নহে, কিন্তু মদ, গাঁজা সেবন বা নিদ্রায় বেহুঁশ হইলে তজ্জন্য নিজে দায়ী হইবে। কাজেই ফওত নামাযের কাজা আদায় করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, নেশার জিনিস ব্যবহারে বেহুঁশ অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হইয়া যাইবে। বাহ্রুর রায়েক কিতাবে আছে- বেহুঁশ এবং পাগল ব্যক্তির নামাযের একই হুকুম।

প্রশ্নঃ- বেহুঁশ অবস্থায় নামায পড়ার হুকুম জানিলাম। এমতাবস্থায় রোযা রাখার বিধান কি?

উত্তরঃ- রোযার মাসের পূর্বে যদি কেহ বেহুঁশ হয় এবং রোযার মাসের পরে হুঁশ হয় তবে রোযার কাজা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু রোযার মাসের পূর্বে পাগল হইয়া রোযার মাসের পর ভাল হইলে রোযার কাজা করিতে হইবে না। (বাহ্রুর রায়েক)

প্রশ্নঃ- বেহুঁশ হওয়ার দরুন কিংবা পাগল হওয়ার কারণে একত্রে ছয় ওয়াক্ত নামায ফওত হইলে তাহার কাজা আদায় করিতে হইবে না, জানিলাম। কিন্তু পীড়া বশতঃ মাথার ইশারায় নামায পড়িতে অক্ষম হওয়ায় নামায ফওত হইলে ঐ নামায কাজা পড়িতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- পীড়া বশতঃ মাথার ইশারায় নামায পড়িতে অক্ষম হইয়া পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে রোগমুক্ত হইলে সকলের মতে কাজা পড়িতে হইবে। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী ফওত হইয়া থাকিলে তাহার কাজা আদায় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মোস্তাছফী কিতাব হইতে হেদায়া কিতাবে লিখিয়াছেন- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে এই নামাযের কাজা পড়িতে হইবে।

পক্ষান্তরে-১। কাজীগণী, ২। কাজীখান, ৩। মুহীত, ৪। শায়খুল ইসলাম, ৫। ফখরুল ইসলাম, ৬। জহিরিয়া, ৭। মে'রাজুদ দেরায়া, ৮। খোলাছা, ৯। এনায়া, ১০। তাতারখানিয়া, ১১। বাদায়ে, ১২। ওয়াল ওয়ালেজিয়া, ১৩। আলমগীরী, ১৪। ফতোয়ায়ে ছোগরা,

১৫। শরহে তাহাবী প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে কাজা করিতে হইবে না।

মারাকিল ফালাহ কিতাবে এই বিষয়ে উল্লেখ করতঃ লিখিয়াছেন- যখন কোন বিষয়ে দুই মত উপস্থিত হয়, তখন অধিকাংশ মোহাক্কেক যে মত সমর্থন করেন সেই মতই সমর্থন করার বিধান। অধিকাংশ মোহাক্কেকের মতে যখন কাজা আদায় করিতে হইবে না, তখন এই মতই গ্রহণযোগ্য। এই সম্বন্ধে শরম্বালালিয়া কিতাবের মোছান্নেফ লিখিয়াছেন- তানজীছ কিতাবে লিখিত আছে- এই ফওত নামাযের কাজা পড়িতে হইবে না। হেদায়ার মোছান্নেফ যিনি তান্‌জীছেরও মোছান্নেফ- বহু সংখ্যক মোহাক্কেকের মনোনীত মত সমর্থন করতঃ নিজ হেদায়ার মত ছাড়িয়া দিয়া তান্‌জীছ কিতাবে নিজেই লিখিয়াছেন যে, এই ফওত নামাযের কাজা পড়িতে হইবে না। অতএব হেদায়ার মত আমল না করিয়া অধিকাংশ মোহাক্কেকের মনোনীত ও তান্‌জীছের মতানুযায়ী এই ফওত নামাযের কাজা পড়িতে হইবে না, এই মতই সমর্থন করা হইল।

নৌকা ও জাহাজে নামায পড়ার মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- চল্‌তি নৌকায় কিরূপ ভাবে নামায পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- যে চল্‌তি নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারা যায়, সেই নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হইবে।

প্রশ্নঃ- ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ হাদীস অবলম্বনে বলিয়াছেন যে, ঐরূপ নৌকায় বসিয়া নামায পড়িলেও হইবে। হুযুর বলিলেন, বসিয়া পড়িলে হইবে না। এখন আমরা কোন মত আমল করিব?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে- ইমাম মোহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ ও ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে বলিয়াছেন যে, বিনা ওজরে চলতি নৌকায় বসিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না।

এতদ্ব্যতীত শামী, মারাকিল ফালাহ, বাহরুর রায়েক, হাশিয়ায়ে তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়ায়েন যে, ঐরূপ মতভেদস্থলে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে সক্ষম হইলে, দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না। শামী কিতাবে আছে- দাঁড়াইয়া নামায পড়ার মতই ছহীহ। যেহেতু হাবি কুদছী কিতাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়ার মতের উপর ফতওয়া দিয়াছেন। মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিয়াছেন- সম্ভব হইলে নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়ার চেয়ে উপরে উঠিয়া নামায পড়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ- ইমাম ছাহেব চলতি নৌকায় বসিয়া নামায পড়িতে হুকুম দেওয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ ও দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে- চলতি নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে অনেকেরই মাথা ঘুরাইয়া থাকে। তজ্জন্য ইমাম ছাহেব

চলতি নৌকায় বসিয়া নামায পড়িতে বলিয়াছেন। শামী ও বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়- যদি ঐরূপ মাথা ঘুরাইবার ও কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে, ক্ষতির আশঙ্কা হইলে বসিয়া পড়িবে। সুতরাং তিন ইমামের মত একই রকম হইল।

প্রশ্নঃ- উপরের প্রমাণে বুঝিতে পারিলাম যে, বড় নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়ায় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের ছোট ছোট নৌকায় দাঁড়ান দূরের কথা, ভাল ভাবে বসিতে বা সিজ্‌দাহ করিতে পারে না। সেই নৌকায় নামায পড়ার কি হুকুম?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও শামী প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায়, ঐরূপ ছোট নৌকা হইলে যদি উপরে উঠিয়া রুকূ, সিজ্‌দাহ আদায় করিয়া নামায পড়া সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিবে। যদি তাহা না পারা যায়, তবে ঐরূপ নৌকায় যথাসম্ভব রুকূ, সিজ্‌দাহ আদায় করিয়া নামায পড়িবে। যদি তাহাতেও অক্ষম হয় তবে ইশারায় নামায পড়িবে। অনেকেই এরূপ অবস্থায় হাঁটু বা বৈঠার উপর অঙ্গুলীর ইশারায় নামায পড়ে, তদ্রূপ করিবে না। কেননা নামায হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, ইশারায় নামায পড়ার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে যেন রুকূর চেয়ে সিজ্‌দায় মাথা কিছু বেশী নীচু করা হয়।

প্রশ্নঃ- নদী বা খালের মধ্যে নৌকা নঙ্গর করা কি কাছি দ্বারা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও সেই নৌকা বাতাসে কিংবা তরঙ্গে হেলিতে দুলিতে থাকিলে কিরূপভাবে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ ও দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- ঐরূপ অবস্থায় বসিয়া নামায পড়িলে হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি ঐরূপ নঙ্গর করা কি বাধা নৌকা না নড়ে কিংবা সামান্য নড়ে,তবে কিরূপভাবে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে- তীরে লাগান নৌকায় যেভাবে নামায পড়ে সেভাবে পড়িবে। দুররুল হেকাম কিতাবে আছে- ঐরূপ নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে- ঐরূপ নৌকা যদি না নড়ে বা সামান্য নড়ে, তবে না দাঁড়াইয়া বসিয়া নামায পড়িলে হইবে না। শামী কিতাবে আছে- সামান্য নড়িলে দাঁড়াইবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসিয়া নামায পড়িলে হইবে না।

প্রশ্নঃ- নৌকা তীরে লাগান থাকিলে সেই নৌকায় কিরূপভাবে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ দুররুল হেকাম কিতাবে আছে- তীরে লাগান নৌকায় বিনা ওজরে বসিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না। নূরুল ইজাহ কিতাবে আছে-যদি নৌকার কতকাংশ মাটির সঙ্গে লাগান থাকে, তবে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে ঐ নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে। বসিয়া পড়িলে নামায হইবে না।

প্রশ্নঃ- তীরে লাগান নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে হইবে কিন্তু মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে লিখিত আছে- ঐরূপ তীরে লাগান নৌকায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেও নামায ছহীহ্ হইবে না। এখন কোন মত আমল করিতে হইবে?

উত্তরঃ- নিম্নোক্ত কিতাব সমূহে যথাঃ- ১। দুররুল মোখতার, ২। হাশিয়ায়ে তাহতাবী, ৩। বাহরুর রায়েক, ৪। ফতহুল কাদীর, ৫। এনায়া, ৬। কেফায়া, ৭। হেদায়া, ৮। দুররুল হেকাম, ৯। শরাম্বালালিয়া, ১০। রেছালায়ে আরকান, ১১। গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবে আছে- ঐরূপ তীরে লাগান নৌকার কতকাংশ মাটিতে লাগান থাকুক বা না থাকুক ঐরূপ তীরে লাগান নৌকায় নামায পড়িলে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে নামায শুদ্ধ হইবে, যেরূপ তীরে নামায পড়িলে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রশ্নঃ- শামী কিতাবে নাকি এক রেওয়ায়েতে ঐরূপ অবস্থায় নৌকায় নামায না পড়িয়া তীরে উঠিয়া নামায পড়িতে হুকুম দিয়াছেন?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে ঐরূপ লেখা থাকিলেও উহা বাজে লোকের মত। উপরোক্ত ১১টি প্রসিদ্ধ কিতাবে যখন এরূপ অবস্থায় নৌকায় দাঁড়াইয়া পড়িলে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে নামায শুদ্ধ হইবে বলিয়া লিখিয়াছেন, এমতস্থলে শামী কিতাবের কথা আমল করা যায় না। কারণ, দুররুল মোখতার কিতাবের ব্যাখ্যা শামী কিতাব। আসল দুররুল মোখতার কিতাবেই যখন জায়েয লিখিত, তখন শামী কিতাবের মত আমল করা যায় না। শামী ও অন্যান্য কিতাবের মর্মে জানা যায়, সম্ভব হইলে তীরে উঠিয়া নামায পড়া উত্তম। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রশ্নঃ- নৌকায় কিবলা ঠিক করিয়া নামায আরম্ভ করার পর যদি নৌকা অন্যদিকে ঘুরিয়া যায়, তবে কিরূপভাবে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- নূরূল ইজাহ্ কিতাবে আছে- যদি কিবলা ঠিক করিয়া নামায আরম্ভ করার পর নৌকা ঘুরিয়া যায়, তবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিবলা ঠিক রাখিয়া নামায পড়িতে হইবে। নচেৎ নামায হইবে না।

দুররুল মোখতার, তাহতাবী, দুররুল হেকাম, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শামী প্রভৃতি কিতাবে আছে- নৌকা ঘুরার সময় নামায আরম্ভ করিতে হইলেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামায পড়িতে হইবে। যেহেতু নামাযে কিবলা ঠিক রাখা ফরজ। শামী কিতাবে আরও লিখিত আছে- ফরজ, নফল সকল নামাযেই কেবলা ঠিক রাখার এক হুকুম।

প্রশ্নঃ- নৌকায় থাকিয়া তীরের ইমামের সহিত এক জামায়াতে নামায পড়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- যদি নৌকা তীরে সংলগ্ন থাকে ও পৃথক করার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে তীরের ইমামের সহিত নৌকার মুক্তাদী এক্তেদা করিতে পারিবে। কিংবা নৌকার ইমামের সহিত তীরের মুক্তাদীগণ এক্তেদা করিতে পারিবে। (দুররুল হেকাম) হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি নৌকা ও তীরের মধ্যে কিছু ফাঁক

থাকে এবং সেস্থান দিয়া নৌকা চলিতে পারে, তবে এরূপ অবস্থায় এক্তেদা করা জায়েয হইবে না।

প্রশ্নঃ- দুই নৌকা একত্রে থাকিলে জামায়াত করিয়া নামায পড়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- দুই নৌকা একত্রে মিশান থাকিলে তথায় জামায়াত করিয়া নামায পড়িতে পারে। যেহেতু একই নৌকার মত হইল। (দুররুল মোখতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ও শামী) কিন্তু দুই ছওয়ারের প্রাণী একত্রে মিশান থাকিলে তাহাতে জামায়াত জায়েয হইবে না।

প্রশ্নঃ- জাহাজে কিরূপভাবে নামায আদায় করিবে?

উত্তরঃ- উপরোক্ত কিতাব সমূহের মর্মে জানা যায়, জাহাজেও নৌকার ন্যায় নামায আদায় করিবে।

রেলগাড়ীতে নামায পড়ার মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- রেলগাড়ীতে কিরূপভাবে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- চলতি রেলগাড়ীতে থাকিয়া নামায পড়া সম্বন্ধে হিন্দুস্থানের ওলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে- কিন্তু গায়াতুল আওতার কিতাবের মর্মে জানা যায়, চলতি রেলে ফরজ ওয়াজিব নামায পড়ার মধ্যে মতভেদ আছে বটে কিন্তু যখন রেলগাড়ী থামে তখন মুসাফিরের ন্যায় ছোট সূরা দ্বারা গাড়ীতে হউক বা নামিতে সক্ষম হইলে নামিয়া পড়ুক, নামায জায়েয হইবে। কিন্তু চল্‌তি রেলে নামায পড়িতে হইলে নামাযের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত গৌণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, গাড়ী থামে কি না; যদি না থামে তবে শেষ ওয়াক্তে যেরূপভাবে হউক নামায পড়িবে। এই মতই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য।

চারপায়া জানোয়ারের উপর নামায পড়ার মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- চারপায়া জানোয়ারের উপর নামায পড়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ- তৎসম্বন্ধে কতক মাসয়ালা নিম্নে লিখিত হইল। চারপায়া জানোয়ারের উপরে থাকিয়া বিনা ওজরে ফরজ নামায পড়া জায়েয নাই। এমনকি ওয়াজিব নামায যথা- বেতের, মান্নত, শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া নফল নামায, জানাযা, যমিনে থাকিয়া যে তেলাওয়াতে সিজ্‌দাহ হইয়াছে ইত্যাদি চারপায়া জানোয়ারের উপর থাকিয়া আদায় করা জায়েয নাই। আলমগীরী ও তাহতাবী কিতাবে আছে- ঈদের নামাযেরও এই হুকুম। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- ফজরের সুন্নাত নামাযেরও এই হুকুম।

প্রশ্নঃ- কিরূপ ওজরে চারপায়া জানোয়ারের উপর নামায পড়া জায়েয আছে?

উত্তরঃ- নিম্নলিখিত কারণে চারপায়া জানোয়ারের উপর থাকিয়া নামায পড়া জায়েয আছে-

১। চারপায়া জানোয়ার হইতে নামিয়া নামায পড়িলে যদি সঙ্গীয় মাল অথবা ঐ প্রাণী চোরে লইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে কিংবা নিজকে অথবা ঐ প্রাণীকে কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিতে পারে ঐরূপ আশঙ্কা স্থলে উপরে থাকিয়া নামায পড়া জায়েয আছে। (আলমগীরী)

২। যদি চারপায়া জানোয়ার এমন উন্মাদ হয় যে, উহার পিঠ হইতে নামিলে পুনঃ অন্যের সাহায্য ব্যতীত উঠিতে না পারে, তবে উপরে থাকিয়া নামায পড়া জায়েয আছে।

৩। আরোহী এত বৃদ্ধ যে, একবার নামিলে পুনঃ অন্যের সাহায্য ব্যতীত সওয়ার হইতে অক্ষম হয়।

৪। মাটি এত নরম যে, সিজ্‌দাহ দাবিয়া যায়। এমতস্থলে না নামিয়া জানোয়ারের উপর থাকিয়া নামায পড়িবে। (আলমগীরী)

৫। যদি জানোয়ারের উপর হইতে নামিলে ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে না নামিয়া উপরে থাকিয়া নামায পড়িবে। (তাহতাবী ও মারাকিল ফালাহ)

৬। উক্ত কিতাবে আরও আছে- সওয়ারীর উপর হইতে নামিয়া নামায পড়িলে যদি কাফেলা চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে না নামিয়া জানোয়ারের উপরে থাকিয়া নামায আদায় করিবে।

৭। পীড়িত ব্যক্তি সওয়ারী হইতে নামিলে যদি বিশেষ কষ্ট হয় বা পীড়া বৃদ্ধি হয় কিংবা আরোগ্য হইতে বিলম্ব হয়, তবে এমতাবস্থায় জানোয়ারের উপরে থাকিয়া নামায পড়া জায়েয আছে।

৮। যদি দুইজন আরোহীর মধ্যে একজন নামিতে সক্ষম হয় ও অপরজন অক্ষম হয়, তবে সক্ষম ব্যক্তি নামিয়া নামায পড়িবে। (গায়াতুল আওতার)

৯। মাটি যদি এমত নরম হয় যে, নামিয়া বিছানা করিলে বিছানায় কাদা জড়াইয়া যায়, তবে সওয়ারীর উপরে থাকিয়া নামায পড়িবে। কিন্তু মাটি যদি এমত নরম না হয় যে, মাথা দাবিয়া যায়, তাহা হইলে সওয়ারীর উপরে থাকিয়া নামায পড়া জায়েয নাই। যদি কেহ সওয়ারী ব্যতীত কাদাযুক্ত রাস্তায় হাঁটিয়া চলে ও সিজ্‌দাহ করার সুযোগ না থাকে তবে ইশারায় নামায পড়িবে। আলমগীরী কিতাবে আছে- সুন্নাত ও নফল নামাযের একই হুকুম। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- ওয়াজিব ও ফজরের সুন্নাত নামাযের একই হুকুম।

প্রশ্নঃ- সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়ার কি হুকুম?

উত্তরঃ- আলমগীরী ও দুররুল হেকাম কিতাবে আছে-

১। শহরের বাহিরে গেলে প্রাণী যেদিকে চলে সেদিকেই ইশারায় নফল পড়িতে পারে। শেষোক্ত কিতাবে আরও আছে, যদিও কিবলার বিপরীত হয়। আরও লিখিত আছে- মুসাফিরিতে রওয়ানা হইয়া নিজ বাসস্থান হইতে যত দূরে গেলে কছর পড়া ওয়াজিব হয়, তত দূরবর্তী স্থানকে শহরের বাহির বলে । এমতাবস্থায় মুকীম ও মুসাফির

সকলেই বিনা ওজরে সওয়ারীর উপরে থাকিয়া নফল পড়িতে পারিবে। শহরের লোক হউক বা গ্রামের লোক হউক, সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া শহর ও গ্রাম হইতে ঐ পরিমাণ দূরে গেলে সওয়ারীর উপরে থাকিয়া নফল পড়িতে পারিবে। আলমগীরী কিতাবে আছে- শহরের মধ্যে থাকিয়া সওয়ারীর উপর নফল পড়া জায়েয নাই। উক্ত কিতাবের মর্মে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায় মুকীম ব্যক্তি যদি সওয়ারীতে থাকিয়া বাড়ীর কাছে ও ঐ পরিমাণ দূরে যায়, তবে সওয়ারীর উপর নফল পড়িতে পারিবে।

প্রকাশ থাকে যে, আলমগীরী ও বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- শহরের বাহির কত দূরবর্তী স্থানকে বলে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ছহীহ রেওয়ায়েত মতে মুসাফির ব্যক্তি শহর হইতে বাহির হইয়া যতদূরে গেলে কছর আরম্ভ করিতে হয় তত দূরবর্তী স্থানকে শহরের বাহির বলিয়া ধরা যাইবে।

২। আলমগীরী কিতাবে আছে- শহরের বাহিরে সওয়ারীর উপর থাকিয়া নফল আরম্ভ করিয়া নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই শহরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বাকী নামায নামিয়া আদায় করিবে।

৩। গায়াতুল আওতার ও আলমগীরী কিতাবে আছে- যমিনে নামায শুরু করিয়া বাকী নামায সওয়ারীর উপর পড়িলে ঐ নামায ফাসেদ হইবে। বাহ্‌রুর রায়েক কিতাবে আছে- সওয়ারীর উপর হইতে নামিতে আমলে কাছির হয় না; কাজেই নামায ফাসেদ হয় না। কিন্তু যমিন হইতে সওয়ারীর উপর উঠিতে আমলে কাছীর হয়, তজ্জন্যই নামায ফাসেদ হইয়া থাকে।

৪। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে– যে কোন অবস্থায় সওয়ারীর উপর থাকিয়া নফল নামায পড়া জায়েয আছে। সওয়ারী চলিতে থাকুক বা না থাকুক, কিবলার দিকে থাকুক বা বিপরীত দিকে থাকুক অথবা সওয়ারী হইতে নামিবার শক্তি থাকুক ঐ সকল অবস্থায় সওয়ারীর উপরে থাকিয়া নামায পড়া জায়েয আছে। দুইজন দুই সওয়ারীতে থাকিয়া জামায়াতে নামায পড়া জায়েয নাই। দুইজন এক সওয়ারীতে থাকিয়া পাশাপাশি বা একজন অপরজনের পিছনে নামায পড়া জায়েয হইবে।

প্রশ্নঃ- ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর উপর নামায পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ- চারপায়া জানোয়ারের উপর যেরূপ বিনা ওজরে ফরজ, ওয়াজিব ও ফজরের সুন্নাত পড়া জায়েয নাই, আইনী শরহে কান্‌য কিতাবের মর্মে জানা যায়, তদ্রূপ উক্ত নামায সমূহ বিনা ওজরে ঘোড়া বা গরুর গাড়ীতে পড়া সম্বন্ধেও সেই হুকুম। দুররুল মোখতার, বাহরুর রায়েক, গায়াতুল আওতার প্রভৃতি কিতাবে আছে– গাড়ী যখন ঘোড়া বা গরুর সহিত জড়িত থাকে, তখন চলিতে থাকুক বা থামাইয়া থাকুক উক্ত অবস্থায় এই হুকুম। কিন্তু গরু বা ঘোড়া গাড়ীর সহিত জড়িত না থাকিয়া মাটিতে ঠেকান থাকিলে তাহাতে বিনা ওজরে নামায পড়া জায়েয আছে, যেরূপ যমিনের উপর নামায পড়া জায়েয আছে।

বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, চারপায়া জানোয়ারের উপর যেরূপ বিনা ওজরে নফল পড়া জায়েয, তদ্রূপ গরু বা ঘোড়ার টানা গাড়ীতে থাকিলেও বিনা ওজরে নফল নামায জায়েয, গাড়ী চলিতে থাকুক বা থামান থাকুক।

প্রশ্নঃ- চারপায়া জানোয়ারের উপর বসিয়া থাকিয়া কিরূপভাবে নামায পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক কিতাবে মুনিয়া কিতাব হইতে লিখিত আছে- চারপায়া জানোয়ারের উপর ইশারায় নামায পড়িবে। তাহতাবী কিতাবে আছে- যদি জানোয়ার কিবলার দিকে থাকে তবে থামাইয়া কিবলামুখী হইয়া ইশারায় নামায পড়িবে। যদি থামান না যায় ও কিবলার দিক করা না যায়, তবে যেদিকে চলে সেদিকে ফিরিয়া নামায আদায় করিবে যদিও কিবলার বিপরীত হয়। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- যদি কোন চালক প্রাণীকে চালায় তবে প্রাণীটি কিবলার দিকে ফিরাইয়া নামায পড়িবে নচেৎ নামায হইবে না। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- চারপায়া জানোয়ার কোন স্থানে রাখিয়া কিবলা ঠিক করিয়া নামায পড়া শর্ত। কিন্তু যদি জানোয়ার থামাইতে ও কিবলা দিক ফিরাইতে অসমর্থ হয় তবে ওজরে মাফ আছে।

আলমগীরী কিতাবে আছে– চারপায়া জানোয়ারের উপর নামায পড়িতে হইলে কিবলার দিকে ফিরিয়া নামায শুরু করিতে অক্ষম হইলে যে দিকে পারে সে দিকেই নামায আরম্ভ করিবে। এই মতই শুদ্ধ। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- চারপায়া জানোয়ারের উপর নফল পড়ার জন্য কিবলা নির্ণয় শর্ত নহে। আলমগীরী ও তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, প্রাণী যে দিকে চলে তাহার বিপরীত দিকে কিবলা হইলেও প্রাণীর সম্মুখ দিকে ফিরিয়া নামায পড়িবে। প্রাণীর সম্মুখের দিক ব্যতীত অন্য দিকে নামায পড়া জায়েয নাই।

আলমগীরী কিতাবে আছে– চারপায়া জানোয়ারের উপর ইশারায় নামায পড়িবার সময় রুকূর চেয়ে সিজ্‌দাতে মাথা কিছু বেশী নীচু করিবে; কিন্তু কোন জিনিসের উপর সিজ্‌দাহ করা জায়েয নাই। তাহতাবী কিতাবে আছে- চারপায়া জানোয়ারের উপর ইশারায় নামায পড়িবার সময় জিনপোষ বা অন্য কোন জিনিসের উপর সিজ্‌দাহ করা মাকরূহ। কিন্তু নামায ফাসেদ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, জিনপোষ ও রেকাবের উপর নাপাক থাকিলে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে ওজরে তাহার উপর নামায পড়া জায়েয আছে। এরূপ গাধার ঘাম বা লালা অথবা কোন প্রকার রক্ত লাগা থাকিলে তাহার উপর নামায পড়া জায়েয।

তাহতাবী কিতাবে শরহে উমদাতুল আহকাম কিতাব হইতে লিখিয়াছে- ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে সক্ষম হইলে চারপায়া জানোয়ারের উপর কিবলামুখী হইয়া নফল নামায আরম্ভ করা মুস্তাহাব। পরে প্রাণী যেদিকে চলে সেই দিকে নামায পড়িবে।

মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায়, যদি জানোয়ারের উপর নামায অবস্থায়

থাকিয়া পা দ্বারা জানোয়ার হাঁকায় তাহা হইলে আমলে কাছীর না হইলে নামায ফাসেদ হইবে না।

প্রশ্নঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ বলিয়াছেন যে, মাজুর ব্যক্তি অন্যের সাহায্যে নামিতে সক্ষম হইলেও প্রাণীর উপর থাকিয়া নামায পড়িলে জায়েয হইবে। কেননা, অন্যের সাহায্য লওয়া ওয়াজিব নহে। কিন্তু হুযুর বলিলেন, নামিয়া নামায পড়িতে হইবে। ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- ঐ বিষয়ে বাহরুর রায়েক, খানিয়া,কাফি প্রভৃতি কিতাব হইতে শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহের মতে সাহায্যের লোক পাওয়া গেলে জানোয়ারের উপরে থাকিয়া নামায পড়া জায়েয নাই।

প্রশ্নঃ- এ বিষয়ে দুই মত হইল এখন আমরা কি করিব?

উত্তরঃ- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় দুরুল মোখতার কিতাবের মত আমল করা যায় না। কারণ, মোস্তাছফী কিতাবে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ বলিয়াছেন, সাহায্যকারী লোক পাওয়া সত্ত্বে চারপায়া জানোয়ারের উপর নামায পড়া জায়েয নাই। আরও জানা যায়- ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ ও ছাহেবাইনের মতে অজু করিতে অক্ষম হইয়া অজুর সাহায্যকারী লোক পাইলে বিনা অজুতে নামায হইবে না। এমতাবস্থায় দুররুল মোখতারের উল্লিখিত মত আমল করা যায় না। যেহেতু তিনজন ইমাম একমত হইয়া বলিতেছেন যে, চারপায়া জানোয়ারের উপর হইতে নামিবার জন্য সাহায্যকারী লোক পাওয়া সত্ত্বে উপরে থাকিয়া নামায পড়িবে না।

প্রশ্নঃ- ওজর বশতঃ প্রাণীর উপর থাকিয়া ইশারায় যে ফরজ নামায পড়া হইয়াছে, ওজর চলিয়া গেলে সেই নামায কাজা পড়িতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- ঐ নামাযের কাজা পড়িতে হইবে না। (মারাকিল ফালাহ ও আলমগীরী)

প্রশ্নঃ- যদি উটের পিঠের হাওদাজ (শুক্‌দুফ বা ছিবুরিয়া) চারি খুঁটির উপর স্থাপন করে ও উহা উটের পিঠ হইতে উচ্চ থাকে তবে কিরূপ ভাবে নামায আদায় করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ঐরূপ খুঁটির দ্বারা প্রাণীর পৃষ্ঠ হইতে হাওদাজ পৃথক রাখিলে যমিনে দাঁড়াইয়া যেরূপ ভাবে নামায পড়ে সেরূপভাবে নামায পড়িবে।

মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- দাঁড়াইয়া রুকূ, সিজ্‌দাহ আদায় করিয়া নামায পড়িবে। উক্ত কিতাবে আরও আছে- চারপায়া জানোয়ারের পিঠের উপর নামায পড়ার যেরূপ বিধান প্রাণীর হাওদাজ বা শুকদুফের উপর নামায পড়ার সেই হুকুম। চাই প্রাণী চলিতে থাকুক বা থামান থাকুক।

প্রশ্নঃ- জানোয়ারের উপরে থাকিয়া কিরূপ ভাবে জামায়াতে নামায পড়িবে?

উত্তরঃ- ১। চারপায়া জানোয়ারের পিঠের উপর বসিবার স্থানের দুই পাশে দুইজন

থাকিলে একজন অন্য জনের এক্তেদা করিতে পারে। এমনকি একপার্শ্বে দুইজন থাকিলেও একে অপরের এক্তেদা করিতে পারিবে; নফল হউক কি ওজর বশতঃ ফরজ নামায পড়া হউক। (আলমগীরী)

২। দুই জানোয়ারের উপর দুইজন থাকিলে এক্তেদা করিলে ইমামের নামায হইবে কিন্তু মুক্তাদীর নামায হইবে না। (তাহতাবী)

প্রশ্নঃ- প্রাণীর উপর ছওয়ার থাকিয়া নামায পড়ার সময় ঐ জানোয়ার চালাইতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি জানোয়ার আপন হইতে চলিতে থাকে তবে হাকান জায়েয নাই। যদি না চলে তাহা হইলে হাতে বেত থাকিলে উহা দ্বারা ভয় দেখাইতে পারে। তাহাতে নামায ফাসেদ হইবে না। কেননা তাহাতে আমলে কাছীর হয় না।

প্রশ্নঃ- বাড়ী হইতে দূরে যাওয়ার সময় প্রাণীর উপর থাকিয়া ফরজ নামায পড়িতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- বাজ্জাজিয়া ১ম খন্ড ও আলমগীরী ৪র্থ খন্ডের মর্মে জানা যায়, যতদূরে গেলে জানোয়ারের উপরে থাকিয়া নফল পড়া জায়েয আছে, ঐরূপভাবে ঐ পরিমাণ দূরবর্তী স্থানে রওয়ানা হইলে জানোয়ারের উপরে থাকিয়া ওজরে ফরজ নামায পড়া জায়েয হইবে।

ঈদের নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- ঈদের নামায কোন্ তারিখে প্রথম শুরু হইয়াছে এবং কেন পড়ার হুকুম হইয়াছে?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার কিতাবে সুনানে আবূ দাউদ হইতে লিখিত আছে- হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন- যখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ হইতে হিজরত করিয়া মদীনা শরীফে গিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মদীনার লোকেরা বৎসরে ২দিন একত্রিত হইয়া খেলাধুলা করিয়া থাকে। তখন আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য এরূপ খেলাধুলা করা হয়? তাহারা বলিল, হুযুর! আমরা যখন বেদ্বীন ছিলাম, তখন আমরা বৎসরে ২দিন এরূপভাবে খেলাধুলা ও আমোদ করিতাম। ইহা শ্রবণে আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা নামাযের দুই দিনকে আমাদের জন্য খুশী অর্থাৎ আনন্দের দিন করিয়াছেন। দুররুল মোখতার ও তাহতাবী কিতাবে আছে- ঈদের নামায প্রথম হিজরীতে মদীনা শরীফেই পড়া আরম্ভ হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- দুই ঈদের নামায পড়া কি?

উত্তরঃ- ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব কি সুন্নাত তাহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু আলমগীরী ও দুররুল মোখতার কিতাবে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে ওয়াজিব লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- সকলের প্রতিই কি ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব?

উত্তরঃ- যাহাদের প্রতি জুম্আর নামায পড়া ওয়াজিব, তাহাদের প্রতি ঈদের নামায পড়াও ওয়াজিব। (আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

প্রশ্নঃ- ঈদের দুই নাম হইল কেন?

উত্তরঃ- কিতাবে আছে- রমজান মাসের রোযার পর ১লা শাওয়াল রোযা ভঙ্গ করতঃ ফেতরা দেওয়া উপলক্ষে সকলে যে খুশী ও আমোদ করে এবং শুকুর গোজারীর জন্য সকল মুসলমান একত্রে মিলিয়া মিশিয়া যে ২ রাকয়াত নামায পড়ে, তাহাকে ঈদুল ফেতের বলে। আর হজ্জের পর দিবস যিলহজ্জ চাঁদের ১০ তারিখে সকল মুসলমান একত্রিত হইয়া খুশীর সহিত যে নামায পড়ে তাহাকে ঈদুল আজহা বলে। ইহার অন্য নাম বকরা ঈদ। উক্ত তারিখে নামায পড়িয়া গরু, বকরী, দুম্বা, উট ইত্যাদি কুরবানী করা হয় বলিয়া বকরা ঈদ নাম হইয়াছে।

প্রশ্নঃ- কোন সময় ঈদের নামায পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- সূর্য উদয়ের পর হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের নামাযের সময়। খানিয়া কিতাবে আছে- সূর্য উদয়ের পর এক কিংবা দুই নেজা উর্দ্ধে উঠিলেই ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

তাহতাবী, মারাকিল ফালাহ, শামী কিতাবে লিখিত আছে- সূর্য এক নেজা অর্থাৎ ১২ বিঘাত পরিমাণ উর্দ্ধে উঠিলে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হয়। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- ইহার পূর্বে ঈদের নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, সূর্য এক নেজা উর্দ্ধে উঠিবার পূর্বে ঈদের নামায পড়িলে হারাম হইবে। এমনকি ঐ সময়ের পূর্বে নফল নামায পড়াও জায়েয হইবে না।

প্রশ্নঃ- মসজিদের মধ্যে ঈদের নামায পড়া যায় কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়-জামে মসজিদের মধ্যে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইলেও ঈদগাহে অর্থাৎ ময়দানে যাইয়া ঈদের নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং এই মতই ছহীহ।

প্রশ্নঃ- এক গ্রামে একাধিক স্থানে ঈদের নামায পড়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- গ্রামে জুমআ পড়া মাকরূহ, ঈদের নামাযও মাকরূহ বটে, কিন্তু আমাদের দেশের যে স্থানকে সাধারণতঃ গ্রাম বলে, প্রকৃতপক্ষে উহা গ্রাম নহে, শরয়ী শহর। কাজেই আমাদের এতদ্দেশের গ্রাম শরয়ী শহর। মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- ঐরূপ শরয়ী শহরে দুই স্থানে ঈদের নামায পড়া জায়েয। এমন কি ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লার মতে তিন স্থানে পড়িলেও জায়েয হইবে। কিন্তু সকলে মিলিয়া একস্থানে পড়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ- যদি এইরূপ স্থানে অর্থাৎ শরয়ী দুই স্থানে লোক একত্রিত হইয়া ঈদের নামায পড়িতে বিশেষ অসুবিধা হয় তবে কি করিবে?

উত্তর- মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- যদি বৃহৎ মৌজা হয় ও লোক একত্রিত

হইতে বিশেষ কষ্ট হয়, তাহা হইলে দুই স্থানের অধিক স্থানে জমা হইয়া ঈদের নামায পড়িলেও জায়েয হইবে। এই মতই ছহীহ।

প্রশ্ন- আমাদের এতদ্দেশের গ্রাম শরয়ী শহর। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে- গ্রামে ঈদের নামায পড়া মাকরূহ তাহরীম। ইহার তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে গ্রামে ঈদের নামায পড়া মাকরূহ তাহরীম লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু উক্ত কিতাবের জুম্‌আর বয়ানে লিখিয়াছেন, যে স্থানে বড় মসজিদের কওল পাওয়া যায় সেই স্থান গ্রাম নহে, শহর। কাজেই আমাদের এতদ্দেশে প্রকাশ্য গ্রামগুলি শরয়ী শহর। তাহাতে বড় মসজিদের কওল পাওয়া যায়। অতএব এরূপ গ্রামে ঈদের নামায পড়া মাকরূহ তাহরীম নহে। যে সকল গ্রামে বড় মসজিদের কওল পাওয়া না যায় সেখানে ঈদের নামায পড়া মাকরূহ তাহরীম, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ দুররুল মোখতার কিতাবেও লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ- যদি ময়দানে ঈদের নামায পড়িতে বিশেষ কষ্ট হয়, তবে মসজিদে পড়া যাবে কি না?

উত্তরঃ- আরকানে আরবা কিতাবে লিখিত আছে- কোন কোন সময় বৃষ্টি হওয়ার দরুন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ঈদের নামায পড়িয়াছেন। এতদ্বারা জানা যায় যে, ওজরে মসজিদে ঈদের নামায পড়া জায়েয আছে।

ঈদের নামাযের পূর্বে যে সমস্ত কাজ করা মুস্তাহাব

প্রশ্নঃ- ঈদের নামাযের পূর্বে কি কি নিয়ম পালন করিতে হইবে?

উত্তরঃ- নূরুল ইজাহ কিতাবে লিখিত আছে- ঈদের নামাযের পূর্বে নিম্নলিখিত কাজ গুলি করা মুস্তাহাব।

১। ফজরের নামাযের পর সম্ভব হইলে ৩/৫/৭ এরূপ বেজোড় সংখ্যার খেজুর কি খুরমা খাইবে। তাহা না পাইলে শরবত কি হালুয়া মিঠাই ইত্যাদি খাইবে। যদি এই সকল জিনিস না পাওয়া যায় ও না খায় তাহা হইলেও গুনাহ হইবে না। ছহীহ বুখারী শরীফে আছে- ঈদুল ফেতরের দিন ফজরের নামাযের পর আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুরমা খাইতেন।

২। গোসল ও মেসওয়াক করিবে।

৩। আতর ইত্যাদি সুগন্ধি ব্যবহার করিবে।

৪। ভাল ও উত্তম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করিবে। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম্‌আ ও ঈদের দিন জুব্বা পরিধান করিতেন। আলমগীরী কিতাবে আছে- নূতন কাপড় কিংবা পুরাতন কাপড় ধৌত করিয়া পরিধান করা জায়েয হইবে।

৫। ফেতরা আদায় করিবে। কারণ, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- ঈদের ময়দানে যাওয়ার পূর্বে ফেতরা দান কর।

৬। ঈদের নামায পড়িতে যাইতে হইবে তজ্জন্য বিশেষ খুশী থাকিবে। যেহেতু ইহা আল্লাহর দান স্বরূপ।

৭। আংটি থাকিলে ব্যবহার করিবে। আলমগীরী কিতাবে পুরুষের জন্য চারি আনা ওজনের রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয লিখিয়াছেন। ইহার চেয়ে বেশী ওজনের জায়েয নহে। পিতল ও সোনার আংটি পুরুষের জন্য মাকরূহ তাহরীম ও হারাম।

৮। হাসি খুশী ভাবে থাকিবে। যেহেতু মুমিন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবে।

৯। অন্য সময় হইতে বেশী পরিমাণে নফল ছদকা দান করিবে।

১০। নামাযের প্রথম ওয়াক্তে কিংবা ওয়াক্তের পূর্বে ঈদগাহে যাইবে। কারণ প্রথম কাতারে দাঁড়াইলে বেশী নেকী পাওয়া যাইবে।

১১। ঈদের দিন মহল্লার মসজিদে গিয়া ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব।

১২। হাঁটিয়া ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব। কেননা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটিয়া ঈদগাহে গিয়াছেন। কিন্তু চক্ষু সামলাইয়া যাইবে যেন কোন হারাম জিনিসের উপর নজর না পড়ে। যাইবার সময় পথে আস্তে আস্তে তাকবীর পড়িবে। কোন সময় তাকবীর শেষ করিবে তাহাতে মতভেদ আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে- ঈদগাহে যাওয়া মাত্র ক্ষান্ত করিবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে- নামায শুরু হইবার পূর্বে ক্ষান্ত করিবে। ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) এই মতের উপর ফতোয়া দিয়াছেন।

১৩। নূরুল ইজাহ্ কিতাবে আছে- ঈদের নামায পড়িয়া অন্য রাস্তায় বাড়ী যাওয়া মুস্তাহাব।

১৪। আলমগীরী কিতাবে আছে- ঈদুল ফেতরের নামায কিছু বিলম্ব করিয়া ও ঈদুল আজহার নামায কিছু সকালে পড়া মুস্তাহাব।

১৫। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- সূর্য এক নেজা উর্ধ্বে উঠিলেই ইমামের ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব। কারণ মুক্তাদিগণকে যেন ইমামের জন্য অপেক্ষা করিতে না হয়। ঈদুল ফেতরের নামাযে সামান্য বিলম্ব করিয়া গেলে মুস্তাহাব আদায় হইবে। উক্ত কিতাবের ২য় খন্ডে আছে- হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর ইবনে হাজেমের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, ঈদুল আজহার নামায সকালে পড়িবে ও ঈদুল ফেতরের নামায যৎকিঞ্চিত বিলম্বে পড়িবে।

প্রশ্নঃ- কিরূপ লোককে ফেতরা দিতে হইবে?

উত্তরঃ- শরহে বেকায়া কিতাবের ১ম খন্ডে আছে- যাহার প্রতি ফেতরা দেওয়া ওয়াজিব, তাহার পক্ষে ফেতরা, যাকাত ও ছদকা লওয়া হারাম।

প্রশ্নঃ- কোন লোকের প্রতি ফেতরা ওয়াজিব?

উত্তরঃ- মাজালিসুল আবরার, শরহে বেকায়া প্রভৃতি কিতাবে আছে- যাহার নিজ আবশ্যকীয় ব্যতীত ঈদের দিন ফজরের সময় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সারে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা ঐ পরিমাণ টাকার মাল, যেমন দুধের গরু মৌজুদ থাকে, তাহার ফেতরা দেওয়া ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ- অনেক আলেম ছাহেবদের বাড়ীর অবস্থা ভাল। এই সময় তাহারা মালেকে নেছাব কেন, তার অধিক টাকা ফেতরা ও খয়রাত পাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে যে ফেতরা দেওয়া হয় তাহাতে ফেতরা আদায় হইবে কি না ও এরূপ লোকের ফেতরা লওয়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- মাজালিসুল আবরার কিতাবের মর্মে জানা যায়- যদি কোন গরীব লোক ফেতরা বাবদ মালেকে নেছাব পরিমাণ টাকা পাইয়া আরও ফেতরা, যাকাত, ছদকা ইত্যাদির মাল গ্রহণ করে, তবে উহা হারাম হইবে। যাহারা জানিয়া শুনিয়া এরূপ মালেকে নেছাব ব্যক্তিকে ফেতরা দিবে, তাহাদের ফেতরা আদায় হইবে না।

প্রশ্নঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাব হইতে বলা হইল যে, ঈদগাহে যাইবার পূর্বে ফেতরা দিবে। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই ইমাম ছাহেবকে ঈদগাহে ফেতরা দিয়া থাকে। তাহাতে ইমাম ছাহেবের বহু টাকা জমা হইয়া যায়। ইহাতে কোন অন্যায় হইবে কি না?

উত্তরঃ- পড়শী গরীব তালেবে এলেম ও গরীব মিসকীনদিগকে দেওয়াই উত্তম। কারণ, গরীব মিসকীন যদি নামাযের পূর্বে একদিনের পরিমাণ খোরাকী পায়, তবে মনের আনন্দে ঈদের নামায পড়িতে যাইবে। খোরাকের জন্য কোন চিন্তা করিবে না। তজ্জন্যই ঈদের নামাযের পূর্বে ফেতরা আদায়ের হুকুম হইয়াছে। ইমামতী করিয়া মজুরী লওয়া কোন কোন রেওয়ায়েতে জায়েয আছে। যদি স্থানীয় লোকদের মধ্যে ঈদের নামায পড়াইয়া দিতে পারে এমন কোন আলেম না থাকে, তাহা হইলে অন্য আলেমকে যৎকিঞ্চিত মজুরী দিয়া নামায পড়াইয়া লইবে। কিন্তু সেই মজুরী ফেতরা দ্বারা আদায় না করিয়া অন্য মাল দ্বারা দেওয়াই মুছল্লীদের কর্তব্য।

প্রশ্নঃ- ঈদগাহে বহুলোক একত্রিত হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কেহ শেষ ওয়াক্তে আসিয়া সকলের সামনে যাইবার চেষ্টা করে। তাহাতে সামনের কাতারের লোক পিছনে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এরূপ করা ঠিক কি না?

উত্তরঃ- মুক্তাদীগণ আগের কাতারে বসিয়া গেলে অন্য মুক্তাদীর সেই লোক উঠাইয়া সামনের কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করা অন্যায়। ইমাম হইলে যাইতে পারেন। কিন্তু ইমামের প্রথম ভাগেই জামায়াতে হাজির থাকা মুস্তাহাব। অতএব, ইমামের কর্তব্য এই যে, মুছল্লীদের পূর্বেই যথাস্থানে থাকেন।

প্রশ্নঃ- ইমাম পালকী কিংবা সওয়ারীতে থাকিয়া মুক্তাদিগণের উপর দিয়া বা সরাইয়া দিয়া সামনে যাইতে পারিবেন কি না?

উত্তরঃ- হাদীস শরীফ ও মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায়- হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ও ছাহাবীগণ ঈদের জামায়াতে হাঁটিয়া আসিতেন। তবে বিশেষ মাজুর হইলে পালকীতে যাইতে পারে। বিনা ওজরে পালকীতে

নামায পড়িতে যাওয়া সুন্নাতের খেলাফ। অতএব, ঈদের জামায়াতে হাঁটিয়া যাওয়া সকলের উচিত। দূরের রাস্তা হইলে নৌকা, গাড়ী, পালকী ইত্যাদিতে যাইতে পারে। কিন্তু মুছল্লীদেরকে সরাইয়া বা তাহাদের উপর দিয়া পালকী নেওয়া উচিত নহে।

প্রশ্নঃ- পূর্বে বলা হইয়াছে আস্তে আস্তে তাকবীর বলিতে বলিতে ঈদগাহে যাইবে। বদ্‌রুল মুন্তাকা কিতাবে নাকি আছে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলিবে- আমরা কোন মত আমল করিব?

উত্তরঃ- আলমগীরী মাজমাউল আনহুর ও উক্ত বদ্‌রুল মুন্তাকা কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহ হইতে রেওয়ায়েত মতে ঈদগাহে যাইবার সময় আস্তে তাকবীর বলার কথা লিখিয়াছেন। পক্ষান্তরে আরকানে আরবা কিতাবে আছে- বর্তমান যামানায় প্রায় লোক গাফেল অবস্থায় থাকে। যদি কেহ রাস্তায় উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলে, তবে তাহাকে নিষেধ না করা ভাল। কারণ নিষেধ করিলে তাকবীর না পড়িয়া গাফেল থাকিতে পারে। তাহাতে ইবাদতে বাঁধা দেওয়া হয়। যদিও উপরে দুই মতের উল্লেখ হইয়াছে তাহা শুধু মুস্তাহাব সম্বন্ধে। বদরুল মুন্তাকা কিতাবে আছে- উচ্চরবে তাকবীর বলা জায়েয হইবে। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- বাজারে থাকিয়াও তাকবীর বলা জায়েয আছে। শামী কিতাবে মুস্তাছফী কিতাব হইতে লিখিয়াছেন যে, বাজারের মধ্যেও তাকবীর বলিবে, এই মতের উপর ফতোয়া হইয়াছে।

ঈদের নামাযের তারতীব

প্রশ্নঃ- ঈদের নামায কিরূপভাবে পড়িবে?

উত্তরঃ- (১) মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায়, ঈদের নামাযের নিয়ত করতঃ তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া কানের লতিতে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া নাভী দেশে হাত বাঁধিবে।

(২) মুক্তাদীগণও ইমামের এক্তেদা করিয়া নিয়ত করিবে। আরবী নিয়ত না জানিলে ইমামের সহিত ছয় তাকবীরে কিবলামুখী হইয়া ঈদের নামায পড়িতেছি, এরূপ নিয়ত করিবে। আরবী নিয়ত এই-

نويت ان اصلى ركعتى صلوة عيد الفطر مع ستة تكبيرات الواجب الله

تعالى اقتديت بهذا الامام متوجها الى جهة الكعبة الشريفة الله اكبر-

নিম্নে তাকবীর দেওয়া হইলঃ-

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ـ

(৩) তৎপর ইমাম ও মুক্তাদীগণ ছোবহানাকা পড়িবে। অতঃপর ইমাম ও মুক্তাদী

আল্লাহু আকবার বলিয়া কানে উলা দিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে ও তিন তাকবীর বলিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ ঝুলান রাখিবে। এরূপভাবে তিনবার তাকবীর বলিয়া কানে উলা দিয়া শেষবারে হাত বাঁধিবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে তাকবীরের মধ্যে তিনবার তাকবীর বলিতে পারে, এমত বিলম্ব করিবে। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পড়িতে যত সময় লাগে ততক্ষণ হাত ঝুলাইয়া বিলম্ব করিবে। আলমগীরী কিতাবে (তরীকুল) হাকায়েক কিতাব হইতে লিখিয়াছেন- তাকবীরের ফাঁকে তিন তাসবীহ বলিতে পারে এই পরিমাণ সময় হাত ঝুলান রাখিবে। শায়েখগণ এই কথার উপর ফতোয়া দিয়াছেন।

(৪) তৎপর ইমাম চুপে চুপে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়িবে।

(৫) পরে ইমাম সূরা ফাতিহা পড়িয়া কিরাত পড়িবে। ঈদের নামাযের প্রথম রাকয়াতে 'সাব্বিহিসমা' সূরা ও দ্বিতীয় রাকয়াতে 'হালআতাকা' সূরা পড়া মুস্তাহাব।

(৬) তৎপর যথারীতি রুকূ, সিজ্‌দাহ করিয়া দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্য দাঁড়াইবে।

(৭) ইমামের ফাতিহা ও কিরাত পড়া শেষ হইলে পূর্বের ন্যায় কানে উলা দিয়া ইমাম ও মুক্তাদীগণ তাকবীর বলিবে ও চতুর্থ তাকবীর বলিয়া সকলেই রুকূতে যাইবে ও যথারীতি সিজ্‌দাহ এবং আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করিবে। যদি কেহ দ্বিতীয় রাকয়াতের সূরা কিরাতের পূর্বে তিন তাকবীর বলে তবে জায়েয হইবে। কিন্তু সূরা কিরাতের পর তিন তাকবীর বলা মুস্তাহাব।

(৮) তৎপর দুই খুৎবাহ পড়িবে ও দুই খুৎবাহর মধ্যখানে কিছুক্ষণ বসিবে। যে খুৎবায় ঈদ সম্বন্ধে উপদেশাবলী আছে, এরূপ খুৎবাহ পড়া মুস্তাহাব।

প্রশ্নঃ- ঈদুল ফেতের ও ঈদুল আজহার নামাযে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- উভয় ঈদের নামাযের তারতীব প্রায় একরূপ। কয়েকটি বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যথা–

(১) ঈদুল আজহার নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব। কেননা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িয়া কোরবানীর গোশত আহার করিয়াছেন। তবে নামাযের পূর্বে কিছু খাইলে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে মাকরূহ্ হইবে না। উক্ত কিতাবে কেহ কেহ বলিয়াছেন যাহার প্রতি কোরবানী ওয়াজিব নহে, তাহার পক্ষে কোরবানীর গোশত দ্বারা খাওয়ার জন্য দেরী করা মুস্তাহাব নহে। পরন্তু আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, নামাযের পরে কোরবানীর গোশত দ্বারা আহার করা মুস্তাহাব; কেননা ইহা আল্লাহ তায়ালার দাওয়াত। শামী ও দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- যে ব্যক্তি কোরবানী না করিবে, তাহার জন্যও কোরবানীর গোশত দ্বারা খাওয়ার নিমিত্ত কিছু বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

(২) মারাকিল ফালাহ ও আরকানে আরবা কিতাবে আছে- ঈদুল আজহার তাকবীর

উচ্চৈঃস্বরে বলা মুস্তাহাব, এই কওলই ছহীহ।

(৩) আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়- ঈদুল আজহার নামাযের পর কোরবানী করিবে। মাজমাউল আনহুর ২য় খন্ডে ও বাহরুর রায়েক কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন যে, নামাযের পূর্বে কোরবানী করা জায়েয হইবে না। হেদায়া ৪র্থ খন্ডের হাশিয়াতে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হইতে লিখিয়াছেন যে, আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- যাহারা নামাযের পূর্বে কোরবানী করিবে উহা তাহাদের আহারের জন্য হইবে, অর্থাৎ কোরবানী হইবে না। আর যাহারা নামাযের পরে কোরবানী করে, তাহাদের সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ও কোরবানী আদায় হইবে। আরও লিখিত আছে- আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- নামাযের পূর্বে কেহ কোরবানী করিয়া থাকিলে তাহার উচিত যে, নামাযের পর পুনঃ কোরবানী করে। হেদায়া কিতাবে আছে- ময়দানে ঈদের নামায পড়ার পূর্বে স্থানীয় মসজিদে ঈদের নামায পড়িলে জায়েয হইবে।

(৪) বাহরুর রায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়- বিনা ওজরে জামায়াতে ঈদের নামায না পড়িয়া ইমামের নামায শেষ হওয়ার পর কোরবানী করিলে জায়েয হইবে। কিন্তু আলমগীরী ও শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, বিনা ওজরে ঈদের জামায়াত তরক করিলে মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হইবে।

ঈদের নামাযের আনুষঙ্গিক মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- ঈদের নামায সম্বন্ধে কতক মাসয়ালা জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- এ সম্পর্কে নিম্নে কতক মাসয়ালা বর্ণনা করা হইল।

১। আলমগীরী ও শরম্বালালিয়া কিতাবে আছে- মসজিদের মিম্বর ঈদের ময়দানে নিবে না। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- মসজিদের মিম্বর ঈদের ময়দানে নেওয়া মাকরূহ তানযীহ। আলমগীরী কিতাবে আছে- ঈদের ময়দানের মিম্বর বানান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জায়েয আছে। গায়াতুল আওতার, শামী, গিয়াছিয়া ও শরম্বালালিয়া প্রভৃতি কিতাবে আছে- বর্তমান যামানায় ঈদের ময়দানে মিম্বর নির্মাণ করিয়া লওয়া উত্তম।

২। ঈদের নামাযের পর খুৎবাহ পড়া সুন্নাত। খুৎবাহ না পড়িলেও নামায জায়েয হইবে। আলমগীরী ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- খুৎবাহ মাত্রই না পড়িলে সুন্নাত তরক হইবে। আলমগীরী কিতাবে আছে- নামাযের পূর্বে খুৎবাহ পড়িলেও নামায জায়েয হইবে কিন্তু মাকরূহ হইবে। নামাযের পূর্বে খুৎবাহ পড়িয়া থাকিলে পুনঃ পড়িতে হইবে না। খানিয়া কিতাবে আছে- দুই ঈদের নামাযে যে কোন সূরা পড়া জায়েয হইবে।

৩। ঈদের নামাযের পর ঈদগাহ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া চারি রাকয়াত নফল পড়া মুস্তাহাব। (আলমগীরী) ঐ চারি রাকয়াত নামাযের ১ম রাকয়াতে সাব্বিহিসমা, ২য়

রাকয়াতে ওয়াশশামছি, ৩য় রাকয়াতে ওয়াল্লাইলি ও ৪র্থ রাকয়াতে ওয়াদ্দোহা পাঠ করিলে যাবতীয় গাছের পাতা পরিমাণ নেকী আমলনামায় লেখা হইবে। (শরম্বলালিয়া) যদি কাহারও উক্ত চারটি সূরা মুখস্ত না থাকে তাহলে সূরা ইখলাছ পড়িবে।

৪। ঈদের নামাযে আযান ও একামত বলিতে হয় না। (জুমআর বিপরীত)। (খানিয়া)

৫। ইমাম খুৎবাহ পড়িতে উঠিয়া প্রথম খুৎবাহর পূর্বে মিম্বরে বসিবে না। (আলমগীরী)

৬। ইমাম খুৎবাহ পাঠের সময় যখন তাকবীর ও দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, মুক্তাদীগণও তখন চুপে চুপে তাকবীর ও দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। দোররুল মোখতার কিতাবে আছে- ছাহেবাইনের মতে মুসাফির ইমাম ও মুক্তাদী মুকীম হইলে উভয়েরই তাকবীর বলিতে হইবে। ইমাম আবূ হানীফা রাহেমাহুল্লাহর মতে শুধু মুক্তাদী বলিলেই হইবে। এমতস্থলে ছাহেবাইনের মত আমল করাই যুক্তিযুক্ত।

৭। মুক্তাদী যদি ইমামকে ঈদের নামাযের রুকূতে পায় তবে সম্ভব হইলে যথারীতি তাকবীর বলিয়া ইমামের সহিত রুকূ করিবে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে তাকবীর বলিয়া রুকূতে যাইবে ও রুকূর মধ্যে তিন তাকবীর চুপে চুপে বলিবে কিন্তু হাত উঠাইবে না। যদি রুকূতে দুই তাকবীর বলার মধ্যেই ইমাম মাথা উঠায় তবে মুক্তাদীও ইমামের সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঠাইবে। বাকী তাকবীর আর বলিতে হইবে না। কেননা ইমামের তাবেদারীর জন্য তাকবীর পূর্ণ করিবার সময় পায় নাই। (আলমগীরী)

৮। বাহরুর রায়েক কিতাবে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়- মুক্তাদী ইমামকে কিয়ামে পাইল বটে, কিন্তু মুক্তাদী অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকূ করিল, এমতাবস্থায় মুক্তাদীও ইমামের সহিত রুকূ করিবে। মুক্তাদীর বাকী তিন তাকবীর বলিতে হইবে না। জাহের রেওয়ায়েত মতে জানা যায়, ইমাম ভুলে তিন তাকবীর না বলিয়া রুকূতে গিয়া স্মরণ হইলে তখন আর মাথা উঠাইয়া তাকবীর বলিতে হইবে না। আলমগীরী কিতাবে আছে- ঐ অবস্থায় রুকূর মধ্যে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলিবে কিন্তু হাত নাড়িবে না।

৯। মুক্তাদী যদি ইমামকে কওমার মধ্যে পায় তবে শুধু তাকবীর বলিয়া ইমামের সঙ্গে শামিল হইবে। অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলিতে হইবে না। ইমামের সহিত বাকী রাকয়াত আদায় করিয়া ১ম রাকয়াত একা আদায় করিবার পূর্বে তিন তাকবীর বলিয়া যথারীতি নামায আদায় করিবে। (আলমগীরী)

১০। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- ইমামের সহিত নামায পড়িবার সময় যদি ইমামকে তাকবীরে হাত উঠাইতে না দেখে তবুও মুক্তাদী হাত উঠাইয়া তাকবীর বলিবে। ইমাম ভুলে তাকবীর না বলিলেও মুক্তাদীর তাকবীর বলা ওয়াজিব। গায়াতুল আওতার কিতাবে আছে- ইমামের তাকবীর বলিতে ভুল হইলে মুক্তাদীগণ স্মরণ করাইয়া দিবে।

১১। যাহার প্রতি জুমআ পড়া ফরজ, তাহার প্রতি ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব। জুমআর জন্য যে শর্ত খুৎবাহ ব্যতীত ঈদের জন্যও সেই শর্ত। ঈদের নামাযে খুৎবাহ শেষে পড়া

সুন্নাত। (হেদায়া) জুম্‌আর দিনে ঈদ হইলে, ঈদ ও জুম্‌আ উভয়ই পড়িতে হইবে। (কবীরী)

১২। যদি কেহ তাশাহ্হুদ পড়ার পর কিংবা এক সালামের পর সোহ-সিজ্‌দাহর আগে কিংবা সালাম ফিরানের পূর্বে ইমামের সহিত এক্তেদা করে তবে বাকী নামায যথারীতি আদায় করিবে, এই মতই ছহীহ। (আলমগীরী)

১৩। ঈদের নামাযের রুকূর তাকবীর বলা ওয়াজিব। নামায শুরু করিবার জন্য যেরূপ আল্লাহু আকবার বলা ওয়াজিব, ঈদের নামাযের রুকূর তাকবীর খাছ করিয়া তদ্রূপ ওয়াজিব। অন্য নামাযে যেমন আল্লাহু "আ'জামু" বলিলে নামায হইয়া যাইবে, ঈদের নামাযে তদ্রূপ আল্লাহু আ'জমু" বলিলে নামায হইয়া যাইবে। ঈদের নামাযে তদ্রূপ আল্লাহু আকবারের স্থলে অন্য শব্দ বলিলে ওয়াজিব তরক হইবে। কাজেই সোহ-সিজ্‌দাহ করিতে হইবে। (আলমগীরী)

১৪। ঈদের নামাযের পূর্বে ফজরের কাজা আদায় করিতে পারে। ফজরের নামায আদায় করিয়া ঈদের নামায পড়িলেও জায়েয হইবে। যদি কেহ অতীত কাজা ঈদের পূর্বে আদায় করে তবে তাহাও জায়েয আছে। কিন্তু ঈদের নামাযের পরে পড়াই উত্তম।

১৫। ইমাম ভুলে হাত না উঠাইয়া তাকবীর বলিলে মুক্তাদীগণ হাত উঠাইয়া কানে উলা দিয়া তাকবীর বলিবে। ইমামের তাবেদারীর খেলাফ হইলেও উহা ধর্তব্য নহে।

যে সকল কারণে দ্বিতীয় দিন ঈদুল ফিতরের নামায পড়া জায়েয

১। যদি আকাশে মেঘ থাকার দরুন চাঁদ দেখিতে না পায় ও পরদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া যাওয়ার পর সংবাদ পাওয়া যায় যে, গতকল্য চাঁদ দেখা গিয়াছে; এমতাবস্থায় পরদিন নামায পড়িবে।

২। যদি সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিবার পূর্বে সংবাদ পায় কিন্তু সূর্য ঢলিবার পূর্বে লোক একত্রিত হইবার সময় না থাকে, তবে পরদিন নামায পড়িবে।

৩। যদি ১ম তারিখে নামায পড়িয়া থাকে ও পরে জানিতে পারে যে, মেঘের দরুন না জানিয়া সূর্য ঢলিবার পর নামায পড়া হইয়াছে, তাহা হইলে পরদিন পুনঃ ঈদের নামায পড়িতে পারে। (আলমগীরী)

৪। যদি এমন বৃষ্টি হয় যে, মুছল্লীগণ ঈদগাহে যাইতে পারে না তাহা হইলে পরদিন ঈদের নামায পড়িবে। (শরহে বেকায়ার হাশিয়া)

৫। বিনা ওজরে ঈদুল ফিতরের নামায ঐ দিনের পরে পড়া জায়েয নাই। (আলমগীরী) ওজর বশতঃ পরদিন ঈদের নামায পড়া হইলে উহা কাজা বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ ঈদের নামায না পায় কিংবা নামাযে সন্দেহ হয়, তবে কি করিবে?

উত্তরঃ- এ সম্পর্কে নিম্নে কতক মাসয়ালা বর্ণনা করা যাইতেছে-

১। ঈদুল আজহার নামায পড়িয়া সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিবার পর ইমামের মনে হইল

যে, বিনা অজুতে নামায পড়া হইয়াছে। এই কথা জানার পূর্বে যে সকল মুছল্লী কোরবানী করিয়াছে, তাহাদের পুনঃ কোরবানী করিতে হইবে না। যাহারা ঐ কথা জানা সত্ত্বেও কোরবানী করিয়াছে, তাহাদের কোরবানী হয় নাই। তাহাদের উচিৎ যে, পরদিন ঈদগাহে গিয়া নামায দোহরাইয়া পড়ে। যদি ৩য় দিন ঈদের নামায পড়িয়া সূর্য ঢলিবার পর ইমাম মুক্তাদীগণকে এই কথা জানায় তবে ঐ নামায পড়িতে হইবে না। (আলমগীরী)

২। ইমামের সহিত ঈদের নামায পড়িয়া যদি জানিতে পারে যে, আমার নামায হয় নাই, তাহা হইলে একা কাজা আদায় না করিয়া অন্য ঈদগাহে গিয়া জামাআতে পড়িবে।

৩। ইমামের সহিত ঈদের জামায়াতে শামিল হইতে না পারিলে একা কাজা না পড়িয়া অন্য ঈদগাহে গিয়া জামায়াতে পড়িবে। যদি অন্য জামায়াতে শামিল না হইতে পারে, তাহা হইলে চারি রাকয়াত নফল পড়িবে। তাহাতে ঈদের ন্যায় তাকবীর বলিতে হইবে না। (শামী) মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- ঈদের নামায না পাইলে দুই বা চারি রাকয়াত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। তাহাতে ১ম রাকয়াতে সূরা গাশিয়াহ, ২য় রাকয়াতে সূরা ওয়াশশামছি, ৩য় রাকয়াতে ওয়াল্লায়লি ও ৪র্থ রাকয়াতে অদ্দোহা সূরা পড়িবে। এক রেওয়ায়েত মতে প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ইখলাছ পড়িবে। এরূপ নামাযীর আমলনামায় এক বৎসর যত উদ্ভিদ জন্মিবে তত নেকী লিখা যাইবে।

৪। যদি কেহ ইমামের সহিত ঈদের জামায়াতে শামিল হইয়া নিজ ত্রুটিতে নামায ফাসেদ করে,তাহার কাজা আদায় করিতে হইবে। (শামী)

৫। যে সকল ওজরে ঈদুল ফিতরের নামায ১ম দিন পড়িতে না পারিলে ২য় দিন পড়া জায়েয আছে, ঈদুল আজহার নামাযও সেই সকল ওজরে ২য় দিন পড়া জায়েয আছে। যদি ২য় দিনে পড়িতে না পারে তবে ৩য় দিনে পড়িলেও নামায আদায় হইবে। কিন্তু বিনা ওজরে ২য় বা ৩য় দিনে পড়িলে মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হইবে।

ঈদের নামাযের পূর্বে নফল পড়া জায়েয কি না?

প্রশ্নঃ- ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল পড়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ- দুই ঈদের পূর্বে ঘরে বা ঈদগাহে কোন নফল নামায পড়িবে না। (আরকানে আরবা) ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে কি ময়দানে কোন স্থানেই নফল পড়িবে না, এই মতই ছহীহ। (খানিয়া, তাহতাবী ও মারাকিল ফালাহ) তাহতাবী কিতাবে আছে- ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া মাকরূহ। যাহার প্রতি ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব নহে, তাহারও ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া মাকরূহ। এমনকি ঈদের নামাযের পূর্বে স্ত্রীলোকের ঘরেও কোন নফল নামায পড়িবে না।

প্রশ্নঃ- মাজমাউল আনহুর ও জাওহারাতুন নাইয়্যেরা কিতাবে আছে- ইমাম ঈদগাহে আসার পূর্বে যদি কেহ নফল নামায আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহার নামায আদায় হইবে। কিন্তু ঐ নামায পড়িতে পড়িতে যদি ঈদের নামাযের

কিছু অংশ ফওত হয় তাহা হইলে মাকরূহ হইবে। এমতাবস্থায় ঈদের পূর্বে এশ্-রাক ও চাশ্ত নামায পড়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ- শরহে ফতহুল কাদীর, আরকানে আরবা, শরম্বালালিয়া, বাহরুর রায়েক, মারাকিল ফালাহ, মাজমাউল আনহুর ও শামী প্রভৃতি কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে নকল করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নামায পড়েন নাই। ঈদের নামাযের পর ঘরে আসিয়া দুই রাকয়াত নফল পড়িয়াছেন। হেদায়া কিতাবে আছে- নফল নামাযের প্রতি আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অত্যন্ত মহব্বত থাকা সত্ত্বেও যখন ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল পড়েন নাই, তখন মাজমাউল আনহুর ও জাওহারাতুন নাইয়্যেরার মত আমল করা যায় না। অতএব, তাহ্ইয়াতুল অজু, এশরাক ও চাশত মাকরূহ না হওয়ার কারণ নাই। ফতহুল কাদীর কিতাবে আছে- ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল পড়া জায়েয আছে। কেননা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়াছেন।

তাকবীরে তাশ্রীকের মাসয়ালা

প্রশ্নঃ- ঈদুল আজহার সময় কিরূপ তাকবীর পড়িবে?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার ও শামী কিতাবে আছে- দুই ঈদে নিম্নরূপ তাকবীর পড়িবে যথা-

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ।

প্রশ্নঃ- এই তাকবীর কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে?

উত্তরঃ- এনায়া ও শামী কিতাবে আছে- হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম যখন ছুরি হস্তে লইয়া হযরত ইসমাইল আলাইহিচ্ছালামকে কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন হযরত জিব্রাইল আলাইহিচ্ছালাম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, যবেহ করিয়া ফেলেন নাকি! তিনি ব্যস্তভাবে একটি দুম্বা লইয়া আসিয়া আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলিলেন। তখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। হযরত ইসমাইল আলাইহিচ্ছালাম ঐ দুম্বা দেখামাত্র বলিয়া উঠিলেন- আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ।

প্রশ্নঃ- ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোন সময় ও কতদিন তাকবীর বলিতে হইবে?

উত্তরঃ- যিলহজ্জ চাঁদের ৯ই তারিখ ফজর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩ই তারিখ আছরের ওয়াক্ত পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের বাদ সকল স্থানে তাকবীরে তাশরীক বলিবে।

প্রশ্নঃ- তাকবীরে তাশ্রীক কতবার বলিতে হইবে?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- ছাহেবাইনের মতে একবার বলা ওয়াজিব, এর চেয়ে বেশী বলা উত্তম। শামী কিতাবে আছে- কেহ বলিয়াছেন, তিনবার বলিবে। (মুস্তাহাব)

প্রশ্নঃ- নূরুল ইজাহ্ ও কানযুল এবাদ কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে ১০ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত মোট ৮ ওয়াক্তের ফরজ নামাযের পর মুকীম ইমাম হইলে সকলের তাকবীর বলিতে হইবে। কিন্তু মুসাফির, একা নামাযী, গোলাম ও স্ত্রীলোকের তাকবীর বলিতে হইবে না। এখন আমরা কোন মত আমল করিব?

উত্তরঃ- নূরুল ইজাহ ও মারাকিল ফালাহ প্রভৃতি কিতাবে ছাহেবাইনের মত অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, ৯ই যিলহজ্জ ফজর হইতে ১৩ই জিলহজ্জ আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পর তাকবীর বলিতে হইবে। চাই একা পড়ুক কিংবা জামায়াতে, মুসাফির হউক, কি মুকীম, গ্রাম্য লোক হউক কি শহরবাসী, সকলের জন্য উক্ত ২৩ ওয়াক্তের ফরজের পর তাকবীর বলা ওয়াজিব। এমনকি, মাজমাউল আনহুর ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- স্ত্রীলোকও উক্ত দিনগুলোতে ফরজ নামাযের পর তাকবীর বলিবে। তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, স্ত্রীলোকেরা চুপে চুপে তাকবীর বলিবে যেন অন্য লোক না শুনে। কেননা , রদ্দুল মোহতার কিতাবে স্ত্রীলোকের স্বরও আওরাত বলিয়া লিখিয়াছেন। নূরুল ইজাহ, মারাকিল ফালাহ, বাহরুর রায়েক, মাজমাউর আনহুর, বদরুল মুন্তাকা আলমগীরী প্রভৃতি কিতাবে ছাহেবাইনের মতই সর্ববাদী সম্মত বলিয়া লিখিয়াছেন। এই কথার উপর ফতোয়া বলিয়া শহর ও গ্রাম সকল স্থানেই জামায়াতে হউক বা একা নামাযী হউক, স্ত্রীলোক হউক বা গোলাম হউক ফরজ নামায অন্তে তাকবীরে তাশরীক বলিবে। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে-

ঐ সকল লোকের তাকবীর ত্যাগ করার চাইতে বলাই উত্তম। তাহতাবী কিতাবে কুরআন শরীফের আয়াত অবলম্বনে লিখিয়াছেন- তাকবীর বলাই আল্লাহ তায়ালার ইশারা। কাজেই নির্দেশিত যেকের বেশী পরিমাণে হওয়াই সকলের মতে উত্তম। এমতস্থলে ইমাম ছাহেব ৮ ওয়াক্তে শুধু জামায়াতে নামায পড়ার পর তাকবীর বলিতে বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ছাহেবাইন ২৩ ওয়াক্তে একা হউক বা জামায়াতে, স্ত্রীলোক হউক বা গোলাম, মুকীম হউক বা মুসাফির, সকলকেই তাকবীর বলিতে বলিয়াছেন। অতএব, ছাহেবাইনের মত আমল করিলেই আল্লাহ তায়ালার নাম বেশী লওয়া হয়।

দ্রষ্টব্যঃ বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- হজ্জের তারিখে অন্য কোন স্থানে খানায়ে কা'বার তাজীমের জন্য ঐরূপ কোন ঘর বানাইয়া হাজীদের ন্যায় উহার চতুর্দিকে তাওয়াফ করা মাকরূহ তাহরীম হইবে। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- করখী রাহেমাহুল্লাহ রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, যদি ঐ দিনের বুযুর্গীর খেয়ালে ওয়াজ নছীহত শুনিবার জন্য একস্থানে জমা হয়, তাহা হইলে মাকরূহ হইবে না। কিন্তু আরাফাতের ময়দানে হাজীদের মত খালী মাথা না হওয়া চাই।

সুন্নাত নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টার মধ্যে কত রাকয়াত সুন্নাত নামায আছে?

উত্তরঃ- নূরুল ইজাহ ও আলমগীরী কিতাবে আছে- দিন রাত্রে মোট ১২ রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামায আছে- যথাঃ-

(১) ফজরের ফরজের পূর্বে ২ রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

(২) জোহরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

(৩) জোহরের ফরজের পরে ২ রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

(৪) মাগরিবের ফরজের বাদে ২ রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

(৫) এশার ফরজের বাদে ২ রাকয়াত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

এতদ্ব্যতীত জুম্‌আর নামাযের পূর্বে ৪ রাক্‌য়াত কাব্‌লাল জুম্‌আ ও পরে ৪ রাকয়াত বাদাল জুম্‌আ ও ২ রাকয়াত সুন্নাতুল ওয়াক্ত, মোট ১০ রাকয়াত সুন্নাত নামায আছে।

প্রশ্নঃ- উপরোক্ত সকল সুন্নাতের কি একই মর্তবা?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে যথাক্রমে নিম্নরূপ মর্তবা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা- সর্ব প্রথমে ফজরের ২ রাকয়াত সুন্নাত। তৎপর মাগরিবের ২ রাকয়াত, তারপরে জোহরের শেষের ২ রাকয়াত, তৎপর এশার ২ রাকয়াত, তারপরে জোহরের ফরজের পূর্বের ৪ রাকয়াত।

প্রশ্নঃ- ফজরের সুন্নাত ও মাগরিবের সুন্নাতের বুযর্গী বেশী হওয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে লিখিত আছে- ফজরের ২ রাকয়াত সুন্নাত ওয়াজিবের নিকটবর্তী বলিয়া ইহা সকল সুন্নাত হইতে বেশী মর্তবা রাখে। এমনকি মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে, বিনা ওজরে এই দুই রাকয়াত বসিয়া পড়া জায়েয নাই। উক্ত কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ হইতে ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাত আমার নিকট বেশী প্রিয়।

শামী, নূরুল ইজাহ্- আশবাহ-ওয়ান্নাজায়ের কিতাবে আছে- ফজরের ২ রাকয়াত সুন্নাত সূরা কাফিরুন ও সূরা এখলাস দ্বারা আদায় করা সুন্নাত। মাগরিবের সুন্নাত তৎপর উল্লেখ করার কারণ এই যে, মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে আছে- হযরত আনাছ (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যদি কেহ মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাতের মধ্যে কোন কথা না বলিয়া ১ম রাকয়াতে সূরা কাফিরূন ও ২য় রাকয়াতে সূরায়ে এখলাছ দ্বারা ২ রাকয়াত সুন্নাত নামায পড়ে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির (ছগীরা) গুনাহ এরূপভাবে মাফ হইয়া যাইবে যেমন সাপ খোলস পরিবর্তন করিয়া নূতন হয়।

প্রশ্নঃ- উক্ত সুন্নাত নামায সমূহ কোন কারণে তরক করা জায়েয কি না?

উত্তরঃ- ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত কোন কোন ওজরে তরক করা জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ- কিরূপ ওজরে জায়েয আছে?

উত্তরঃ- গায়াতুল আওতার, দুররুল হেকাম ও আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়-সাধারণের অতি আবশ্যকীয় মাসয়ালা জিজ্ঞাসার জন্য যদি আলেমের নিকট লোকের খুব ভীড় হয় তাহা হইলে তিনি ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত তরক করিয়া মাসয়ালার উত্তর দিবেন। শামী কিতাবে আছে- ঐরূপ মাসয়ালার উত্তর দিয়া সময় থাকিলে সুন্নাত পড়িবে। উহার মর্ম এই যে, সুন্নাতের পূর্বক্ষণে যদি মাসয়ালা জানিবার জন্য অনেক লোকের ভীড় হয় ও তাহাদের ঐ মাসয়ালা তখনই বলিয়া না দিলে ফরজ বা ওয়াজিব তরক হয়, তাহা হইলে এমতাবস্থায় সাধারণের মাসয়ালার উত্তর দেওয়ার জন্য সুন্নাত নামায তরক করা যাইতে পারে। কিন্তু বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া যেন কেহ সুন্নাত নামায তরক না করেন।

প্রশ্নঃ- উল্লিখিত ১২ রাকয়াত সুন্নাত আদায় করিলে কিরূপ ফজীলত পাওয়া যাইবে?

উত্তরঃ- ছহীহ মুসলিম ও নাসায়ী শরীফ হইতে মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিয়াছেন- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- যদি কেহ উল্লিখিত ১২ রাকয়াত সুন্নাত নামায আদায় করে, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতে একখানা পৃথক ঘর তৈয়ার করাইয়া দিবেন।

প্রশ্নঃ- যদি কাহারও উক্ত সুন্নাত সমূহ ফওত হইয়া যায়, তাহা হইলে কাজা আদায় করিতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- বাহরুর রায়েক ও আলমগীরী কিতাবদ্বয়ে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়- ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য সুন্নাতের কাজা আদায় করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ফজরের ফরজ সহ সুন্নাত ফওত হইয়া যায় তবে সূর্য উদয়ের পর পশ্চিমে ঢলিবার পূর্বে সুন্নাত সহ ফজরের কাজা আদায় করিবে। সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া গেলে শুধু ফরজের কাজা আদায় করিবে। সুন্নাতের কাজা আদায় করিতে হইবে না।

যদি কাহারও শুধু ফজরের সুন্নাত ফওত হয়, তবে তাহার কাজা আদায় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মাজমাউল আনহুর কিতাবে আছে- সূর্য উদয়ের পূর্বে কাজা আদায় করিবে না। ইহাতে কোন মতভেদ নাই। সূর্য উদয়ের পূর্বে আদায় করিলে মাকরূহ তাহরীম হইবে।

সূর্য উদয়ের পর কাজা আদায় সম্বন্ধে হেদায়া ও শরহে বেকায়া কিতাবে আছে- ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ রাহেমাহুল্লার মতে সূর্য উদয়ের পরেও ঐ সুন্নাতের কাজা আদায় করিবে না। ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লাহ বলিয়াছেন- আমার মতে ঐ সুন্নাতের কাজা আদায় করা উত্তম। মাজমাউল আনহুর, জাওহারাতুন নাইয়্যেরা,

এনায়া ও শামী কিতাবে উভয় মতের মীমাংসা স্থলে লিখিয়াছেন, শায়খানের মতে ঐ সুন্নাতের কাজা আদায় করিতে হইবে না; কিন্তু আদায় করিলে নফলের ছওয়াব পাইবে।

শরহে বেকায়ার হাশিয়াতে ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লার মতের সমর্থনে তিরমিজী শরীফের এক হাদীস উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ সুন্নাতের কাজা আদায় করিবে। মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখিয়াছেন- এরূপ মতভেদ স্থলে আদায় করিলে যখন শায়খানের মতে নফল ও ইমাম মুহাম্মদ রাহেমাহুল্লার মতে উত্তম হইবে তখন ঐ সুন্নাত কাজা আদায় করিলে নেকী পাইবে।

প্রশ্নঃ- ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত কাজা আদায় করিতে হইবে না। কিন্তু জোহরের ফরজের পূর্বে সুন্নাত ফওত হইলে পুনঃ কাজা আদায় করা হয় কেন?

উত্তরঃ- জোহরের ফরজের পূর্বে সুন্নাত আদায়ের সময় না পাইলে জামায়াতে শামিল হইলে ফরজের পর উহা আদায় করিবে। কেননা উহা কাজা নহে। জামায়াতের জন্য আগে না পড়িয়া পরে পড়া হয় মাত্র। উহাকে কাজা বলে না। ওজরে স্থান পরিবর্তন করতঃ ঐ ওয়াক্তেই পড়া হয়। যদিও কিতাবে কাজা বলিয়া উল্লেখ আছে, প্রকৃত পক্ষে উহা আদায়ের সময় পরিবর্তন করিয়া পড়া হয় বলিয়া উহাকে কাজা নামে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্নঃ- ফরজের পূর্বে জোহরের সুন্নাত আদায় না করিয়া জামায়াতে শামিল হইলে কোন সময় ঐ সুন্নাত পড়িবে?

উত্তর- মাজমাউল আনহুর ও শরহে বেকায়া কিতাবে ফরজ পড়ার পর ফওত ৪ রাকয়াত সুন্নাত আদায় করিয়া পরে ২ রাকয়াত সুন্নাত পড়া উত্তম লিখিয়াছেন। বদরুল মুন্তাকা ও আলমগীরী কিতাবে ঐ কওলের উপর ফতোয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে শরহে বেকায়ার হাশিয়াতে ফরজের পর ২ রাকয়াত সুন্নাত পড়িয়া শেষে ৪ রাকয়াত ফওত সুন্নাত আদায় করা আছাহ্হ অর্থাৎ বিশুদ্ধ লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- ইমামকে ফজরের ফরজ পড়িতে দেখিলে সুন্নাত না পড়িয়া ঐ জামায়াতে শামিল হইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- ইমামকে ফজরের নামায পড়িতে দেখিয়া যদি মনে করে যে, সুন্নাত আদায় করিয়া তাশাহ্হুদের মধ্যে জামায়াতে শামিল হইতে পারিবে, তাহা হইলে আড়ালে থাকিয়া সুন্নাত পড়িয়া জামায়াতে শামিল হইবে। যদি তাশাহ্হুদ না পাইবার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে সুন্নাত না পড়িয়া জামায়াতে শামিল হইবে।

কবীরী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে- জোহরের সুন্নাত পড়ার পূর্বে যদি জামায়াতে দাঁড়াইয়া যায় ও বিবেচনা করে যে, সুন্নাত পড়িয়া ফরজের প্রথম রাকয়াতে জামায়াতে শামিল হইতে পারিবে, তাহা হইলে আড়ালে থাকিয়া সুন্নাত পড়িয়া ফরজে দাখিল

হইবে। আর যদি না পাইবার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে সুন্নাত না পড়িয়া জামায়াতে শামিল হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি সুন্নাত আরম্ভ করার পর জামায়াত আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি ৪ রাকয়াত সুন্নাত আরম্ভ করার পর ইমাম জামায়াতে দাঁড়াইয়া যায় কিংবা খুৎবাহ আরম্ভ করে, তাহা হইলে ঐ সুন্নাত পূর্ণ করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ছহীহ রেওয়ায়েত মতে পূর্ণ আদায় করিয়া জামায়াতে শামিল হইবে। যদি ৪ রাকয়াত নফল আরম্ভ করে, তাহা হইলে মাত্র ২ রাকয়াত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জামায়াতে শামিল হইবে।

প্রশ্নঃ- যদি মসজিদে কোন আড়াল বা বারান্দা না থাকে, তাহা হইলে জামাআতের পিছনে সুন্নাত পড়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- সুন্নাত ও নফল নামায ঘরের মধ্যে পড়াই উত্তম। যদি ঘরে না পড়িয়া থাকে ও মসজিদে গিয়া দেখিতে পায় যে, ইমাম জামায়াতে দাঁড়াইয়াছেন, তাহা হইলে মসজিদের বাহিরে দেওয়াল বা খামের আড়ালে থাকিয়া অর্থাৎ সামনে ছোৎরা রাখিয়া সুন্নাত পড়িয়া ইমামের সহিত জামায়াতে দাখিল হইবে। যদি কেহ ফরজের কাতারের মধ্যে থাকিয়া কিংবা কাতারের পিছনে বিনা ছোৎরায় সুন্নাত পড়ে, তাহা হইলে শক্ত মাকরূহ তাহরীমের গুনাহ হইবে। জামায়াতের পূর্বে সুন্নাত শুরু করিয়া থাকিলে যেখানে ইচ্ছা পড়িতে পারিবে। ছোৎরার বিস্তারিত বয়ান তরীকুল ইসলাম ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

কবীরী কিতাবে আছে- ফরজের পূর্বে ও পরের সুন্নাত এবং নফল ঘরের মধ্যে পড়া উত্তম।

প্রশ্নঃ- ফরজের বাদে যে সুন্নাত আছে, উহা কোন খানে দাঁড়াইয়া আদায় করিবে?

উত্তরঃ- কবীরী কিতাবে আছে- ফরজের পর সুন্নাত বা নফল পড়িতে হইলে ইমাম নিজ স্থান পরিবর্তন করতঃ আগে পাছে বা ডানে বামে সরিয়া পড়িবেন। এমনকি ঘরে যাইয়াও পড়িতে পারেন। উক্ত কিতাবে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হইতে লিখিয়াছেন- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত ও নফল ঘরের মধ্যে পড়িতেন। ঐ কিতাবে আরও আছে- বেতের নামায ঘরে যাইয়া পড়া উত্তম।

আলমগীরী কিতাবে আছে- মুক্তাদীগণ যে স্থানে ফরজ পড়ে, সেখান হইতে ২/১ কদম সরিয়া গিয়া সুন্নাত নফল পড়া মুস্তাহাব। ইমাম ইমামতির স্থান হইতে অবশ্যই সরিয়া গিয়া সুন্নাত পড়িবে। কবীরী কিতাবে আছে- একা নামায পড়িলেও ফরজ পড়িয়া স্থান পরিবর্তন করতঃ সুন্নাত ও নফল পড়া ভাল।

দুররুল মোখতার ও তাহ্তাবী কিতাবে আছে- ঘরে যাইয়া সুন্নাত পড়িতে কোন

বাঁধা বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলে মসজিদের মধ্যে সুন্নাত পড়াই ভাল। কেহ কেহ বলিয়াছেন- জোহর, ও মাগরিবের সুন্নাত মসজিদে থাকিয়া পড়িবে। এই কথার উপর ফকীহ আবু জাফর (রঃ) ফতোয়া দিয়াছেন। শামী কিতাবে আছে - ঘরে সুন্নাত পড়িলে যদি দেলের একাগ্রতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে মসজিদের মধ্যে সুন্নাত পড়িবে। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- মসজিদের মধ্যে তারাবীহ নামায পড়া উত্তম।

প্রশ্নঃ- ফরজের পূর্বে যে সুন্নাত নামায আছে, সেই নামায পড়িয়া ফরজের পূর্বে বা ফরজের পর যে সুন্নাত আছে, ফরজ পড়ার পর সেই সুন্নাত আদায়ের পূর্বে কোন কথা বলা বা কাজ করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ- হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়- ফরজের পূর্বে সুন্নাত পড়িয়া বাজে কথা বলিলে সুন্নাতের ছওয়াব কম পাইবে। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- সুন্নাত পড়িয়া যদি খানা খায় কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহা হইলে পুনঃ সুন্নাত পড়িয়া লইবে। যদি এক লোকমা খানা খায় কিংবা এক ঢোক পানি পান করে, তাহা হইলে পুনঃ সুন্নাত পড়িতে হইবে না। এর চেয়ে বেশী পানাহার করিলে পুনঃ সুন্নাত পড়িতে হইবে। কিন্তু উপস্থিত খানার স্বাদ বিশেষ পরিবর্তন হইয়া যাইবার আশঙ্কায় খানা খাইলে পুনঃ সুন্নাত পড়িতে হইবে না। উক্ত কিতাবের মর্মে আরও জানা যায়- যে কাজে নামায ফাসেদ হয়, সুন্নাত পড়িয়া বিনা ওজরে সেইরূপ কাজ করিলে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে সুন্নাতের ছওয়াব কমিয়া যাইবে। ফরজের পরের সুন্নাত আদায়ের পূর্বে নামায ফাসেদ হয় এমন কোন কাজ করিলেও সুন্নাতের ছওয়াব কমিয়া যাইবে।

আলমগীরী কিতাবে আছে- ফরজের পরের সুন্নাত পড়ার পূর্বে বিনা ওজরে বাজে কথা বলিলে ঐ সুন্নাতের অতি কম ছওয়াব পাইবে।

শামী কিতাবে আছে- ফরজের পরের সুন্নাতের পূর্বে 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম' এই দোয়ার চেয়ে বেশী লম্বা দোয়া দরুদ পড়ার জন্য দেরী করিলে সুন্নাতের ছওয়াব কম পাইবে।

প্রশ্নঃ- ফজরের সুন্নাত কোন সময় পড়িতে হইবে?

উত্তরঃ- ছোবহে ছাদেক আরম্ভ হইলে ফজরের সুন্নাত পড়িবে। যদি ছোবহে ছাদেকের পূর্বে কিংবা ছোবহে ছাদেক হইল কি না এমত সন্দেহ করিয়া সুন্নাত পড়ে, তাহা হইলে সুন্নাত বাতিল হইবে। আর যদি সুন্নাত পড়িতে পড়িতে ছোবহে ছাদেক হইয়া যায়, তাহা হইলে সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে। তরীকুল ইসলাম ৪র্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বয়ান লিখিত হইয়াছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- তাহাজ্জুদ নামায পড়া কি?

উত্তরঃ- মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবে আছে- তাহাজ্জুদ নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করিয়া কোন সময় উহা তরক করেন নাই। যদি কোন কারণে ফওত হইয়া যাইত, তাহা হইলে দিনে ১২ রাকয়াত কাজা আদায় করিতেন। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছেন- কওলী দলীলে তাহাজ্জুদ নামায মুস্তাহাব বলিয়া বুঝা যায় কিন্তু আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা পড়িয়াছেন বলিয়া হুলিয়া কিতাবে সুন্নাত বলিয়া ফতোয়া দিয়াছেন। ঐ কওল অবলম্বনে গায়াতুল আওতার ও শামী কিতাবে তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- তাহাজ্জুদ নামায পড়িলে কিরূপ নেকী পাওয়া যাইবে?

উত্তরঃ- হাদীস শরীফ হইতে শামী কিতাবে লিখিয়াছেন- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- রাত্রে ঘুম হইতে উঠিয়া ২ রাকয়াত নামায পড়িলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে যাকেরীনের মধ্যে লিখিবেন। আরও লিখিত আছে, আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-আল্লাহ তায়ালা তিন ভাগের দুই ভাগ রাত্র অতীত হওয়ার পর প্রথম আসমানে আসিয়া বলিতে থাকেন, ওহে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার নিকট এই সময় যে দোয়া করিবে, তাহা আমি কবুল করিব। যে কোন জিনিস প্রার্থনা করিবে, তাহা আমি দান করিব। গুনাহ মাফ চাহিলে তাহা মাফ করিব। শামী কিতাবে উক্ত কথার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রথম আসমানে আসার অর্থ আল্লাহ তায়ালার আদেশ প্রথম আসমানে আসে। মিশকাত শরীফের শরাহ মিরকাত ২য় খন্ডে লিখিয়াছেন- ঐ হাদীসের মতলব এই যে, আল্লাহ তায়ালার আদেশবাণী লইয়া একজন ফেরেস্তা প্রথম আসমানে আসিয়া আল্লাহর বান্দাগণকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত আদেশবাণী প্রচার করিয়া থাকেন।

প্রশ্নঃ- আল্লাহ তায়ালা যে প্রথম আসমানে আসিয়া থাকেন, এই কথার খোলাছা মতলব বুঝিতে পারিলাম না।

উত্তরঃ- ঐরূপ হাদীস ও আয়াত সম্বন্ধে আশ্‌আতুল লোমআত ১ম খন্ডে মিশ্‌কাত শরীফের শরাহ মিরকাতে লিখিত আছে- উহা মোতাশাবেহাতের অন্তর্গত। অর্থাৎ উহার ভেদ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই জানে না। এইরূপ "আররাহমানু আলাল আরশিস্তাওয়া অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর অবস্থিত ও নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারীদ" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা শাহরগের চেয়েও নিকটবর্তী এই সকল কথার মর্ম আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই জানে না। কিন্তু ইহার উপর ঈমান আনিতে হইবে।

১। আশ্আতুল লোমআতে হাদীস অবলম্বনে লিখিয়াছেন– শয়তান নিদ্রিত অবস্থায় লোকের মাথায় যাদুর তিনটি গিরা স্থাপন করে। তাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তি মনে করে যে, এখনও বহু রাত্রি আছে। যখন কোন লোক নিদ্রা হইতে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার নাম লয়, তখন একটি গিরা খুলিয়া যায়। যখন অজু করে তখন আর একটি গিরা খুলিয়া যায়। যখন কোন ব্যক্তি শয়তানের যাদুতে নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন শয়তান তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে ও তাহার দেল অন্ধকারময় থাকে। যে ব্যক্তি শয়তানের যাদু ছিন্ন করতঃ অজু করিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে তখন আর একটি গিরা খুলিয়া যায় ও তাহার দেল ছাফ হয় এবং আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

২। যে ব্যক্তি রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতে উঠে এবং পরিবারবর্গকে উঠায়' তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন। যদি পরিবারবর্গ তাহাজ্জুদ পড়িতে না উঠে তাহা হইলে মুখে পানির ছিটা দিয়া তাহাকে উঠাইবে। স্ত্রী প্রথমে উঠিলে স্বামীকেও উঠাইবে। যদি না উঠে, তাহা হইলে ঐরূপ পানি ছিটাইয়া উঠাইবে। উক্ত কিতাবে আরও আছে– স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে এবং বন্ধু বান্ধব সহযোগী একজন অপরজনকে বন্দেগীর কাজে সাহায্য করিবে।

৩। উক্ত কিতাবে আছে– হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- শেষ রাত্রে কিংবা ওয়াক্তিয়া নামাযের পর দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া কবুল করেন। আরও বলিয়াছেন, (১) যাহারা লোকের সহিত নম্রভাবে কথা বলেন, (২) যাহারা নেক লোকের সঙ্গে সদভাব করেন, (৩) যাহারা ক্ষুধার্তকে পানাহার করান,(৪) যাহারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, (৫) যাহারা শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়েন, তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের মধ্যে এমন স্বচ্ছ ও মনোরম গৃহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার মধ্য দিয়া ভিতর ও বাহির দেখা যায়।

৪। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন- হযরত দাউদ (আঃ) শেষ রাত্রে পরিবারবর্গকে বলিতেন, তোমরা উঠ ও নামায পড়। কেননা ইহাই দোয়া কবুলের সময়। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- যাহারা যাদু শিক্ষা করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়া কবুল করিবেন না।

৫। মিশকাত শরীফে আছে- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আশরাফ- (১) যাহারা কুরআনের হাফেজ, (২) যাহারা রাত্রে জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে। মিশকাত শরীফে আছে- যে সকল আলিম পরহেজগার ও যাকের এবং বে-রিয়া ইবাদত করেন ও দ্বীনি এলেম শিক্ষা দান করেন তাহারাও আশরাফ।

প্রশ্নঃ- শেষ রাত্রে ঘুম হইতে উঠিবার কোন তদবীর আছে কি না?

উত্তরঃ- এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাবে আছে, মানুষের পক্ষে শেষ রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠা কষ্টকর বটে, কিন্তু যাহাকে আল্লাহ তায়ালা নিম্নলিখিত জাহেরী ও বাতেনী ইলমের

শক্তি দান করিয়াছেন তাহার পক্ষে সহজ। নিদ্রা হইতে উঠিবার চারটি প্রকাশ্য তদবীর আছে- (১) কম আহার করিবে। (২) দিবসে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না। (৩) রাত্রে উঠিবার নিয়তে দিবাভাগে কিছু নিদ্রা যাইবে (সুন্নাত) (৪) দিনে কোন গুনার কাজ করিবে না; করিলে দেল শক্ত হইয়া যাইবে ও গুনাহর দরুন আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হইবে না।

শেষ রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠিবার চারটি বাতেনী তদবীর আছে, যথা- (১) ঈর্ষা, বিদয়াত ও দুনিয়ার চিন্তা হইতে মনকে পাক রাখিতে হইবে। কেননা ঐ সকল কাজ মানুষকে আল্লাহর চিন্তা হইতে গাফেল রাখে। যদিও নিদ্রা হইতে জাগে কিন্তু ঐ সকল লাভের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। (২) আল্লাহ তায়ালার ভয় মনে জাগরুক রাখিবে এবং মৃত্যুকে অতি নিকটবর্তী মনে করিবে। আখেরাতের ভয় ও দোযখের চিন্তা মনে থাকিলে ঘুম কম হইবে। (৩) কুরআন শরীফে ও হাদীস শরীফে রাত্রী জাগরণের ফজীলত সম্বন্ধে যে সকল আয়াত আছে, তৎপ্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবে। (৪) বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার মহব্বত দেলে রাখিবে, নামাযে যত কালাম বলা হয়, উহা যেন আল্লাহ তায়ালার সহিত কথোপকথন করা হয়, এবং তাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়, আল্লাহ তায়ালা আমার অবস্থা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন, এ সকল বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(৫) ১৬ পারায় সূরা কাহাফের শেষ আয়াত অর্থাৎ ইন্নাল্লাযীনা আমানু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া শেষ রাত্রে উঠিবার নিয়তে শুইয়া থাকিবে। আল্লাহর ফজলে নির্দিষ্ট সময়ে জাগরিত হইবে।

প্রশ্নঃ- তাহাজ্জুদ নামায কত রাকয়াত পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- শামী, আলমগীরী, দুররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাবে উর্দ্ধ সংখ্যা ৮ রাকয়াত, মধ্যম ৪ রাকয়াত ও নিম্ন সংখ্যা ২ রাকয়াত উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- তাহাজ্জুদ নামায কি নিয়মে পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবে আছে- দুই রাকয়াত করিয়া পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে যে কোন আয়াত বা সূরা পড়িবে। অথবা সূরা ইখলাছ পড়িবে। কবীরী কিতাবের মর্মানুযায়ী প্রত্যেক রাকয়াতে সমান কিরাত পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে ৩/৫/৭ বার সূরা ইখলাছ পড়িবে। কিন্তু সমান বেজোড় হওয়া চাই। ইহাই সাধারণের জন্য উত্তম।

প্রশ্নঃ- যদি কেহ শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতে না পারে, তাহা হইলে কি করিবে?

উত্তরঃ- মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবে আছে- কোন কারণে তাহাজ্জুদ ফওত হইলে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবসে উহার কাজা আদায় করিতেন। অতএব , তাহাই আমল করিতে হইবে। এহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাবে আছে- যদি কেহ ৪ রাকয়াত বা ২ রাকয়াত পড়ে কিংবা বিশেষ কোন আশঙ্কায় অজু করিতে না পারে,তাহা হইলে কিবলাদিক হইয়া কিছু সময় যেকের ও দোয়া দরূদ পাঠ করিলেও আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তাহাজ্জুদ পাঠকদের মধ্যে গণ্য করিয়া লইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ– প্রকাশ থাকে যে, আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, তাহাজ্জুদ এশরাক, চাশত, আওয়াবীন ইত্যাদি নফল নামায ব্যতীত অন্যান্য নফল পড়ার চেয়ে উমরী কাজার নিয়ত করতঃ পিছনের ফরজ ওয়াজিব নামাযের কাজা পড়া ভাল। কাজা নামাযের মাসয়ালা তরীকুল ইসলাম ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

গায়াতুল আওতার কিতাবে মুফতী আবু সাইদ হইতে নকল করিয়াছেন- উম্মি লোকে কিরাত অশুদ্ধ পড়ে। কাজেই উম্মি লোকের পিছনে নামায পড়িয়া থাকিলে ঐ নামায কাজা আদায় করিবে।

এশরাক নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- এশরাক নামায কোন সময় পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- সূর্য উদয়ের কিছুক্ষণ পরেই এশরাক নামায পড়ার সময়। শামী কিতাবে আছে- সূর্য ১ নেজা বা ২ নেজা উর্দ্ধে উঠিলে পড়িবে। আরও লিখিত আছে সূর্যের দিকে নজর করিলে যদি গরম বোধ হয়, সেই সময় পড়িতে পারে। এক নেজার পরিমাণ সম্বন্ধে হাশিয়ায়ে তাহতাবীর ঈদের বয়ান হইতে শামী কিতাবে ১২ বিঘত অর্থাৎ ৬ হাত লিখিয়াছেন।

প্রশ্নঃ- এশরাক নামায পড়িলে কিরূপ ছওয়াব পাওয়া যাইবে?

উত্তরঃ- মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবে আছে- ফজরের নামাযের পর কিছুক্ষণ দোয়া দরূদ যেকের ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকিয়া সূর্যোদয়ের পর ২ রাকয়াত এশরাক পড়িলে তাহার আমল নামায় এক হজ্জ ও ওমরার পূর্ণ ছওয়াব লেখা যাইবে। আরও লিখিয়াছেন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, ৪ রাকয়াত এশরাক পড়িলে সমস্ত দিন আমি তাহার মদদগার থাকিব।

চাশ্‌ত নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- চাশ্‌ত নামায কোন সময় কত রাকয়াত পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- ছহীহ রেওয়ায়েত মতে জানা যায়, যখন সূর্য এক প্রহরের উপরে উঠিবে, তখন চাশ্‌ত নামায পড়িবে। মুনিয়া কিতাবে আছে নিম্নে ২ রাকয়াত, মধ্যম ৮ রাকয়াত ও উর্দ্ধে ১২ রাকয়াত পড়িতে পারে।

মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- ২০ রাকয়াত চাশত নামায পড়িলে তাহাকে আলস্যহীন ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করা যাইবে। ৪ রাকয়াত পড়িলে আবেদীনের মধ্যে গণ্য হইবে। যে ৬ রাকয়াত পড়িবে, সে যেন সমস্ত দিন ভরিয়া ইবাদত করিল। ৮ রাকয়াত পড়িলে আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনকারীর মধ্যে গণ্য হইবে। ১২ রাকয়াত পড়িলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে একখানা পৃথক ঘর বা খাছ কামরা তৈয়ার করাইয়া দিবেন। মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবের হাশিয়াতে আছে তাহার জন্য সোনার ঘর তৈয়ার করা হইবে।

আওয়াবীন নামাযের বিবরণ

প্রশ্নঃ- আওয়াবীন নামায কোন সময় ও কত রাকয়াত পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- নূরুল ইজাহ কিতাবে আছে- মাগরিবের বাদে ৬ রাকয়াত নফল পড়িতে হয়, উহাই আওয়াবীন নামায। জামেউর রমুজ কিতাবে আছে- যদি তিন সালামে ঐ ৬ রাকয়াত নামায পড়ে এবং তাহার মধ্যে দুনিয়া দারীর কোন বাজে কথা না বলে, তবে তাহার ১২ বৎসর নফল ইবাদতের ছওয়াব হইবে। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- মাগরিবের পর ২০ রাকয়াত নফল পড়িলে তাহার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে একখানা খাছ কামরা বা পৃথক ঘর তৈয়ার করা হইবে।

দুখুলুল মসজিদ বা তাহ্ইয়াতুল মসজিদ নামায পড়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুখুলুল মসজিদ নামায পড়া কি?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- তাহ্ইয়াতুল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ নামায পড়া নফল। মসজিদে দাখিল হইয়া বসিবার পূর্বেই উহা পড়িতে হয়। উক্ত নামায ২ রাকয়াত ও ৪ রাকয়াত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি কেহ নামায ব্যতীত অন্য কাজ যেমন যেকের করা কি দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও ২ রাকয়াত নফল পড়িয়া লওয়া ভাল। যদি কেহ মসজিদে দাখিল হইয়াই সুন্নাত বা ফরজ নামায পড়ে, তবে তাহাতেই মসজিদের হক আদায় হইয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ- কতক লোককে দেখা যায়, যাহারা মসজিদে প্রবেশ করিয়া একটু বসিয়া পুনঃ দাঁড়াইয়া তাহ্ইয়াতুল মসজিদ নামায পড়ে, ইহা কিরূপ?

উত্তরঃ- শামী কিতাবে আছে- ঐরূপ প্রথমে বসিয়া পরে দাঁড়াইয়া তাহ্ইয়াতুল মসজিদ পড়া সুন্নাতের খেলাফ, কাজেই মসজিদে প্রবেশ করিয়াই উহা আদায় করিবে। কিন্তু ছোবহে ছাদেক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ও আছরের পর মসজিদে প্রবেশ করিলে তাসবীহ কিংবা দরূদ শরীফ পড়িবে অথবা আল্লাহর নামের যেকের করিবে। তাহাতেও মসজিদে দাখিল হওয়ার হক আদায় হইবে। পুনঃ পুনঃ এক মসজিদে প্রবেশ করিলে একবার দুখুলুল মসজিদ পড়িলেই চলিবে। প্রথমে বা শেষে যখন ইচ্ছা পড়িতে পারে। আরও লিখিত আছে- দিবা রাত্রির মধ্যে যতবারই মসজিদে প্রবেশ করুক, একবার দুখুলুল মসজিদ নামায পড়িলে পুনঃবার পড়িতে হইবে না। কিন্তু পড়িলে ছওয়াব পাইবে। যদি মসজিদে প্রবেশ করিয়া বসিয়া যায় ও পরে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করে, তাহাতেও হক আদায় হইবে কিন্তু সুন্নাতের খেলাফ হইবে। কেননা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকয়াত নামায পড়িয়া পরে বসিয়াছেন।

শামী কিতাবে আছে- তাওয়াফ করিলেই বায়তুল্লাহ শরীফে তাহ্ইয়াতুল মসজিদ

নামায পড়ার হক আদায় হইবে।

প্রশ্নঃ- মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় ও মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় কোন দোয়া পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় বলিবে- "আল্লাহুম্মাফতাহলী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিকা।" অর্থাৎ আয় আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দাও।

মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় বলিবে- "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা মিন ফাদ্বলিকা" অর্থাৎ হে দয়াময় আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।

দ্রষ্টব্যঃ- তাহ্‌ইয়াতুল অজু সম্বন্ধে তরীকুল ইসলাম প্রথম ভাগ ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে।

এস্তেখারা নামাযের নিয়ম

প্রশ্নঃ- এস্তেখারা নামায কি?

উত্তরঃ- মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- এস্তেখারার নামায সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ। উক্ত কিতাবে এক হাদীস অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে যেরূপ যত্নের সহিত কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ আমাদের যাবতীয় জটিল কার্যে এস্তেখারা নামাযের রীতিনীতি শিক্ষা দিতেন।

প্রশ্নঃ- এস্তেখারা নামায কিরূপভাবে পড়িতে হয়?

উত্তরঃ- উক্ত কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিত আছে- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এস্তেখারার নিয়তে দুই রাকয়াত নামায পড়িয়া নিম্ন লিখিত দোয়া পড়িবে। যথা-

এস্তেখারার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَااَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ـ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَشَرٌّلِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ ـ

তন্মধ্যে হাযাল আমরা বলিবার সময় নিজের মকছুদের প্রতি খেয়াল করিবে। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- যাবতীয় কাজের জন্য এস্তেখারা করা উত্তম। যথা- হজ্জ ও জিহাদ, কিন্তু ঐরূপ নেক করিব কি না, এরূপ নিয়তে এস্তেখারা করিবে না। কোন সময় ঐ কাজ করিলে ভাল হইবে। শুধু এই নিয়তে এস্তেখারা করিবে।

এস্তেখারার অন্য নিয়ম

হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) কওলুল জামীল কিতাবে লিখিয়াছেন- কোন কাজের ভাল মন্দ অনুভব করিবার জন্য ভাল মত অজু করতঃ পাক কাপড় পরিধান করিয়া ডান কাতে শয়ন করিবে এবং সূরা ওয়াশশামছি ৭ বার, ওয়াল্লাইলি সূরা ৭ বার, ও সূরা ইখলাছ ৭ বার পড়িবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, সূরা ইখলাছের পরিবর্তে সূরা ওয়াত্তীনে ৭ বার পড়িবে। তৎপর বলিবে, হে আল্লাহ! আমাকে খাবের মধ্যে ঐ জিনিস দেখাইয়া দাও, যাহাতে আমার উদ্দেশ্য সহজে বুঝিতে পারি।

এইরূপ ১ দিন, ২ দিন, ৩ দিন করিবে। যদি কিছু বুঝিতে না পারে, তবে ৭ দিন পর্যন্ত করিবে ইনশাআল্লাহ ইহার মধ্যেই ভালমন্দ ভেদ বুঝিতে পারিবে। মোহাদ্দেছ ছাহেব বলিয়াছেন- আমার সঙ্গীয় লোকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

দশম অধ্যায়

(জানাযাহ নামাযের মাসয়ালা)

পীড়ার প্রতিকার

প্রশ্নঃ- পীড়া হইলে কিরূপে প্রতিকার করিতে হয়?

উত্তরঃ- পীড়া হইলে হাদীস মতে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবে। উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে পীড়া আরোগ্য হওয়ার আশা করা যায়। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক দুঃখের প্রতিকারের একটি উপায় আছে, যাহাতে দুঃখ দূর হইয়া যায় ও প্রত্যেক পীড়া দূরীকরণের প্রতিকার অর্থাৎ ঔষধ আছে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দ্রব্যে এক একটি গুণ দান করিয়াছেন। কিন্তু রোগীর রোগ মুক্তির সময় না আসা পর্যন্ত এবং যদি রোগমুক্তি না হইবার রোগ হয়, তাহাতে ঔষধ ব্যবহার করিলে ঐ ঔষধের গুণ বা ক্রিয়া আল্লাহ তায়ালা বন্ধ করিয়া দেন। ঔষধ ব্যবহার করিতে এই নিয়ত করিবে যে, রোগ মুক্তিকারী আল্লাহ তায়ালা। ঔষধ অছিলা মাত্র। নেসাবুল এহ্‌তেসাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন- শরাব কিংবা হারাম দ্রব্য দ্বারা রোগ আরোগ্য লাভের নিশ্চয়তা না থাকিলে উহা দ্বারা চিকিৎসা করা সকলের মতে না-জায়েয। হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিলে রোগ মুক্তির নিশ্চয়তা থাকিলেও ঐ রোগ চিকিৎসার জন্য অন্য হালাল দ্রব্য থাকা সত্ত্বে হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নাই। যেহেতু অন্য হালাল দ্রব্য পাওয়া যায়। হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিলে এবং রোগ মুক্তির নিশ্চয়তা থাকিলে, যদি ঐ হারাম দ্রব্য ব্যতীত হালাল দ্রব্য না মিলে, তবে হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন, পিপাসায় জীবন যাইবার স্থলে পানির অভাবে যখন জীবন বাঁচান পরিমাণ শরাব খাওয়া জায়েয আছে, এমতস্থলে প্রাণ বাঁচানোর নিমিত্ত হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয হইবে। অন্য পক্ষ প্রকাশ করেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হারাম দ্রব্যের মধ্যে রোগ মুক্তির কোন ক্রিয়া নাই। অতএব হারাম দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নাই। রাসূলের বিধান মতে জানা যায়, যদি কোন দ্রব্য ব্যবহার করা সম্বন্ধে হালাল ও হারাম বলিয়া মতভেদ ঘটে, তবে ঐ দ্রব্য হারাম বলিয়া ত্যাগ করিবে।

দুররুল মোখতার ও বজলুল মজহুদ কিতাবে আছে- জরুরতের সময় হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করা ছহীহ রেওয়ায়েত মতে বিধান আছে। পক্ষান্তরে দুররুল হেকাম ও শামী কিতাবে আছে, যাহার মধ্যে ফাসেকী নাই, এমত বিজ্ঞ মুসলমান চিকিৎসক যদি বলেন যে, হারাম দ্রব্য ব্যতীত চিকিৎসা হইতে পারে না, তবে জায়েয আছে।

মোজাহেরে হক কিতাবে আছে- কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কতক ফেকাহবিজ্ঞদের মত এই যে, যদি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ একমত হয় যে, এই পীড়ার জন্য হারাম দ্রব্য ব্যতীত আর কোন চিকিৎসা নাই, তবে এমতাবস্থায় জায়েয আছে বটে কিন্তু ঐরূপ বিজ্ঞ চিকিৎসকদের একত্র হইয়া একমত হওয়া কষ্টকর।

অতএব বর্তমান বিজ্ঞ মুসলমান চিকিৎসক যাহাদের মধ্যে ফাসেকী নাই (ডাক্তার, কবিরাজ, হাকীম) তাহাদের একত্রে হারাম দ্রব্যের উপর একমত হওয়া কঠিন। কাজেই হারাম দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করার ব্যবস্থাও অতি কঠিন।

প্রশ্নঃ- ঔষধ ব্যতীত রোগ মুক্তির অন্য কোনরূপ চিকিৎসার উপায় আছে কি না?

উত্তরঃ- যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- পীড়িত অবস্থায় রোগী হাজারবার কুলইয়া আইউহাল কাফিরূন সূরা পড়িলে আল্লাহর ফজলে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবে। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- পীড়িত অবস্থায় নিম্নের আয়াত চল্লিশবার পড়িলে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবে। যদি মৃত্যু হয়, তবে শহীদী দরজা পাইবে। দোয়া এই-

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ *

উচ্চারণঃ- লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জালেমীন।

যাদুল আখিরাত কিতাবে ইহাও লিখিয়াছেন যে, সাদা চীনা বর্তনে আয়াতে শেফা লিখিয়া ধৌত করিয়া ফজর ও মাগরিবে পান করিবে।

আয়াতে শেফা

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ - وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ -
وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ -
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - وَاِذَا
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ - قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ -

নিম্ন লিখিত দরূদ শরীফ বেশী পরিমাণে পড়িবে এবং নিজ শরীরে ফুঁক দিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ
كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ -

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বি-আদাদি কুল্লি দায়িত্তঁ ওয়া দাওয়ায়িন। আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বি-আদাদি কুল্লি ইল্লাতিওঁ ওয়া শিফায়িন।

প্রশ্নঃ- কিরূপ তাবীজ ব্যবহার করিতে হইবে?

উত্তরঃ- যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- তামিমা দেও, ভুত ইত্যাদির নাম দ্বারা তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয নাই। উহাতে মুক্তি পাইবে এইরূপ বিশ্বাস করা শেরেকী। যেহেতু হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তামিমা ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি শেরেককারী। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফোজায়েল (রাঃ) এর গলা হইতে ঐরূপ তামিমা কর্তন করতঃ ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, তামিমা মন্ত্র ও যাদু ইত্যাদি শেরেকী। যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- যে সকল মন্ত্রের অর্থ জানা না থাকে, তাহা ব্যবহার করা জায়েয নাই। যে মন্ত্রে দেও, পরী বা কাফের কিংবা কাফেরদের মাবুদের নাম আছে, সেই মন্ত্র পড়া জায়েয নাই। নজ্জুম কিংবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীদের নিকট পীড়ার ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করা কিংবা উহা বিশ্বাস করা জায়েয নাই। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি নজ্জুম অথবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীর গায়েবী কথা বিশ্বাস করে, সে কাফের হইবে।

যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- কুরআন শরীফের আয়াত ও আল্লাহ তায়ালার নামের তাবীজ ও দোয়া জায়েয আছে।

হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী কিতাবে আছে- তাবীজ সঙ্গে রাখা জায়েয বটে কিন্তু তাবীজ তিন প্রকার (১) আল্লাহ তায়ালার কালাম ও আল্লাহ তায়ালার নামের তাবীজ দেওয়া জায়েয আছে। যে সকল কালাম দ্বারা তাবীজ লিখিয়া সঙ্গে দিতে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই তাবীজ সঙ্গে দেওয়া মুস্তাহাব। (২) ফেরেশ্তার নাম আরশ, কুরসী এবং বুযুর্গ লোকের নাম লিখিত তাবীজ মর্তবাজনক ভাবিয়া সঙ্গে রাখা জায়েয আছে বটে, কিন্তু নিয়তের গোলমাল হইবার আশঙ্কা বিধায় না দেওয়াই ওয়াজিব।

(৩) আল্লাহ তায়ালার কালাম ভিন্ন অন্য কথার তাবীজ বা অন্যের লিখিত তাবীজ, যাহার মানি মতলব বুঝা যায় না, তাহা সঙ্গে না দেওয়া ওয়াজিব। কারণ শেরেক হইতে পারে। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

ছদ্‌কা দিবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- পীড়িত ব্যক্তির রোগ মুক্তির মানসে কিরূপ ছদকা দিবে, তাহার রীতিনীতি জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- ছদকা দ্বারা তোমাদের রোগের চিকিৎসা কর। অতএব হালাল মাল গরীব মিসকীনকে ছদকা দিবে। আওরাদে কাসেমিয়া কিতাব হইতে যাদল আখিরাতে লিখিয়াছেন যে, যেরূপ সুস্থকায় নিখুঁত বকরী কোরবানীতে দেওয়া যায়, এমত একটি বকরী রোগ মুক্তির মানসে যবেহ দিবে। যবেহকালে নিম্নের দোয়া পড়িবে। --

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا لَكَ فِدَاءُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ مِنْهُ -

আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা লাকা ফেদায়া ফুলান ইবনে ফুলান ফাতাক্বাববালহু মিনহু (ফুলান ইবনে ফুলান) এর স্থলে রোগী ও তাহার পিতার নাম উল্লেখ করিবে। নিজের জন্য নিজে যবেহ করিলে "ফেদায়া ফুলানা" স্থলে ফিদায়াম্ মিন্নী এবং "মিনহু" স্থলে মিন্নী বলিবে। একটি গর্ত করতঃ তন্মধ্যে রক্ত ও হাড় যাহা খাওয়া না যায়, তাহা রাখিয়া মাটি দিবে যেন ঐ সকল কেহ পদদলিত করিতে না পারে। তৎপর মাথা, চামড়া ও কলিজা তিনজনকে দিবে। বাকী সব সাতান্ন ভাগ করিয়া ৫৭ জন মিসকীনকে দিতে হইবে। মোট ষাট ভাগ ষাট জন মিসকীনকে দিবে। কিন্তু নিজ পরিবার বর্গের কেহই উহা খাইবে না। এইরূপ ছদকা আল্লাহর ফজলে ঐ ব্যক্তির জন্য ঢালস্বরূপ হইবে। অর্থাৎ পীড়া হইতে আমান পাইবে।

ষাটজন মিসকীনকে না দিয়া একজনকেও দিতে পারে। যবেহ না করিয়া জীবিত অবস্থায়ও দিতে পারে। বকরী হউক, টাকা পয়সা হউক, কিংবা গরু ঘোড়া ইত্যাদি দ্বারাও ছদকা দিতে পারে। ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর ছাহেব কিবলা ফরমাইয়াছেন যে, কোন কঠিন পীড়ার জন্য একে একে ৭টি বকরী ছদকা দিলে আল্লাহর ফজলে তাহাতে ঐ রোগ আরোগ্যের আশা করা যায়। বহুবার আজমায়েশ করিয়া এই বিষয় হইতে আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে।

যাদুল আখিরাতের ১১শ পৃষ্ঠায় আছে- মুমিন লোকের পীড়া হইলে নাখোশ হইবে না এবং খারাপ জানিবে না অথবা ব্যাকুল হইবে না, ছবর করিবে। কারণ ছবর একটি বৃক্ষ তুল্য এবং উহার ফল উত্তম। ছবর এক বৃষ্টি স্বরূপ, উহার পানি মিষ্ট ও সুস্বাদু। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই ছবর করনেওয়ালাদের সাথী আমি। আল্লাহ তায়ালা ছবর করনেওয়ালাকে বেহিসাব পুরস্কার দিবেন। পীড়া হইলে আলস্য দূর হয়, আখেরাতের কথা স্মরণ হয় আল্লাহ তায়ালার ইয়াদ হয়, তাঁহার নিকট কান্নাকাটি করে এবং গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- লোকের যখন এমত পরিমাণ গুনা হয় যে, তদ্রূপ নেক না থাকে যে তাহার কাফ্‌ফারা হইতে পারে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নানা প্রকার আপদ-বিপদ ও পীড়া

দিয়া গুনাহের কাফ্‌ফারা করিয়া তাহার মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীর সর্বদা বালা মুছীবত থাকে- যথা নিজের পীড়া বা মাল নষ্ট বা কম করিয়া দেওয়া কিংবা ছেলে মেয়ের পীড়া হওয়া অথবা মরিয়া যাওয়া। ঐ সকল দ্বারা তাহাদের গুনাহ খাতার কাফ্‌ফারা হইয়া যায়। কাল কেয়ামতে ঐ লোক বেগুনাহ হইয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে উঠিবে।

মুসলমানের পীড়া মুক্তি হইলে জানিতে হইবে - পিছনের গুনাহ মাফ হইয়া গেল এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি হিতোপদেশ পাইল। যখন কোন নেকবান্দা পীড়া গ্রস্থ হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা কিরামন কাতেবীনকে হুকুম করেন যে, বান্দার আমলনামায় নেকী লেখ। সে সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া যেরূপ নেক কার্য করিয়াছে, যে পর্যন্ত পীড়া আরোগ্য না হয় তদ্রূপ নেকী লিখিয়া রাখ। যদি আরোগ্য হইল, তবে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া গেল। আর যদি মরিয়া যায় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করিবেন ও রহমত করিবেন।

যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- পীড়িত হইয়া সময়কে গালি দিবে না, সময়কে গালি দিলে আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেওয়া হয়, যেহেতু সময় আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট। পীড়িতের কর্তব্য, এইরূপ বিপদ মুছীবত কিংবা রোগ যন্ত্রণায় অধৈর্য্য হইয়া নিজের মৃত্যুর কামনা না করা। কেননা আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- তোমরা কেহ স্বীয় মৃত্যু কামনা করিও না। কেননা নেককার ব্যক্তি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাহার নেক বৃদ্ধি হইবে। আর পাপী হইলে সে পাপ হইতে তাওবাহ করিয়া ফিরিতে পারে। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- তোমরা মৃত্যু কামনা করিও না, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে বেহেশ্‌তবাসী হইবার অধিকতর উপযুক্ত হইবে। আর যদি তুমি দোযখবাসী হও, তবে দোযখে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ কেন? যেহেতু দোযখবাসীর জন্য এই দুনিয়াই বেহেশ্‌ত। কাজেই যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন দোযখের আযাব হইতে নিরাপদে থাকিবে। পীড়িত ব্যক্তি যতক্ষণ সচেতন থাকে, ততক্ষণ বিশেষভাবে সাবধান থাকিবে যেন তাহার দ্বারা কোন প্রকার গুনাহের কার্য না হয় এবং সাধ্যানুযায়ী পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ ও শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক পবিত্র রাখিবে। এবং সুন্নাত অনুযায়ী নখ্‌ মোছ, বোগল ও লজ্জাস্থানের পশম কাটিয়া ঠিক করিয়া রাখিবে এবং মাথার চুল ও দাড়ি আঁচড়াইয়া পরিপাটি করিবে। পরকালের ভয়ে সব সময় তাওবাহ ইসতেগফার আল্লাহর স্মরণ ও চিন্তায় নিবিষ্ট ও মশগুল থাকিবে।

পীড়িত ব্যক্তি সকল সময় তাওবাহ করিতে থাকিবে। কেননা গুনাহ করিয়া তাওবাহ না করিলে আল্লাহর নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। লোকের নিকট ঋণী থাকিলে পরিশোধ করিবে, কাহার নিকট অপরাধী থাকিলে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে; কিংবা নিজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে এবং নিজ কৃত পিছনের গুনাহ ও ভুল ক্রটির জন্য যথাসাধ্য সংশোধন ও তাহা পুরা করিতে চেষ্টা করিবে এবং নেককার্য শীঘ্র সমাধা করিবে। সুস্থ হইয়া করিবার আশায় ফেলিয়া রাখিবে না।

মৃত্যুর বিবরণ

মৃত্যুকালের পূর্ব লক্ষণঃ

প্রশ্নঃ- মুমূর্ষ অবস্থার পূর্ব লক্ষণ কি কি, জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- মানুষের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কিরূপে চেনা যায়, তাহা প্রথম জানিয়া লওয়া কর্তব্য। আলমগীরী কিতাবে আছে- মৃত্যুর পূর্বক্ষণে নিম্ন বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিবে। যথা- (১) পদদ্বয় শক্তিহীন হওয়া, (২) নাসিকার অগ্রভাগ টেরা হইয়া যাওয়া, (৩) কপাটিদ্বয় বসিয়া যাওয়া, (৪) মুখমন্ডল লম্বাকৃতি ধারণ করা, (৫) পুরুষের অন্ডকোষের চামড়া ঢিলা হওয়া। যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে (৬) হাতের তালু শূন্য হইয়া বসিয়া যাওয়া। রোগীকে ধরিয়া দাঁড়া করিলেও দাঁড়াইতে অক্ষম হওয়া। এইরূপ দৃষ্ট হইলে রোগীকে ডাহিন কাতে উত্তর শিয়রী করতঃ শয়ন করান সুন্নাত। (এতদ্দোশ্যের জন্য) যদি উত্তর শিয়রী করিয়া মুখমন্ডল কিবলার দিকে ফিরাইতে অক্ষম হয়, তবে তাহার মাথার নীচে এমত ঠেস দিবে যেন মুখমন্ডল কিবলার দিকে থাকে। উর্দ্ধে না থাকে এমতভাবেও রাখিতে পারে। রোগী যেরূপ ওজরে পশ্চিম দিকে পা রাখিয়া নামায পড়ে, তদ্রূপ রাখাও জায়েয আছে।

ঐ সময় রোগীকে আস্তে আস্তে কলেমা শাহাদত পড়াইবে। যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে-রোগীর পার্শ্বে থাকিয়া আস্তে আস্তে কলেমা শাহাদত পড়িবে যেন রোগী শুনিতে পায়, হয়ত রোগী পড়িতে পারে। যদি মৃত্যু যন্ত্রণায় পড়িতে না পারে, তবে তাহাকে পড়িতে বলিবে না, কেননা যন্ত্রণায় পড়িতে অস্বীকার করিতেও পারে। ঐরূপ পাঠ করা ও করান আমাদের হানাফী মাযহাব মতে মুস্তাহাব। সেই সময় মৃদুস্বরে সূরা ইয়াসীন পাঠ করাও মুস্তাহাব।

তাবীনুল হাকায়েক কিতাবের মর্মে জানা যায়, মৃত্যুর সময় শয়তান আসিয়া ঈমান বিনষ্ট করিতে চায়। সেই সময় কলেমা শাহাদত শুনাইলে ঈমানকে বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

প্রশ্নঃ- যদি কোন রোগীকে কলেমা শাহাদত পড়াইবার কালে না পড়ে কিংবা রোগ যন্ত্রণায় কুফরী কালাম বলিয়া ফেলে তবে তাহার উপর কি হুকুম?

উত্তরঃ- আলমগীরী ও রেসালায়ে আরকান কিতাবে আছে, ঐ সময় কুফরী কালাম বলিলে উহা ধর্তব্য নহে। তাহার উপর ফতোয়া জারি হইবে না। তাহাকে মুসলমান জানিয়া যথারীতি কাফন ও দাফন করিবে।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণের তাওবার বিবরণ

প্রশ্নঃ- মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাওবাহ পড়াইতে হইবে কি না?

উত্তরঃ- যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাওবাহ করিবে।

প্রশ্নঃ- ঐ সময় তাওবা করিলে নাকি তাওবাহ কবুল হয় না?

উত্তরঃ- যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে, মৃত্যুকালে তাওবাহ কবুল হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু দুররুল মোখতার ও খোলাছাতুল ফতোয়া হইতে লিখিয়াছেন, ছহীহ রেওয়ায়েত মতে তাওবাহ কবুল হইবে। কিন্তু কাফেরের ঈমান কবুল হইবে না অর্থাৎ মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে না। যাদুল আখিরাত ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে আছে, তাওবাহ কবুল অর্থাৎ গুনাহ মাফ হইবে। যাদুল আখিরাত কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন যে, মৃত্যুকালে গড়গড়ি হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাওবাহ কবুল হইবে, কিন্তু গড়গড়ির পূর্বক্ষণে কোন অমুসলমান তাওবাহ করিলে তাহাকে মুসলমান বলিয়া ধরা যাইবে না।

ঐ কিতাবে আছে বেহেশ্ত দোযখ না দেখিয়া এবং স্বেচ্ছায় আল্লাহ তায়ালার আদেশ প্রতিপালনার্থে ঈমান আনিতে হয়।

ঐ কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে আনিয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ঈমানদার বেহেশ্ত দেখে ও বেঈমান দোযখ দেখে। অতএব বেঈমানগণ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আযাব দেখিয়া ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অনিচ্ছায় তাওবাহ করে। এজন্যই ঐ সময় বেঈমানের তাওবাহ কবুল হয় না।

মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পড়া

প্রশ্নঃ- মৃত্যু প্রায় লোকের নিকট সূরা ইয়াসীন পড়িলে কি ছওয়াব হয়?

উত্তরঃ- তাফসীরে হামাবী কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে আনিয়াছেন হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- যদি কেহ মৃত্যুকালে রোগীর নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তাহা হইলে ঐ সূরার প্রত্যেক হরফে দশ দশটি ফেরেশতা নাযিল হইয়া ঐ রোগীর সম্মুখে কাতার বান্ধিয়া দাঁড়াইবে ও তাহার গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া চাহিতে থাকিবে এবং মৃত্যু ব্যক্তির গোসল স্থানে যাইবে। এমনকি শরীক হইয়া কবরস্থান পর্যন্ত যাইবে। "রেসালায় আরকান" কিতাবের মর্মে জানা যায়, ঐ সময় সূরা ইয়াসীন পাঠ করিলে মৃত্যু যন্ত্রণা কম হইবে।

মৃত্যু হইলে কি করিতে হইবে

প্রশ্নঃ- মৃত্যুর পর কি কি কাজ করিতে হইবে।

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি মাহরেম বা দয়ালু, সেই ব্যক্তি মৃতের চক্ষুদ্বয় আস্তে আস্তে বন্ধ করিয়া দিবে ও ঠিডি (চিবুক) জড়াইয়া মাথার সহিত রুমাল বাঁধিবে, যেন মুখ হা করিয়া না থাকে। পরে সঞ্জাব স্থান সমূহ আস্তে আস্তে মর্দন করতঃ হাত, পা, অঙ্গুলীসমূহ সোজা করিয়া দিয়া পরিধানের কাপড় বদলাইয়া স্বতন্ত্র কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া কোন তক্তা বা খাটের উপর রাখিয়া দিবে (মুস্তাহাব) যেহেতু মাটিতে আর্দ্রতায় মুর্দার সহজে দুর্গন্ধময় হইয়া যাইতে পারে।

(২) অঙ্গুলীসমূহ মুষ্টিবদ্ধ থাকিলে খুলিয়া সোজা করিয়া দিবে। উরু পেটের সহিত সংলগ্ন থাকিলে এবং পায়ের নলা উরুর সহিত সংলগ্ন থাকিলে সোজা করিয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত ঐ কিতাবে আছে- মৃত ব্যক্তির পেট যাহাতে ফাপিতে না পারে তজ্জন্য লৌহ অথবা নরম মাটি পেটের উপর রাখিয়া দিবে। ইহাও মুস্তাহাব।

(৩) যদি গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটে ও পেটের ভিতর সন্তান নড়াচড়া করিতেছে অনুভব হয় এবং বাহির করিবার উপায় না থাকে, তবে পেট ফাড়িয়া সন্তান বাহির করিবে।

(ক) মৃত্যুকালে তাহার নিকট হায়েজ ও নাপাকওয়ালী লোক থাকায় কোন দোষ নাই। (আলমগীরী)

(খ) যদি কাহারও আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, তবে জীবিত কি মৃত এই সন্দেহের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহার দাফন কার্য সমাধা করিবে। (আলমগীরী)

মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার বিবরণ

প্রশ্নঃ- কোন লোক মরিয়া গেলে তাহার জানাযাহ ও দাফনের জন্য কত দূরবর্তী লোকের নিকট সংবাদ দিতে হইবে?

উত্তরঃ- মুর্দারের জানাযাহ পড়া নিকটস্থ পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য ও হক তজ্জন্য তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া মুস্তাহাব। (আলমগীরী) মৃত্যু সংবাদ হাট বাজারের মধ্যে সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া কোন কোন আলেম মাকরূহ বলিয়াছেন। কিন্তু ছহীহ রেওয়ায়েত মতে উহাতে কোন দোষ হইবে না। (আলমগীরী)

বেঈমানের মৃত্যুর বিবরণ

মেশকাত শরীফে আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- যখন কাফেরের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন কদর্য্য চেহারা বিশিষ্ট একজন ফেরেশ্তা দোযখ হইতে একটা চট্ নিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া বলিবে, হে খবীছ রূহ! আল্লাহর যন্ত্রণাময় দোযখের দিকে তাকাও।

হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, কাফের মৃত্যুকালে

আযাবের আলামত দেখিতে থাকে তাহার ভয়ে কাফেরের রূহ তাহার শরীরের চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করে। সহজে বাহির হইতে চায় না। যেমন মুমিনের মৃত্যুকালে বেহেশ্‌তের আলামত দেখিয়া খুশী হইয়া সহজে রূহ বাহির হয়। তখন মালাকুল মওত ঐ কাফেরের রূহ সজোরে টানিয়া বাহির করেন। কাবাব বানান লৌহ শলাকায় জড়িত পোড়া গোশতের দ্বারা ভিজা পশমের উপর রাখিয়া টানিয়া আনিলে যেরূপভাবে ঐ পশম ছিড়িয়া আসে, তদ্রূপ কাফেরের রূহ টানিয়া আনিবার সময় তাহার শরীরের রগ রেশাও কতক ছিড়িয়া তৎসহ বাহির হয়। রূহ বাহির করিয়া ঐ চট্‌ওয়ালা ফেরেশতার হাতে দিবে ও আযাবের ফেরেশতা চটের মধ্যে বন্ধ করিবে। তৎপর উহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে, যেরূপ দুর্গন্ধ পৃথিবীর কোন মড়কের হয় না। পরে এই রূহ নিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে। তখন যে সকল ফেরেশ্‌তার সহিত সাক্ষাত হইবে, তাহাদিগকে বলিবে, এই রূহ অমুকের পুত্র অমুক বেঈমানের। এইরূপ প্রথম আসমানের দরওয়াজাতে নিয়া উক্ত ফেরেশতা দরওয়াজা খুলিতে বলিবে। কিন্তু দরওয়াজা খুলিবে না। ইহার প্রমাণ পাক কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দর্শাইয়াছেন। আয়াতের ভাবার্থ সুচের ছিদ্র দিয়ে উট চলিয়া যাওয়া যেরূপ অসম্ভব, কাফেরের জন্য আসমান ও বেহেশ্‌তের দরওয়াজা খোলা তদ্রূপ অসম্ভব। অর্থাৎ আসমানের দরওয়াজাও খুলিবে না এবং বেহেশ্‌তেও যাইতে পারিবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, উহার নাম সিজ্জীনের মধ্যে লিখিয়া দাও। সিজ্জীন সাত তবক যমিনের নীচে অবস্থিত। কাফেরের রূহ তখন ঐ সিজ্জীনের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। কুরআন শরীফে আছে-

ومن يشرك بالله فكانما خر - الخ

অর্থাৎ আল্লাহর সহিত যে শরীক করিবে, সে যেন আসমান হইতে পতিত হইল।

মুমিন লোকের মৃত্যুর বিবরণ

মেশকাত শরীফে আছে- হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আসমান হইতে উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তাগণ বেহেশতের রেশমী পোশাক ও বেহেশতের সুঘ্রাণ অর্থাৎ মেশ্‌ক আম্বর জড়িত পোশাক লইয়া পীড়িত ব্যক্তির নিকট এমন ভাবে বসিবেন যেন পীড়িত ব্যক্তি দেখিতে পায়। মোজাহেরে হক কিতাবে আছে- তাহারা নেহায়েত আদবের সহিত বসিয়া থাকিবেন যে, কোন সময় পীড়িতের রূহ বাহির হইবে। মালাকুল মউত তখন মাথার দিকে আসিয়া বলিতে থাকিবেন- হে পাক রূহ! তুমি দয়ার অন্তর্ভুক্ত স্থানে চলিয়া আস। আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি রাজী আছেন ও তোমাকে মাফ করিয়াছেন। তখন রূহ এমত

সহজে বাহির হইবে যেন মোশক হইতে আস্তে আস্তে পানি বাহির হয়। তখন মালাকুল মউত উক্ত রূহ হাতে লইবা মাত্র আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ অবিলম্বে নিয়া বেহেশ্‌তের সুঘ্রাণ জড়িত পোশাকে আদবের সহিত রাখিবে। তাহাতে এত সুঘ্রাণ আসিবে, যাহা দুনিয়াতে কখনও পাওয়া যায় নাই বা যাইবে না। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- ইহার পর ঐ রূহ লইয়া আসমানের দিকে রওয়ানা করিবেন। পথে যত ফেরেশ্‌তাদের সহিত সাক্ষাত হইবে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই পাক রূহ কোন ব্যক্তির? তখন ফেরেশ্‌তাগণ অতি প্রশংসার সহিত বলিবেন- অমুকের পুত্র অমুকের পাক রূহ। এইরূপ বলিতে বলিতে প্রথম আসমানে নিয়া যাইবেন। আসমানের ফেরেশ্‌তাগণকে বলিবেন- দরওয়াজা খোল, তখন দরজা খুলিয়া দিবে! তৎপর ঐ আসমানের কতক সম্মানিত ফেরেশ্‌তা দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত আগু বাড়াইয়া দিয়া আসিবেন। পুনঃ দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ ঐরূপ তৃতীয় আসমান পর্যন্ত দিয়া আসিবেন। এইরূপে সপ্ত আসমান অতিক্রম করিয়া আল্লাহর দরবারে পৌছাইয়া দিবেন। তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আদেশ হইবে- আমার এই বান্দার নাম ইল্লিয়্যীনের অর্থাৎ বেহেশতের দপ্তরে লিখাইয়া দাও। তৎপর আল্লাহ বলিবেন ঐ ব্যক্তির রূহ কবরে পাঠাও। মোজাহেরে হক কিতাবে লিখিত আছে যে, কবরে পাঠানোর উদ্দেশ্য, মনকীর নকীরের সওয়াল জওয়াবের জন্য।

মুর্দারের গোসলের বয়ান

প্রশ্নঃ- মৃতদেহ গোসল করান কি?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- মৃতদেহ গোসল করান ফরজে কেফায়া অর্থাৎ কতক লোকে গোসল করাইলে বাকী লোক ঐ ফরজের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। একবার সমস্ত শরীর ধৌত করিয়া গোসল করান ফরজ। একাধিকবার ধৌত করা সুন্নাত।

প্রশ্নঃ- মৃত ব্যক্তিকে কিরূপ পানি দ্বারা গোসল করাইবে?

উত্তরঃ- আলমগীরী কিতাবে আছে- বরই পাতার সহিত পানি গরম করিয়া গোসল করান মুস্তাহাব। কিন্তু বরই পাতা না পাইলে শুধু পানি গরম করিয়া গোসল করাইবে।

(২) শামী কিতাবে আবূ দাউদ শরীফ হইতে লিখিয়াছেন, কুল পাতা মিশান গরম পানি দ্বারা দুইবার সমস্ত শরীর ধৌত করাইবে। তৃতীয় বারের সময় গরম পানিতে কর্পুর মিশাইয়া ধৌত করিবে। বিনা ওজরে তিন বারের কম কিংবা বেশী ধৌত করান মাকরূহ।

গোসলের নিয়ম

প্রশ্নঃ- মুর্দারকে কিরূপে গোসল করাইবে এবং গোসলের রীতি প্রথম কোন সময় হইতে হইয়াছে?

উত্তরঃ- ফতহুল কাদীর কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন, যখন হযরত আদম

(আঃ)-এর মৃত্যু হইল তখন ফেরেশ্‌তাগণ বেহেশত হইতে খুশ্‌বু কাপড় লইয়া আসিলেন। হযরত আদম (আঃ) অতি লম্বা ছিলেন। তাহার গোসলের জন্য বরই পাতার সহিত পানি গরম করা হইয়াছিল। তৃতীয় বার গোসলের সময় ফেরেশতাগণ ঐ পানির সহিত কর্পুর মিশ্রিত করিয়াছেন এবং জানাযা নামায পড়িয়া কবর খুদিয়া দাফন কার্য শেষ করতঃ হযরত আদম (আঃ) এর পুত্রগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, আপনাদের মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যু ঘটিবে, তখন এইরূপভাবে গোসল ও কাফন করতঃ জানাজা নামায পড়িয়া দাফন করিবেন।

(১) আলমগীরী কিতাবে আছে- যে তক্তায় করিয়া মুর্দারকে গোসল করাইবে, ঐ তক্তায় গোসল করাইবার পূর্বেই খুশ্‌বুর ধূয়া দিয়া লইবে। কিন্তু বেজোড় সংখ্যা সেক দিবে। ধূয়া দিবার নিয়ম এই যে, খুশ্‌বু (যেমন লোবান) জ্বালাইয়া তক্তার চতুর্দিকে একবার কিংবা তিনবার অথবা পাঁচবার ঘুরাইবে। শামী কিতাবেও ঐরূপ সাতবার সেক দিবার বিধান লিখিয়াছেন।

(২) আলমগীরী কিতাবের মর্মে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, কতিপয় আলিমের মতে রুগ্নলোক যেরূপ শয়ন অবস্থায় পশ্চিম দিকে পা রাখিয়া ইশারায় নামায পড়ে, তদ্রূপ অবস্থায় রাখিয়া গোসল করাইবে। কতক আলিম বলিয়াছেন, মৃতদেহ যেরূপ ভাবে কবরে রাখিতে হয়, তদ্রূপ ভাবে গোসল করাইবে।

আলমগীরী ও শামী কিতাবের ছহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী জানা যায় যে, যেরূপ ভাবে মুর্দারকে রাখিয়া গোসল করান সুবিধাজনক হয় তদ্রূপ করিবে।

(৩) যে স্থানে রাখিয়া মৃত দেহ গোসল করাইবে, সেই স্থানে এইরূপ ভাবে ঢাকিয়া লইবে যেন গোসল করানেওয়ালা এবং তাহার সাহায্যকারীগণ ভিন্ন অন্য কেহ না দেখে।

(৪) মুর্দারের লজ্জাস্থান ঢাকা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম বলেন যে, পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান ঢাকিলেই যথেষ্ট হইবে। ঐ রেওয়ায়েত হেদায়া কিতাবে শুদ্ধ বলিয়া লিখিয়াছেন। অন্যান্য ওলামাগণ নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা কর্তব্য বলিয়াছেন। এই মতকে মোহীত কিতাবে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। (আলমগীরী)

(৫) লজ্জাস্থান পরিস্কার করার নিয়ম এই যে, উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা ও নজর করা হারাম বিধায় হস্তে একখানা নেকড়া জড়াইয়া তদ্বারা ঘর্ষণ করতঃ ময়লা ধৌত করিয়া ফেলিবে।

মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিয়াছেন যে, নেকড়া অভাবে কাপড়ের উপর দিয়া ঘর্ষণ করিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। শামী কিতাবে লিখিত আছে-স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য ঐ হুকুম।

(৬) মুর্দার পুরুষই হউক কিংবা স্ত্রীলোকই হউক, পুরুষ পুরুষের, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের রাণ দেখিবে না। মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে অবগত হওয়া যায় যে, ধৌত কার্য সুসম্পন্ন হইলে নামাযের অজুর ন্যায় অজু করাইয়া লইবে। যে নাবালোক মুর্দা নামায পড়া বুঝিত না, তাহাকে অজু করাইবার আবশ্যক নাই।

(৭) আলমগীরী কিতাবে আছে- জীবিত লোক যেরূপ ডাহিন দিক হইতে অজু শুরু করে, মুর্দারকেও তদ্রূপ ডাইন দিক হইতে অজু করাইতে আরম্ভ করিবে। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আরও লিখিত আছে- মুর্দারের নাসিকা ও মুখের মধ্যে পানি দিবে না; কেননা মুর্দারের কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গুলীতে একখন্ড ভিজা নেকড়া জড়াইয়া তদ্বারা নাক মুখ মুছিয়া ফেলিবে।

আলমগীরী কিতাবে নাক মুখ পরিষ্কার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, অঙ্গুলীতে একখানা ভিজা নেকড়া জড়াইয়া প্রথমতঃ মুখের দন্ত পাটিদ্বয় ও উহার গোড়া পরিষ্কার করিয়া নাসিকা পরিষ্কার করিবে। তাহ্‌তাবী কিতাবে আছে, নাভীস্থলও এরূপভাবে নেকড়া দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে কিন্তু দুররুল মোখতার ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে, যদি হায়েজ, নেফাস ও নাপাকওয়ালী স্ত্রীলোক মুর্দার হয়, কিংবা নাপাকওয়ালা পুরুষ মুর্দার হয়, তবে নাসিকা ও মুখের মধ্যে পানি দিবে। দুররুল মোখতার কিতাবে শরহে মোকাদ্দেছীন ও এমদাদুল ফতোয়া হইতে লিখিত আছে, নাকে ও মুখে পানি দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে একমত। পক্ষান্তরে শামী, তাহতাবী ও মিনহাতুল খালেক কিতাবে ঐ কৌলকে রদ করতঃ লিখিয়াছেন যে, মুর্দারের মুখ ও নাকের মধ্যে পানি ঢালিবে না। যেহেতু মুর্দারের নাক ও মুখের মধ্যের পানি বাহির করা কঠিন ও মুর্দারের কষ্ট হয়। মালাবুদ্দামিনহু কিতাবের হাশিয়ায় আছে মুর্দার নাপাক অবস্থায় হইলে নাক ও মুখের মধ্যে পানি ঢালিয়া না দিয়া আঙ্গুলে নেকড়া জড়াইয়া নাসিকার ছিদ্র ও মুখগহবর পরিষ্কার করিয়া দিবে।

যদি কাহারও মুখ বন্ধ থাকে, হা করান না যায়, তাহা হইলে দাঁতের উপর দিয়া মুছিয়া ফেলিবে।

(৮) আলমগীরী কিতাবের ছহীহ্ রেওয়ায়েত মতে মুর্দারের মাথা মাসেহ করিবে এবং পদদ্বয় ধৌত করিবে। অজুর প্রথম অবস্থায় কবজা পর্যন্ত হস্ত ধৌত করার কোন আবশ্যকতা নেই। কেননা উহা দ্বারা সে পবিত্র হইতে পারে না।

(৯) মুর্দারকে বাম কাত করাইয়া এমনভাবে পানি ঢালিয়া দিবে যেন তক্তার সহিত সংলগ্ন শরীর পর্যন্ত পানি পৌছে। এইরূপ ডাহিন কাত করাইয়াও ধৌত করিবে। তাহতাবী কিতাবে আছে, প্রত্যেক কাতে তিনবার করিয়া পানি ঢালা সুন্নাত। ঐ কিতাবে আরও লিখিত আছে, আবশ্যক হইলে তিনবারের বেশী বেজোড় সংখ্যক বার পানি ঢালিতে পারে। কিন্তু অনাবশ্যক পানি খরচ করা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(১০) মারাকিল ফালাহ্ কিতাবে আছে, মুর্দারকে একটু হেলান অবস্থায় বসাইয়া আস্তে আস্তে পেট মালিশ করিবে। ইহাতে যদি কোন নাপাকি বাহির হয়, তবে তাহা ধৌত করিয়া ফেলিবে এবং শুষ্ক কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। পুনঃ পুনঃ গোসল ও অজু করান আবশ্যক হইবে না। ঐরূপ ময়লা বাহির হইলে মুর্দারের অজু ও গোসল টুটিয়া যায় না।

(১১) চুল ও দাড়ি থাকিলে সাবান কিংবা সাবানের ন্যায় অন্য কোন দ্রব্য যাহাতে ময়লা পরিষ্কার হয়, তদ্বারা জীবিত লোকের ন্যায় ধৌত করিবে। আলমগীরী ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে- সাবান ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে, উহাতে দুর্গন্ধ দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু চুল ও দাড়ি না থাকিলে ঐরূপ সাবান ব্যবহার করা অনাবশ্যক। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- যে সমস্ত ছেলের দাড়ি উঠে নাই এবং যাহারা মাকুন্দা (জীবনে যাহাদের দাড়ি উঠে না) তাহাদের দাড়িতে সাবান ব্যবহার আবশ্যক করে না। তাহ্‌তাবী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মিঠা পানি দ্বারা গোসল করান উত্তম। বিশেষতঃ মুর্দারের শরীরের ময়লা ভালরূপে পরিষ্কার করণার্থে সাবান ব্যবহার করিলে লবণাক্ত পানি অপেক্ষা মিঠা পানি দ্বারা ধৌত করাই উত্তম। কেননা সাবান ব্যবহার করিয়া লবণাক্ত পানি দ্বারা ধৌত করিলে ভালরূপে ময়লা পরিষ্কার

হয় না।

(১২) মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- যদি কাহাকে পানির মধ্যে মৃত অবস্থায় পায়, তবে উঠাইবার সময় গোসলের নিয়তে পানির মধ্যে নাড়াচাড়া দিয়া উঠাইলে ফরজ ও সুন্নাত উভয় আদায় হইয়া যাইবে। খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, পানির মধ্য হইতে যে মুর্দারকে গোসল না করাইয়া উঠাইয়া থাকে, তাহাকে সাধারণত মৃতলোকের ন্যায় তিনবার করিয়া পানি ঢালিয়া গোসল করাইবে।

মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- পানি না পাওয়ার দরুন মুর্দারকে তাইয়াম্মুম করাইয়া জানাযাহ নামায পড়ার পর যদি পানি পাওয়া যায়, তবে গোসল করাইয়া কাফন করত পুনঃ জানাযাহ নামায পড়িবে।

(১৩) খানিয়া কিতাবে আছে, যদি কোন মুর্দারের শরীরের উপর দিয়া পানি প্রবাহিত হইয়া যায়, অথবা যদি এরূপ বৃষ্টি বর্ষে যে তাহাতে মুর্দারের সম্পূর্ণ শরীর ভিজিয়া যায়, তবুও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) এর মতে তাহাকে গোসল করাইতে হইবে। কারণ, উহাতে গোসলের কার্য সমাধা হয় না।

(১৪) আলমগীরী কিতাবে আছে- মুর্দারের দাড়ি ও চুল আঁচড়াইবে না এবং নখ, চুল,মোচ, স্কন্ধের ও কানের লোম ফেলিবে না। যাদুল আখিরাত কিতাবের মর্মে জানা যায়- লজ্জাস্থানের পশম ফেলিবে না; অর্থাৎ শরীরের কোন অংশ ফেলিবে না।

(১৫) শামী কিতাবে আছে- মুর্দারের দাড়ি ও চুল আঁচড়ান মাকরূহ। যেহেতু দাড়ি ও চুল সৌন্দর্যের জন্য আঁচড়ান হয়। মৃতের সৌন্দর্যের কোন আবশ্যক নাই। দুররুল মোখতার কিতাবে খাতনা করিতেও নিষেধ লিখিয়াছেন। খাতনা করা জীবিত লোকের জন্য সুন্নাত। কিন্তু মুর্দারের জন্য সুন্নাত নহে। যদি কেহ না জানিয়া দাড়ি, মোচ, লোম ও নখ ইত্যাদি কাটিয়া থাকে কিংবা আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে মুর্দারের কাফনের ভিতর ভরিয়া দিবে।

(১৬) শামী কিতাবে আছে- যাহাতে পানি না ঢুকিতে পারে তজ্জন্য মুর্দারকে গোসল করাইবার সময় তাহার নাসিকায়, কর্ণকুহরে, চক্ষে ও মলদ্বারে তুলা দিতে পারে। কিন্তু না দেওয়াই ভাল।

তাহতাবী ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিয়াছেন যে, পেশাব ও পায়খানার মোকামে তুলা দেওয়া ওলামাগণের মতে অতিশয় দোষণীয়। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- মুর্দারের ওয়ারিসগণের মধ্যে যে ঘনিষ্ট, সে গোসল করাইবে। সেরূপ কেহ না থাকিলে কোন দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তি গোসল করাইবে।

আলমগীরী কিতাবে আছে- ওয়ারিসগণের মধ্যে ঘনিষ্ট ব্যক্তির গোসল করান মুস্তাহাব; কিন্তু তাহারা গোসল করাইতে না জানিলে দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তির গোসল করান মুস্তাহাব।

(১৭) তাহ্তাবী কিতাবে লিখিয়াছেন- কোন মজুরী না লইয়া গোসল করান উত্তম। যদি গোসল করাইবার জন্য অন্য লোক না থাকে, তবে ইচ্ছা করিলে মজুরী লইয়া গোসল করাইতে পারে। গোসল করাইতে জানে এইরূপ একজন ব্যতীত অন্য কেহ সেখানে না থাকিলে সে মজুরী লইতে পারিবে না। কেননা তাহার পক্ষে তখন গোসল করান ফরজ। এইরূপ কাফন সেলাই, মুর্দার বহন করিয়া নেওয়া এবং কবর তৈয়ার

করিবার অতিরিক্ত লোক না থাকিলে তাহারা মজুরী গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ ঐ সমস্ত কার্য তাহাদের জন্য সমাধা করা ফরজ।

(১৮) তাহ্‌তাবী কিতাবে আছে- যদি মুর্দার এইরূপ ফুলিয়া যায় যে, তাহাকে ধরিয়া গোসল করান অসম্ভব হয়, তবে পানি ঢালিয়া গোসল করাইবে। আলমগীরী কিতাবে আছে- স্ত্রীলোকের গোসল পুরুষের ন্যায় করাইবে। স্ত্রীলোকের চুল পিঠের দিকে লটকাইয়া দেওয়া নিষেধ।

(১৯) তাহ্‌তাবী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, যদি কোন মুর্দারকে গোসল করাইবার সময় তাহার মধ্যে নেকের আলামত দেখে, যেমন তাহার চেহারা রৌশন হইয়াছে, কিংবা সুগন্ধি বাহির হইয়াছে, অথবা গোসল করাইতে হালকা বোধ হয় ইত্যাদি, তবে তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করা মুস্তাহাব। আর যদি গোসল করনেওয়ালা মুর্দারের মধ্যে মাকরূহ জনক কার্য দেখে , যেমন দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, মুখ ও শরীর কালবর্ণ হইয়া যাওয়া বা আকৃতি পরিবর্তন হইয়া যাওয়া ইত্যাদি, এই সকল বিষয় লোকের নিকট বর্ণনা করা হারাম। কিন্তু মুর্দার প্রকাশ্য বিদয়াতী ফাসেক ও জালেম হইলে অন্য লোকের হেদায়েতের নিয়তে উল্লিখিত দোষ প্রকাশ করা জায়েয আছে।

আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায়, তাহ্‌তাবী কিতাবে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস শরীফ বয়ান করিয়াছেন, "তোমরা মৃত ব্যক্তির নেকী প্রকাশ কর। কিন্তু দোষ প্রকাশ করিও না।" উক্ত লোকের গীবৎ করা শক্ত গুনাহ। কেননা জীবিত লোকের নিকট ক্ষমা চাওয়া যায়, কিন্তু মৃতের নিকট ক্ষমা চাহিয়া মাফ লওয়া যায় না।

(২০) তাহতাবী কিতাবে আছে- যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিবে এবং তাহার দোষ সমূহ গোপন রাখিবে, তাহার চল্লিশটি কবীরাহ গুনাহ মাফ করা হইবে। আর যে ব্যক্তি মৃতকে কাফন পরাইবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে বেহেশ্‌তে অতি মূল্যবান রেশমী কাপড় দান করিবেন। আর যদি কেহ মৃত ব্যক্তির জন্য কবর তৈয়ার করিয়া দাফন করে, তবে সে যেন মুর্দারের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত একখানা ঘর উঠাইয়া দিল।

(২১) আলমগীরী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি কোন মুর্দারের অর্দ্ধেকের বেশী শরীর পাওয়া যায়, কিংবা মাথার সহিত অর্দ্ধেক শরীর পাওয়া যায়, তবে গোসল, কাফন ও জানাযাহ নামায সমুদয়ই সমাপন করিবে। তাহার পর যদি আর বাকি অংশ পায়, তবে সেই অংশের জানাযাহ পড়া লাগিবে না। দুররুল মোখতার ও শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মাথা ছাড়াও যদি অর্দ্ধেকের বেশীর ভাগ পাওয়া যায়, তবে গোসল, কাফন, জানাযাহ আদায় করিবে। কিন্তু যদি শুধুমাত্র মাথা পাওয়া যায়, তবে গোসল করাইবে না বা জানাযাহ পড়িবে না, দাফন করিয়া রাখিবে। আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি মৃত দেহের মস্তক ব্যতীত শরীরের অর্দ্ধাংশ পাওয়া যায়, অথবা যদি লম্বাভাবে সমদ্বিখন্ডিত মৃতদেহের এক অংশ পাওয়া যায়, তবে তাহার গোসল ও জানাযাহ লাগিবে না। মাত্র কাপড়ে আবৃত করিয়া দাফন করিবে।

(২২) দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- মৃত দেহ কাফের কি মুসলমান, তাহা নিশ্চিত ঠিক করিতে না পারিলে, যদি মুসলমান বলিয়া কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিংবা

মুসলমান প্রধান স্থানে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে মুসলমান মৃতদেহের ন্যায় গোসল ও কাফন পরাইয়া জানাযাহ পড়িয়া দাফন করিবে।

(২৩) আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি কোন মুর্দারকে এমতাবস্থায় পাওয়া যায় যে, সে মুসলমান কি কাফের, তাহা জানা না যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে মুসলমানের চিহ্ন পাওয়া যায়, কিংবা দারুল ইসলামের মধ্যে মুসলমানের জমিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে গোসল করাইবে। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিয়াছেন, তাহার জানাযাহও পড়িবে।

(২৪) আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি কোন যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে বহু মুসলমান ও কাফের নিহত অবস্থায় থাকে এবং তাহার মধ্যে কে মুসলমান ও কে কাফের তাহা জানা না থাকে, তাহা হইলে যাহাদের মধ্যে মুসলমানের চিহ্ন পাওয়া যায়, যেমন খাত্না করা, দাড়িতে খেজাব দেওয়া ও কাল রঙের পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি, তবে তাহাদিগকে জানাযাহ নামায পড়িয়া দাফন করিবে। যদি মুসলমানের চিহ্ন পাওয়া না যায় কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা অধিক হয়, তবে সমস্ত মৃতদেহের উপর নামায পড়িয়া মুসলমানের গোরস্থানে দাফন করিবে, কিন্তু নামায পড়িতে ঐরূপ নিয়ত করিবে যে, যাহারা মুসলমান তাহাদের জন্য নামায পড়িতেছি। আর যদি কাফেরের সংখ্যা অধিক হয়, তবে সমস্তকে গোসল করাইয়া দাফন করিবে, নামায পড়িবে না। প্রকাশ থাকে যে, মুসলমান মুর্দারের ন্যায় গোসল কাফন করিবে না। তাহাদিগকে কাফের লোকের গোরস্থানে কবর দিবে। আর যদি কাফের ও মুসলমান সমান সংখ্যক হয়, তাহা হইলে কাহারও উপর নামায পড়িবে না, কিন্তু দাফনের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কতক ওলামার মতে তাহাদের জন্য ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া গোর দিবে। কতকের মতে মুসলমানের গোরস্থানে মাটি দিবে।

(২৫) কাফেরের ছেলে, যাহার ভালমন্দ বুঝিবার সামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, সে যদি তাহার মা কিংবা বাপ বন্দী হওয়ার পর বন্দী হয় এবং মা বাপের মধ্যে কেহ ইসলাম কবুল না করে অথবা সে নিজে ইসলাম গ্রহণ না করে, এমতাবস্থায় সে মরিয়া গেলে তাহাকে গোসল করাইবে না। মা বাপ বা ছেলের মধ্যে যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে গোসল করাইতে হইবে। দাদা ও দাদীর সহিত বন্দী হইয়া মরিয়া গেলে গোসল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু উক্তরূপে ছেলে যদি একাই বন্দী হইয়া মরিয়া যায়, তবে তাহার গোসল দিয়া জানাযাহ নামায পড়িয়া দাফন করিবে। (আলমগীরী)

(২৬) আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি কোন মুসলমান নৌকায় মারা যায়, তবে গোসল কাফন জানাযাহ পড়িয়া ভারী কোন বস্তুর সহিত বাঁধিয়া পানিতে ডুবাইয়া দিবে। তাহ্তাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, নদীর তীর নিকটে কিংবা দূরে হউক মুর্দার ফুলিয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা না থাকিলে কিংবা নৌকা হইতে কিনারায় যাইয়া দাফন করা সম্ভব হইলে পানিতে ডুবাইয়া দেওয়া হারাম। উক্ত কিতাব হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, মুর্দারের সঙ্গে কাফন শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ডাহিন কাতে যাহাতে কিবলার দিকে মুখ থাকে, এইরূপ ভাবে আস্তে নদীতে ছাড়িয়া দিবে যেন পানির নীচে ডুবিয়া যায়।

(২৭) আলমগীরী কিতাবে আছে- মুর্দার গোসলকারীর পাক হওয়া আবশ্যক।

নাপাক, হায়েজওয়ালী অথবা কাফের যদি গোসল করায়, তবে গোসল দুরস্ত হইবে কিন্তু মাকরূহ হইবে। যে গোসল করায় তাহার অজু না থাকিলে মাকরূহ হইবে না। প্রকাশ থাকে যে, অজু করিয়া লওয়া ভাল।

তাহ্‌তাবী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, কাফের ব্যক্তি যদি গোসল করায়, তবে মাকরূহ তাহরীম হইবে কিন্তু কাহাকেও না পাইলে জায়েয আছে।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ও পুরুষ স্ত্রীলোককে গোসল করাইতে পারে কি না

১। মৃত পুরুষকে পুরুষলোক, মৃতা স্ত্রীকে স্ত্রীলোক গোসল করাইবে। ইহার এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে গোসল করাইতে পারে না। কিন্তু উভয় শ্রেণীর মুর্দার যদি এত ছোট হয় যে, এখন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে কামভাব জন্মে নাই, তবে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে গোসল করাইতে পারে।

২। লিঙ্গ কাটা অথবা খাসী করা পুরুষকে স্ত্রীলোকে গোসল করাইতে পারিবে না। (আলমগীরী)

৩। আলমগীরী কিতাবে আছে, স্ত্রী তাহার মৃত স্বামীকে গোসল করাইতে পারে। কিন্তু স্বামী তাহার মৃতা স্ত্রীকে গোসল করাইতে পারিবে না। স্ত্রীকে যদি রেজায়ী তালাক দিয়া ইদ্দতের মধ্যে মরিয়া যায়, তবে স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাইতে পারিবে।

৪। আলমগীরী, জামেউর রমুয, বাহরুর রায়েক, তাবীনুল হাকায়েক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে গোসল করাইতে পারিবে না। রদ্দুল মোহতার কিতাবে লিখিত আছে- গোসল করাইতে বা স্পর্শও করিতে পারিবে না, কিন্তু দেখিতে পারে। মারাকিল ফালাহ কিতাবেও লিখিয়াছেন- স্বামী মৃতা স্ত্রীকে গোসল করাইতে পারিবে না। কেননা মরিয়া যাওয়ায় নেকাহ থাকে না।

তাহতাবী কিতাবে আছে, স্বামী স্ত্রীকে তায়াম্মুম করাইয়া দিতে হইলে অন্য পুরুষের ন্যায় হাতে নেকড়া পেঁচাইতে হইবে না। যদি অন্য কোন স্ত্রীলোক না থাকে, তবে সেই সময় স্বামী স্ত্রীকে তাইয়াম্মুম করাইয়া দিবে, চক্ষু বন্ধ করিয়া লইতে হইবে না।

৫। হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু বিবি ফাতেমা (রাঃ) কে গোসল করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, দুররুল মোখতার ও শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আমার সহিত যাহাদের আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক আছে, জীবিতকালে যেরূপ তাহাদের সম্পর্ক আছে, মৃত্যুর পরও তদ্রূপ সম্পর্ক বজায় থাকিবে। তন্নিমিত্ত হযরত আলী (রাঃ) বিবি ফাতেমা (রাঃ) কে গোসল করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শামী কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে নকল করিয়াছেন, আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- হে আলী!

জানিয়া রাখ, ফাতেমা (রাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার বিবি থাকিবে।

৬। আলমগীরী কিতাবে আছে- প্রবাসে কোন মুসলমানের সহিত কতিপয় মুসলমান স্ত্রীলোক এবং কতিপয় কাফের পুরুষ থাকিলে যদি মুসলমান পুরুষটির মৃত্যু ঘটে, তবে মুসলমান স্ত্রীলোক আড়ালে থাকিয়া কাফের পুরুষকে গোসল করান শিখাইয়া দিবে ও তদনুযায়ী তাহারা গোসল করাইবে। যদি কোন পুরুষ সঙ্গে না থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে এমন একটি ছোট মেয়ে থাকে যে, নিয়ম শিক্ষা দিয়া দিলে সে গোসল করাইতে সক্ষম হয়, তবে স্ত্রীলোকগণ তাহাকে আড়ালে থাকিয়া শিক্ষা দিবে। ঐ মেয়েই গোসল করাইবে।

৭। আলমগীরী কিতাবে আছে- নপুংষক পুরুষ বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী বয়স হইলে কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষকে গোসল করাইতে পারিবে না, এবং কোন স্ত্রীলোকও পুরুষকে গোসল করাইতে পারিবে না এবং কোন স্ত্রী পুরুষও ঐ নপুংষককে গোসল করাইতে পারিবে না, নপুংষকের মৃত্যু ঘটিলে হাতে নেকড়া জড়াইয়া গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করাইয়া দিবে।

মারাকিল ফালাহ কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, স্ত্রীলোক বা পুরুষ উভয়ের যে কেহ নপুংষককে তায়াম্মুম করাইলে চলিবে।

৮। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- যদি কতিপয় পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক কোনস্থানে অবস্থান করে এবং স্ত্রীলোকটির মৃত্যু ঘটে তবে কোন একজন লোকে হাতে একখানা নেকড়া জড়াইয়া মুর্দারকে তায়াম্মুম করাইয়া দিবে। কিন্তু মোহাররাম অর্থাৎ যাহারা দেখিতে ও স্পর্শ করিতে পারে, এইরূপ লোক উপস্থিত থাকিলে নেকড়া জড়াইবার আবশ্যক নাই। কতিপয় স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন পুরুষের মৃত্যু হইলেও ঐরূপ হুকুম।

নূরুল ইজাহ ও মারাকিল ফালাহ কিতাবে লিখিত আছে- ভিন্ন স্ত্রী লোককে তায়াম্মুম করাইতে হইলে, যদি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও হয়, তথাপি হাতে একখানা নেকড়া জড়াইয়া লইবে। যাহাতে তাহার অঙ্গ না দেখা যায় তজ্জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লইবে।

৯। আলমগীরী কিতাবে আছে- কোন কাফেরের মৃত্যু ঘটিলে তাহার অলি মুসলমান হইলে মুর্দারকে গোসল, কাফন ও দাফন করিবে। কিন্তু ঐ সমস্ত কাজ মুসলমানী তরীকা মোতাবেক করিবে না।

১০। কোন মুসলমান মুর্দারের পিতা কাফের হইলে, সে তাহাকে গোসল করাইতে পারিবে না, অন্য কোন মুসলমান দ্বারা গোসল করাইবে। (আলমগীরী)

১১। সফরে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে এবং পাক পানি না পাইলে তায়াম্মুম করাইয়া কাফন পরাইয়া জানাযাহ পড়িয়া দাফন করিবে।

১২। যে সকল সন্তান সন্ততির সম্পূর্ণ অবয়ব গঠিত হইয়া মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগকে গোসল করাইবে। কিন্তু যে সন্তানের সম্পূর্ণ অবয়ব গঠিত না হয়, তাহাকে

গোসল করান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শরহে মাজমাউল আনহুর, রদ্দুল মোহতার, বাহরুর রায়েক, তাহতাবী, দুররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে যে, মরা ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হইলে ছহীহ কওল মতে নাম রাখিয়া গোসল কার্য সমাধা করতঃ একখানা কাপড় দ্বারা জড়াইবে। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিয়াছে যে, ঐরূপ মরা ছেলেমেয়েকে গোসল করাইয়া একখানা নেকড়া জড়াইয়া দাফন করিবে, জানাযাহ পড়িবে না। দুররুল মোখতার, তাহ্তাবী , মারাকিল ফালাহ কিতাব সমূহে ছহীহ কওল মতে লিখিয়াছে যে, ঐরূপ সন্তানের সমস্ত শরীর না হইয়া থাকিলেও নাম রাখিয়া গোসল দিয়া একখানা নেকড়া জড়াইয়া দাফন করিবে। নামায পড়িবে না। তাহতাবী কিতাবে আছে- ঐরূপ গোসল সুন্নাত মোতাবেক করান শর্ত নহে। আদমের আওলাদ বলিয়া তাজিমের জন্য ঐরূপ নিয়ম। তাহতাবী কিতাবে লিখিয়াছে- ঐ সন্তান তাহার পিতামাতাকে শাফায়াত করিবে। হাদীস শরীফ হইতে ইহাও নকল করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- কেয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ছেলেমেয়েগণ বেহেশ্তের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া বলিবে- হে আল্লাহ! যে পর্যন্ত আমার পিতামাতা বেহেশ্তে না যায়, সে পর্যন্ত আমি বেহেশ্তে যাইব না।

শামী, বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে– আমাদের হানাফী মাযহাবের ওলামাগণের মত এই যে, উক্ত মৃত সন্তানগণ রূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকুক কি না থাকুক ঐ অবস্থায় তাহারা কেয়ামতের দিন জীবিত হইবে। ইবনে ছিরীন ও শা'বী (রাঃ) যাহারা তাবেঈনগনের অন্তর্গত মোহাক্কেক ছিলেন তাহাদের উক্ত মত শামী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত মৃত সন্তানের নাম রাখা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দার নিজ নিজ নাম ধরিয়া ডাকিবেন। অতএব উক্ত নাম রাখার আদেশ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারা জীবিত হইবে। জীবিত না হইলে নাম রাখা নিরর্থক হয়। তাহ্তাবী কিতাবে লিখিত আছে মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে গোসল করাইবে। যে সকল সন্তানের কতকাংশ শরীর হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের কেয়ামত সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

১৩। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে- যদি কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটে এবং তাহার পেট হইতে মরা সন্তান বাহির হয়, তবে ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কবরে দাফন করা জায়েয আছে। (ওয়াকেয়াতে মুফতীন) উক্ত কিতাবে আরও লিখিত আছে- ঐ স্ত্রীলোকের সন্তান যদি জীবিত পয়দা হইয়া মরিয়া যায় তবে তাহার জানাযাহ পড়িবে এবং দাফন করিবে। উল্লিখিত মুর্দার স্ত্রীলোকের সহিত এক কবরে দাফন করাও জায়েয আছে। তাহতাবী কিতাবে আছে- যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নমুনা না হইয়া থাকে, তবে গোসল করান, নাম রাখা দরকার পড়ে না।

১৪। কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যদি কোনরূপ কান্নার শব্দ করিয়া মরিয়া যায়, তবে তাহার নাম রাখিয়া গোসল ও কাফন করতঃ জানাযাহ পড়িবে। (আলমগীরী)

১৫। মারাকিল ফালাহ ও শামী কিতাবে আছে- যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কান্নাকাটি নড়াচড়া ইত্যাদি হায়াতের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিংবা গর্ভ হইতে প্রথম মাথার দিক হইতে ছীনা পর্যন্ত বাহির হয় অথবা পায়ের দিক হইতে নাভী পর্যন্ত বাহির হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় মাতা অথবা ধাত্রী তাহার মধ্যে হায়াতের আলামত দেখার সাক্ষ্য দেয় যে সন্তান জীবিত হইয়া মরিয়াছে। তবে তাহাকে নাম রাখিয়া গোসল করাইয়া জানাযাহ নামায পড়িয়া দাফন করিবে। ইহারা সম্পত্তির ওয়ারিস হইতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ফরমাইয়াছেন যে, এক জন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক বা দুইজন পুরুষ জীবিত সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলে ওয়ারিস হইবে আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে মাতা ব্যতীত অন্য কোন একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষীতেও ওয়ারিস হইবে। কেননা প্রসূতির নিকট তখন কোন পুরুষ থাকে না, তাহতাবী কিতাবে লিখিয়াছেন, পাক্কা দ্বীনদার বিশ্বাসী একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে গ্রাহ্য হইবে (জাওহারাতুন্নাইয়্যেরা)।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন ব্যক্তিকে যবেহ করা হইয়াছে, সে ধড়ফড় করিতেছে; এমন সময় তাহার পিতারও মৃত্যু ঘটিল। এই যবেহ করা ব্যক্তি তাহার মৃত পিতার সম্পত্তির ওয়ারিস হইবে না। এইরূপ যবেহ করা অবস্থায় ধড়ফড় করা হায়াতের মধ্যে ধরা যাইবে না।

১৬। খোলাছাতুল ফতোয়ায় আছে, গোসল দেওয়ার পর কাফন দিবার পূর্বে কিংবা পরে যদি মুর্দারের কোন অঙ্গ পৃথক হইয়া যায়, তবে ঐ অঙ্গ পুনঃ গোসল করাইতে হইবে না। মাসেহ করাইয়া ঐ কাফনের মধ্যে দিয়া মাটি দিবে।

কাফনের বয়ান

১। ফতহুল কাদীর কিতাব হইতে আলমগীরী কিতাবে লিখিয়াছেন- মুর্দারকে কাফন দেওয়া ফরজে কেফায়া। পুরুষ মুর্দারকে (১) লেফাফা, (২) ইজার, (৩) কামিছ এই তিন খানা কাপড় দেওয়া সুন্নাত। স্ত্রীলোককে দাফন করিতে পাঁচ খানা কাপড় দেওয়া সুন্নাত। যথাঃ- (১) ছীনাবন্ধ, (২) লেফাফা, (৩) ইজার, (৪) কামিছ, (৫) ছেরবন্ধ।

পুরুষকে এক কাপড় দ্বারা স্ত্রীলোককে দুই কাপড় দ্বারা দাফন করা মাকরূহ। কিন্তু ওজরে পারিবে। সাবালেগ হইবার নিকটবর্তী হইয়াছে, ঐরূপ ছেলেমেয়েদের জন্য ঐ হুকুম। নপুংষকের কাফন স্ত্রীলোকদের কাফনের ন্যায় হইবে। কিন্তু অতি শিশু হইলে এক কাপড় ও শিশু মেয়েকে দুই কাপড় দ্বারা কাফন করিলে জায়েয হইবে। শামী কিতাবে আছে- শিশুদের দাফনে সুন্নাত অনুযায়ী কাপড় দেওয়া অতি উত্তম।

২। যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- অবস্থা বিশেষে মুর্দারকে তিন প্রকারের কাপড় হইলেও দাফনের কার্য চলে।

(১) সুন্নাতি কাপড় (২) কেফায়েতী বা মধ্যম রকমের কাপড় অর্থাৎ যে রকম কাপড় হইলে দাফন কার্য চলে। (৩) জরুরী বা আবশ্যকীয় কাপড় অর্থাৎ যে কাপড় না হইলে দাফন কার্য চলে না।

আলমগীরী, হেদায়া, মাজমাউল আনহুর, বাহরুর রায়েক, জামেউর রমুজ, দুররুল হেকাম, ছগীরী, কবীরী, শামী, মারাকিল ফালাহ ও যাদুল আখিরাত প্রভৃতি কিতাবে আছে- "কামিছ গলা হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত" এই সম্বন্ধে সকল কিতাবে একইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু লেফাফা ইজারের চেয়ে কিছু বড় হওয়া আবশ্যক বলিয়াছেন, যেহেতু উহা দ্বারা যেন মাথা ও পা ঢাকিয়া যায়। যাদুল আখিরাতে লিখিয়াছেন যে, লেফাফা এতটুকু লম্বা হওয়া আবশ্যক যেন দুই দিকে গিরা দেওয়া যায়।

উপরোক্ত কিতাব সমূহের মর্মে জানা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ইজার ও লেফাফা সম্বন্ধে একই হুকুম।

প্রশ্নঃ- যাদুল আখিরাতের একমতে লেফাফা ও ইজারের দৈর্ঘ্য প্রস্থে হাতের পরিমাণ লিখিয়াছেন, তাহা আমল করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ- যাদুল আখিরাত কিতাবের ঐ পরিমাণের উপর আমল করা যায় না। যেহেতু মুর্দার ছোট বড় চিকন মোটা ভেদে দৈর্ঘ্য প্রস্থ হাতের পরিমাণ ঠিক হয় না। তজ্জন্য উল্লিখিত আলমগীরী, হেদায়া, মাজমাউল আনহুর, বাহরুর রায়েক, দুররুল হেকাম, ছগীরী, কবীরী প্রভৃতি কিতাব সমূহে দৈর্ঘ্য প্রস্থ হাতের পরিমাণ না লিখিয়া মানুষের পরিমাণ অনুযায়ী দৈর্ঘ্য প্রস্থ লিখিয়াছেন। অতএব হাতের পরিমাণ আমলের অযোগ্য। সুতরাং যাদুল আখিরাতের দ্বিতীয় মত, যাহা উক্ত কিতাব সমূহ অনুসরণে লিখিত আছে, তাহাই আমলের যোগ্য ও আমল করিবে।

হাতের পরিমাণ আমল করিলে যে মানুষ খাট ও চিকন, তাহার ঐরূপ কাপড় বেশী হইয়া পড়ে। আবার যাহার দেহ লম্বা মোটা, তাহার ঐ পরিমাণ কাপড়ে না হইতে পারে। কাজেই হাতের পরিমাণের মত আমলের অযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সিরাজিয়া কিতাবে আছে- মুর্দারকে আবশ্যক পরিমাণের বেশী কম কাপড় দেওয়া জায়েয নাই।

মুর্দারকে পাগড়ি দেওয়া যায় কি না

১। জাহের রেওয়ায়েত মতে মুর্দারকে কাফন দিতে পাগড়ী দিবে না। মোতাআখ্খেরীন ওলামাগণের কেহ কেহ মুর্দারকে পাগড়ী দেওয়া ভাল বলিয়াছেন। পাগড়ীর লেজ জীবিত লোকের ন্যায় ঝুলাইয়া দিবে না। মাথার কাপড়ের সহিত গুজিয়া দিবে। পাগড়ী সম্বন্ধে মোতাআখ্খেরীন ওলামাগণের যে রেওয়ায়েত লিখা হইল উহা,(১) শরম্বালালিয়া, (২) দুররুল মোখতার, (৩) শামী, (৪) বাহরুর রায়েক কিতাবে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে মাকরূহ লিখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জাহেদী কিতাব হইতে শরহে বেকায়া কিতাবের হাশিয়ায় মুর্দারকে পাগড়ী দেওয়া ছহীহ রেওয়ায়েত মতে মাকরূহ লিখিয়াছেন। যদি আলেম মুর্দারকে পাগড়ী দেওয়া ভাল হইত, তবে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগড়ী দেওয়া হইল না কেন, যেহেতু তিনি সমস্ত মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মেয়ে লোকের কাফন

১। আলমগীরী কিতাবে স্ত্রীলোককে দাফন করিতে পাঁচখানা কাপড় দেওয়া সুন্নাত লিখিয়াছে। যথাঃ- (১) কামিছ, (২) লেফাফা, (৩) ইজার, (৪) ছেরবন্ধ ও (৫) ছীনাবন্ধ। ইজার, ছেরবন্ধ ও লেফাফা দ্বারা দাফন করাও জায়েয আছে। ছীনাবন্ধ স্তনদ্বয় হইতে নাভী পর্যন্ত, কিন্তু রান পর্যন্ত দেওয়াই ভাল। স্ত্রীলোককে দুই কাপড়ের দ্বারা দাফন করা মাকরূহ। কিন্তু ওজরে পারিবে।

যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোকের কামিছ গলা হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত। উহাতে আস্তিন, কল্লি ও গেরবান অর্থাৎ কলার, পকেট ইত্যাদি থাকিবে না। উপর নীচ উভয় দিক সমান হইবে। স্ত্রীলোকের কামিছ বুক ফাঁড়িয়া দিবে। যতদূর পর্যন্ত কাপড় হইলে মুর্দারের এপাশ ওপাশ ঢাকিয়া যায় ততদূর পর্যন্ত প্রস্থ দিবে। দামানী বা খিমার অর্থাৎ যদ্বারা স্ত্রীলোকের চুল জড়াইয়া বন্ধন করা হয়, উহার দৈর্ঘ্য দুই হাত এবং প্রস্থ এক হাত। কতক ওলামার মত এই যে, যে পর্যন্ত কাপড়ে মাথা ঢাকিয়া যায় ততদূর পর্যন্ত খিমারের প্রস্থ দিবে। শরহে বর্জোখ কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে প্রকাশ করিয়াছে যে, মুর্দার যতটুকু লম্বা তাহার অর্দ্ধ পর্যন্ত খিমারের প্রস্থ দিবে। কাহারও মতে যতদূর আবশ্যক ততটুকু প্রস্থ দিবে। উহার সীমা এক হাত নির্দেশ করিয়াছে।

ছীনাবন্ধ দ্বারা মুর্দার স্তনদ্বয় ও বক্ষঃস্থল হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত পেচাইয়া দিবে। ইহা তিন হাত লম্বা হইবে। কিন্তু প্রস্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কতক ওলামার মতে স্তনদ্বয় হইতে নাভী পর্যন্ত এবং কতক ওলামার মতে স্তনদ্বয় হইতে উরু পর্যন্ত, আর কতক ওলামার মত এই যে, উহার প্রস্থ বোগল হইতে হাঁটু, উরু ও পায়ের নালার জোড়স্থান পর্যন্ত হইবে। মোতাআখ্‌-খেরীন ওলামাগণ যে হাঁটু পর্যন্ত দিতে বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, হাটু পর্যন্ত প্রস্থ হইলে বাতাসে উল্টাইয়া উরুদেশ খুলিয়া ফেলিবার আশঙ্কা থাকে না। কাফন সম্বন্ধে ওলামাগণ উপরে যে সমস্ত মত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার চেয়ে কম বা বেশী করা শরীয়ত বিরোধী।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যাদুল আখিরাতে আছে- আছহাবগণ হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইজার, লেফাফা ও কামিছ এই তিনখানা কাপড় দ্বারা দাফন করিয়াছিলেন। উহা সাদা রঙ্গের ছিল। বুখারী শরীফ হইতে বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাদা তিনখানা কাপড় দ্বারা দাফন করিয়াছিলেন।

যদি কোন মুর্দারকে তাহার নিজের কামিছ দ্বারা দাফন করে, তবে সেই কামিছের আস্তিন, কল্লি ও পকেট কর্তন করতঃ ফেলিয়া লইবে।

পুরুষ মুর্দারকে তিনখানা ও স্ত্রী মুর্দারকে পাঁচখানা কাপড়ের বেশী দেওয়া মাকরূহ।

(যাদুল- আখিরাত)

যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- যদি কোন মুর্দারের সম্পত্তি বেশী থাকে, কিন্তু ওয়ারিস কম থাকে, তবে তাহাকে সুন্নাতি কাফন দ্বারা দাফন করাই ভাল। আর সম্পত্তি কম কিন্তু ওয়ারিস বেশী থাকিলে পূর্ব বর্ণিত কেফায়েতী কাফন দ্বারাও দাফন করিতে পারে।

কি রকম কাপড় দ্বারা কাফন করিতে হয়

১। আলমগীরী কিতাবে আছে- জরদা ও হলদে রঙের কাপড় এবং রেশমী বস্ত্র দ্বারা পুরুষকে কাফন দিবে না। পুরুষ যেরূপ কাপড় পরিধান করিয়া ঈদের নামায পড়িতে যায় এবং স্ত্রীলোক যেরূপ কাপড় পরিধান করিয়া মাতা-পিতার বাড়ী বেড়াইতে যায়, ঐরূপ উত্তম কাপড় দ্বারা দাফন করা সিদ্ধ। যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, সাদা কাপড় দ্বারা দাফন করা সবচেয়ে উত্তম, যেহেতু হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুর্দারদিগকে সাদা কাপড় দ্বারা দাফন করা ভাল বলিয়াছেন।

আলমগীরী ও যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- নূতন কি পুরাতন উভয় প্রকারের পাক কাপড় দ্বারা কাফন দিতে পারে। কিন্তু পুরাতন কাপড় পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। প্রকাশ থাকে যে, মধ্যম রকম কাপড় দ্বারা কাফন কার্য সম্পন্ন করিবে। যে যেরূপ উপযুক্ত তাহার চেয়ে মূল্যবান কাপড় দ্বারা কাফন করা মাকরূহ।

পুরুষ মুর্দারের কাফন বিছাইবার নিয়ম

যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- পুরুষ মুর্দারের কাফন বিছাইবার তক্তা বা বিছানার উপর লম্বাভাবে লেফাফা অর্থাৎ বড় চাদর বিছাইবে। দ্বিতীয় ইজারের চাদর লেফাফার উপর বিছাইবে; তৃতীয় কামিছ, ইহা ইজারের উপর বিছাইবে এবং মাথার দিকের কাপড় গুছাইয়া ঘাড়ের নীচের বরাবর রাখিবে। ইহার পর মুর্দারকে ভাল রকম মুছিয়া তাহার পর্দার স্থান ঢাকিয়া কাফনের উপর রাখিবে এবং কামিছের গুছান কাপড়ের ফাড়ার ভিতর দিয়া মাথা ভরিয়া দিবে ও উক্ত গুছান অংশ পা পর্যন্ত টানিয়া দিবে। যে কাপড় দ্বারা গোসলের পর পর্দাস্থান আবৃত করিয়া রাখিবে, তাহা এইরূপ কৌশলে বাহির করিবে যেন মুর্দার উলঙ্গ হইয়া না যায়। ইহার পর মুর্দারের হাত দুইখানা দুই পার্শ্বের সহিত সোজা করিয়া রাখিবে। তাহার পর ইজারের বাম পার্শ্ব ডাহিন পার্শ্ব দিকে এইরূপভাবে টানিয়া দিবে, যেন মুর্দারের মুখমন্ডল আবৃত হইয়া যায়। এইরূপভাবে লেফাফাও বাম পার্শ্বের হইতে ডাহিন দিকে টানিয়া দিবে। ঐ প্রকার ডাহিন দিকের কাপড় বামপার্শ্বের কাপড়ের উপর দিয়া বামদিকে টানিয়া দিবে, যেরূপ জীবিত অবস্থায় লোক দিয়া থাকে। বাতাসে কাফন উল্টাইয়া শরীর বাহির করার সম্ভাবনা থাকিলে, কাপড়ের টুকরা দ্বারা মাথা, কোমর, পা, এই তিন স্থানে তিনটি বাঁধন দিয়া দিবে।

মেয়েলোক মুর্দারের কাফন বিছাইবার নিয়ম

১। স্ত্রী মুর্দারের কাফন বিছাইতে প্রথমে ছীনাবন্ধ আড়াআড়ি ভাবে বিছাইবে, তাহার উপরে লেফাফা লম্বাভাবে বিছাইবে, তদুপরি ইজার ঐরূপ লম্বাভাবে বিছাইবে। ইজারের উপর কামিছ বিছাইবে। ইহার পর মুর্দারকে ভালরূপে মুছিয়া অন্য কাপড় দ্বারা লজ্জাস্থান

ঢাকিয়া কাফনের উপর রাখিয়া কামিছ পরাইয়া দিবে। উক্ত কামিছ পরাইবার সঙ্গে সঙ্গে আবরণের কাপড়খানা সাবধানে বাহির করিবে, যেন মুর্দার উলঙ্গ হইয়া না যায়। ইহার পর মাথার চুল দুইভাগ করতঃ মাথার দুই পার্শ্বে স্কন্ধের উপর দিয়া কামিছের উপর রাখিয়া দিবে। পরে ছেরবন্ধের মধ্যভাগ মাথার সঙ্গে জড়াইয়া অঞ্চলদ্বয় দ্বারা দুই পার্শ্বের চুল ঢাকিয়া স্তনদ্বয় ও পেটের উপর রাখিবে। হস্তদ্বয় মুর্দারের পার্শ্বের সহিত সোজাভাবে রাখিবে। তৎপর ইজার বামদিক হইতে উঠাইবে। পরে ডাহিন দিক হইতে উঠাইয়া মুর্দারকে জড়াইয়া দিবে। লেফাফাও ঐরূপ উঠাইয়া জড়াইবে। ছিনাবন্ধ ঐ প্রকার বাম পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া শেষে ডাহিন পার্শ্ব উঠাইবে।

২। যাদুল আখিরাত কিতাবের মর্মে জানা যায়– মুর্দারকে ইজারের উপর রাখিয়া কামিছ পরাইবার পর কামিছের ভিতর হাত দিয়া মাথায়, বক্ষস্থলে এবং মুখমন্ডলে খুশবু মালিশ করিয়া দেওয়া মুস্তাহাব। খুশবুর সহিত কিছু মেশক মিশাইয়া দিতে পারে। তাহার প্রমাণ এই যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহুর নিকট কতক মেশক মৌজুদ ছিল। তিনি অসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার মরণের পর খুশবুর সহিত ঐ মেশক কতকাংশ মিশাইয়া আমার শরীরে মালিশ করিয়া দিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর খুশবুর সহিত যে মেশক মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহা তাহার বাকী অংশ।

৩। কুফাবাসী মুসলমানগণ বলিয়াছেন যে, মুর্দারকে গোসল দেওয়ার পর উত্তমরূপে শরীর মুছিয়া খুশবুর সহিত কিছু কর্পুর মিশাইয়া মালিশ করিবে।

৪। উক্ত যাদুল আখিরাত কিতাবে বরজেন্দি কিতাব হইতে উল্লেখ করিয়াছে যে, মুর্দারকে কবরে রাখিবার পূর্বে কবরের ভিতর কিছু খুশবু ছিটাইয়া দিবে, কেননা হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর কবরে ঐরূপ খুশবু ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৫। মুর্দারের সিজদাহর স্থান সমূহে যথা- কপাল, নাসিকা, হাটুদ্বয়, হাতের তালু ও হাতের অঙ্গুলী, পায়ের তলা ও পায়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কর্পুর মালিশ করিবে। কোন কোন ওলামাগণ কর্পুর অভাবে মেশক ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। জাফরান, আতর, মেশক, ওশনান ও আম্বর ইত্যাদি সুঘ্রাণ ব্যবহার করা জায়েয আছে। যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন, মুর্দারকে কামিছ পরিধান করাইবার পর উপরোক্ত নিয়মে খুশবু মালিশ করিয়া বিনা কালিতে শাহাদৎ অঙ্গুলী দ্বারা কপালে এবং বক্ষস্থলে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখিলে গোর আযাব হইতে মাফ পাইবে। এইরূপ করা মুস্তাহাব। ঐ কিতাবে ইহাও আছে যে, বক্ষস্থলে কলেমা তৈয়ব ও "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখিয়া দিবে এবং কপালে শুধু " বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখিয়া দিবে।

৬। কতক ওলামা বলিয়াছেন যে, আহাদ নামা দোয়া কপালে কিংবা কাফনের উপর লিখিলে আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিবেন। যাদুল আখিরাত কিতাবে

লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার নাম কিংবা কুরআন শরীফের কোন আয়াত মুর্দারের কাফনে লিখিয়া দেওয়া অসিদ্ধ। শামী কিতাবে আছে– মুর্দারের কাফনের উপরে সূরা ইয়াসীন বা সূরা কাহাফ অথবা কোন কালাম লেখা অসিদ্ধ বলিয়া ফতোয়া দিয়াছে। আর ঐরূপ কোন দোয়া কালাম কাফনের উপর লেখা না জায়েয লিখিয়াছে; কেননা শেষে নাপাকে পতিত হওয়ার দরুন আল্লাহ তায়ালার নামের বেতাজীম হয়। এইরূপ গৃহের দেওয়ালে আল্লাহর নাম বা কোন কালাম লেখা অসিদ্ধ লিখিয়াছে। কারণ কোন সময় উহা ভাঙ্গিয়া পায়ের নীচে বা অন্য নাপাকে পড়িবার আশঙ্কা আছে।

৭। শামী কিতাবে আছে- কপালে এবং বুকের উপর কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা জায়েয আছে। তাহার কারণ এই যে, মুর্দারের গোসলের পর উহা বিনা কালিতে লেখা হইয়া থাকে।

৮। দুররুল মোখতার কিতাবে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি অসিয়ত করিয়াছিল যে, মৃত্যুর পর আমার কপালে ও বক্ষস্থলে "বিসমিল্লাহ" লিখিয়া দিবে। মৃত্যুর পর লোকে ঐরূপ লিখিয়া দাফন করিল। পরে ঐ ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নাবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "আপনার অবস্থা কিরূপ?" তিনি বলিলেন, কবরের মধ্যে যখন আযাবের ফেরেস্তা আসিয়া আমার কপালে ও বক্ষস্থলে ঐরূপ লেখা দেখিল, তখন আমাকে আযাব হইতে মাফ করিয়া দিল।

জানাযাহ নামাযের বয়ান

প্রশ্নঃ- জানাযাহ নামায পড়া কি?

উত্তরঃ- জানাযাহ নামায সম্বন্ধে বহু বিষয় জানিবার আবশ্যক, উহা সম্মুখে দেওয়া হইল।

১। যাদুল আখিরাত কিতাবে বাহরুর রায়েক ও ইবাদতে খাওয়াছ হইতে নকল করিয়াছেন যে, জানাযাহ নামায সকলের মতে ফরজে কেফায়া। একজনে আদায় করিলেও আদায় হইবে। পুরুষই হউক কি স্ত্রীলোকই হউক। যদি কেহই আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হইবে।

২। অন্যান্য নামায শুদ্ধ হইবার জন্য যে যে শর্তের আবশ্যক, যেমন পাক হওয়া, কেবলা রোখ হওয়া, ছতর ঢাকা, নিয়ত করা ইত্যাদি, জানাযাহ নামায পড়িতেও ঐ সকল শর্তের আবশ্যক।

যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- ফরজে কেফায়াকে যদি কেহ তুচ্ছ করে, তবে সে কাফের হইবে।

৩। জানাযাহ নামায আদায়ের জন্য নয়টি শর্ত আছে- তন্মধ্যে প্রথম ৫টি শর্ত যথা- (১) মুসলমান হওয়া, (২) পাক হওয়া, (৩) কাপড় পাক হওয়া, (৪) স্থান পাক হওয়া (৫) ছতর ঢাকা এই পাঁচটি মুর্দার ও মুছল্লী উভয়ের জন্য আবশ্যক। (৬) মুর্দারকে সম্মুখে রাখা চাই। (যমিনের উপরই হউক কিংবা খাটের উপরই হউক) কিন্তু মুর্দার ও

মুছল্লীর মধ্যে যেন কোন আড় (পর্দা) না থাকে। (৭) নামাযী ব্যক্তি বালেগ হওয়া। (৮) মুছল্লীর কেবলা রোখে দাড়ানো। (৯) খাঁটি আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়িয়া মুর্দারের জন্য দোয়া করা।

প্রশ্নঃ- হুযুর! প্রত্যেক শর্তের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ- ১ম শর্তঃ মুসলমান হওয়া। মুসলমানের জানাযাহ নামায কাফের ও কাফেরের জানাযাহ নামায মুসলমানের পড়া শুদ্ধ নহে কিন্তু যদি কোন কাফেরের নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে (যাহারা ইসলাম বুঝে না) তাঁহার পিতা কি মাতার সহিত কয়েদ হয়, আর পিতা মাতা কেহ মুসলমান হয়, ঐ ছেলেমেয়ের মৃত্যু হইলে তাহার জানাযাহ নামায পড়িতে হইবে।

২য় শর্তঃ পাক হওয়া। আলমগীরী, বাহরুর রায়েক ও জামেউর রমুজ কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, বিনা গোসলে অথবা মুর্দারের শরীরে নাপাক থাকিলে জানাযাহ নামায পড়া জায়েয নাই। যেরূপ ইমামের শরীর নাপাক থাকিলে নামায শুদ্ধ হয় না। মুর্দারের শরীরের নাপাক দূর করিতে ও গোসল করাইতে অসাধ্য হইলে তখন ওজরে বিনা গোসলে জানাযা নামায পড়া জায়েয, যেরূপ বিনা গোসলে মুর্দার কবরে রাখার পর মুর্দার কবর হইতে উঠাইতে অক্ষম বিধায় কবরের উপর জানাযাহ পড়া জায়েয।

৩য় শর্তঃ বাহরুর রায়েক দুররুল মোখতার ও জামেউর রমুজ কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মুছল্লীর যেরূপ কাপড় পাকের শর্ত, তদ্রূপ মুর্দারের কাপড়েরও ঐ হুকুম। নাপাক (এক দেরহাম পরিমাণ) লাগিলে ঐ মুর্দারের জানাযাহ পড়া জায়েয নাই। ঐ নাপাক মুর্দারের শরীর হইতে বাহির হইলে জানাযাহ জায়েয হইবে। বাহিরের নাপাক দ্বারা নাপাক হইলে জানাযাহ জায়েয হইবে না।

৪র্থ শর্তঃ বরজেন্দী, বাহরোর রায়েক, দোররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, নামাযের স্থান যেমন পাক হওয়া শর্ত, তদ্রূপ মৃতদেহ পাক স্থানে রাখা শর্ত। পক্ষান্তরে ঐ কিতাবে আলমগীরী কিতাব হইতে লিখিয়াছেন যে, মৃতদেহ পাক স্থানে রাখা শর্ত নহে। উভয় মত মিমাংসা স্থলে হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শামী, বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, মুর্দার যদি খাটের উপর রাখা হয়, আর যমিন নাপাক থাকে তবে কাহারও মতে বাধা নাই। যদি পাক স্থান না পাওয়া যায়, তবে ওজরে নাপাক স্থানে মুর্দার রাখা হইলেও চলিবে। যাহারা মুর্দার রাখার স্থান পাক হওয়া শর্ত নহে লিখিয়াছেন, তাহাদের মতে মুর্দারের কাফন, মুর্দারের পোশাক নহে, বিছানা সদৃশ। কাজেই নাপাক স্থানে রাখিলেও মুর্দার নাপাক স্থানে রাখা হয় না বলিয়া স্থান পাক হওয়া শর্ত বলিয়া প্রকাশ করে নাই। যাহারা স্থান পাক হওয়া শর্ত লিখিয়াছেন, তাহারা মুর্দারের কাফনকে মুর্দারের পোশাক বলিয়া ধরিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, বিনা ওজরে নাপাক স্থানে মুর্দার রাখিবে না। যখন পাক তক্তা বা বিছানা

বিছাইয়া তদুপরি মুর্দার রাখিলে কোন মতভেদ থাকে না, তখন পাক স্থান না পাইলে ঐরূপ তক্তা বা বিছানা বিছাইয়া লইবে। মুছল্লীর দাঁড়ান স্থানটুকু পর্যন্ত পাক হইলেও নামায হইবে। যদি পাক স্থান না পাওয়া যায়, তবে ওজরে পায়ের জুতা পাক থাকিলে খুলিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়া জানাযাহ পড়া জায়েয হইবে। সে জন্য কেহ যেন জুতা পায়ে দিয়া জানাযাহ না পড়ে।

৫ম শর্তঃ বাহরুর রায়েক, জামেউর রমুজ ও দুররুল মোখতার প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মুছল্লী ও মুর্দার উভয়ের যতদূর পর্যন্ত ঢাকা ফরজ, ততদূর স্থান কাহারও উলঙ্গ থাকিলে জানাযাহ নামায হইবে না।

৬ষ্ট শর্তঃ দুররুল মোখতার ও বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবে আছে- মুর্দার হাজির থাকা চাই, যমিনে হউক কিংবা খাট ইত্যাদির উপর হউক, ইমামের বরাবর সম্মুখে কিবলাদিকে থাকা আবশ্যক। ইমাম ও মৃতদেহের মধ্যে কোন আড়াল না থাকা চাই, যেরূপ মৃতদেহ হাজির না থাকিলে জানাযাহ হইবে না, তদ্রূপ মৃতদেহ কোন সওয়ারীর উপর বা লোকের স্কন্ধে কিংবা হাতের উপর থাকিলে জানাযাহ হইবে না।

ইমামের ডাহিনে, বামে কিংবা পশ্চাতে অথবা মধ্যে আড়াল অবস্থায় মুর্দার থাকিলে নামায হইবে না।

৭ম শর্তঃ দুররুল মোখতার কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন ইমামের বালেগ হওয়া শর্ত। বরজেন্দি কিতাব হইতে ঐ কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ইমাম বালেগ স্ত্রীলোক কিংবা বালেগ গোলাম বা বান্দী হউক, জানাযাহ নামায পড়িলে শুদ্ধ হইবে।

৮ম শর্তঃ জামেউর রমুজ কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ইমাম কিবলা রোখ হইয়া মুর্দারের ছীনা বরাবর দাঁড়াইবে। মুর্দার স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক, সকলের একই হুকুম।

৯ম শর্তঃ জামেউর রমুজ হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন- জানাযাহর নিয়ত করা চাই। তাহা যেন খাছ আল্লাহর ওয়াস্তে পড়া হয় ও মুর্দারের দোয়ার জন্য হয়। বাহরুর রায়েক, নাহরুল ফায়েক ও ফতহুল কাদীর প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, জানাযাহ নামাযের তিনটি রোকন আছে, যথা- (১) কেয়াম (দাঁড়ান)। বিনা ওজরে বসিয়া বা কোন সওয়ারীর উপর থাকিয়া জানাযাহ পড়িলে দুরস্ত হইবে না, (২) চারি তাকবীরের শেষ তিন তাকবীর, (৩) দোয়া।

জানাযাহর আনুষঙ্গিক মাসয়ালা

১। যদি কোন মাসবুক আসিয়া জানাযায় শরীক হয়, আর মনে করে যে, দোয়া পড়িতে পড়িতে মুর্দার যমিন হইতে স্কন্ধে উঠাইয়া নিবে, এমতাবস্থায় দোয়া না পড়িয়া বাকী তাকবীর বলিয়া শেষ করিবে।

২। আলমগীরী কিতাবে আছে– এক ব্যক্তি ইমামের প্রথম তাকবীর বলার পরে আসিয়া

উপস্থিত হইল, সে প্রথমে উপস্থিত ছিল না। সে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। তৎপর ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর বলিলে তাহার সহিত তাকবীর বলিয়া নামাযে শামিল হইবে। ইমাম নামায শেষ করিলে উক্ত মাসবুক জানাযাহ ভূমি হইতে উত্তোলন করিবার পূর্বে বাকী তাকবীর নিজে আদায় করিয়া নামায শেষ করিবে। ঐরূপ দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় তাকবীরের পরে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেও ইমামের পুনঃ তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে এবং তাকবীর বলার সাথে সাথে নামায ভুক্ত হইবে। কিন্তু কেহ ৪র্থ তাকবীরের পরে সালাম ফিরাইবার পূর্বে আসিয়া উপস্থিত হইলে নামাযে শরীক হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে. ছহীহ কওল মতে নামাযে শরীক হইবে এবং মৃতদেহ মাটি হইতে উঠাইবার পূর্বেই অবশিষ্ট তিন তাকবীর তাড়াতাড়ি আদায় করিবে। ইহাতে কোন দোয়া পাঠ করিবে না।

শামী কিতাবে আছে— জানাযাহ নামাযের চারি তাকবীরে শেষ তাকবীর বলিয়া সালামের পূর্বে নামাযে শামিল হইলে উক্ত ওজরে শরীক হওয়া সিদ্ধ হইবে. এবং ইমামের সালামের পরে তিন তাকবীর আদায় করিতে হইবে। শামী কিতাবের মর্মে জানা যায় যে. জানাযার নামাযের প্রত্যেক তাকবীর এক এক রাকয়াতের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং নামাযের মধ্যে যেরূপ রুকূর পরে আসিয়া কেহ শরীক হইলে পরবর্তী রাকয়াত হইতে গণনা করা হয়. সেই রূপ জানাযাহ নামাযেও দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ে আসিয়া শামিল হইলে পরবর্তী তাকবীর হইতে গণনা করা হইবে এবং তাহার পূর্ববর্তী তিন তাকবীর আদায় করিতে হইবে।

আলমগীরী কিতাবে আছে- যদি কেহ জানাযার স্থানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইমামের সহিত প্রথম তাকবীরে শরীক না হইয়া থাকে তবে তাহার দ্বিতীয় তাকবীর পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না,বরং ঐ অবস্থায় শরীক হইবে। তাহার প্রথম তাকবীর পুনঃ আদায় করিতে হইবে না। কেননা সে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হইবার জন্য প্রস্তুত ছিল বলিয়া প্রথম হইতেই তাহাকে নামাযভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। যদি তাকবীর বলিবার মধ্যে মুর্দার উঠাইয়া নেওয়ার আশংকা হয়, তবে দোয়া না পড়িয়া তাড়াতাড়ি ঐ তাকবীর সমূহ বলিয়া শেষ করিবে। আর যদি তাকবীর আদায়ের পূর্বেই মুর্দার স্কন্ধে উঠাইয়া লয়, তবে আর বাকী তাকবীর বলিবে না।

হেদায়া, এনায়া, কেফায়া, আলমগীরী ও তাবীনুল হাকায়েক প্রভৃতি কিতাবে আছে- ছহীহ কওল মতে জানা যায়, যদি ইমাম ভুলে পাঁচ তাকবীর বলে, তবে মুক্তাদীগণ সঙ্গে সঙ্গে ৫ম তাকবীর বলিবে না, বরং চুপ থাকিবে, কিন্তু পরে ইমামের সহিত সালাম ফিরাইবে।

জানাযাহ নামাযে দাঁড়াইবার নিয়ম

১। ইব্রাহীম শাহী, সফরে ছায়াদাত, শরহে বরজখ, শরহে মুসলিম শরীফ, আলমগীরী, তাতারখানী, জামেউর রমুজ, বাহরুর রায়েক, কাঞ্জল ইবাদ, বাহরে জোখার মাখতারুল ফাতাহ প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছেন- জানাযাহ নামাযে চল্লিশজন মুছল্লী হওয়া মুস্তাহাব। ছহীহ হাদীস শরীফে আছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চল্লিশজন বা একশতজন অথবা তদপেক্ষা

অধিক লোকে যাহার জানাযাহ পড়িবে, তাহাকে আল্লাহ মাফ করিবেন। অতএব যাহাতে জানাযায় বেশী লোক হয়, তজ্জন্য চারিদিকে সংবাদ দিবে।

৩। জানাযাহ নামাযে তিন কাতার হওয়া মুস্তাহাব। ৬/৭ জন হইলেও তিন কাতার করিবে। যেমন একজন ইমাম, পিছনের কাতারে ৩ জন, ২য় কাতারে ২ জন, ও শেষ কাতারে একজন। মোট ৬ জন লোক হইলে প্রথমে ইমাম, তৎপর দুইজন, তৎপর দুইজন, তৎপর একজন দাঁড়াইয়া পড়িলেও মুস্তাহাব আদায় হইবে। প্রকাশ থাকে যে, পিছনের কাতারে একজন দাঁড়াইলে মাকরূহ হয় না। হাদীস শরীফে আছে- যে জানাযার নামায তিন কাতারে পড়িবে সেই মুর্দারকে আল্লাহ মাফ করিবেন।

৪। ঐ কিতাবে আছে- জানাযার পিছনের কাতারে ছওয়াব বেশী হয় অন্যান্য নামাযের প্রথম কাতারে ছওয়াব বেশী।

৫। মুর্দারের ছীনা বরাবর ইমাম দাঁড়ান মুস্তাহাব। স্ত্রীলোক মুর্দার হউক কিংবা পুরুষ মুর্দার হউক। একটু এদিক ওদিক সরিয়া দাঁড়াইলেও নামায জায়েয হইবে। কিন্তু নাভি বা মাথা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইবে না।

৬। ইমামের এতদূর পিছনে মুক্তাদী দাঁড়াইবে, যেমন অন্য নামাযে মুক্তাদী দাঁড়ায়, ইহা মুস্তাহাব। মুক্তাদী ইহার চেয়ে কিছু বেশী দূরে দাঁড়াইলেও নামায জায়েয হইবে। কিন্তু ইমাম ও মুক্তাদী বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইলে মুক্তাদীর এক্তেদা শুদ্ধ হইবে না। যেমন ইমাম উচ্চ স্থানে ও মুক্তাদী নিম্ন স্থানে। যেরূপ অন্য নামাযে নিয়ম।

৭। জানাযার নামাযে চারি তাকবীর ও দুই সালাম আছে। মৃত্যুদেহ সম্মুখে রাখিয়া নিয়ত পড়িবে।

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى

النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ- "নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া আরবাআ তাকবীরাতি ছালাতিল জানাযাতি আচ্ছানাও লিল্লাহি তায়ালা ওয়াচ্ছালাতু আলান্নাবিয়্যি ওয়াদ্দোয়াও লিহাযাল মাইয়্যিতি, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।"

এইরূপ নিয়ত করিয়া দুই হাত উঠাইয়া দুই কর্ণের লতীতে বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বয় স্পর্শ করাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ইমাম "আল্লাহু আকবার" তাকবীর উচ্চরবে বলিয়া অন্যান্য নামাযের ন্যায় হাত বাঁধিবে। (তরীকুল ইসলাম ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে "লিহাযাল" স্থলে "লিহাযিহিল" বলিবে, তৎপর ছানা পড়িবে। যথাঃ-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণঃ- "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা

জাদ্দুকা ওয়াজাল্লা ছানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।"

চুপে চুপে পাঠ করতঃ হাত না উঠাইয়া পুনঃ আল্লাহু আকবার বলিবে। তৎপর নিম্ন দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ

وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা ওয়া সাল্লামতা ওয়া বারাকতা ওয়া রাহিমতা ওয়া তারহামতা আলা সায়্যিদিনা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি সায়্যিদিনা ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজিদ, পড়িয়া পুনঃ আল্লাহু আকবার বলিবে। তারপর বালেগ হইলে নিম্ন দোয়া পড়িবে। যথাঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরীনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহী আলাল ইসলামি, ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।

ইহা পাঠ করতঃ আল্লাহু আকবার বলিয়াই সালাম ফিরাইয়া জানাযার নামায শেষ করিবে। নাবালেগ ছেলে হইলে উক্ত দোয়ার পরিবর্তে নিম্ন দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজ আলহুলানা ফারতাওঁ ওয়াজআলহু লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজআলহু লানা শাফিয়াওঁ ওয়া মুশাফ্ফাআ।

নাবালেগা মেয়ে হইলে

"ওয়াজআলহু লানা স্থলে ওয়াজআলহালানা- শাফিয়াওঁ এর স্থলে শাফিয়াতাওঁ মুশাফ্ফাআ এর স্থলে মোশাফ্ফায়াহ পড়িবে।"

প্রকাশ থাকে যে, জানাযার দোয়া ও নিয়ত বিভিন্ন প্রকারের আছে। কিন্তু এক প্রকারই লিখা হইল।

মুক্তাদীর কর্তব্য

মুক্তাদী নিয়তের মধ্যে লিহাযাল মাইয়্যিতির পর এক্তাদাইতু বিহাযাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা যিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি পাঠ করতঃ আল্লাহু আকবার" বলিয়া

তাহরীমা বাঁধিবে। তৎপর ইমামের যেরূপ ছানা, দোয়া ও দরূদ শরীফ পড়িতে হয়, তদ্রূপ পড়িবে। যদি মুক্তাদীগণ অশিক্ষিত হয় ও নিয়ত পাঠ করিতে না জানে, তবে নিম্নরূপ নিয়ত করিবে।

শারায়াতু ফি ছালাতিল ইমাম ওয়া এক্তাদাইতু বিহী অর্থাৎ ইমামের নামায শুরু করিলাম এবং তাহার অনুসরণ করিলাম।

বাকী দোয়া দরূদ না জানিলে দোয়ার নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়িবে। যদি তাহাও না জানে,তবে শুধু তাকবীর বলিবে। (মালাবুদ্দামিনহুর হাশিয়া ও মোজাহেরে হক কিতাবের ২য় খন্ডের জানাযার বয়ানে আছে) ইমামের সহিত সালাম ফিরাইবে। শামী ও দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- দুই পার্শ্বস্থ মুছল্লী ও ফেরেশতাদের প্রতি সালামের নিয়ত করিবে এবং শেষে সালাম চুপে চুপে বলিবে। ছালাম ফিরাইবার সময় উভয় হাত ছাড়িয়া দিয়া ছালাম ফিরাইবে।

একাধিক মুর্দারের একত্রে জানাযাহ পড়া

বাহরুর রায়েক, তাতারখানিয়া, আলমগীরী, দুররুল মোখতার, ফতহুল কাদীর, মিনহুল গাফার, নাহরুল ফায়েক প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছে-

১। একাধিক মুর্দার একত্র হইলে, ইমাম ইচ্ছা করিলে পৃথক পৃথক ভাবে কিংবা একত্রে সকলের জানাযাহ একবার পড়িতে পারে। কিন্তু পৃথক পৃথক জানাযাহ পড়া ভাল। পৃথক পৃথক জানাযাহ পড়িতে হইলে, যে মুর্দার ব্যক্তি বেশী পরহেজগার ছিল তাহার জানাযাহ প্রথমে পড়িবে, ঐরূপ পর পর পড়িবে।

একত্রে সকলের জানাযাহ পড়িতে হইলে, যদি সকলেই এক শ্রেণীর হয়, তবে স্ত্রীলোক হউক কি পুরুষ হউক, মুর্দার রাখার দুইটি নিয়ম আছে-

১ম নিয়মঃ- ইমামের সম্মুখে বেশী দ্বীনদার ব্যক্তিকে রাখিয়া তাহার পর বাকী মুর্দারকে যথাক্রমে মাথার দিক কিংবা পায়ের দিকে লম্বাভাবে রাখিতে পারে।

২য় নিয়মঃ- বেশী দ্বীনদার ব্যক্তিকে ইমামের সম্মুখে রাখিয়া বাকী মুর্দারকে যথাক্রমে পাশাপাশি রাখিয়া দিবে, যেন সকলের ছীনা বরাবর থাকে। এই নিয়ম উত্তম। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জঙ্গে ওহুদের শহীদগণের জানাযাহ এইরূপে পড়িয়া ছিলেন। মুর্দার যদি পুরুষ, স্ত্রীলোক কি নপুংষক ইত্যাদি একত্র হয়, তবে যথাক্রমে পুরুষ, তৎপর বালক শিশু, তৎপর যথাক্রমে নপুংষক, তৎপর স্ত্রীলোক, বালিকা, শিশু বালিকা রাখিয়া জানাযাহ পড়িবে। সকলের জানাযাহ পড়িতেছি, এই নিয়ত করিবে।

২। যদি মুর্দারের মধ্যে হোর (স্বাধীন) ও গোলাম উভয় থাকে তবে ইমামের সম্মুখে স্বাধীন ব্যক্তিকে রাখিবে, যদিও সে নাবালেগ হয়। গোলাম ও আজাদ একত্র

হইলে, গোলাম দ্বীনদার পরহেজগার বেশী হইলে, গোলামকেই ইমামের সম্মুখে রাখিতে হইবে।

৩। যদি গোলাম ও আজাদ স্ত্রীলোকের লাশ একত্র হয়, তবে ইমামের সম্মুখে গোলামকে রাখিয়া পার্শ্বে আজাদ স্ত্রীলোক রাখিবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মুর্দারের জানাযাহ নামায একত্রে পড়িতে হইলে, এক প্রকার দোয়া দরূদ পড়িলেই হইবে। যদি পুরুষ মুর্দারের নিয়তে নামায পড়ে, আর ঐ মুর্দার স্ত্রী হয় কিংবা স্ত্রী মুর্দারের নিয়তে নামায পড়ে ও মুর্দার যদি পুরুষ হয়, তবে জানাযাহ হইবে না।

কোন্ কোন্ মৃত ব্যক্তির জানাযাহ পড়া জায়েয বা নাজায়েয তাহার বিবরণ

খাযানাতুর রেওয়ায়েত, দুররুল মোখতার, আলমগীরী, কাজীখান, মিনহাতুল খালেক, ইব্রাহীমশাহী, বাহারেজেখার, তাতারখানিয়া, মোক্তারুল ফতোয়া, নাহরুল ফায়েক, প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাতে লিখিয়াছেন যে, (১) যদি কোন ব্যক্তি নিজে স্বেচ্ছায় অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে ঐ ব্যক্তির জানাযাহ পড়িবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ঐ ব্যক্তির জানাযাহ পড়িবে। এই কওলই শুদ্ধ।

(২) যদি অনিচ্ছায় নিজ অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়, যেমন শত্রুকে আঘাত করিবার কালে ঘটনাক্রমে নিজের উপর পড়িয়া মৃত্যু হইলে সকলের মতে তাহার জানাযাহ নামায পড়া জায়েয আছে।

(৩) স্বেচ্ছায় আগুনে জ্বলিয়া মরিলে তাহার জানাযাহ পড়া জায়েয নাই।

(যাদুল আখিরাত)

(৪) নিজে গলায় রশি দিয়া বা গলা টিপিয়া মরিলে, তাহাকে গোসল করাইবে ও জানাযাহ পড়িবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে শুধু গোসল করাইবে।

(৫) যদি কাহারও বিচারে ফাঁসি হয়, বা কোন প্রকার কেছাছ গ্রহণে মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে যথারীতি গোসল করাইবে ও জানাযাহ নামায পড়িবে।

(৬) জারজ সন্তান ও তাহার মাতার মৃত্যু হইলে গোসল ও জানাযাহ উভয় সমাধা করিবে।

(৭) দারুল হরবে থাকিয়া যদি কোন মুসলমান অল্প বয়স্ক কাফের গোলাম খরিদ করে, আর তখন ঐ গোলামের মৃত্যু হয়, তবে তাহার জানাযাহ নামায পড়িবে না।

আলমগীরী কিতাবে আছে- দারুল হরবে অবস্থানকালে যদি কাফেরের একা ছোট শিশু মুসলমানের হস্তগত হয়, আর তথায় মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে গোসল দিয়া জানাযাহ নামায পড়িবে।

(৮) মৃত্যুর পর্বক্ষণে খৃষ্টান মুসলমান হইলে তাহার জানাযাহ পড়িবে না। কিন্তু সে যদি বলিয়া থাকে যে, আমি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করিলাম, তবে তাহার জানাযাহ পড়িবে।

(৯) রাজদ্রোহীর বিদ্রোহের অবস্থায় এবং ডাকাতি করিতে যাইয়া নিহত হইলে তাহার জানাযাহ পড়িবে না।

(১০) রাজদ্রোহী বা ডাকাত ধরিবার কালে যদি তাহারা রাজ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও নিহত হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকেও জানাযাহ করিবে না বটে কিন্তু গোসল করাইয়া দিবে, যেন সাধারণে শহীদ বলিয়া মনে না করে। এই কওলেই ফতোয়া (মুসলমান বাদশাহর বিপক্ষীয় হইলে)

(১১) যদি রাজদ্রোহী ও ডাকাত, শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত পরাস্ত হইয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত করে, এমতাবস্থায় উহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিলে, তাহাদের গোসল করাইবে ও জানাযাহ পড়িবে।

(১২) চুরির অপরাধে বাদশাহ যদি চোরকে শূলে দিয়া মারে, তবে তাহার নামায পড়া সম্বন্ধে ইমাম ছাহেব হইতে আবু সালমান রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তাহার জানাযাহ নামায পড়িবে না।

কবরের বয়ান

মারাকিল ফালাহ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, জামেউর রমুজ, শরহে ইলিয়াছের হাশিয়া, শরস্বালালিয়া, তাবীনুল হাকায়েক, দুররুল মোখতার ও বরজেন্দী প্রভৃতি কিতাবে আছে- কবর মৃত ব্যক্তির অর্ধেক পরিমাণ বা ছীনা পরিমাণ গভীর করিবে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী গভীর করিতে পারিলে ভাল হয়।

১। শামী ও কবীরী কিতাবে কবরের গভীরতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কমপক্ষে মানুষের অর্ধেক পরিমাণ এবং বেশীর ভাগে মানুষ বরাবর গভীর করিবে। কিন্তু স্থানভেদে অর্ধেকের বেশী যতদূর গভীর করিতে পারে, তাহাই উত্তম।

২। মারাকিল ফালাহ কিতাবে কবর গভীর করার কারণ লিখিত আছে যে, মৃতদেহ হিংস্র জন্তুতে উঠাইতে না পারে। শামী, কবীরী, তাহতাবী, যাদুল আখিরাত প্রভৃতি কিতাবে কবর গভীর করার উদ্দেশ্য এই লিখিয়াছেন যে মৃতদেহের দুর্গন্ধ উর্দ্ধে না উঠে ও হিংস্র প্রাণীতে মৃতদেহ উপরে উঠাইতে না পারে।

৩। শামী ও আলমগীরী কিতাবে আছে- মানুষ যাহাতে কবরে রাখিতে পারে তত পরিমাণ দীর্ঘ ও মানুষের অর্ধেক পরিমাণ প্রস্থ করিবে।

৪। শামী, বাহরুর রায়েক, মারাকিল ফালাহ, এনায়া, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, আইনী, হেদায়ার হাশিয়া, ফতোয়ায়ে বোরহান প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছে যে, কবর দুই প্রকার (১) লহদ্ (২) শাক্। লহদ কবর করা সুন্নাত। কিন্তু মাটি নরম হইলে শাক্ কবর করা জায়েয আছে। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে মাটি নরম হইলে শাক কবর করা মুস্তাহাসান (ভাল)।

আরকানে আরবাআ কিতাবে আছে, যে স্থানে লহদ ও শাক কোনও প্রকার কবর করিতে পারা যায় না, যেমন বালুকাময় ভূমি, তথায় কতকস্থান খুদিয়া মাটি দিয়া রাখিবে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা শক্তির অতীত কাজ করিতে হুকুম করেন নাই।

প্রশ্নঃ লহদ ও শাক কবর কিরূপ জানিতে বাসনা।

উত্তরঃ আলমগীরী, তাহতাবী, শামী ও বাহরুর রায়েক প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, পূর্বে লিখিত রূপে কবর খনন করিয়া কিবলার দিকে কাত (ঢালু) করিয়া এমন ভাবে গর্ত খনন করিবে, যাহাতে মৃতদেহ ফরাগত মত রাখা যায়, ইহাই লহদ।

শাক্ কবর শামী, বাহরুর রায়েক, এনায়া, মারাকিল ফালাহ, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, আইনী হেদায়ার হাশিয়া, ফতোয়ায়ে বোরহান প্রভৃতি কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, মৃতদেহের অর্দ্ধ শরীর পরিমিত কিংবা পূর্ণশরীর পরিমিত গভীর কবর খনন করিয়া উহার মধ্যে মৃতদেহ পরিমাণ দৈর্ঘ-প্রস্থ বিশিষ্ট একটি স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র কবরের ন্যায় খনন করিবে, যাহাতে মৃতদেহ স্বচ্ছন্দে রাখা যায়। (ইহাকে সিন্দুক কবর বলা হয়।)

প্রশ্নঃ কোন কোন দেশে যেরূপ কবর খনন করিয়া মাটি দিয়া থাকে, পূর্বোক্ত কিতাব সমূহের মর্ম মতে বুঝা যায় যে, ঐরূপ কবর সমূহ কিতাব অনুযায়ী হইতেছে না, অতএব কিতাব সমূহের মোতাবেক কিরূপ করিব, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে মর্জি হয়।

উত্তরঃ বৎস! আমরা এতদ্দেশে যেরূপ কবর তৈয়ার করিয়া থাকি তাহা বাস্তবিকই কোন কিতাব অনুযায়ী হয় না। আমরা দেশের রছম অনুযায়ী কবর তৈয়ার করিয়া থাকি, উহা আমাদের ভুল বটে। যাহা হউক, কিতাব লিখিবার উপলক্ষ্যে যত কিতাব দেখিলাম, তাহাতে লহদ কবর করা সুন্নাত বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে মাটি নরম বলিয়া শাক কবর করিবে, ইহা জায়েয আছে।

পশ্চিমাঞ্চলে কবর খুদিয়া তন্মধ্যে মানুষটি স্বচ্ছন্দে কিবলামুখী করিয়া শয়ন করাইতে পারে এমত খুদিয়া, যাহাতে মানুষ স্পর্শ না করে তদ্রূপভাবে টালি বা তক্তা দিয়া তদুপরি মাটি ভরিয়া দেওয়া হয়, ইহাই কিতাবের মত। যেহেতু কবরের উপর বেশী মাটি থাকিলে দুর্গন্ধ উপরে উঠিতে পারে না ও হিংস্র জন্তুতে উঠাইয়া নিতে পারিবে না।

আমাদের দেশে যথারীতি কবর হয় না বলিয়া স্থানে স্থানে কবর ভাঙ্গিয়া যায় ও শিয়ালে উঠাইয়া খায়। কবরের মধ্যে শিয়ালে পায়খানা করে। অতএব কর্তব্য যে, একহাত বা সোয়া হাত নীচে কবরের হাসিয়া রাখিয়া কবর করতঃ চালি বা তক্তা দিয়া তদুপরি মাটি ভরিয়া দিবে, যেন বাঁশ বা তক্তার উপর একহাত কিংবা দেড় হাত মাটি পড়ে। তাহা হইলে আর ঐরূপ দুর্গন্ধ হইবে না এবং শিয়ালে উঠাইতে পারিবে না বা ভাঙ্গিয়া যাইবে না। কাজেই এই মাসয়ালাটি সকল স্থানে প্রচার করা একান্ত কর্তব্য।

মৃতদেহ কবরে রাখিবার বিবরণ

১। আলমগীরী, বাহ্রুর রায়েক ২য় খন্ড, শরহে ইলিয়াছ দুররুল মুন্তাকা, জামেউর রমুজ প্রভৃতি কিতাবে আছে মৃতদেহ ডাহিন কাতে কিবলাদিকে মুখ করিয়া শয়ন করাইয়া রাখিবে। জাওহারাতুন্নাইয়্যেরা, যাদুল আখিরাত, তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মৃতদেহ একেবারে চিৎভাবে অথবা একেবারে উপুরভাবে রাখিবে না।

এই দুই কথার মর্মে জানা যায় যে, মধ্যম অবস্থায় রাখিবে। তাহতাবী কিতাবে আছে, মৃতদেহের পিঠের নীচে এমত মাটি রাখিবে যেন একেবারে চিৎ হইয়া না পড়ে। এই কথার মর্মে জানা যায় যে, শাক্ কবর কিংবা লহদ কবর এমত ঢালুভাবে করিতে হইবে, যেন মৃতদেহ কাতভাবে কিবলামুখী থাকে। শামী কিতাবে তোহফা কিতাবের কথা উল্লেখ করতঃ লিখিয়াছেন যে, ঐ কিতাবে মৃতদেহ কিবলাদিকে মুখ করিয়া রাখা সুন্নাত লিখিয়াছেন। কিন্তু আইনী, শরহে বেকায়া, তাবিনুল হাকায়েক, মারাকিল ফালাহ প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলিয়াছেন যে, মৃতদেহ কেবলামুখী রাখিবে।

দুররুল মোখতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শামী, শরহে বেকায়ার হাশিয়া প্রভৃতি কিতাবে আছে- হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ বলিয়া এইরূপ কিবলাদিকে মুখ রাখা ওয়াজিব।

দাফন করিতে নেওয়ার বিবরণ

১। যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- মুর্দারকে ঘর হইতে বাহির করিবার সময় প্রথমে মাথার দিকে বাহির করিবে, এমনকি গোরস্থানে লইয়া যাইবার সময়ও মাথা সামনের দিকে রাখিবে। শরম্বালালিয়া কিতাবেও ঐরূপ লিখিয়াছে।

২। মুর্দারকে কাফন দেওয়া ও গোসল করান যেরূপ ফরজে কেফায়া; কবরস্থানে বহন করিয়া নেওয়াও তদ্রূপ ফরজে কেফায়া।

৩। মুর্দারকে তক্তা বা খাটের উপর রাখিয়া চারিজন লোকে চারি কোণ ধরিয়া কাঁধে লইবে (সুন্নাত)। কাঁধে লইবার সময় "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" বলিবে (মুস্তাহাব)। স্কন্ধে লইয়া দশ পা হাঁটার পর মুর্দার বহনকারীগণের ডাহিন পার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তি তাহার পশ্চাতের ব্যক্তির নিকট যাইবে এবং ডাহিন পার্শ্বের পশ্চাতের ব্যক্তি বাম পার্শ্বের পশ্চাতের ব্যক্তির নিকট এবং বাম পার্শ্বের পশ্চাতের ব্যক্তি বাম পার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তির নিকট আর বাম পার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তি ডাহিন পার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তির স্থানে যাইবে। মুর্দারকে স্কন্ধ বরাবর রাখিয়া ঐরূপ চারিবার ঘুরিতে ঘুরিতে যাহার যে স্থান ছিল সে ব্যক্তি সেই স্থানে আসিয়া পৌছিবে। এই কথা নিম্নলিখিত কিতাবেও আছে- মারাকিল ফালাহ, তাহতাবী, যাদুল আখিরাত, আলমগীরী, নূরুল ইজাহ, বাহরুর রায়েক, তাবীনুল হাকায়েক, কবীরী, আইনী, শরহেকাঞ্জ, মাজালেছুল আবরার প্রভৃতি কিতাবে এইরূপ করা মুস্তাহাব লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাবে হাদীস শরীফ হইতে লিখিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ চল্লিশ পা হাঁটিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার চল্লিশটি কবীরাহ গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

যাদুর আখিরাত কিতাবে আছে- উপস্থিত লোকের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দ্বীনদার ও পরহেজগার হইবে, সে প্রথমে মুর্দারের খাট উঠাইবে। যেহেতু হযরত রাসূলে করীম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়াযের পুত্র ছায়াদের জানাযাহ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ কিতাবে আছে, স্ত্রীলোক মুর্দার হইলেও স্ত্রীলোকে জানাযার খাট উঠাইবে না বা বহন করিয়া নিবে না।

৪। মুর্দারের খাট দুইজনে কাঁধে করিয়া নেওয়া মাকরূহ। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ ঘটিলে মাকরূহ হইবে না, যেমন রাস্তা এত সরু যে, সে স্থান দিয়া একজনের বেশী চলা যায় না অথবা চারি জনে কাঁধে করিয়া নিতে বিশেষ অসুবিধা হয়, কিংবা বহন করিয়া নিতে লোকের অভাব হয় ইত্যাদি। (যাদুল আখিরাত)

৫। মুর্দারের খাট এক পার্শ্বের লোকের স্কন্ধের উপর ও অপর পার্শ্বের লোকের হাতের উপর করিয়া নেওয়া মাকরূহ।

৬। মুর্দারকে তাড়াতাড়ি বহন করিয়া নিবে কিন্তু এইরূপ দৌড়াইবে না, যাহাতে মুর্দার নড়াচড়া পায় বা কোন কষ্ট হয়।

৭। যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত মুর্দারকে গোরস্থানে নেওয়ার পথে নামাইবে না।

৮। মুর্দার দুগ্ধপোষ্য শিশু হউক কিংবা দুধ ছাড়িয়া থাকুক, যদি তাহাকে একজনে হাতে বহন করিয়া গোরস্থানে নিতে পারে, তবে সেরূপ নেওয়া জায়েয আছে।

নেওয়ার সময় একজনের হাত হইতে পরিবর্তন করিয়া অন্যে বহন করিয়া নিলেও সিদ্ধ হইবে। ঘোড়া উট ইত্যাদি সাওয়ারের উপর চড়িয়া ঐরূপ হাতে করিয়া নেওয়া জায়েয আছে। উক্ত রূপ শিশু মুর্দারকে তক্তা বা খাট ইত্যাদির উপর করিয়া নেওয়াও কোন দোষ নাই, তবে হাতে করিয়া নেওয়া উত্তম। (যাদুল আখিরাত) মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)-এর জানাযার পাছে পাছে খালি পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন।

৯। মুর্দার দাফন করিতে নেওয়ার সময় মুর্দারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদের যাওয়া মাকরূহ।

১০। মুর্দারের পিছে পিছে পায়দলে হাঁটিয়া যাওয়া ভাল (যাদুল আখিরাত) মুর্দারের আগে আগে যাওয়ার চেয়ে পশ্চাতে যাওয়ায় এত বেশী ফজীলত, যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরজ নামায উত্তম। এইরূপ নূরুল ইজাহ, জামেউর রমুজ, এনায়া, ফতহুল কাদীর ও কেফায়া কিতাবে লিখিত আছে যে, মুর্দারের পিছে পিছে চলাই খুব ভাল। তাহতাবী ও ফতহুল কাদীর কিতাবে লিখিয়াছে যে, মুর্দারের পশ্চাৎ হইতে সমস্ত লোকের মুর্দারের আগে যাওয়া মাকরূহ। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হইতে কোন কোন রেওয়ায়েতে লিখিয়াছেন, মুর্দারের ডাহিন বা বাম পার্শ্বে যাওয়ায় কোন দোষ নাই। মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে, পশ্চাতে সওয়ারীতে যাওয়ায় কোন দোষ নাই, যদি অপরকে কষ্ট না দেয়, কিন্তু আগে যাওয়া মাকরূহ। যাদুল আখরাত কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, যদি কতক লোক পায়দলে হাঁটিয়া যায় আর কতক মুর্দারের আগে আগে যায়,

তবে তাহাও জায়েয আছে।

১১। যাদুল আখিরাত ও দুররুল মোখতার কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, বিশেষ নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি কোন স্ত্রীলোক কান্নাকাটি করিতে করিতে মুর্দারের পিছে পিছে যায়,তবে মুর্দারের সঙ্গীয় পায়দল যাত্রীগণের মুর্দারের আগে যাওয়াই ভাল। দুররুল মোখতার কিতাবে আছে- মুর্দারের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যাওয়া মাকরূহ তাহরীম।

১২। কোন প্রকার সওয়ারীতে ছওয়ার হইয়া মুর্দারের সঙ্গীয় লোকগণের সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া মাকরূহ। কিন্তু মুর্দারের পিছনে মুর্দার হইতে কিছু দূরে থাকিলে মাকরূহ হইবে না। (যাদুল আখিরাত)

১৩। ঐ কিতাবে আছে, মুর্দারকে রেশমী বা বুটাদার কাপড় অথবা লাল কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া নেওয়া ও মুর্দারকে কবরস্থানে লইয়া যাইবার সময় ফুল ইত্যাদি অর্পন করা বিদয়াত (যাদুল আখিরাত)। মুর্দারকে দাফন করিতে লইয়া যাইবার সময় পথে খোশবু, চেরাগ বাতি জ্বালাইবে না।

১৪। মুর্দারকে দাফন করিতে লইয়া যাইবার সময় হউক অথবা আগে কি পিছনে হউক, যাহা শরীয়তের বহির্ভূত হয়, মুর্দারের এইরূপ অসম্ভব প্রশংসা করা মাকরূহ। কিন্তু মুর্দারের জীবিত অবস্থায় তাহার মধ্যে যে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ নাই। (যাদুল আখিরাত)

১৫। লাশ বহনকারীগণ অথবা মুর্দারের সঙ্গীয় লোকগণের উচ্চৈঃস্বরে কুরআন শরীফ পড়া বা যিকির করা মাকরূহ তাহরীম। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী) কিন্তু মনে মনে আয়াত পড়া বা যিকির করায় দোষ নাই। (যাদুল আখিরাত)

১৬। কোন কথা না বলিয়া চুপে চুপে মুর্দারকে কবরস্থানে লইয়া যাওয়া মুস্তাহাব। মুর্দারকে গোরস্থানে নেওয়ার সময় দুনিয়াদারীর কথা বলিবে না বা হাসি ঠাট্টা করিবে না। যেহেতু যাহারা ঐরূপ করে তাহাদের অন্তঃকরণ মলিন ও কঠিন হইয়া যায়। ঐ সময় সকলে মৃত্যু চিন্তা করিবে ও চুপে চুপে আল্লাহর নাম ইয়াদ করিবে।

১৭। যাদুল আখিরাতে আছে- কবর কিংবা মুর্দারের নিকট বসিয়া হাসি ঠাট্টা করা মাকরূহ। ঐ কিতাবে আছে, মুর্দারকে কবরের পার্শ্বে রাখিবার পূর্বে সঙ্গীয় লোকদের বসা মাকরূহ। এতদ্ব্যতীত খানিয়া, দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার, বরজেন্দি শরহে ইলিয়াছের হাশিয়া, তাহতাবী, এনায়া-বাহরুর রায়েক, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, কাজীখান, আলমগীরী, মাজমাউল আনহুর, দুররুল হেকাম, জামেউর রমুজ, জওহারাতুন্নাইয়্যেরা প্রভৃতি কিতাবে লিখিয়াছেন যে, মুর্দারকে কাঁধ হইতে নামাইবার পূর্বে সঙ্গীয় লোকদের বসা মাকরূহ।

১৮। মুর্দারকে কাঁধ হইতে নামাইয়া সঙ্গীয় লোকেরা বসিবে, দাঁড়াইয়া থাকিলে মাকরূহ হইবে। এই মতভেদ মীমাংসার জন্য শামী ও বাহরুর রায়েক কিতাবে নিম্ন হাদীস উল্লেখ করতঃ মতভেদ রদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, মুর্দারকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া

তাহার সঙ্গীয় লোকদের দাঁড়াইয়া থাকা মাকরূহ। হাদীস- একদা আছহাবগণ একটি মুর্দার আনিয়া জমির উপর রাখিয়া ছিলেন, তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। সে সময় আঁ- হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আছহাবগণ দাঁড়ান ছিলেন। এক ইহুদী আঁ- হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, হযরত আমাদের মত করিয়াছেন। আমরা যেরূপ মুর্দার রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকি, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তদ্রূপ দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা শুনিয়া হযরত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছহাবদিগকে বলিলেন বস। ইহুদীদের উল্‌টা কর অর্থাৎ মুর্দার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে না। ঐ হাদীস তাহতাবী কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কিতাবেও দাঁড়াইয়া থাকা মাকরূহ লিখিত আছে। এনায়া, খানিয়া, দুররুল মোখতার বরজেন্দি শরহে বেকায়ার হাশিয়া প্রভৃতি ও মিনহাজুল খালেক কিতাবে ঐ সময় দাঁড়াইয়া থাকা মাকরূহ তাহরীম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে- ফতহুল কাদীর শরহে ইলিয়াছের হাশিয়ার মর্মে জানা যায় যে মুর্দার স্কন্ধ হইতে নামাইবার পূর্বে বসা ও স্কন্ধ হইতে নামাইবার পর সঙ্গীয় লোকের দাঁড়াইয়া থাকা মাকরূহ। এই মাকরূহ শুধু সঙ্গীয় লোকের জন্য, রাস্তায় চলিত লোকের ও পূর্বে উপস্থিত কবরস্থানের লোকের জন্য নহে। শামী কিতাবে আছে- যাহারা মুর্দারের দাফন কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের জন্য বসার কোন আদেশ নাই।

মৃত্যুস্থান হইতে কতদূরে নিয়া দাফন করা জায়েয

১। তাহতাবী কিতাবে আছে- মৃত্যুস্থান হইতে মুর্দারকে ১/২ মাইল দূরে নিয়া দাফন করিলেও কোন দোষ ঘটিবে না। কিন্তু দুই মাইলের বেশী দূরে নিয়া দাফন করিলে মাকরূহ হইবে। কতক ওলামা বলেন যে তাহাতেও মাকরূহ হইবে না। ওয়াকেয়াতে মুফতীন কিতাবে লিখিত আছে- হযরত ছাদ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ) মদীনা শরীফ হইতে চারি ক্রোশ দূরে ইন্তেকাল করেন- কিন্তু লোকে তাহার জানাযাহ স্কন্ধে করিয়া মদীনা শরীফ নিয়া দাফন করিয়াছিল।

২। তাহতাবী ও যাদুল আখিরাত কিতাবে আছে- যদি কাহারও দূর দেশে মৃত্যু হয় তবে তাহাকে সেই দেশের গোরস্থানে দাফন করা মুস্তাহাব। মুর্দারকে এক দেশ হইতে অন্য দেশে নিয়া দাফন করায় কোন দোষ নাই। কোন কোন ওলামা বলিয়াছেন যে, উহার দূরত্ব মোসাফেরী রাস্তার চেয়ে যদি কম হয়,তবে জায়েয আছে।

দ্রষ্টব্যঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিশর শহরে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে শাম বা সিরিয়া দেশে নিয়া দাফন করা হইয়াছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে আবিসিনিয়া দেশে নিয়া দাফন করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন পর তাহার তাবুত উঠাইয়া শাম দেশে দাফন করা হইয়াছিল।

৩। মুর্দারকে কবরের কিবলা (ডাহিন) পার্শ্বে রাখিয়া, সেই পার্শ্ব হইতেই কবরের মধ্যে নামাইয়া রাখিবে (আলমগীরী)। স্ত্রী মুর্দার সম্পর্কেও ঐ একই হুকুম। মুর্দার কবরে রাখিবার সময় "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" এই দোয়া পড়িবে। মুর্দারকে কবরের ভিতর কিবলা রোখে ডাহিন কাতে রাখিবে এবং মাথার দিকের ও পায়ের দিকের কাফনের গিরা খুলিয়া দিবে। (আলমগীরী)

৪। স্ত্রী মুর্দারকে কবরে রাখিবার সময় পর্দা করিবে। পুরুষের জন্য পর্দার কোন আবশ্যক নাই, মুর্দারকে কবরে রাখার পর কবরের উপর বাঁশ তক্তা ইত্যাদি বিছাইয়া মাটি দিবে। (আলমগীরী)

আলমগীরী ও তাহতাবী কিতাবে আছে- ঐ ছোট কবরের মধ্যে মৃত দেহ রাখিয়া তদুপরি ছাদ করিবে। তাহতাবী, ছগীরী ও কবীরী কিতাবে আছে, ঐ নহরের মধ্যে রাখিয়া তদুপরি কাঁচা ইট, বাঁশ বা তক্তা ইত্যাদি দিয়া ঢাকিবে, যেন মৃতদেহের সহিত স্পর্শ না করে তদুপরি মাটি দিবে।

দাফন করিয়া কবরস্থানে দোয়া দরূদ পড়িবার বিবরণ

১। দাফনের পর কবরস্থানে থাকিয়া এক খতম কুরআন শরীফ পাঠ করিতে পারিলে ভাল হয়। দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়াইয়া সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুলুক পাঠ করিবে, পরে মাথার দিকে থাকিয়া সূরা বাকারার আলিফ লাম মিম হইতে মুফলিহুন পর্যন্ত ও পায়ের দিকে থাকিয়া সূরা বাকারার শেষ আমানাররাসূল হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবে।

২। মেশকাত শরীফে আছে- দাফনের বাদ সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িবে। আলমগীরী কিতাবে আছে, দাফনের পর একটি উট যবেহ করিয়া বানাইতে অর্থাৎ বন্টন করিয়া নিতে যত সময় লাগে, ততপরিমাণ সময় কবরস্থানে থাকিয়া দোয়া দরূদ পাঠকরা মুস্তাহাব। মেশকাতের শরাহ মোজাহেরে হক কিতাবে হযরত আলী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে, যদি কবরস্থানে যাইয়া এগারবার সূরা ইখলাছ পড়িয়া ছওয়াব রেছানী করে, তবে উহার ছওয়াব কবরস্থানের সকলেই সমভাবে পাইবে। ঐ কিতাবে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত আছে- হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়া সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাছ ও সূরা আলহাকুমুত্তাকা পড়িয়া ছওয়াব রেছানী করে, তবে কবরস্থানের সকলের উপরই করিবে। তাহা হইলে কবরস্থ ব্যক্তিগণ উক্ত পাঠকের কবরে গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট আরজ করিবে।

৩। বহু কবরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দোয়া পড়া মাকরূহ। যদি পড়িয়া থাকে তবে পূনরায় পড়া আবশ্যক করে না।

৪। কবরস্থানে খালি পায়ে যাওয়া ও মুর্দারের জন্য দোয়া করা সুন্নাত।

কবর যিয়ারত করা ও যিয়ারত অন্তে মুনাজাত করিবার নিয়ম

কিব্‌লাকে পিছনে রেখে কবরের মৃত ব্যক্তির চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ-

رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ قَالَ التِّرْمِذِىْ هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ-

প্রকাশ থাকে যে, মুল্লা আলী কারী তদীয় গ্রন্থ মিশকাত শরীফের শরাহ্ মিরকাত-৪/১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهٖ-اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ-

অনুবাদঃ হযরত আব্বাসের পুত্র আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূল মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের গোরস্থানে গিয়া মৃতদের মুখামুখী দাঁড়াইয়া বলিলেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ-

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী নিম্নরূপ লিখিয়াছেন। যথা মিরকাত-৪/১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

وَفِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِىْ حَالِ السَّلَامِ عَلَى الْمَيِّتِ اَنْ يَّكُوْنَ وَجْهُهٗ لِوَجْهِ الْمَيِّتِ - وَاَنْ يَّسْتَمِرَّ كَذٰلِكَ فِى الدُّعَاءِ اَيْضًا وَّعَلَيْهِ عَمَلُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ - خِلَافًا لِّمَا قَالَهُ اِبْنُ حَجَرٍ مِنْ اَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَنَا اَنَّهٗ حَالَةِ الدُّعَاءِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ-

অনুবাদঃ বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত, মৃত ব্যক্তিকে সালাম দিবার সময় মুসতাহাব হইল সালামদাতা মৃত ব্যক্তির চেহারার প্রতি মুখ করিয়া সালাম দিবে এবং ঐ অবস্থায় রত থাকিয়া মুনাজাত করিবে। এমত অধিকাংশ মুসলমানদের। শুধু হাফেজ ইবনে হাযর এর বিরোধীতা করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের নিকট সুন্নাত হইল মুনাজাত করিবার সময়

কবরকে পিছনে রাখিয়া কিবলামুখী হইয়া মুনাজাত করা। (উল্লেখ্য যে, ইবনে হাযর (রহঃ) শাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।)

এরূপ মারাকিল ফালাহ ও হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যথাঃ -

ثُمَّ تَنْهَضُ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ مُسْتَدْبِرًا الْقِبْلَةَ ثُمَّ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَتَدْعُوْ بِمَا شِئْتَ عِنْدَ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ- كَذَا فِى الْمَرَاقِى الْفَلَاحِ- قَوْلُهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ قَدَمَهُ وَاِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا اِشَارَةً اِلَى اَنَّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى الْحَالِ الْاَوَّلِ مِنَ الْاِسْتِدْبَارِ-

অনুবাদঃ হযরত রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করিবার নিমিত্তে কিবলাকে পিছনে রাখিয়া কবর শরীফের দিকে মুখ কর, অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ কর এবং যেসব দোয়া মনে পড়ে তা পাঠ কর, এরূপ মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- مستدبر القبلة শব্দের ব্যাখ্যায় হাশিয়ায়ে তাহতাবীর লিখক বলিয়াছেন- এতে এদিকে ইশারা করা হইয়াছে যে, যিয়ারতের প্রথমে যেরূপ কিবলাকে পিছনে রাখা হয় তদ্রূপ মুনাজাতের সময় কিবলাকে পিছনে রাখিতে হইবে।

মুল্লা আলী কারীর লুবাব কিতাব হইতে আল্লামা শামী তদীয় গ্রন্থের ১/৮৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। যথাঃ-

ثُمَّ مِنْ اٰدَابِ الزِّيَارَةِ مَاقَالُوْا مِنْ اَنَّهُ يَاْتِى الزَّائِرُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ يَكُوْنُ مُقَابِلَ بَصَرِهِ - لٰكِنْ هٰذَا اِذَا اَمْكَنَهُ وَاِلَّافَقَدْ ثَبَتَ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَرَءَ عِنْدَ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَاٰخِرَهَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ- كَذَافِى الشَّامِىْ ج ١ ص ٨۴۴

অনুবাদ ঃ ফকীহগণ যিয়ারতের আদাব সম্পর্কে বলিয়াছেন, যিয়ারতকারী মৃত ব্যক্তির পায়ের নিকট দাঁড়াইবে মাথার নিকট নয়। কারণ মাথার নিকট দাঁড়াইলে মৃত ব্যক্তির যিয়ারত কারীকে দেখিতে অসুবিধা হয়। এভাবে দাঁড়াইবে যেন মৃত ব্যক্তির চোখ বরাবর

দাঁড়ানো হয়। তবে ইহা ঐ ক্ষেত্রে যখন পায়ের নিকট দাঁড়াইবার যায়গা থাকে। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট সূরায়ে বাকারার প্রথমাংশ এবং পায়ের নিকট সূরায়ে বাকারার শেষাংশ পাঠ করিয়াছেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা সাব্যস্থ হইল প্রথমে কিবলাকে পশ্চাতে রাখিয়া কবর সম্মুখ করিয়া যিয়ারত করিবে। যদি সামনে যায়গা না থাকে তখন পায়ের নিকট দাঁড়াইয়া যিয়ারত করিবে। যদি পায়ের নিকট দাঁড়াইবার যায়গা না থাকে তখন মাথার নিকট দাঁড়াইবে, যদি মাথার নিকট যায়গা না থাকে তখন পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া যিয়ারত করিবে।

কবরস্থানের গাছ কাটা জায়েয কি না

১। কবরের উপরস্থিত গাছ তরুলতা ইত্যাদি খুঁদিয়া উঠান বা একেবারে কাটিয়া ফেলা মাকরূহ। যেহেতু জীবিত তরুলতা আল্লাহর যিকির করে, তাহার বরকতে মুর্দারের কবর আযাব কম হইবে। কিন্তু মরা গাছ ও মরা তরুলতা ইত্যাদি ফেলিয়া দেওয়া জায়েয আছে।

২। কবরস্থানে পায়খানা প্রসাব করা, কবরের উপর বসা, এমনকি কবরের উপর হাটা নিষেধ, জুতা পায় দিয়া কবরস্থানের সীমার মধ্যে যাওয়া মাকরূহ। কারণ, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কবরের উপর বসার চেয়ে আগুনের উপর অথবা ধারাল তলোয়ার এর উপর বসা ভাল। যেহেতু কবরের উপর বসিলে আখেরাতে আযাব হইবে। তলোয়ার বা আগুনের উপর বসিলে দুনিয়াতে আযাব পাইবে। কাজেই কবরের উপরে বসার চেয়ে তলোয়ার কিংবা আগুনের উপর বসা উত্তম।

৩। কবর পুরাতন হউক বা কবরের চিহ্ন না থাকুক, তদুপরি ঘর দরওয়াজা ইত্যাদি করা বা ঐ স্থান দ্বারা কোন উপকার লওয়া জায়েয নাই। এই হুকুম ওয়াক্ফকৃত কবরস্থান সম্পর্কে।

মনকীর নকীরের সওয়ালের বয়ান

ইব্রাহীম শাহী, শরহে বরজখ, খাযানাতুল মুফতীন, লালিয়েফাখেরা, কাঞ্জুল ইবাদ, খোলাছাতুল ফতোয়া, মোখতারুল ফতোয়া, তাতারখানি, ফতহুল কাদীর, মিনহুল গাফার ও নাহরুল ফায়েক প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে নিম্ন মাসয়ালা সমূহ লিখিয়াছেন-

১। মৃত ব্যক্তির কবরে সওয়াল জওয়াব হইবে। আগুনে দগ্ধ হইয়া মরে বা কোন প্রাণীতে খাইয়া ফেলে, অথবা পানিতে ডুবিয়া মরে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে মৃত্যু হউক তাহাদের নিকট মনকীর নকীর সওয়াল করিবে। প্রত্যেক মানুষ, ফেরেশ্‌তা, জ্বিন

প্রভৃতির সওয়াল জওয়াব হইবে। চাই মুসলমান হউক বা কাফের, নেককার হউক বা বদকার। কিন্তু মুমিনের সওয়াল সম্মানের জন্য ও কাফেরের সওয়াল শাস্তির জন্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে, (১) মনকীর নকীরের সওয়াল, (২) কবর আযাব,(৩) কবরের চাপ, এক প্রকার নহে। পৃথক পৃথক ভাবে হইবে।

২। ফেরেশ্তাদের নিকট (সওয়াল) জিজ্ঞাসা করা হইবে। এমনকি হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আপনি যথারীতি অহী নাযিল করিয়াছিলেন কি না?

৩। নবীদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহ এক কি না ও উম্মতের অবস্থা কি? সাধারণের নিকট তাহাদের প্রতিপালক, নবী এবং ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

৪। কবরে মুমিন লোকের শিশুদিগকে প্রশ্ন করা হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, প্রশ্ন করা হইবে।

ছোট শিশুগণ কিছু জানে না, তাহারা কিরূপে জওয়াব দিবে? তৎসম্বন্ধে ঐ কিতাবে আছে যে, আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ফেরেশ্তাগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া দিবে।

শিশুদের প্রতি জিজ্ঞাস্য বিষয়

তোমার আল্লাহ কে? ফেরেশতা শিশুকে বলিয়া দিবে- বল, আল্লাহ। তোমার দ্বীন কি? ফেরেশ্তা বলিয়া দিবে- ইসলাম। তোমার নবী কে? ফেরেশ্তা বলিয়া দিবে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কাহারও মতে ফেরেশ্তাগণ শিক্ষা দিবেন, কাহারও মতে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ বলে এল্হাম দ্বারা শিক্ষা দিবেন।

মুশরিকের ছেলেমেয়েদের প্রতি প্রশ্ন করা হইবে। কিন্তু জোহাক ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন - প্রথম যে রূহ সকলকে তৈয়ার করিয়া আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি কি তোমাদের আল্লাহ নহি? তখন কি বলিয়াছিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিবে।

কবরে কোন্ সময় জিজ্ঞাসিত হইবে

ইব্রাহীম শাহী, নাহরুল ফায়েক, কাঞ্জুল ইবাদ, মোখতারুল ফতোয়া শরহে মেশকাত প্রভৃতি কিতাব হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিত আছে, কতকের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর প্রশ্ন করা হইবে। কতকের মতে কবরের উপর চালি দেওয়ার পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করা হইবে। কতকের মতে হাত হইতে মুর্দার কবরে রাখা মাত্রই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে।

উক্ত মত সমূহের মধ্যে প্রথম মতই অগ্রগণ্য, যেহেতু হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন মৃতদেহ কবরে রাখার পর লোকজন চলিয়া যায়, তখন ফেরেশ্তা আসিয়া প্রশ্ন করেন।

মৃতদেহ দুই তিন দিন বিলম্ব করিয়া দাফন করিলে, ছহীহ কওল মতে দাফনের পরক্ষণেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। যদি বিদেশের মৃত দেহ দেশে আনা হয়, তবে কাহার মতে মৃতদেহ যে তাবুতে আনা হয় সে তাবুতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে। কাহার মতে বাড়ীতে নিয়া দাফন করার পর প্রশ্ন করা হইবে। শরহে মেশকাতে আছে- যাহাকে বাঘে কি কুম্ভিরে ভক্ষণ করিবে, তাহার সওয়াল উহাদের পেটের মধ্যে হইবে। যদি কেহ আগুনে জ্বলিয়ে মরে কিংবা পানিতে ডুবিয়া মরে অথবা নিবিড় জঙ্গলে মৃত হয়, তবে লোক চক্ষুর অদৃশ্য হইলেই সওয়াল জিজ্ঞাসিত হইবে।

কিরূপভাবে মুর্দারের নিকট মনকীর নকীর সওয়াল করিবে

শরহে মেশকাতের ২য় খন্ডে লিখিত আছে- হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যখন মৃতদেহ দাফন করিয়া সঙ্গীয় লোকগণ চলিয়া যায়, তখন পুনঃ রূহ্ আসিয়া থাকে।" ঐ সময় মনকীর নকীর এই দুই ফেরেশ্তা আসিয়া মৃতদেহকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার সৃষ্টিকর্তা কে? অবিলম্বে উত্তর করিবে, "আল্লাহ তায়ালা।" পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার নিকট কোন পয়গাম্বর আসিয়াছিলেন কি? উত্তরে বলিবে- হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী, তোমার রাসূলকে কি প্রকারে চিনিয়াছিলে? উত্তরে বলিবে, আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম পাঠ করিয়া জানিয়াছি। তৎপর আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এক শব্দ আসিবে, আল্লাহ তায়ালা বলিবেন-আমার বান্দা সত্য। হে ফেরেশ্তাগণ! আমার ঐ বান্দার জন্য বেহেশ্তের দরজা খুলিয়া দাও ও তথায় বিছানা বিছাইয়া দাও এবং তাহাকে বেহেশেতের কাপড় পরিধান করাও। আল্লাহ তায়ালার আদেশে তদ্রূপ কাপড় পরান হইবে। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তখন বেহেশ্ত হইতে সুঘ্রাণ মিশ্রিত বাতাস কবরে আসিতে থাকিবে। যতদূর দেখা যাইবে ততদূর পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কবর বিস্তৃত করিয়া দিবেন।

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- তৎপর সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুঘ্রাণ জড়িত পোশাক পরিধান করিয়া একজন ফেরেশ্তা হাজির হইয়া বলিবেন আজ আপনার শুভদিন। আজ আপনাকে এমন সুসংবাদ দিব, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। উহা এই যে, এইরূপ নেয়ামত আপনার জন্য মজুদ আছে, যাহা কেহ চক্ষে দেখে নাই ও কর্ণে শুনে নাই। দনিয়াতে ওয়াদা পূর্ণ করিবার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত্যুর পরে বহু নেয়ামত দেওয়া হইবে, আজ সেই দিন। তখন মৃত ব্যক্তি বলিবে, আপনাকে বড়ই দয়াবান ও সুগঠিত দেখা যায়, বোধ হয় আপনি কোন খোশ খবর দিবেন। তিনি বলিবেন- আমি আপনার নেক আমল, এইরূপ সু-আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। তখন মৃত ব্যক্তি বলিবে, হে আল্লাহ! শীঘ্রই কেয়ামত উপস্থিত কর। আমি আমার আহাল ও মালের মালিক হইব। মোজাহেরে হক কিতাবে আহাল ও মালের অর্থ করিয়াছেন- মাল অর্থ বেহেশ্তের বাগান, যথায় খাদ্যাদি ও ফল ফলাদি আছে। আহাল অর্থ হূর। আহালের আর এক অর্থ এই যে, আত্মীয়দের মধ্যে মুমিন মুসলমান। মালের অর্থ বেহেশ্তের বালাখানা ও হূর।

বে-ঈমানের কবরে কিরূপ সওয়াল জওয়াব হইবে

বে-ঈমানের মৃতদেহ কবরস্থ করার পর তাহার রূহ শরীরের মধ্যে দিবে। তৎপর দুইজন ফেরেশ্‌তা আসিয়া তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার "রব" কে? সে উত্তর করিবে, হায়! হায়! তাহা আমি জানি না।" আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অহি আসিবে যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, উহার জন্য দোযখের দরওয়াজা খুলিয়া দাও ও আগুনের বিছানা বিছাইয়া দাও। তখন দোযখ হইতে অতি উষ্ণ বায়ু তাহার কবরে আসিতে থাকিবে। তৎপর কবরের দুই পার্শ্ব এমত একত্র হইবে যেন ডান দিকের হাড় বাম দিকে ও বাম দিকের হাড় ডান দিকে আসিবে। তৎপর দুর্গন্ধ জড়িত অদ্ভুত চেহারার এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে ঠাট্টা করতঃ বলিবে- তোমার জন্য আজ শুভ সংবাদ, এমন সুসংবাদ, যাহাতে তুমি অতি বেজার হইবে। আজ ঐ দিন যে দিনের কথা দুনিয়াতে থাকিয়া শুনিয়াছিলে, যে কুফরী করিবে তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা কবরে যন্ত্রনা রাখিয়াছেন তখন গুনাহগার ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? তখন বলিবে- আমি তোমার দুনিয়ার বদ আমল। তখন সে আযাবের আলামত দেখিয়া বলিবে, হে আল্লাহ! তুমি কিয়ামত করিও না, করিলে মহা যন্ত্রণাময় জাহান্নামে পতিত হইব।

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাইবার পূর্বে তাহার নিকট বসিয়া কুরআন শরীফ পাঠ করিতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ- বৎস! মৃত ব্যক্তির নিকট বসিয়া কুরআন শরীফ পাঠ করায় মতভেদ আছে। কেহ ইহা মাকরূহ বলিয়াছেন, কেহ বা জায়েয বলিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসিত মত এই যে, মৃতদেহ হইতে কিছু দূরে বসিয়া কুরআন শরীফ পাঠ করায় কোন দোষ নাই। (শামী)

শামী কিতাবে আরও উক্ত হইয়াছে- পাক কাপড় দ্বারা মৃতদেহ আবৃত থাকিলে কিংবা নিকটে বসিয়া মনে মনে কুরআন শরীফ পাঠ করায় কোন দোষ নাই। কিন্তু নিকটে বসিয়া তাসবীহ তাহলীল পড়ায় কোন মতভেদ নাই।

মৃতদেহ দাফন করিবার পূর্বে ছদকাহ খয়রাত দিবার বয়ান

যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিত আছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, দাফনের পূর্বে খয়রাত ও ছদকাহ দিবে। কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া ছওয়াব-রেছানী করিবে। আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, ছদকায় মৃতের কবর আযাব নিবারণ হয় ও শান্তি প্রাপ্ত হয়, যদি এক টুকরা গোশত দ্বারাও ছদকাহ করা হয়।

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, মৃতদেহ দাফনের পূর্বে তোমরা ছদকাহ কর, যদি ছদকাহ সামান্য পরিমাণও হয়। উক্ত কিতাবে আছে- জীবিত অবস্থায় নিজের হাতে এক দেরহাম ছদকাহ করিলে যে নেকী হইবে মৃত্যুর পর একশত দেরহাম দান করিলেও সেইরূপ নেকী পাইবে না। (অতএব জীবিত অবস্থায় নিজ হাতেই ছদকাহ করা উত্তম) আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণের কর্তব্য এই যে,

মৃত্যু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য মৃত্যুর দিবস গরীব দুঃখীকে কিছু দান-খয়রাত করা। আত্মার মঙ্গলের জন্য কিছু দান করা সুন্নাত। এক খতম কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া ছওয়াব রেছানী করা উত্তম। ইহা প্রাচীন বুযুর্গানের আমল।

কোন কোন হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার কলেমা তৈয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করিয়া ছওয়াব রেছানী করিলে মৃতব্যক্তি আযাব হইতে মুক্তি পায়। প্রাচীন যামানার বুযুর্গ আলেমগণ এই নিয়ম পালন করিতেন। মতান্তরে এক লক্ষ কিংবা পঁচাত্তর হাজার বার কলেমা তৈয়্যেবা পড়ার বিধান আছে।

কোন কোন অবিসংবাদিত হাদীসের মর্মে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শুধু পঁচাত্তর হাজারবার কলেমা তৈয়্যেবা পাঠ কালে প্রত্যেক দশমবারে পূর্ণ কলেমা অর্থাৎ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িবে।" ইহার ছওয়াব যাবতীয় মুসলমানের জন্য দান করিলে সকলেই আযাব হইতে শান্তি পাইতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, দোয়া দরূদ পাঠ করিবার জন্য মৃতদেহ দাফন করিতে বিলম্ব করা কিতাবে নিষেধ লিখিয়াছে। দাফন করিবার উদ্যোগ করিতে যে সময় লাগে, ঐ সময়ের মধ্যে দোয়া দরূদ শেষ করিবে।

কাফ্ফারা দেওয়ার বিবরণ

প্রশ্ন- মানুষ মরিয়া গেলে তাহার নামায, রোযা ফৌত হইয়া থাকিলে কি নিয়মে কাফ্ফারা দিতে হইবে?

উত্তর- কাফ্ফারা ও ফেদিয়া সম্বন্ধে বহু মাসয়ালা আছে যথাক্রমে শ্রবণ কর।

১। দুররুল মোখতার ও শামী প্রভৃতি কিতাবে আছে- যদি কোন লোক মরিয়া যায়, তাহার ফরজ, বেতের নামায কিংবা রোযা ইত্যাদি ফওত হইয়া থাকে, আর মৃতব্যক্তি অসিয়ত করিয়া যায় যে, আমার নামায রোযার কাফ্ফারা দিবে, তবে, ওয়ারিসগণের ওয়াজিব যে, মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য মালের এক- তৃতীয়াংশ দ্বারা প্রত্যেক রোযা ও নামাযের পরিবর্তে অর্দ্ধ'ছা' (১.৭৫ পৌণে দুই সের) ময়দা, গম, যব ইত্যাদি বা তাহার মূল্য গরীব মিসকীনকে দিবে। উহা দেওয়া ওয়াজিব। যদি অসিয়ত না করিয়া গিয়া থাকে, তবে ফেদিয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে। কিন্তু ফেদিয়া দিলে মুর্দার ছওয়াব পাইতে পারে ও রোযা নামাযের জিম্মা হইতে মুক্তি পাইবার আশা আছে।

২। যদি কেহ তাহার নামায রোযার কাফ্ফারা দিতে অসিয়ত করিয়া গিয়া থাকে, আর তাহার ত্যাজ্য মালের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ আদায় না হয় কিংবা একেবারে মাল না থাকে, সে অবস্থায় শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, মৃতব্যক্তির কাফ্ফারা সম্পূর্ণ আদায় করিতে ওয়ারিসগণ স্বইচ্ছায় সাহায্য করিলে আদায় হইতে পারে। কিন্তু ওয়ারিসগণের প্রতি জোর জবরদস্তি করিতে পারা যাইবে না।

৩। মারাকিল ফালাহ, আলমগীরী, বাহরুর রায়েক, ছগীরী, কবীরী ও শামী প্রভৃতি কিতাবে আছে অসিয়ত করনেওয়ালার ত্যাজ্য মালের অংশে যদি কাফ্ফারা পূর্ণরূপে আদায় না হয় কিংবা

মাল একেবারে না থাকে বা ওয়ারিসগণ আদায় করিতে রাজী না থাকে, তবে যে মাল থাকে তাহা একজন মিসকীনকে দিবে। সে কবুল করতঃ পুনঃ ওয়ারিসকে দিবে। ওয়ারিস পুনঃ উহা অন্য মিসকীনকে দিবে। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ হিলা করতঃ আদায় করিলে আদায় হইবে। যদি মাত্রই মাল না থাকে, তবে ওয়ারিসগণ অর্দ্ধ 'ছা' ময়দা, গম, যব ইত্যাদি পরিমাণ কর্জ্জ করিয়া ঐরূপ মিসকীনকে পুনঃ পুনঃ দিয়া হিলা করতঃ আদায় করিলেও আদায় হইবে।

৪। বাহারে জোখার ও লালীয়েফাখেরা কিতাবে হইতে যাদুল আখিরাত কিতাবে লিখিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মরিয়া যায় এবং তাহার ফরজ, ওয়াজীব নামায ফরজ রোযা এবং তেলাওয়াতে সিজদাহ এইরূপ অন্যান্য ওয়াজিব কার্য ফওত হইয়া থাকে, আর ঐ সকলের ফেদিয়া বা কাফ্ফারা আদায় করিতে অসিয়ত করিয়া গিয়া থাকে, তবে মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য মালের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা কাফ্ফারা ও ফেদিয়া আদায় করিবে।

প্রথমে মৃতব্যক্তির বয়স নির্ণয় করিবে। পুরুষ হইলে ১২ বৎসর বাদ দিয়া, স্ত্রী হইলে নয় বৎসর বাদ দিয়া বাকী জীবনের হিসাব করিবে। প্রত্যেক দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ও এক ওয়াক্ত বেতের নামায, মোট ছয় ওয়াক্তের প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ২ সের হিসাবে মোট একদিন এক রাত্রের জন্য বার সের ময়দা বা গম; একমাস হইলে নয় মণ, এক বৎসরে একশত আট মণ, এক বৎসরে ত্রিশ রোযায় দেড় মণ, একুনে বৎসরে একশত সাড়ে নয় মণ। এইরূপ যত বৎসর, মাস, দিন, রোযা, নামায আদায় করিয়া থাকে, তাহা বাদ দিয়া বাকী নামায ও রোযার ফওতের জন্য উপরোল্লিখিত হিসাব মতে ময়দা বা গম কিংবা তাহার মূল্য একজন মিসকীন বা বহুজনকে দেওয়া যাইবে। যদি এক তৃতীয়াংশ মালদ্বারা আদায় না হয় তবে ওয়ারিসগণ অনুগ্রহ করতঃ তাহাদের তরফ হইতে অবশিষ্ট ফেদিয়া দিলেও আদায় হইবে। যদি মৃতের মাল না থাকে কিংবা তাহার ত্যাজ্যাংশের দ্বারা সম্পূর্ণ ফেদিয়া আদায় না হয়, অথবা ওয়ারিসগণ দিতে রাজী না থাকে, এমতাবস্থায় নিম্নলিখিত মতে হিলা করতঃ আদায় করিবে।

কাফ্ফারা হিলা করিবার বিধানঃ- উপরোল্লিখিত হিসাব মতে যে পরিমাণ ফেদিয়া নির্ণয় হইয়াছে, তাহা এক জেলদ কুরআন শরীফের মূল্য স্বরূপ ধরিয়া ও একজন ফকির বা মিসকীনের নিকট অন্ততপক্ষে দুইজন মুসলমান সাক্ষীর সাক্ষাতে বিক্রয় করিবে। মিসকীন উহা কবুল করিবে। পরে ঐ টাকা চাহিবে। ফকির টাকা দিতে অক্ষম। তখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস বলিবে, আমার অমুকের এত বৎসর, এত মাস, এত দিনের ফরজ ও ওয়াজিব নামায, ফরজ রোযা ও আল্লাহ্ তায়ালার অন্যান্য হক, যাহা আদায় করা ওয়াজিব ছিল, তাহার ফেদিয়া মোট এত টাকা এত পয়সা আদায় করিতে অক্ষম বিধায় তোমার নিকট কুরআন শরীফের মূল্য বাবদ যাহা পাইব, তাহা ঐ ফেদিয়া বাবদে দিলাম, তুমি কবুল কর, তোমার ঋণ হইতে মুক্তি পাইবে। অতএব তুমি কবুল কর। মিসকীন বলিবে, কবুল করিলাম। এইরূপ তিনবার বলিবে।

শামী কিতাবে আছে, যদি মুর্দারের উমরী ফরজ রোযা ও ফরজ ওয়াজিব নামায বা অন্যান্য ওয়াজিব, যাহা আল্লাহ্ তায়ালার হক ও আদায় করা ওয়াজিব ছিল তাহা যদি কেহ আদায় করিতে চায়, তবে উক্তরূপ হিসাব করিয়া যাহা হইবে, তাহা সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলে তাহার কতকাংশ কর্জ্জ করিয়া এক ফকিরকে ফেদিয়া বাবদ দিবে। ফকির উহা কবুল করতঃ পুনঃ মুর্দারের ওয়ারিসকে দান করিবে। ওয়ারিস পুনঃ অন্য ফকিরকে দিবে। এইরূপ বার বার দিয়া

নিয়া শেষে যাহার টাকা সে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ হিলা দ্বারা ফেদিয়া আদায় করিবে।

৫। জীবনে যত সোহ্ সিজদাহ বা তেলাওয়াত সিজদাহ ফওত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক সিজদার জন্য দুই সের গম ফেদিয়া দিবে। (যাদুল আখিরাত)

৬। জীবনে যতবার কসম ভঙ্গ করিয়াছে, তন্মধ্যে যে কসমের কাফ্ফারা আদায় করে নাই, তাহার প্রত্যেক কসমের জন্য ২০ (কুড়ি) সের করিয়া হিসাব করতঃ আদায় করিবে। যদি অসিয়ত করিয়া যাইয়া থাকে, তবে ওয়ারিসের প্রতি আদায় করা ওয়াজিব। (যাদুল আখিরাত)

৭। মারাকিল ফালাহ ও তাহতাবী কিতাবে আছে, নিম্নলিখিত রোযা ও নামাযের ফেদিয়া দেওয়া লাগিবে না। যথা-

মুসাফির অবস্থায় যদি রোযা ভঙ্গ হইয়া থাকে, অথবা রোগ বশতঃ রোযা ভঙ্গ হইয়া থাকে, আর মুকীম বা আরোগ্য হওয়ার পূর্বে মৃত্যু হইয়া পড়ে, তবে ঐ ফওত রোযার ফেদিয়া দিতে হইবে না।

রোযার পর মুসাফিরী হইতে মুকীম হইয়া বা রোগ মুক্তির পর যতদিন জীবিত ছিল, মাত্র ততদিনের ফেদিয়া দেওয়া ওয়াজিব। যেহেতু মুকীম হইয়া বা রোগ মুক্তির পর যতদিন জীবিত ছিল, ততদিনের রোযার কাজা আদায় করা ফরজ ছিল। (মারাকিল ফালাহ)

যে ব্যক্তি এমন দূর্বল হইয়াছিল যে, "তখন ইশারায় নামায পড়িতেও অক্ষম হইয়াছিল।" সেই অবস্থায় মৃত্যু হইলে যতদিন ঐরূপ অক্ষম ছিল, ততদিনের নামাযের ফেদিয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে, যদিও ছয় ওয়াক্তের কম ফওত হইয়া থাকে। (মারাকিল ফালাহ)

প্রশ্ন- মৃত ব্যক্তি রোযা, নামায, হজ্জ্ব, যাকাত আদায় না করিয়া থাকিলে ওয়ারিসগণ তাহার পরিবর্তে রোযা, নামায, হজ্জ্ব, যাকাত আদায় করিলে আদায় হইবে কি না?

উত্তর- মারাকিল ফালাহ কিতাবে আছে- মৃতের রোযা কিংবা নামাযের পরিবর্তে তাহার ওয়ারিস রোযা নামায আদায় করিলে আদায় হইবে না। শামী কিতাবে আছে- ইবাদত তিন প্রকার। যথা-

১। যাহা শরীর দ্বারা করা হয় ইহাকে ইবাদতে বদনী বলে। যেমন-রোযা ও নামায, উহা অন্যে আদায় করিলে আদায় হইবে না।

২। দ্বিতীয় মালী ইবাদত, যেমন যাকাত; উহা ওজরে হউক কিংবা বিনা ওজরে হউক, অন্যের দ্বারা আদায় করিলে আদায় হইবে।

৩। ইবাদতে মালী ও বদনী। যেমন- হজ্জ্ব।

হজ্জ্ব দুই প্রকার। ফরজ হজ্জ্ব ও নফল হজ্জ্ব। নফল হজ্জ্ব ওজরে হউক বা বিনা ওজরে হউক, অন্যের দ্বারা আদায় করাইলে আদায় হইবে।

ফরজ হজ্জ্ব ওজরে অন্যের দ্বারা আদায় করিলে আদায় হইবে। যেমন- চিররোগী ব্যক্তির নায়েবী হজ্জ্ব কবুল হইবে।

একাদশ অধ্যায়

{হায়েজ, নেফাস, এস্তেহাজা ও মাযুরের মাসয়ালা}

হায়েজ, নেফাস ও এস্তেহাজার পরিচয়

প্রশ্ন- স্ত্রীলোকের কত প্রকার রক্তস্রাব হইতে পারে?

উত্তর- স্ত্রী লোকের জরায়ুদ্বার হইতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর স্রাব হয়। যথা- ১ম হায়েজ (ঋতুস্রাব), ২য় নেফাস (প্রসবজনিত স্রাব), ৩য় এস্তেহাজা (প্রদরজাতীয় স্রাব)।

১। স্ত্রীলোকের নয় বৎসর বয়সের পর জরায়ুদ্বার হইতে ষাট বৎসর বয়সের পূর্বে প্রসব ও পীড়া ব্যতীত নির্বিঘ্নে প্রতি মাসে যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে হায়েজ বা ঋতুস্রাব বলে।

২। প্রসবের পর হইতে বিনা পীড়ায় উর্দ্ধপক্ষে চল্লিশ দিন পর্যন্ত যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে নেফাস বলে।

৩। ইহা ব্যতীত যে কোন প্রকার স্রাব হউক না কেন তৎসমূদয়কে এস্তেহাজা (পীড়া) ধরিতে হইবে। ইহার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইবে।

হায়েজের মাসয়ালা

প্রশ্ন- হায়েজ কাহাকে বলে?

উত্তর- বালেগা (বয়োপ্রাপ্তা) স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে নির্বিঘ্নে প্রতিমাসে যে রক্তস্রাব হয়, উহাকে হায়েজ বলে।

প্রশ্ন- হায়েজের রং কয় প্রকার এবং কি কি?

উত্তর- হায়েজের রং ছয় প্রকার। যথা- লাল, কাল, সবুজ, হলদে, ধূসর ও ধূমল।

প্রশ্ন- কত বৎসর বয়সে প্রথম হায়েজ দেখা দেয় এবং কত বৎসর পর্যন্ত থাকে?

উত্তর- নয় বৎসর বয়সে প্রথম হায়েজ হয় এবং পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত তাহা থাকে। যদি নয় বৎসর বয়সের পূর্বে এবং পঞ্চান্ন বৎসরের পরে অথবা গর্ভবর্তী রমণীদের রক্তস্রাব হয়, তবে উহা হায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে না; এবং এস্তেহাজা রোগ বলিয়া গণ্য হইবে। পঞ্চান্ন বৎসরের অধিক বয়সে কোন মেয়েলোক লাল কিংবা গাঢ় কাল বর্ণের স্রাব দেখিতে পায় অথবা পূর্বের যে রং এর হায়েজ হইত, সেই বর্ণের রক্ত পঞ্চান্ন বৎসরের পরে দেখিতে পায় তবে ৬০ বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত স্রাব হইতে থাকিলে হায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু ৬০ বৎসরের পরে যে কোন বর্ণের স্রাব দেখুক না কেন, উহা এস্তেহাজা বলিয়া গণ্য হইবে। বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, রং শুকাইয়া সাদা হইলেও হায়েজই ধরিতে হইবে। কিন্তু সাদা পদার্থ নির্গত হইয়া অন্য যে কোন রং প্রাপ্ত হউক না কেন তাহা হায়েজ হইবে না।

প্রশ্ন- কোন সময় হইতে স্ত্রীলোককে প্রকৃত ঋতুবতী বলিয়া ধরা যাইবে?

উত্তর- রক্তধারা গুপ্তস্থানের বাহিরে নির্গত হইলে সেই সময় হইতে স্ত্রীলোককে ঋতুবতীর হুকুম পালন করিতে হইবে। যদি গুপ্তস্থানে নেকড়া বা পট্টি ব্যবহার করার দরুন স্রাব হইতে না পারে, তবে ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি হায়েজের হুকুম হইবে না। কিন্তু ঐ নেকড়া বা পট্টি বাহির করিলেই হায়েজের হুকুম হইবে। যদি কোন স্ত্রীলোক পাক অবস্থায় স্বীয় গুপ্তস্থানে নেকড়া বা পট্টি ব্যবহার করিয়া নিদ্রা যায় এবং নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঐ পট্টি বাহির করিয়া উহাতে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পায়, তবে পট্টি বাহির করার পর সে ঋতুবতী হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। প্রকাশ থাকে যে, অবিবাহিতা স্ত্রীলোক মাত্র ঋতুর সময় নেকড়া ব্যবহার করিবে এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণের সকল সময় উহা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। (শামী)

প্রশ্নঃ হায়েজের উর্দ্ধ ও নিম্ন মুদ্দত কত দিন?

উত্তরঃ শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, হায়েজের উর্দ্ধ মুদ্দত দশ দিন দশ রাত্রি ও নিম্ন মুদ্দত তিন দিন তিন রাত্রি। যদি মুদ্দতের পূর্ণ দিবারাত্রি হইতে দুই এক মিনিট সময় কম স্রাব হয়, তবে স্রাবের সমস্ত সময়কেই এস্তেহাজা বা পীড়া বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উপরোক্ত দীর্ঘ মুদ্দত দশ দিবারাত্রির চেয়ে দুই এক মিনিট সময় বেশী স্রাব হইলে, ঐ দশ দিন হায়েজ: এবং অতিরিক্ত সময় এস্তেহাজার মধ্যে পরিগণিত হইবে। (শামী)

প্রশ্নঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের কি প্রকারে দিবারাত্রির হিসাব করিতে হইবে?

উত্তরঃ শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, স্বভাবতঃ আমরা ২৪ঘন্টায় দিবারাত্রি গণনা করিয়া থাকি; সুতরাং এই হিসাবেই দিবারাত্রির গণনা করা হইবে। ২৪ ঘন্টায় দিবারাত্রি হিসাবে তিন দিন তিন রাত্রে ৭২ ঘন্টা হয়। এই ৭২ ঘন্টা হইতে দুই এক মিনিট সময় কম স্রাব হইলেও ঐ সকল সময়কে এস্তেহাজা বলিয়া ধরিতে হইবে। এইরূপে ২৪ ঘন্টার দিবারাত্রির হিসাবে পূর্ণ দশ দিন দশ রাত্রিতে ২৪০ ঘন্টা হয়। এই ২৪০ ঘন্টার পরে যদি ২/১ মিনিট পরিমাণ সময়ও বেশী স্রাব হইয়া থাকে, তবে প্রথম ঋতুবতী স্ত্রীলোকের জন্য দশ দিনের অতিরিক্ত সময়কে এস্তেহাজা মনে করিতে হইবে। সুতরাং নিম্ন মুদ্দত তিন দিন তিন রাত্রি অর্থাৎ ৭২ ঘন্টা হইতে দুই এক মিনিট কম সময় স্রাব হইলে ঐ সকল সময়ের রোযা নামায কাজা করিতে হইবে এবং উর্দ্ধ মুদ্দত দশ দিনের পর স্রাব হইলে ঐ দশ দিন অতীত হওয়ার পরই গোসল করিয়া রোযা নামায আদায় করিতে থাকিবে।

যথা- যদি কোন স্ত্রীলোকের শুক্রবার সূর্য উদয়ের সময় হইতে হায়েজ আরম্ভ হয় এবং সোমবার সূর্য উদয়ের দুই এক মিনিট পূর্বে হায়েজ বন্ধ হয়, তবে উক্ত সম্পূর্ণ সময়কে এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। যদি দশ দিবা রাত্রি গত হইয়া সোমবার সূর্য উদয়ের পরও দুই এক মিনিট কাল স্রাব থাকে, তবে এই অতিরিক্ত দুই এক মিনিট সময়কে এস্তেহাজা ধরিতে হইবে।

প্রশ্ন- স্ত্রীলোকগণের হায়েজের নিয়মিত মুদ্দত কিরূপে স্থির করিতে হইবে?

উত্তর- স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথম অবস্থায় যে কয়েক দিন হায়েজ থাকে, সেই কয় দিনই তাহার নিয়মিত মুদ্দত বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মত এবং এই মতের উপরই ফতোয়া হইয়াছে।

(গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন- কোন মেয়েলোকের তিন দিন কিংবা চারিদিন হায়েজের সময় নির্দিষ্ট ছিল, পরে কোন এক মাসে একাদিক্রমে দশ দিন ঋতুস্রাব হইল এখন সে কি করিবে?

উত্তর- যদি কোন মেয়েলোকের নিয়মিত আদত ছুটিয়া গিয়া কোন এক মাসে পূর্ণ দশ দিন ঋতুস্রাব হয়, তবে ঐ দশ দিন হায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে। আর যদি দশ দিনের পর দুই এক মিনিট সময়ও ঋতুস্রাব হয়, তবে ঐ আদতের অতিরিক্ত সময়কে এস্তেহাজার মধ্যে গণ্য করিবে। যেমন কোন স্ত্রীলোকের সচরাচর প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া হায়েজ হইবার নিয়ম ছিল। কিন্তু কোন এক মাসে এই নিয়ম পরিবর্তন হইয়া এক মাসে ছয়, সাত, আট, নয় কি দশ দিন ঋতুস্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে ঐ পূর্ণ দশ দিন হায়েজের মধ্যে গণ্য করিবে। দশ দিনের অতিরিক্ত সময় স্রাব হইলে পূর্ব আদত মত তিন দিন হায়েজকাল বাদ দিয়া বাকী কয়দিন এস্তেহাজার মধ্যে গণ্য করতঃ ঐ সময়ের রোযা ও নামায কাজা আদায় করিতে হইবে। ইহা ফরজ।

(গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ- কোন স্ত্রীলোকের হায়েজ হইবার নিয়ম ঠিক নাই। কোন মাসে চারিদিন, কোন মাসে পাঁচদিন, কোন মাসে সাতদিন কি পূর্ণ দশ দিন হায়েজ হইল, এমতাবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে?

উত্তর- এইরূপ অনিয়মিত ঋতুবতী স্ত্রীলোকের যদি পূর্ণ দশদিন ঋতুস্রাব প্রবাহিত থাকিয়া বন্ধ হয়, তবে ঐ দশ দিনই হায়েজ বলিয়া গণনা করা হইবে। কিন্তু যদি কোন মাসে দশ দিনের কিছু বেশী সময় স্রাব হয়, তবে এই অবস্থায় পূর্ব মাসে যতদিন হায়েজ হইয়াছিল ততদিন হায়েজের মধ্যে গণনা করিয়া বাকী দিনগুলিকে এস্তেহাজার ভিতর ধরিবে। (শামী)

প্রশ্ন- কোন স্ত্রীলোকের সচরাচর নিয়মিত ভাবে পাঁচ দিন হায়েজ হইত কিন্তু যদি কোন একমাসে ছয় দিন ঋতুস্রাব হইয়া পরবর্তী মাসে দশ দিনের অতিরিক্ত রক্তস্রাব চলিতে থাকে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- উক্ত স্ত্রীলোকটির ঋতুর পূর্ব নিয়ম পাঁচ দিন পরিবর্তিত হইয়া ছয় দিনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জানিতে হইবে। সুতরাং ছয় দিন হায়েজ এবং বাকী কয় দিন এস্তেহাজা ধরিতে হইবে এবং পূর্ণ দশ দিনের পর স্রাব বন্ধ না হইলে সেই সময়ই গোসল করিয়া যথারীতি নামায ও রোযা আদায় করিতে থাকিবে। ছয় দিনের পর হইতে দশ দিন পর্যন্ত চারি দিনের নামাযের কাজা আদায় করিতে হইবে। (শামী)

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রথম বারেই পূর্ণ দশ দিন কিংবা দশ দিনের বেশী বা কম সময় রক্তস্রাব হয়, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- যদি কোন স্ত্রীলোকের দশ দিন কিংবা দশ দিনের কম সময় ঋতুস্রাব হয়, তবে স্রাবের কয় দিনকে হায়েজ ধরিতে হইবে ও দশ দিনের অতিরিক্ত সময়কে এস্তেহাজা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। (হেদায়া)

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রথমবার রক্তস্রাব ক্রমশঃ কয়েক মাস চলিতে থাকে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- এমতাবস্থায় যে তারিখে প্রথম হায়েজ হইয়াছিল প্রত্যেক মাসের সেই তারিখ হইতে পূর্ণ দশদিন হায়েজ ধরিয়া অতিরিক্ত দিনগুলি এস্তেহাজা বলিয়া গণ্য করিবে। (শামী)

প্রশ্ন- দুই হায়েজের মধ্যে পাক থাকার কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি না?

উত্তর- হ্যাঁ আছে। দুই হায়েজের মধ্যে কমপক্ষে পনর দিন পাক থাকিবে, বেশীর পক্ষে কতদিন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের তিনদিন রক্তস্রাব হইয়া পনর দিন পাক থাকিবার পর পুনঃ রাত্রিসহ তিন দিন স্রাব হইয়া বন্ধ হয়, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- প্রথম তিন দিন ও পনর দিনের পরের তিন দিন হায়েজ ধরিবে এবং মধ্যের পনর দিন পাক জানিবে। (শামী)

প্রশ্ন- নেফাসের পর তোহরের নিম্ন মুদ্দত কতদিন?

উত্তর- নেফাস পূর্ণ চল্লিশ দিনে বিরাম হইলে কম পক্ষে পনর দিন পাক থাকিবে। পনর দিনের পূর্বে স্রাব হইলে উহা এস্তেহাজা বলিয়া ধরিতে হইবে।

প্রশ্ন- মধ্যে পনর দিন পাক থাকিবার পর পূর্ণ তিন দিনের কম সময় স্রাব হইয়া বন্ধ হইলে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- এ স্থলে মধ্যের পনর দিন পাক এবং প্রথম ও শেষের রক্ত স্রাবকে এস্তেহাজা মনে করিবে। তাই প্রথমা হউক, কি নিয়মিতা হউক ঐ একই হুকুম। (শামী)

প্রশ্ন-কোন স্ত্রীলোক দুইদিন কি একদিন রক্তস্রাব দেখার পর পনর দিনের কম সময় পাক থাকিয়া পরে পুনঃ দুই একদিন স্রাব হইতে দেখিলে; এমতাবস্থায় তাহার কি কর্তব্য?

উত্তর- উক্ত স্ত্রীলোক যদি নিয়মিত ঋতুবতী হয়, তবে তাহার পূর্বের নিয়ম তারিখের কয়দিন হায়েজ গণনা করিয়া বাকী এস্তেহাজা মনে করিবে। যদি প্রথম ঋতুবতী হয়, তবে তাহার স্রাবের তারিখ হইতে দশ দিন হায়েজ গণনা করিয়া বাকী এস্তেহাজা ধরিয়া নিবে। (শামী) এমতাবস্থায় রোযা নামাযের হুকুম তোহরে মোতাখাল্লালের বয়ান দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন- কোন স্ত্রীলোকের মাসের ৪/৫/৬ তারিখে নিয়মিত হায়েজ হইত। কোন মাসে তাহার ২য় কি ৩য় তারিখে স্রাব হইয়া বার দিন বিরাম থাকার পর পুনঃ ১৬/১৭ দুই তারিখে স্রাব হইল। এখন তাহার কি হুকুম হইবে?

উত্তর- এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রীলোকের ঐ ৪/৫/৬ তারিখে হায়েজ ধরিয়া পূর্ব ও পরের স্রাবকে এস্তেহাজা বলিয়া গণ্য করিবে এবং মধ্যের বাকী সময় তোহরে মোতাখাল্লাল (অনিয়মিত শুচিকাল) বলিয়া স্থির করিবে। তোহরে মোতাখাল্লালের বয়ান দ্রষ্টব্য। (শামী) উল্লিখিত মাসয়ালায় ৪/৫/৬ তারিখে স্রাব না থাকা সত্ত্বেও ঐ কয়দিন হায়েজের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইহাতে যেন কেহ সন্দেহে পতিত না হয়। (শামী)

প্রশ্ন- কোন স্ত্রীলোকের নিয়মিত ২/৩ বার ঋতুস্রাব হইবার পর ক্রমশঃ অনবরত স্রাব হইতে আরম্ভ করিল, এমতাবস্থায় তাহার কি হুকুম?

উত্তর- এমতাবস্থায় পূর্বে তাহার যে কয়দিন নিয়ম ছিল সেই কয়দিন হায়েজ ধরিবে এবং যে কয়দিন পাক থাকিত সেই কয়দিন পাক ধরিবে। যেমন কাহারও নিয়ম ছিল যে, পাঁচ দিন হায়েজ হইবার পর চল্লিশ দিন পাক থাকিত। ইহার পর তাহার উক্তরূপ অবস্থা হইল; অথবা অনবরত স্রাব চলিল। এমতাবস্থায় ঐ নিয়ম অনুসারে পাঁচ দিন হায়েজ ধরিয়া চল্লিশ দিন পাক ধরিবে পুনঃ এই চল্লিশ দিন গত হইলে পাঁচ দিন হায়েজ গণনা করিবে। পরে আবার চল্লিশ দিন পাক এবং পাঁচ দিন হায়েজ ধরিবে। যতদিন ঐ প্রকার স্রাব থাকে, ততদিন এইরূপ হায়েজ ও তোহর গণনা করিবে। (শামী)

প্রশ্ন-(১) যদি কোন স্ত্রীলোকের জীবনে কোন দিন হায়েজ না হয় অথবা (২) তিন দিনের কম স্রাব হইয়া ঐ প্রকারে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, অথবা (৩) কাহারও মাত্র তিন দিন স্রাব হইয়া ঐ প্রকার চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়, তবে ইহাদের জন্য কি হুকুম?

উত্তর- ইহাদের চির জীবনই পাক ধরা যাইবে এবং সেই অনুসারে রোযা নামায আদায় করিবে; কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক তিন মাস ইদ্দত পালন করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে। আর ৩য় অবস্থায় তালাক প্রাপ্তা হইলেও অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে চাহিলে তিন হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে অর্থাৎ যে সময় আর হায়েজ হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে পঞ্চাশ বৎসরের কথাও লিখিয়াছে। (শামী)

প্রশ্ন- কোন স্ত্রীলোকের প্রথমে দুই তিন বার নিয়মিত হায়েজ হইবার পরে অবিরত স্রাব হইতে আরম্ভ করিল কিন্তু সে স্ত্রীলোকটি পূর্বের নিয়ম ভুলিয়া গেল। এমতাবস্থায় সে কি করিবে?

উত্তর- এরূপ সমস্যায় পতিত হইলে সে খুব মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিবে এবং যে দিকে প্রবল ধারণা জন্মে সেই অনুযায়ী 'হায়েজ' ও 'তোহর' স্থির

করিবে। আর যদি কোন স্ত্রীলোকের দিন মনে থাকে কিন্তু তারিখ ভুলিয়া যায়, এরূপ অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস যেদিকে ধাবিত হয়, সেই অনুযায়ী তারিখ ধরিয়া 'হায়েজ' ও তোহর নির্ণয় করিবে। আর যদি কোন স্ত্রীলোক এরূপ সমস্যায় পতিত হয় যে, কত দিন বা কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্যন্ত তাহা কিছুই মনে নাই এবং অনুমান দ্বারাও কিছু স্থির করিতে সমর্থ না হয়, তবে এরূপস্থলে দুইটি পন্থা আছে। প্রথমতঃ তাহার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, সে এখন ঋতুর অবস্থায় না তোহরের অবস্থায়। যদি এরূপ বিশেষ চিন্তা করিয়াও অনুমান দ্বারা কিছু স্থির করিতে না পারে, তবে নামাযের ওয়াক্তে অজু করিয়া ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায আদায় করিবে। নামাযের ফরজ পরিমাণ কিরাত পড়িবে। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে, এখন হায়েজের শেষ অবস্থা কিংবা তোহরের শেষ অবস্থা, ইহাও চিন্তা বা অনুমান দ্বারা ঠিক করিতে না পারিলে সে সময় প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করিয়া উক্ত প্রকার সংক্ষেপে ফরজ পরিমাণ কিরাত পাঠ করিয়া নামায পড়িবে। উভয় অবস্থায় স্বামী সহবাস, মসজিদে প্রবেশ, মুস্তাহাব নামায পড়া ও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা নিষেধ।

(গায়াতুল আওতার, শামী)

প্রশ্ন- উক্ত স্ত্রীলোকের অনবরতঃ স্রাব হইলে ও দিন তারিখ ভুলিয়া গেলে, তাহার রোযা আদায় করিবার হুকুম কি জানিতে বাসনা।

উত্তর- যদি ঐ প্রকার স্ত্রীলোকের রাতে স্রাব আরম্ভ হয় বলিয়া স্মরণ থাকে, তবে সমস্ত রমজানের রোযা রাখিবার পরে আরও বিশ দিনের রোযা কাজা আদায় করিতে হইবে। আর যদি হায়েজ দিনে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া স্মরণ থাকে, তবে রমজানের সমস্ত রোযা আদায় করিবার পর বাইশ দিন রোযার কাজা আদায় করিতে হইবে। কারণ, যেদিন প্রথম হায়েজ শুরু হইয়াছে সেই দিনের এবং বন্ধ হইবার দিনের রোযা কাজা আদায় করিতে হইবে। আর যদি দিনে কি রাতে হায়েজ হইয়াছে তাহা ঠিক করিতে না পারে তবুও এহতিয়াতের জন্য বাইশ দিনের রোযা কাজা আদায় করিতে হইবে। (শামী) আলমগীরী কিতাবে লিখিয়াছেন- এহ্তিয়াতের জন্য বাইশ দিনের রোযা কাজা করিবে।

নেফাসের বিবরণ

প্রশ্ন- নেফাস কাহাকে বলে? এবং ইহার মুদ্দত কত দিন?

উত্তর- স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর তাহাদের জরায়ু হইতে যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে 'নেফাস' বলে। ইহার ঊর্দ্ধ মুদ্দত চল্লিশ দিন, নিম্ন মুদ্দতের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, এক ঘন্টাও হইতে পারে। 'এনায়া' কিতাবে লিখিয়াছে যে, সন্তান প্রসবের এক ঘন্টা পরে প্রসবজনিত স্রাব বন্ধ হইলে তখনই তাহার পক্ষে গোসল করা ফরজ এবং গোসল করিয়া যথাবিহিত নামায রোযা আদায় করিবে। ইহাই ইমাম ছাহেবের কওল এবং এই কওলের উপরই ফতোয়া। (শামী)

প্রশ্ন- যদি সন্তান প্রসবের পর একেবারেই স্রাব না হয় তবে প্রসূতির প্রতি গোসল করা ফরজ কি না?

উত্তর-সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব না হইলেও শুদ্ধ কওল মতে তাহার প্রতি নেফাসের হুকুম হইবে এবং তাহার গোসল করা ফরজ হইবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব হওয়ার মধ্যে নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তবে সেই অবস্থায় তাহার নেফাস গণনা করিতে হইবে কি না এবং তাহার নামাযের কি হুকুম?

উত্তর- যদি সন্তানের শরীর মাতৃগর্ভ হইতে অর্দ্ধেক কিংবা অর্দ্ধেকের বেশী বাহির হয়, তবে প্রসূতির প্রতি নেফাসের হুকুম হইবে, তাহার ঐ ওয়াক্তের নামায মাফ হইয়া যাইবে। যদি অর্দ্ধেকের কম বাহির হয়, তবে তাহার প্রতি নেফাসের হুকুম হইবে না, তাহার ঐ ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরজ। যদি ঐ অবস্থায় সন্তান নিরাপদে রাখিয়া ইশারায় নামায আদায় করিতে পারে, তবুও আদায় করিবে। আর যদি একান্ত না পারা যায় তবে পরে কাজা আদায় করিবে।

(আলমগীরী, দুররোল মোখতার ও গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- সন্তানের শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি একটি মাত্র অঙ্গুলী বা উহার নখ পর্যন্ত গঠিত হইয়া থাকিলে স্ত্রীলোকের প্রতি নেফাসের হুকুম হইবে। যদি একখন্ড মাংস বা রক্তের পিন্ড বা শুধু রক্তপাত হয় ও কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত্রি স্রাব হইয়া থাকে, তবে ইহা হায়েজের মধ্যে গণ্য করিবে। ইহার কম হইলে এস্তেহাজা গণ্য করিয়া নামায ও রোযা যথারীতি আদায় করিবে। (শামী)

প্রশ্ন- স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চারের কতদিন পরে সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়?

উত্তর- গর্ভ সঞ্চারের একশত বিশ দিন অর্থাৎ চার মাস পরে সন্তানের অবয়ব গঠিত হয়।

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পরেও রক্তস্রাব চলিতে থাকে, তাহার কি হুকুম?

উত্তর- স্ত্রীলোকটির যদি এই প্রথমবারের প্রসব হয় আর এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে চল্লিশ দিন পরেই গোসল করিয়া নামায পড়িবে। যদি ইহার পূর্বে আরও সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, তবে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী নেফাস গণনা করিয়া অবশিষ্ট দিন এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। যেমন কোন স্ত্রীলোকের চব্বিশ দিনে পাক হইবার নিয়ম ছিল। পরের প্রসবে একচল্লিশ দিন স্রাব হইয়া বন্ধ হইল। এমতাবস্থায় পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী চব্বিশ দিন নেফাস ধরিয়া বাকী সতরদিন এস্তেহাজা ধরিবে এবং চব্বিশ দিনের পর হইতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ষোল দিনের নামায কাজা আদায় করিবে। (গায়াতুল আওতার ও শামী)

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের পূর্ব নিয়ম ব্যতিক্রম হইয়া তাহার পূর্বে বা পরে, চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন সময় পাক হয় তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- নেফাস বন্ধ হওয়া মাত্রই পাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে, এরূপ অবস্থা হইলে তাহার

নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (শামী)

প্রশ্ন- নেফাসের পর পুনঃ নামায ও রোযার কাজা আদায় করিতে হইবে কি না?

উত্তর- হায়েজের ন্যায় নেফাসের সময়ও নামায মাফ হইয়াছে। কিন্তু ফরজ রোজা মাফ হইবে না। উহার কাজা আদায় করিতে হইবে। নেফাসের সময় সহবাস করা হায়েজের ন্যায় হারাম। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন- যমজ সন্তান প্রসব করিলে কোন্ সময় হইতে নেফাস ধরা যাইবে এবং কত দিন অন্তর যমজ সন্তান প্রসব করিলে এক গর্ভ ধরা যাইবে?

উত্তর- প্রথম সন্তান প্রসবের পরেই নেফাস আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত ধরা যাইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের প্রসবের মধ্যে ছয় মাসের ব্যবধান হইলে দুই গর্ভ ধরা যাইবে। (শামী)

প্রশ্ন- প্রথম সন্তান প্রসবের পর নেফাস গণনা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের প্রসবের পর হইতে ইদ্দত গণনা হইবে, ইহার কারণ কি?

উত্তর- প্রথম সন্তান প্রসবের পরে নেফাস ধরা যাইবে, তাহার কারণ এই যে, জরায়ুদ্বয় খুলিয়া যায় ও নেফাস আরম্ভ হয়, আর ইদ্দত পূর্ণ হইবার জন্য জরায়ু খালি হওয়া আবশ্যক, এইজন্য দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পরে ইদ্দত শেষ হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত ধরা যাইবে। (শামী)

প্রশ্ন-যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রথম সন্তান হইবার পর হইতে স্রাব চলিতে থাকে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- উক্ত স্ত্রীলোক প্রত্যেক সন্তান প্রসবের পরে দীর্ঘ মুদ্দত চল্লিশ দিন করিয়া নেফাস গণনা করিবে। (শামী)

তোহরে মোতাখাল্লাল বা অনিয়মিত পবিত্রতা

প্রশ্ন- তোহরে মোতাখাল্লাল কাহাকে বলে? এবং ইহার হুকুম কি?

উত্তর- শামী কিতাবের মর্মে জানা যায়, দুই একদিন রক্তস্রাব হইয়া তোহরের (শুচিকালের) নিম্ন মুদ্দত ১৫ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে পুনরায় তিন দিনের কম স্রাব হইলে এই অসম্পূর্ণ মুদ্দতকে তোহরে মোতাখাল্লাল বলে। এই তোহরে-মোতাখাল্লাল বা অনিয়মিত পবিত্রতার মাসয়ালায় নানা প্রকার মতভেদ আছে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ মাসয়ালা কদাচিত ঘটিয়া থাকে। কিতাবে শুধু যে মাসয়ালার উপর ফতোয়া দিয়াছে তাহাই এখানে লিখিয়া দেওয়া হইল।

যথা-দুই স্রাবের মধ্যবর্তী তোহর (পবিত্রতা) যদি তিন দিনের কম হয়, তবে এই তোহরের সময় সর্ববাদিসম্মত মতে হায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে। যদি তিন দিনের বেশী এবং পনর দিনের কম সময় পাক থাকে, তবে এই কয়টি দিনও শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী রক্তস্রাবের মধ্যে ধরা যাইবে। যেমন কোন স্ত্রীলোকের দুইদিন স্রাব হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে চৌদ্দদিন পর্যন্ত স্রাব বন্ধ থাকিয়া পরে দুইদিন রক্তস্রাব হইল, এস্থলে প্রথম স্রাবের দুই দিন এবং মধ্যের

তোহরের চৌদ্দদিন ও পরবর্তী স্রাবের দুইদিন মোট আঠার দিন রক্তস্রাব হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। এমতাবস্থায় নিম্ন প্রকারের হুকুম হইবে-

(ক) সর্বপ্রথম ঋতুবতী স্ত্রীলোকের যদি এই অবস্থা হয়, তবে হায়েজের উর্দ্ধ মুদ্দত দশ দিন বাদ দিয়া বাকী আট দিন এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। যদি নিয়মিত ঋতুবতী স্ত্রীলোকের কোন সময় নিয়ম ব্যতিক্রম হইয়া পূর্বে ও পরে স্রাব হয়, তবে সে তাহার নিয়ম ও তারিখ অনুযায়ী হায়েজ গণনা করিবে এবং পূর্বাপর সময়কে এস্তেহাজা গণ্য করিবে।

(খ) যেমন কোন স্ত্রীলোকের মাসের প্রথম হইতে নিয়মিত পাঁচ তারিখ পর্যন্ত হায়েজ হইত; পরে এই নিয়ম ছুটিয়া গিয়া মাসের প্রথম তারিখ স্রাব হওয়ার পর চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত তের দিন বন্ধ থাকিয়া পুনঃ পনর ষোল দুই তারিখ স্রাব হইল এখন ঐ স্ত্রীলোকের পাঁচ দিন হায়েজ নিশ্চিত হইল।

কিন্তু এই পাঁচ দিনের মধ্যে মাত্র একদিন তাহার স্রাব হইয়াছিল। বাকী রক্তবন্ধের চারি দিন হায়েজকাল বলিয়া ঐ সময় ফরজ রোযা রাখিয়া থাকিলে উহার কাজা আদায় করিতে হইবে এবং পূর্বোক্ত মাসের ন্যায় পনর ষোল তারিখের স্রাবের দুই দিন এস্তেহাজা বিধায় রীতিমত নামায রোযা আদায় করিতে হইবে। যে স্ত্রীলোকের সাত তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্যন্ত হায়েজ হইবার নিয়ম ছিল কোন মাসে তাহার পাঁচ, ছয় তারিখ হায়েজ হইয়া সাত তারিখ হইতে তের তারিখ পর্যন্ত পাক রহিল পরে চৌদ্দ, পনর দুই তারিখ স্রাব হইল। এস্থলে হিসাব মত তাহার সাত হইতে দশ তারিখ পর্যন্ত হায়েজকাল স্থির হইয়াছে। এই তারিখের মধ্যে রোযা রাখিয়া থাকিলে তাহা পুনঃ আদায় করা ফরজ এবং পাঁচ, ছয় তারিখের নামায কাজা করিতে হইবে। দ্বিতীয় মাসয়ালায় পাক অবস্থা হায়েজকালের মধ্যে পতিত হইয়াছে। ইহাতে যেন কেহ ইতস্ততঃ না করেন।

নেফাসের তোহরে-মোতাখাল্লাল বা অনিয়মিত পবিত্রতা

প্রশ্ন- ইতি পূর্বে জানা গিয়াছে যে, যদি এক ঘন্টা বা অর্দ্ধ ঘন্টা পরেও নেফাস হইতে পাক হয়, তবে যথারীতি অজু গোসল করিয়া নামায পড়িবে, কিন্তু কোন স্ত্রীলোকের যদি প্রথম দুই এক দিন স্রাব হওয়ার পরে মধ্যে কিছু সময় পাক থাকিয়া পুনঃ স্রাব হয় তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- সন্তান প্রসবের পর ২/১ দিন স্রাব হইয়া পনর দিনের কম পাক থাকিয়া পুনঃ স্রাব হইলে, এই দ্বিতীয়বারের স্রাব প্রসবকাল হইতে চল্লিশ দিনের মধ্যে বিরাম হইলে, সর্ববাদীসম্মত মতে তোহর ও স্রাবের সকল সময়কে নেফাসের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। কিন্তু ইমাম ছাহেবের মতে মধ্যবর্তী 'তোহর' পনর দিনের বেশী হইলেও তোহর ও স্রাবের সকল সময়কে নেফাসের মধ্যে গণনা করা যাইবে। (রাহ্‌রুর রায়েক)

দ্রষ্টব্যঃ- এরূপ অবস্থায় নামায পড়িয়া থাকিলে কোন দোষ হয় নাই। এই নামাযের কাজা করিতে হইবে না। যদি ফরজ বা ওয়াজিব রোযা রাখিয়া থাকে, তবে তাহার যথাবিহিত কাজা আদায় করিবে। ইহাই কিতাবের হুকুম।

এস্তেহাজার বিবরণ

প্রশ্ন- এস্তেহাজা কাহাকে বলে?

উত্তর- স্ত্রীলোকের গুপ্তাঙ্গের অন্তর ভাগের একটি শিরা ছিন্ন হইয়া যে রক্তস্রাব হয় তাহাকে এস্তেহাজা বলে। ইহা এক জাতীয় পীড়া। হায়েজ ও এস্তেহাজার মধ্যে প্রভেদ আছে। হায়েজের স্রাবের গন্ধ আছে, এস্তেহাজার স্রাবে গন্ধ নাই। (শামী)

প্রশ্ন- যে স্ত্রীলোকের এস্তেহাজা বা প্রদর জাতীয় পীড়া আছে, তাহার কি হুকুম?

উত্তর- এস্তেহাজার পীড়া বিশিষ্ট স্ত্রীলোকগণের কর্তব্য এই যে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে লজ্জাস্থান ধৌত করত নূতন অজু করিয়া নামায, কুরআন শরীফ ও আজিফা পাঠ করিবে এবং সহবাস ইত্যাদি যাহা পাক অবস্থায় বিধেয় আছে, এস্তেহাজায় তাহা সমস্তই করিতে পারিবে। কিন্তু এইটুকু মাত্র পার্থক্য আছে যে, এস্তেহাজার সময় প্রত্যেক ওয়াক্তে নূতন অজু করিয়া নামায পড়িবে। (বিস্তারিত মাযুরের মাসয়ালা দ্রষ্টব্য) (শামী)।

প্রশ্ন- গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব হইলে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যে কোন সময় যে কোন প্রকার যত দিন রক্তস্রাব হউক না কেন, উহা এস্তেহাজা বলিয়া জানিতে হইবে। যদি সন্তানের শরীরের অর্ধেকের কম বাহির হইয়া স্রাব হইতে থাকে, তবে উহাও এস্তেহাজা বলিয়া জানিবে। (শামী)

এস্তেহাজা চিনিবার কতিপয় সংক্ষিপ্ত উপায়

(শামী, বাহরুর রায়েক, ফতহুল কাদীর ও শরহে বেকায়া প্রভৃতি কিতাবের মর্মে)

১। নয় বৎসর বয়সের পূর্বে স্রাব হইলে।

২। ষাট বৎসরের পরে স্রাব হইলে।

৩। গর্ভবতী হওয়ার পর হইতে সন্তানের অর্ধ শরীর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে স্রাব হইলে।

৪। দশদিন স্রাব হইবার পর পনর দিনের মধ্যে পুনঃ স্রাব হইলে।

৫। তিন দিনের কম স্রাব হইলে।

৬। নিয়মিত স্ত্রীলোকের দশ দিনের অতিরিক্ত স্রাব হইলে নিয়মের অতিরিক্ত দিন এস্তেহাজা হইবে।

৭। প্রথমবার দশ দিনের বেশী স্রাব হইলে, দশ দিনের পর হইতে এস্তেহাজা হইবে।

৮। চল্লিশ দিনের বেশী নেফাস হইলে অতিরিক্ত দিন এস্তেহাজা হইবে।

হায়েজ নেফাসের অবস্থায়, রোযা, নামায ও সহবাসের হুকুম

প্রশ্ন- ঋতুবতী স্ত্রীলোকের রোযা ও নামায আদায় করিবার কি হুকুম, তাহা জানিতে বাসনা।

উত্তর- হায়েজ নেফাসের অবস্থায় রোযা ও নামায উভয়েই হারাম, কিন্তু পাক হইলে শুধু রোযার কাজা আদায় করিতে হইবে। নামাযের কাজা আদায় করিতে হইবে না। (আলমগীরী)

প্রশ্ন-যদি কোন স্ত্রীলোকের নামাযের মধ্যে বা রোযার অবস্থায় হায়েজ কিংবা নেফাস আরম্ভ হয় তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- ফরজ নামায আরম্ভ করিয়া থাকিলে উহা মাফ হইবে, তাহার কাজা আদায় করিতে হইবে না। কিন্তু যদি নফল বা সুন্নাত নামায অথবা নফল ও সুন্নাত রোযার মধ্যে কাহারও ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়, তবে পাক হওয়ার পরে এই সমস্তের কাজা আদায় করিতে হইবে। কারণ, নফল নামায ও রোযার নিয়ত শুদ্ধ হইলে উহা আদায় করা ওয়াজিব।(আলমগীরী, শামী)

প্রকাশ থাকে যে, রোযার দিবসে হায়েজ ও নেফাস হইলে দিনের বেলায় পানাহার করা জায়েয আছে। কিন্তু রোযাদারের সম্মুখে বসিয়া না খাওয়া ভাল।

প্রশ্ন- উল্লিখিত প্রশ্নে শামী কিতাবের মর্মে অবগত হইলাম যে, নফল রোজা আরম্ভের পরে কোন স্ত্রীলোক ঋতুবতী হইলে পাক হওয়ার পর তাহার কাজা আদায় করিতে হইবে কিন্তু শরহে বেকায়ায় লিখিত আছে যে, নফল রোযা আদায় করিতে হইবে না। এখন আমরা কোন মত অবলম্বন করিব?

উত্তর- শামী কিতাবের মতে, ঋতুকালীন অবস্থায় আরম্ভ করা নফল রোযার কাযা আদায় করিতে হইবে, এই উক্তিই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, দুররুল মোখতার, শরহে বেকায়ার হাশিয়া, বাহরুর রায়েক, হেদায়া, শরহে মোখতাছার, তাহতাবী প্রভৃতি কিতাবে ঐ অবস্থায় পাক হওয়ায় নফল রোযা কাজা করা ছহীহ হইয়াছে। ইহার কারণ এই লিখিয়াছে, নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার কারণে ঐ নফল রোযা ও নফল নামায আদায় করা ওয়াজিব। আলমগীরী কিতাবে লিখিয়াছে, এহ্‌তিয়াতের জন্য ঐ অবস্থায় রোযাও কাজা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন- ফরজ নামায মাফ হইল, কিন্তু ফরজ রোযা মাফ হইল না, ইহার কারণ কি? জানিতে বাসনা।

উত্তর- তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, যখন আদি জননী হযরত হাওয়া (আঃ) নামাযের মধ্যে রক্তস্রাব দেখিলেন, তখন তিনি হযরত আদম (আঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এই অবস্থায় নামায পড়িবেন কি না? তৎপর হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, ঐ অবস্থায় নামায মাফ হইয়াছে। পুনঃ হযরত হাওয়া (আঃ) রোযার অবস্থায় একদিন ঋতুবতী হন। তিনি ইহা হযরত আদম (আঃ) কে

জানাইলেন। হযরত আদম (আঃ) তাহাকে রোযা ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু পাক হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত হাওয়াকে রোযার কাজা করিতে আদেশ করেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অসাধ্য সাধন করিতে আদেশ করেন নাই। কারণ, রোযা রাখা এক মাসের জন্য বিশেষ ইবাদত এবং ইহার কাজা আদায় করা সহজ। কেননা, হায়েজের উর্দ্ধ মুদ্দত দশ দিন মাত্র। কাজেই বৎসরে দশ দিনের অধিক ফরজ রোযার কাজা আদায় করিতে হয় না। কিন্তু হায়েজের উর্দ্ধ মুদ্দত দশদিন ধরিয়া প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত হিসাবে প্রতি মাসে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের কাজা করিতে হয়। এই হিসাবে বৎসরে ছয়শত ওয়াক্ত নামাযের কাজা আদায় করিতে হয়। ইহা আদায় করা অতিশয় কঠিন কাজ। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া নামায মাফ করিয়া রোযার কাজা আদায় করিতে আদেশ দিয়াছেন। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

প্রশ্ন- যদি নামাযের শেষ ওয়াক্তে কোন স্ত্রীলোকের রক্তপাত হয়, আর সে ঐ ওয়াক্তের নামায আদায় না করিয়া থাকে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- তাহার উক্ত নামায মাফ হইয়া যাইবে এবং উহার কাজা আদায় করিতে হইবে না। (শামী)

প্রশ্ন- ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে উঠা বসা করা, শয়ন ও চুম্বন করা, কিংবা তাহার হাতের রন্ধন খাওয়া, তাহার সহিত একত্রে খাওয়া, সহবাস করা ইত্যাদি জায়েয কি না?

উত্তর- ঋতুবতী স্ত্রীলোকের রান্না খাওয়া ও তাহার সহিত একত্রে পানাহার করা, কিংবা শয়ন ও চুম্বন সকলই জায়েয। কিন্তু তাহার সহিত সহবাস করা হারাম। এমনকি নাভির নিম্নে হাঁটুর উপরিভাগে কোন প্রকার স্পর্শ করাও নিষেধ। ঋতুবতী স্ত্রীলোককে অপবিত্র মনে করিয়া স্বামীর ভিন্ন বিছানায় শয়ন কর জায়েয নহে। কেননা ইহা ইহুদীদের প্রথা। প্রকাশ থাকে যে, পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বিছানায় থাকা নিষেধ নহে, ঘৃণা করিয়া বিছানা পৃথক করা নিষেধ। (শামী)

প্রশ্ন- স্ত্রীলোকের দশ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে হায়েজ বন্ধ হইলে তাহার গোসলের পূর্বে সহবাস করা জায়েয কি না?

উত্তরঃ না, যে স্ত্রীলোকের হায়েজ তিন দিনের পর, দশ দিনের পূর্বেই বন্ধ হয় কিংবা চল্লিশ দিনের পূর্বেই যে কোন সময় নেফাস বন্ধ হয়, তবে স্ত্রীলোক গোসল করিয়া নামাযের নিয়ত করিতে পারে এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা না করিয়া সহবাস করিতে পারিবে না। যদি হায়েজ পূর্ণ দশ দিনে এবং নেফাস পূর্ণ চল্লিশ দিনে বন্ধ হয়, তবে গোসল করিবার পূর্বে সহবাস করা দুরস্ত আছে। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই সহবাসের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। (শামী)

প্রশ্ন- কোন্ স্ত্রীলোকের পাঁচ দিন হায়েজ হইবার নিয়ম ছিল, পরে কোন একমাসে তাহার চারদিন হায়েজ হইয়া বন্ধ হইল, এখন তাহার নামাযের কি হুকুম? এবং সে পাঁচ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে সহবাস করিতে পারিবে কি না?

উত্তর- উক্ত স্ত্রীলোকের চারি দিন পরেই মুস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া গোসল

করিয়া নামায পড়া ফরজ। কিন্তু পাঁচ দিন গত না হইলে সহবাস করিতে পারিবে না কারণ ঐ অবস্থায় পুনঃ স্রাব হইতে পারে। যাহাদের দশ দিনের মধ্যে এবং নিয়মিত অভ্যাসের পূর্বে যে কোন সময় হায়েজ বন্ধ হয়, তাহাদের উপরোক্ত নিয়ম পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের পূর্বে হায়েজ বন্ধ হইলে নিয়ম পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সহবাস করিবে না। কিন্তু স্রাব বিরাম হওয়ার পরে মুস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করতঃ গোসল করিয়া নামায পড়িবে। এইরূপ আদতের পূর্বে হায়েজ বন্ধ হইলে গোসল করিয়া নামায রোযা আদায় করিবে, কিন্তু আদতের পূর্বে সহবাস করিবে না। (শামী)

প্রশ্ন- উল্লিখিত মাসয়ালায় নিয়মিত সময়ের পূর্বে হায়েজ বন্ধ হইলেও নিয়ম পর্যন্ত পুনরায় স্রাব হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নামায পড়িবে। কিন্তু সহবাস হইতে বিরত থাকিবার হুকুম দিবার কারণ কি?

উত্তর- শরহে বেকায়ার মর্মে জানা যায় যে, স্রাব বন্ধ থাকাকালীন স্ত্রীলোক যে পাক, ইহাতে সাময়িকভাবে কোন সন্দেহ থাকে না। পক্ষান্তরে নিয়মিত সময়ের মধ্যে পুনঃ স্রাব হওয়া নিশ্চিত নহে। ইহা সন্দেহের অন্তর্গত। কেননা পুনরায় স্রাব না-ও হইতে পারে। কাজেই সন্দেহের জন্য ফরজে আইন নামায ছাড়িয়া দিতে পারিবে না বরং এহতিয়াতের সন্দেহের (সাবধানতা অবলম্বন) জন্য নামায আদায় করিতে হইবে। উক্ত এহতিয়াতের কারণে অর্থাৎ নিয়মের মধ্যে পুনঃ স্রাব হওয়ার আশঙ্কাস্থলে সহবাস হইতে ক্ষান্ত থাকা আবশ্যক। কেননা সহবাস হইতে কিছুকাল ক্ষান্ত থাকিলে উহাতে কোন গোনাহ হইবে না। শামী কিতাবের মর্মেও এইরূপ জানা যায়।

প্রশ্ন-কোন্ স্ত্রীলোকের স্রাব বন্ধ হওয়ার পরে বিলম্ব করা ওয়াজিব?

উত্তর-যে স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের পূর্বে স্রাব বন্ধ হয়, তাহার জন্য নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা ওয়াজিব। (শরহে বেকায়া, শামী)

প্রশ্ন-যদি কোন স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের পূর্বে স্রাব বন্ধ হইয়া পূর্ণ পনর দিন পাক না থাকে, তবে স্রাব বন্ধ হইবার পরেই গোসল করা ফরজ কি না এবং যদি পূর্ণ পনর দিন পাক না থাকে, তবে তাহার কি হুকুম?

উত্তর- যাহার দুই একদিন রক্তস্রাব হইয়া বন্ধ হয়, তাহার গোসল ফরজ নহে; বরং সে অজু করিয়া শেষ ওয়াক্তে নামায পড়িবে এবং সহবাস হইতে বিরত থাকিবে। পূর্ণ পনর দিন পূর্বে পুনঃ স্রাব হইলে নিয়মিত ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ নিয়মের কয়দিন হায়েজ গণনা করিবে। ঐ মুদ্দতের মধ্যে রোযা থাকিয়া থাকিলে উহার কাজা আদায় করিবে এবং যদি পূর্ণ পনর দিন পাক থাকে, তবে প্রথম দুই দিনের স্রাবকে এস্তেহাজা গণ্য করিবে। এই দুই দিনের নামায কাজা করিবে। (গায়াতুল আওতার)।

প্রশ্ন-যদি তিন দিনের নিয়মাধীন কোন স্ত্রীলোকের কোন সময় তিন দিনের পরেও স্রাব বন্ধ না হয়, তবে গোসল করিয়া নামায পড়িবে কি না?

উত্তর- উক্ত স্ত্রীলোক সেই অবস্থায় নামায পড়িবে না। তাহার সহিত সহবাস করা

অবৈধ। যদি দশ দিন পূর্ণ না হইয়া তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তবে তাহার নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে জানিবে এবং সে পাক হইবার পর যথারীতি নামায আদায় করিবে।

তিন দিনের পর হইতে যে কয়দিন অতিরিক্ত হায়েজ হইয়াছে, তাহার কাজা করিতে হইবে না। কিন্তু যদি দশ দিনের পরেও স্রাব হইতে থাকে, তবে এগার দিনের সময় গোসল করিয়া নামায পড়িবে এবং তিন দিনের পর হইতে এগার দিন পর্যন্ত গত সাত দিনের নামায ও রোযা কাজা করিবে এবং এই কয়দিনই এস্তেহাজার মধ্যে গণ্য হইবে। যদি দশ দিনের পূর্বে রক্তপাত বন্ধ হইয়া থাকে, তবে উক্ত সম্পূর্ণ সময়কে হায়েজ মনে করিবে এবং তাহার নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে জানিবে। (আলমগীরী)

প্রশ্ন- যদি কেহ দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে পাক হইয়া এবং খুব তাড়াতাড়ি গোসল করিয়া মাত্র একবার "আল্লাহু আকবার" বলিবার সময় পায়, তবে তাহার প্রতি উক্ত ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরজ কি না? যদি এতটুকু সময়ও না পাওয়া যায়, তবে তাহার জন্য উক্ত ওয়াক্তের নামায মাফ হইবে কি না? এবং যদি পূর্ণ দশ দিন স্রাবের পর রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে ও গোসল না করিয়া মাত্র একবার "আল্লাহু আকবার" বলার সময় পায়, তাহার প্রতি উক্ত ওয়াক্তের নামায ফরজ কি না?

উত্তর-যে স্ত্রীলোকের পূর্ণ দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে হায়েজ বন্ধ হয়, সে যদি তাড়াতাড়ি গোসল করিয়া নামাযের শেষ সময়ে শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলিতে পারে, তবে তাহার প্রতি এ ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরজ। 'যদি আল্লাহু আকবার' বলিবার সময়ও না পায়, তবে সেই ওয়াক্তের নামায পড়া তাহার প্রতি ফরজ নহে। আর যদি পূর্ণ দশ দিনে পাক হইয়া থাকে ও গোসল না করিয়া শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু পরিমাণ নামাযের ওয়াক্তের বাকী থাকে। তবু ঐ ওয়াক্তের নামায তাহার প্রতি ফরজ হইবে এবং গোসল করিয়া ঐ নামাযের কাজা যথাসময়ে আদায় করিবে। (শামী, শরহে বেকায়া) প্রকাশ থাকে যে, নেফাস সম্বন্ধে এইরূপ মাসয়ালা অনুমান করিয়া লইবে।

প্রশ্ন-যদি কোন স্ত্রীলোক রোযার দিবসে হায়েজ ও নেফাস হইতে পাক হইয়া থাকে, তবে সেদিন কিছু পানাহার করিবে কি না ও পানাহার না করিয়া থাকিলে তাহার সেই দিনের রোযা আদায় হইবে কি না?

উত্তর-রোযার দিবসে ছোবহে-ছাদেকের পর যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব ও নেফাস বিরাম হয় সে রোযাদারের ন্যায় সমস্ত দিন খাওয়া ও পান করা ইত্যাদি হইতে ক্ষান্ত থাকিবে এবং তাহাদের নামায পড়িতে হইবে ও ঐ দিবসের রোযা কাজা করিতে হইবে। (শামী)

প্রশ্ন- যদি কোন স্ত্রীলোকের রোযার মাসে ছোব্হে ছাদেকের ঠিক পূর্বক্ষণে হায়েজ বা নেফাস বন্ধ হয়, তবে তাহার ঐ দিনের রোযার কি হুকুম?

উত্তর- এরূপ অবস্থায় যদি উক্ত স্ত্রীলোকের পূর্ণ দশ দিনের হায়েজ এবং চল্লিশ দিনে

নেফাস বন্ধ হয়, আর ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলিবার সময়টুকু থাকে, তবে সেদিনের রোযার নিয়ত করিয়া রোযা রাখিতে হইবে। তাহার ঐ রোযা শুদ্ধ হইবে। যদি দশ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে হায়েজ এবং চল্লিশ দিনের পূর্বে নেফাস বন্ধ হয় এবং ছোবহে ছাদেক হইবার পূর্বে এই পরিমাণ সময় থাকে যে, গোসল করিতে পারে, তবে তাহার ঐ দিনের রোযা রাখা ফরজ। গোসল পরে করিলেও চলিবে। যদি ঐ অবস্থায় ছোব্‌হে ছাদেক হইবার পূর্বে গোসল করিতে পারে এই পরিমাণ সময় না থাকে, তবে সেই দিনের রোযার নিয়ত করিবে না। ঐদিন পানাহার করা জায়েয নহে। (গায়াতুল আওতার, শামী) প্রকাশ থাকে যে, রোযার সম্মানের জন্য পানাহার হইতে বিরত থাকিবে।

হায়েজ নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকের পালনীয় কর্তব্য

(নিম্নলিখিত ১৮ দফা মাসয়ালা আলমগীরী কিতাব হইতে লিখিত হইল)

১। স্ত্রীলোকের ঋতু ও নেফাস অবস্থায় রোযা রাখিবে না। বা নামাযও পড়িবে না। যখন পাক হইবে তখন রোযার কাজা করিবে কিন্তু নামাযের কাজা করিতে হইবে না।

২। ঋতু বা নেফাস প্রকাশ পাইলেই নামায ছাড়িয়া দিবে।

৩। রোযা অবস্থায় সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে ঋতু বা নেফাস প্রকাশ পাইলে সেই দিনের রোযা কাজা করিতে হইবে।

৪। নামাযের ওয়াক্তে হায়েজ বা নেফাস হইলে এই ওয়াক্তের নামায মাফ হইবে। সম্পূর্ণ নামায আদায় করিতে পারে এমত সময় না থাকিলে সেই ওয়াক্তের নামায মাফ হইবে।

৫। নামাযের শেষ ওয়াক্তে যদি নামায আরম্ভ করে আর ঐ নামাযের মধ্যে তাহার হায়েজ বা নেফাস হয়, তবে নামায ছাড়িয়া দিবে। ঐ নামাযের কাজা করিতে হইবে না।

৬। নফল নামাযের বা নফল রোযার মধ্যে হায়েজ আসিলে উহার কাজা আদায় করিতে হইবে। নেফাসেরও ঐ হুকুম।

৭। ঋতুবতী বা নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অজু করিয়া তাছ্‌বীহ তাহ্‌লীল পাঠ করিবে। (ইহা মুস্তাহাব)

৮। হায়েজ নেফাস বা এইরূপ অন্য কোন কারণে যাহাদের উপর গোসল করা ফরজ, তাহাদের মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কিন্তু গুরুতর প্রয়োজন বশতঃ প্রবেশ করার বিধান আছে। যেমন-মসজিদ ছাড়া অন্যত্র পানি না পাইলে, শত্রু, চোর, ডাকাত ও হিংস্র প্রাণী কিংবা শীততাপ হইতে আশ্রয় না পাইলে ঐ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয আছে। কিন্তু তাইয়াম্মুম করিয়া লওয়া ভাল।

৯। হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কবর যিয়ারত করিতে পারে।

১০। হায়েজ, নেফাস কিংবা অন্য যে কোন অশুচিতার কারণে নাপাক অবস্থায় কাবা

শরীফের তাওয়াফ করা হারাম।

১১। উল্লিখিত নাপাক অবস্থায় কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে পাঠ করা হারাম। কিন্তু দোয়া ও শেফার নিয়তে পাঠ করিতে পারিবে। যেমন খাওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' ও পরে শোকরের জন্য 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ করা জায়েয আছে।

১২। ঐ প্রকার নাপাক অবস্থায় তাওরাত, যাবুর প্রভৃতি আসমানী কিতাব পড়িতে পারিবে না।

১৩। ঐ অবস্থায় যাবতীয় দোয়া, যেমন দোয়ায়ে কুনূত, আযানের দোয়া ইত্যাদি পড়িতে পারে ও আযানের জওয়াব দিতে পারে।

১৪। ঐরূপ নাপাক অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনিলে সিজদা দিবে না।

১৫। শিক্ষয়িত্রী নাপাক অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়াইলে প্রত্যেক বারে একটি একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া পড়াইতে পারিবে।

১৬। বিনা অজুতে, নাপাক অবস্থায়, হায়েজ ও নেফাসের মধ্যে কুরআন শরীফ স্পর্শ করিতে পারিবে না। কুরআন শরীফের বর্ণ বিন্যাস করিয়া পড়িতে পারিবে।

১৭। পৃথক জুজদানে কিংবা গেলাফ দ্বারা আবৃত থাকিলে কুরআন শরীফ স্পর্শ করিতে পারে। পরিধানের কাপড় দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিবে না। কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ঐ অবস্থায় স্পর্শকরা মাকরূহ। কিন্তু নিজ পিরহানের আস্তিন বা পরিধেয় কাপড়ের পাক আঁচল দ্বারা ধরিতে পারিবে। (আলমগীরী, তরীকুল ইসলাম ১ম অধ্যায়)

১৮। হায়েজ, নেফাস অবস্থায় সহবাস করা হারাম, কিন্তু স্পর্শ, চুম্বন ও একত্রে শয়ন করা যায়েয আছে। নাভির নিম্ন ভাগ হইতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত স্পর্শাদি করিবে না। (আলমগীরী)

১৯। হায়েজ, নেফাস হইতে পাক হইলে গোসল করা ফরজ। (শামী)

২০। হায়েজ দশ দিনে এবং নেফাস পূর্ণ চল্লিশ দিনে শেষ হইলে গোসলের পূর্বে সহবাস করা জায়েয আছে। কিন্তু গোসল করিয়া লওয়া মুস্তাহাব। (শামী)

২১। দশ দিনের পূর্বে হায়েজ এবং চল্লিশ দিনের পূর্বে নেফাস বন্ধ হইলে গোসল করিয়া নামাযের নিয়ত করিতে পারে, এই পরিমাণ সময় বিলম্ব না করিয়া সহবাস করা জায়েয নাই। (গায়াতুল আওতার)

২২। নিয়মিত সময়ের পূর্বে হায়েজ ও নেফাস বন্ধ হইলে, নিয়মিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সহবাস করিবে না। (শামী)

২৩। যদি কোন স্ত্রীলোক তিন দিনের পূর্বে হায়েজ হইতে পাক হয়, তবে অজু করিয়া নামায পড়িবে। যদি নিয়মিত ঋতুবতী হয়, তবে সহবাসের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। অন্যথায় উর্দ্ধ মুদ্দত দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। (শামী)

মা'যুরের মাসয়ালা

প্রশ্নঃ মা'যুর কাহাকে বলে? এবং মা'যুর ব্যক্তির অজু কতক্ষণ থাকে, জানিতে বাসনা।

উত্তর- যদি কোন লোকের এমন অবস্থা হয় যে, সদাসর্বদা প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে অথবা সদাসর্বদা রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে বা ক্ষতস্থান হইতে পুঁজ অথবা পানি নির্গত হইতে থাকে, কিংবা অবিরত দাস্ত ও বমি হইতে থাকে বা সর্বদা এস্তেহাজার স্রাব হইতে থাকে, এইরূপ ওযরে একবার অজু করিয়া সেই অজু দ্বারা সে একবার ফরজ নামায আদায় করিতে না পারে, শরীয়ত তাহাকে মা'যুর বলে। মা'যুর ব্যক্তির ওযর ব্যতীত অন্য কোন কারণে অজু ভঙ্গ না হইলে এক ওয়াক্ত পর্যন্ত তাহার অজু থাকিবে। যেমন কোন এক ব্যক্তির সর্বদাই প্রস্রাব বাহির হয়, তাহার প্রস্রাব ভিন্ন অন্য কোন কারণে, যেমন পায়খানা, বদবায়ু, পুঁজ কি পানি বাহির হইলে কিংবা ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ উপস্থিত হইলে অজু ভঙ্গ হইবে। (শামী)

মা'যুর ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্তে নূতন অজু করিয়া ফরজ, সুন্নাত ও নফল নামায পড়িতে এবং কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে পারিবে। (গায়াতুল আওতার, শামী)

প্রশ্নঃ মা'যুর ব্যক্তি ফজরের অজু দ্বারা সূর্যোদয়ের পর এশ্‌রাক নামায পড়িতে পারিবে কি না এবং সূর্যোদয়ের পরে অজু করিলে সেই অজু দ্বারা জোহরের নামায পড়িতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ মা'যুর ব্যক্তি ফজরের অজু দ্বারা শুধু ফজরের সুন্নাত ও ফরজ নামায পড়িয়া সূর্যোদয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত অজিফা ইত্যাদি পাঠ করিতে পারিবে এবং সূর্যোদয়ের পরে অজু করিলে সেই অজুর দ্বারা এশ্‌রাক ও জোহরের নামায পড়িতে পারিবে।

(গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তির একটি যখম হইতে সদাসর্বদাই পানি বাহির হয়। যদি তাহার অজু করার পর আর একটি নূতন যখম হইতে রক্ত বা পানি প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে এই অজু দ্বারা নামায পড়িতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ না, ঐ অজু দ্বারা নামায হইবে না। কারণ শেষোক্ত যখমের কারণে পুনঃ তাহাকে অজু করিতে হইবে। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ কতক্ষণ পর্যন্ত ওযর থাকিলে প্রকৃত মা'যুর বলিয়া গণ্য হইবে এবং একবার অজু করিলে মা'যুর ব্যক্তির কতক্ষণ অজু থাকিবে?

উত্তর- নামাযের পূর্ণ এক ওয়াক্তের মধ্যে যদি এতটুকু সময়ও ওযর ব্যতীত না থাকে যে, মাত্র ফরজ আদায় করিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি মা'যুর বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু তাহার পরের ওয়াক্তে যদি ওযর না থাকে, বরং মাঝে মাঝে অজু ভঙ্গের কারণ ঘটে তবে যতদিন এইরূপ থাকিবে ততদিন মা'যুর বলিয়া ধরা যাইবে। কিন্তু

নামাযের পূর্ণ এক ওয়াক্ত ওযর হইতে নিরাপদ থাকিলে তাহাকে আর মা'যুর বলিয়া গণ্য করা হইবে না। তাহার ওযর চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

(গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন- যদি কোন ব্যক্তির নামাযের ওয়াক্তের কিছু সময় চলিয়া যাওয়ার পর ওযর প্রকাশ পায় এবং সেই ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত ওযর থাকে কিংবা তাহার পরের ওয়াক্তের সম্পূর্ণ সময় বা কতক সময় ওযর প্রকাশ পায়, তবে তাহার প্রতি কি হুকুম?

উত্তর- পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পর্যন্ত ওযর না থাকিলে তাহাকে মা'যুর ধরা যাইবে না। যেমন এক ব্যক্তির জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার কিছু পরে ওযর প্রকাশ পাইয়া জোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত চলিল এমন কি মাত্র চারি রাকয়াত ফরজ নামায পড়িবার সময় টুকুও ওযর ব্যতীত কাটিল না, এই অবস্থায় জোহরের শেষ ওয়াক্তে অজু করিয়া চারি রাকয়াত ফরজ আদায় করিবে এবং আছরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত গৌণ করিয়া অজু করতঃ শুধু আছরের চারি রাকয়াত নামায পড়িবে এবং তাহার ওযর যদি আছরের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে, তবে জোহরের নামায কাজা করিতে হইবে না। আর যদি আছরের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত পর্যন্ত ওযর না থাকে, তবে সে ব্যক্তি মা'যুর হইবে না। তাহার জোহরের নামায কাজা করিতে হইবে।

(গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন- ওযর বন্ধ থাকার অবস্থায় মা'যুর ব্যক্তি অন্য কোন কারণে অজু করিল পরে ওযর হইলে ঐ অজু দ্বারা নামায হইবে কি না?

উত্তর-ওযর বিরাম থাকাকালীন অন্য কোন কারণে অজু করার পর পুনঃ ওযর দেখা দিলে সেই অজু দ্বারা নামায হইবে না। বরং পুনঃ অজু করিতে হইবে। কারণ ঐ ওযরের অজু করা হয় নাই। (গায়াতুল আওতার)

প্রশ্ন- যদি মা'যুর ব্যক্তির রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি কাপড়ে লাগে তবে সেই কাপড় দ্বারা নামায হইবে কি না?

উত্তর-যদি কাপড় পাক রাখিয়া নামায আদায় করিতে সক্ষম না হয়, তবে ঐ নাপাক কাপড় দ্বারাই নামায পড়া জায়েয হইবে। যদি ওযর এতটুকু সময়ও বন্ধ থাকে, শুধু নামায আদায় করিতে পারে তবে এমতাবস্থায় ঐ ওযরে কাপড় নাপাক হওয়ার দরুন এক দের্‌হামের চেয়ে কম স্থান নাপাক হইলে নামাযের জন্য ধৌত করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু এক দের্‌হাম পরিমিত কাপড়ে নাপাক লাগিলে উহা ধৌত না করিয়া নামায পড়িলে হইবে না। (গায়াতুল আওতার)

প্রকাশ থাকে যে-এক দের্‌হামের বেশী পরিমাণ নাপাক হইলে উহা ধৌত করা ফরজ। এক দের্‌হামের পরিমিত হইলে ধৌত করা ওয়াজিব এবং ইহার কম হইলে ধৌত করা মুস্তাহাব।

এস্তেহাজা কিংবা অন্য কোন কারণে মা'যুর ব্যক্তি ওযর বিরাম থাকা অবস্থায় অজু

করিলে যদি অজু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ না ঘটে, তবে ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়াতেও অজু যাইবে না। পরবর্তী ওয়াক্ত পর্যন্ত অজু থাকিলে ঐ অজু দ্বারা সেই ওয়াক্তের নামায পড়িতে পারিবে। যেমন এস্তেহাজা কিংবা অন্য কোন ওযর বিশিষ্ট স্ত্রীলোক জোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্তের ওজর কিংবা এস্তেহাজার স্রাব বিরাম থাকাকালীন অজু করিল ঐ অজু দ্বারা আছরের নামায পড়িতে পারিবে। তাহার পুনঃ অজু করিতে হইবে না। পূর্ণ আছরের ওয়াক্ত সুস্থাবস্থায় কাটিলে অর্থাৎ ওযর বা এস্তেহাজা জনিত কোন প্রকার স্রাব না হইলে তাহার ওযর চলিয়া গিয়াছে জানিবে। ওযরের অবস্থায় অজু করিলে ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার সাথে অজু চলিয়া যাইবে। (বাহরুর রায়েক)

মা'যুর ব্যক্তি ওযর বন্ধ করিয়া নামায পড়িতে পারিলে বন্ধ করিবে ইহা ওয়াজিব। যখম থাকিলে পট্রি দ্বারা উহা বন্ধ করিবে। এইরূপ এস্তেহাজা কিংবা অন্য কোন ওযর যে কোন উপায়ে বন্ধ করিয়া নামায পড়িতে পারিলে পড়িবে।

কেহ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে গেলে ওযর প্রকাশ পায়, কিন্তু বসিয়া পড়িলে ঐ ওযর বিরাম থাকে, এরূপ অবস্থায় বসিয়া নামায পড়িবে। যদি বসিয়া ইশারায় নামায পড়িলে ওযর বিরাম থাকে, তবে ইশারায়ই নামায পড়িবে। যদি শুইয়া পড়িলে ওযর বিরাম থাকে কিন্তু বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে ওযর ঘটে, এমতাবস্থায় শুইয়া না পড়িয়া দাঁড়াইয়া রুকূ সিজদাহ করিয়া নামায আদায় করিবে। কিন্তু হায়েজের স্রাব এরূপভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার প্রতি ঋতুবতীর হুকুম বর্তিবে পাক ধরা যাইবে না। (কাঃ ফঃ) প্রকাশ থাকে যে, উক্ত কিতাবের মর্মে নেফাসেরও এরূপ হুকুম জানা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

(রোযার মাসয়ালা)

রোযার হুকুম ও ফজীলত

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মজীদে এরশাদ করিয়াছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
اَيَّامٍ اُخَرَ- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ- فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-
وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-
وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ- اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ
وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ- اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ- هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ- عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ- فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ- وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ

إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ-

সূরা বাকারাহ, ২য় পারা, রুকূ-(৬)

অর্থ- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ রোযা ফরজ করা হইয়াছিল তদ্রূপ তোমাদের উপরও রোযা ফরজ করা হইয়াছে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর। (রোযা) নির্দ্ধারিত কিছুদিনের জন্য; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেহ রোগাক্রান্ত হয়, কিংবা প্রবাসী হয়, তবে সে যেন অন্যান্য দিন হইতে রোযার দিন সমূহ পূরণ কর (অর্থাৎ রোগী বা প্রবাসী হইয়া রোযা ভংগ করিলে রমযানের পরে সেইগুলির কাজা আদায় করিবে) এবং যাহারা রোযা রাখিতে অসমর্থ হয় (বার্দ্ধক্যের কারণে) তাহারা প্রতি রোযার জন্য একজন মিসকীনকে আহার করাইবে। যদি কেহ নেকীর আশায় ইহার বেশী করে, তবে উহা তাহার জন্য ফলদায়ক হইবে। এবং রোযা পালন করাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝিয়া থাক।"

"পবিত্র রমজান মাস; এই মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে যাহাতে আছে মানুষের হেদায়াত এবং হেদায়াতের নিদর্শন সমূহ ও হক্-বাতিলের পার্থক্যকারী বিষয়াবলি। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেহ রমজান মাস পায়, সে যেন রোযা পালন করে এবং তোমাদের যে কেহ ঐ সময়ে রোগাক্রান্ত হইবে বা প্রবাসী সে যেন অন্য দিন সমূহে উক্ত রোযা পূর্ণ করে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজ ব্যবস্থা চাহেন এবং তিনি তোমাদের জন্য কোনও কঠিন ব্যবস্থা চাহেন না। অতএব তোমাদের রোযার দিন সমূহ যাপন করা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা যে তোমাদিগকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহতায়ালার মহিমা ঘোষণা কর। আর যেন তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হও; এবং যখন আমার বান্দা তোমার নিকটে (হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে (আপনি বলুন যে) আমি তাহাদের অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছি, যখন তাহারা আমাকে আহ্বান করে, আমি তাহাদের আহ্বানে সাড়া দেই। অতএব তাহাদের উচিত যে, তাহারা আমার নির্দেশ গ্রহণ করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যেন তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়।

"রমজানের রাত সমূহে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস হালাল করা হইয়াছে। স্ত্রীগণ তোমাদের আচ্ছাদন এবং তোমরা তাহাদের আচ্ছাদন! তোমরা ইহার পূর্বে নিজেদের প্রতি খেয়ানত করিতেছিলে, ইহা আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তোমাদের তাওবাহ কবুল করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা

করিয়াছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণের সহিত রাত যাপন কর এবং আল্লাহ তায়ালা যাহা তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তোমরা কামনা কর। শেষরাতের কালো রেখা হইতে শুভ্র রেখা (ফজর) বাহির না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করিতে থাক। অতঃপর পুনঃ রাত্রি আগমন পর্যন্ত তোমরা রোযা সম্পূর্ণ কর। এবং তোমরা মসজিদে এতেকাফে রত অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করিও না। উক্ত বিধানগুলি আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত সীমানা, উহা লংঘনের উপক্রম করিও না। এইরূপই আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বিধানসমূহ মানুষের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেন তোমরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাক।"

রোযার ফজীলতের হাদীস সমূহ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- "যখন পবিত্র মাস উপস্থিত হয়, তখন আসমানের দরওয়াজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।"

ইমাম আহ্মদ, তিরমিজী ও ইবনে মাজা হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন রমজানের প্রথম রাত সমাগত হয় তখন শয়তান এবং অবাধ্য জ্বিনগুলিকে কয়েদ করা হয় এবং দোযখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হয়। উহার কোনও দরওয়াজাই খোলা থাকে না, পরন্তু বেহেশতের দ্বার সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং উহার কোন দরজা বন্ধ রাখা হয় না। তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিয়া বলে, "হে কল্যাণকামিগণ! তোমরা মনোনিবেশ কর এবং হে অসদাচরণকারিগণ! বিরত হও।" সেই রাতে কতক লোক দোযখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। রমজানের প্রতি রজনীতেই এইরূপ হইতে থাকে।

ইমাম আহমদ এবং নাছায়ী হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রমজান আগমন করিয়াছে, ইহা বরকত ও কল্যাণের মাস। এই মাসে আল্লাহ তোমাদের প্রতি রোযা ফরজ করিয়াছেন। এই মাসে আকাশের দ্বার সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, দোযখের দরওয়াজা সমূহ বন্ধ করা হয়, চরম অবাধ্য শয়তানদিগকে শৃঙ্খলিত করা হয় এবং এই মাসের একটি রজনী হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এই মাসের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, সে সব কিছু হইতে বঞ্চিত হইবে।

ইবনে মাজা হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রমজান মাস আগমন করিলে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, রমজান মাস আসিল, এই মাসের একটি রাত হাজার রাতের চেয়েও উত্তম। যে ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিল, সে সব কিছু হইতেই বঞ্চিত হইল। যে এই নেকী হইতে বঞ্চিত হইল

সে সব কিছু হারাইল।

বাইহাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, রমজান মাস আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কয়েদীকে মুক্তি করিয়া দিতেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে দান করিতেন।

বাইহাকী শো'য়াবুল ঈমান গ্রন্থে ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বেহেশতকে রমজান মাসের জন্য সজ্জিত করা হইতে থাকে। রমজান মাস আরম্ভ হইলে বেহেশতের বাগিচা হইতে আরশের নিম্নদেশে অবস্থিত হুরগণের উপর একটি বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। হুরগণ বলেন, হে আল্লাহতায়ালা, তোমার বান্দাগণের মধ্য হইতে তাহাদিগকে আমাদের স্বামী নির্বাচন কর, যাহাদিগকে দেখিলে আমাদের চক্ষু জুড়ায় এবং আমাদিগকে দেখিলেও যাহাদের চক্ষু জুড়ায়।

ইমাম আহমদ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, রমজানের শেষ রজনীতে তাঁহার উম্মৎগণের গুনাহ মাফ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, উহা কি কদরের রজনী? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন "না বরং রোযাদারগণকে রোযা পূর্ণ করার পরে তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।"

ইমাম বাইহাকী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে শো'য়াবোল ঈমানে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের শেষ দিনে বলিলেন যে, হে মানবগণ! তোমাদের নিকট সম্মানিত ও কল্যাণময় মাস উপস্থিত হইয়াছে। উহাতে একটি রজনী হাজার মাস হইতেও উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এই মাসে রোযা ফরজ করিয়াছেন। এই মাসে রাত্রি সমূহে নফল নামায পড়িলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের ন্যায় ছওয়াব হইবে। এই মাসে ফরজ সমূহ আদায় করিলে সে অন্যান্য মাসের ফরজ আদায়ের সত্তরগুণ ছওয়াব লাভ করিবে। ইহা সংযমের মাস, সংযমের পুরস্কার বেহেশ্ত। এইমাস বরকতের মাস, এই মাসে ঈমানদারগণের রিজিক বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি রোযাদারগণকে এই মাসে ইফতার করাইবে, তাহার গুনাহ মাফ হইবে এবং তাহাকে দোযখের আগুন হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। ইফতার করানেওয়ালাও রোযাদার ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব পাইবে। ইহাতে রোযাদারের ছওয়াব কোন অংশে কম হইবে না। আমরা আরজ করিলাম "হে আল্লার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোযাদারগণকে ইফতার করাইবার উপকরণ আমাদের অনেকেরই নাই। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক চুমুক দুধ কিংবা পানি অথবা খোরমা দ্বারা ইফতার করাইলেও ঐরূপ ছওয়াব লাভ হইবে এবং যে ব্যক্তি রোযাদারকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করাইবে কিয়ামতে আল্লাহ তায়ালা আমার হাওজ কাওসার হইতে তাহাকে পানি পান করাইবেন এবং সে বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে কখনও

পিপাসিত হইবে না। ইহা ঐ পবিত্র মাস, যাহার প্রারম্ভে রহমত এবং মধ্যভাগে ক্ষমা ও শেষভাগে দোযখ হইতে মুক্তি। যে ব্যক্তি এই মাসে নিজের গোলামের প্রতি সহজ অর্থাৎ দাস দাসীর কাজ লঘু করিয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং দোযখ হইতে মুক্তি দান করিবেন।

বুখারী ও মুসলিম, ছুনানে তিরমিজী, নাসায়ী ও ছহীহ ইবনে খোযাইমাতে সহল বিন্ সাদ হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশ্তের ৮টি দরওয়াজা। ইহার একটির নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ এই দরওয়াজা দিয়া বেহেশ্তে প্রবেশ করিবেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ঈমানদার ব্যক্তি ছওয়াবের নিয়তে রমজানের রোযা রাখিবে, তাহার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে এবং যে ঈমানদার ব্যক্তি রমজানের রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া নফল ইবাদত করিবে তাহার পশ্চাতের গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি কদরের রজনীতে জাগরিত থাকিয়া ইবাদত করিবে, তাহার পূর্বের গুনাহরাশী মাফ হইয়া যাইবে।

ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, রোযা ও কুরআন শরীফ ঈমানদারগণের জন্য শাফায়াতকারী হইবে।

রোযা বলিবে যে,"হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাকে দিনে পানাহার ইত্যাদি হইতে বিরত রাখিয়াছি। তাহাদের জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর।"

কুরআন শরীফ বলিবে- হে আল্লাহ! আমি রাত্রিতে তোমার বান্দাকে ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি। তাহার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর।

অতএব, উভয়ের সুপারিশই কবুল হইবে।

হাদীস- বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, বান্দাগণের প্রত্যেক নেক কাজের জন্য দশ হইতে সাতশত গুণ ছওয়াব দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু রোযাদারগণের ছওয়াব আমি নিজ হাতেই দিব। বান্দা তাহার নিজের বাসনা ও পানাহার আমার জন্যই ত্যাগ করিয়া থাকে। রোযাদারগণ দুইটি সময়ে পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ইফতার করিবার সময়, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর সহিত মোলাকাতের সময় লাভ করিবে। রোযাদার ব্যক্তিগণের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণ অপেক্ষাও পবিত্র। রোযার দিনে অনাবশ্যক কথা বলিবে না এবং কলহ চিৎকার করিবে না। যদি কেহ রোযাদার ব্যক্তির সহিত ঝগড়া কলহ ও গালি গালাজ করিতে উদ্যত হয়, তবে সে জানাইয়া দিবে যে, সে রোযাদার। এইরূপ ইমাম মালেক, আবূ দাউদ, তিরমিজী ও নাসায়ী হইতে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীস- হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- রোযা ঢাল স্বরূপ এবং

দোযখ হইতে বাঁচিবার দৃঢ় কিল্লা।

হাদীস- হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে একটি রোযা রাখিবে, একটি কাকের ছানা শিশুকাল হইতে উড়িতে উড়িতে বৃদ্ধ হইয়া মরিয়া গেলে যতদূর যাওয়া সম্ভব, দোযখ তাহার নিকট হইতে তত দূরে থাকিবে।

হাদীস- আবূ ইয়ায়েলী ও তিবরানী বলেন, আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ একদিন নফল রোযা রাখে, তবে পৃথিবীর সমান স্বর্ণদান করিলেও উক্ত রোযার সমান হইবে না। উহার ছওয়াব কিয়ামতের দিন পাওয়া যাইবে।

হাদীস- হযরত ইবনে মাজা হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, শরীরের যাকাত রোযা এবং রোযার অর্দ্ধেক ছওয়াব ছবর।

হাদীস- নাসায়ী শরীফে, ইবনে খোযাইমা ও হাকেম আবূ ইমাম হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা বলিলেন, হে রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমাদিগকে কিছু আমল করিতে উপদেশ দান করুন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "রোযা অবলম্বন কর, উহার সমকক্ষ কোনও আমল নাই। আমি পুনঃ বলিলাম আমাকে কোনও আমল বলিয়া দিন। রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "রোযা অবলম্বন কর" কেননা উহার তুল্য কোনও আমল নাই। তাঁহারা পুনরায় ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় উক্তরূপই আদেশ করিলেন।

হাদীস- বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী ও নাছায়ী হযরত আবূ সাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার জন্য একটি রোযা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার মুখমণ্ডল দোযখের আগুন হইতে সত্তর বৎসরের রাস্তা দূরে রাখিবেন। তিবরানী, আবূ দারদা, তিরমিজী, আবূ ইমামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার জন্য এরূপ একটি রোযার ফলে দোজখ আকাশ ও পৃথিবী ব্যবধানে অবস্থান করিবে। ওমর ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, দোযখ ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে একশত বৎসরের রাস্তা দূরে অবস্থান করিবে। এবং মুয়ায বিন আনাস হইতে বর্ণিত আছে যে, রমজান মাস ব্যতীত অন্য সময় আল্লাহ তায়ালার জন্য একটি রোযা রাখিলে একটি দ্রুতগামী ঘোড়া একশত বৎসরের যে রাস্তা অতিক্রম করিতে পারে, দোযখ তাহার নিকট হইতে তত দূরে অবস্থান করিবে।

হাদীস- বাইহাকীতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, ইবনুল আ'ছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, রোযাদার ব্যক্তির দোয়া ইফতারের সময় বিফল হয় না।

হাদীস- হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হযরত রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- "তিন ব্যক্তির দোয়া বিফল হয়না। ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের দোয়া এবং নির্যাতীতের দোয়া। আদেল বাদশার এবং নির্যাতীতের দোয়া আল্লাহ তায়ালা মেঘের উপরে তুলিয়া লন এবং উহার জন্য আসমানের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমার ইয্যৎ ও জালালের কসম, অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিব যদিও কিছু পরে হয়।

হাদীস- ইবনে মাজা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমজান মাসে রোযা রাখিবার সুযোগ লাভ করিয়া যথারীতি রোযা রাখিয়াছে এবং যথাসম্ভব রাত্রি জাগরণ করিয়া ইবাদত করিয়াছে, সে ব্যক্তি অন্যস্থানের তুলনায় একলাখ রোযার ছওয়াব লাভ করিবে এবং প্রত্যহ দিবসে এবং রাত্রিতে এক এক দল গোলাম আযাদ করার এবং প্রত্যহ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় আরোহণ করার ছওয়াব পাইবে এবং দিনে ও রাত্রিতে সব সময় তাহার জন্য নেকী লিখিত হইবে।

হাদীস- বাইহাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমার উম্মতগণকে রমজান মাসে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কোনও উম্মত লাভ করে নাই। প্রথমতঃ এই যে, রমজানের রজনীতে রোযাদারের প্রতি আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টি পাত করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা যাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করেন, তাহার আযাব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ সন্ধ্যার সময় রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশক হইতে অধিক পবিত্র হইবে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেকদিন ও রাত্রে রোযাদারগণের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করিয়া থাকেন। ৪র্থঃ এই যে, আল্লাহ তায়ালা বেহেশতকে আদেশ করেন যে, হে বেহেশত! তুমি প্রস্তুত হও, শীঘ্রই আমার বান্দাগণ পৃথিবীর শোক তাপ হইতে এইখানে আসিয়া বিশ্রাম ভোগ করিবে। ৫মঃ এই যে, রমজানের শেষ রাত্রে রোযাদারের সকল গুনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি কদরের রজনী? হুযুর বলিলেন, না তোমরা কি দেখ নাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কাজের শেষে মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে।

রোযার পরিচয়

শরীয়ত মতে যাহাদের মধ্যে রোযা রাখার উপযুক্ততা বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রতি ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বক্ষণ হইতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের নিয়তে পানাহার ও সহবাস হইতে বিরত থাকার নাম রোযা। -আলমগীরী

শ্রেণী বিভাগ

রোযা প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। ফরজ, ওয়াজিব ও নফল। ফরজ রোযা দুই প্রকার। (১) নির্দ্ধারিত ফরজ, যেমন রমজান মাসের রোযা। (২) অনির্দিষ্ট ফরজ যেমন কাজা ও কাফ্‌ফারার রোযাসমূহ। (আলমগীরী)

প্রকাশ থাকে যে, রমজানের রোযার কাজাও রমজানের রোযার ন্যায়ই ফরজ,

এইরূপ কাফ্ফারার রোযাও ফরজ। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, রমজানের রোযা এবং উহার কাজা অস্বীকার করিলে কাফির হইবে। কিন্তু কাফ্ফারার রোযা অস্বীকার করিলে কাফির হইবে না। (শামী ২য় জেলদ) তবে সে পথভ্রষ্ট গুনাহ্গার।

ওয়াজিব রোযা দুই প্রকার। (১) নির্দিষ্ট মানতের রোযা। (২) অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা।

নফল রোযা দুই প্রকার। (নফলে মাসনুন যথা- মোহাররমের ৯ই এবং ১০ই তারিখের রোযা। (২) নফলে মুস্তাহাব যেমন, আইয়াম বীজ তথা প্রতি চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। (৩) হজ্জের দিন, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা এবং শাওয়াল চাঁদের ছয় রোযা ও (৪) ছওমে দাউদী। (বাহারে শরীয়ত)

মাকরূহ রোযাসমূহ- (১) আশুরার একটি রোযা, অর্থাৎ মোহার্‌রমের ১০ই তারিখ শুধু একটি রোযা রাখা। (২) নিয়ত সহকারে নির্দিষ্ট করিয়া প্রতি শনিবার রোযা রাখা। (৩) নওরোজ ও মাহরজানে (অর্থাৎ পারসিকগণের তৎকালীন দুইটি পর্ব দিনে) রোযা রাখা। (৪) ছওমে দহ্‌র অর্থাৎ বারমাস রোযা রাখা। (৫) ছওমে ছকুত, (অর্থাৎ রোযা রাখিয়া একদম কথা না বলা) (৬) ছওমে বেছাল অর্থাৎ ইফতার না করিয়া পরস্পর দুইটি রোযা রাখা। এই সকল রোযা মাকরূহ তানজীহ। এতদ্ব্যতীত দুই ঈদের দুইদিন এবং আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন, মোট পাঁচদিন রোযা রাখা মাকরূহ তাহরীম।

(দুররুল মোখতার)

রোযা ফরজ হওয়ার কারণ

রমজান মাসের দিবা রাত্রির কোনও এক অংশ উপস্থিত হইলেই রোযা ফরজ হওয়ার কারণ উপস্থিত হয়। ইহা গ্রহণীয় কওল বটে, কিন্তু কতক আলেমের মতে প্রত্যেকদিন ছোবহে ছাদেকের শুরু হইতে শরয়ী দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনও এক সময় পাওয়া গেলেই রোযা ফরজ হইবার কারণ হয়, ইহাই ফতোয়া। এই কওল অনুসারেই আমল করিতে হইবে। সুতরাং কোনও অজ্ঞান ব্যক্তি দিনের শেষে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সে দিনের রোযা তাহার প্রতি ফরজ হইবে না। এবং ঐ দিনের রোযার কাজাও করিতে হইবে না। কেননা সে নিয়ত করার সময় পায় নাই।

(দুররুল মোখতার, শামী ২য় জিলদ, দোহ্ওয়াতুল কোবরা)।

শরয়ী দ্বিপ্রহরঃ উপরি বর্ণিত শরয়ী দ্বিপ্রহর বলিতে ছোবহে ছাদেকের প্রারম্ভ হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের অর্দ্ধেক বুঝাইবে। (শামী ২য় জিলদ)

রোযার সময়

ছোবহে ছাদেক অর্থাৎ রাত্রি শেষে আকাশের পূর্ব দিগন্তে উত্তর-দক্ষিণ প্রস্থভাবে সাদা রেখা সম্প্রসারিত হওয়া মাত্র দিন আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে সূর্য অস্ত যাওয়া

পর্যন্ত রোযা রাখার সময়। অবশ্য ইহাতে মতভেদ হইয়াছে যে, ছোবহে ছাদেক হওয়া মাত্রইকি রোযা রাখার সময় আরম্ভ হইবে, না আলো বিস্তৃত হওয়া মাত্র রোযার সময় শুরু হইবে। শামসুল আয়েম্মা হালওয়ায়ী বলিয়াছেন যে, প্রথম বর্ণিত সময় হইতে রোযা রাখা এহ্তিয়াত অর্থাৎ সাবধানতা মূলক এবং শেষে বর্ণিত সময় হইতে রোযা রাখা সুযোগমূলক। অধিকাংশ আলেম এই দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করিয়াছেন।

(আলমগীরী ১ম, শামী ২য়)

তবে শামী, আলমগীরী, মাজমাউল আনহুর প্রভৃতি অধিকাংশ ফেকার কিতাবের মর্মে ফজরের সময়ের দুইটি অবস্থার কথা লিখিত আছে- উহার একটি হইল ছোবহে কাযেব। ছোবহে কাযেবের পরিচয় এই যে, রাত শেষ ভাগে আকাশের পূর্বদিকে দৈর্ঘ্যভাবে একটি লম্বা আলো রেখা প্রকাশ পায়। অতঃপর উহা ডুবিয়া গিয়া পুনরায় অন্ধকার হয়। উহা যতক্ষণ বিরাজমান থাকে, ততক্ষণই ছোবহে কাযেব। ইহা রাতের মধ্যে গণ্য। ইহার পরই সূর্যোদয়ের আলো প্রকাশ পায়, এবং তখনই ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সুতরাং এই সময় হইতেই রোযা রাখার সময় শুরু হইল বলিয়া ধরা হইবে।

সাহ্‌রী খাওয়ার সময়

রমজান মাসে সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-"তোমরা রমজান মাসের শেষ রাতে কিছু খাও। উহাতে বরকত নিহিত রহিয়াছে।" সাহ্‌রী বিলম্ব করিয়া খাওয়া মুস্তাহাব। ইফ্‌তার জলদি করা এবং সাহ্‌রী বিলম্বে খাওয়া নবীগণের নীতি ছিল বলিয়া কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে। আমাদের মাশায়েখগণ বলিয়াছেন যে, রাতের শেষ ষষ্ঠমাংশের মধ্যে সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু ছোবহে ছাদেকের খুব নিকটবর্তী সময় কিংবা ছোবহে ছাদেক হওয়ার সন্দেহ হয় এই সময় পর্যন্ত সাহ্‌রী খাওয়ার জন্য বিলম্ব করিবে না। কেননা, রমজান মাসে দিবাভাগে খাওয়া হারাম, উক্ত হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং উক্ত ছোবহে ছাদেক হওয়ার যথেষ্ট পূর্বে নিঃসন্দেহভাবে রাত থাকিতে সাহ্‌রী খাওয়া শেষ করিবে। সামান্য মাত্র রাত আছে বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস হইলে সাহ্‌রী খাওয়া ত্যাগ করিবে।

(আরকানে আরবা)

ফতোয়ায়ে এমদাদীয়া ১ম খণ্ডে রোযার বয়ানে লিখিত আছে- সূর্য উদয় হওয়ার দেড় ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সাহ্‌রী খাওয়া যাইতে পারে। ফকীহগণ সতর্কতা হিসাবে বলিয়াছেন যে, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে সাত ভাগ করিয়া উহার ৬ষ্ঠ ভাগের মধ্যে সাহ্‌রী খাওয়া শেষ করিবে।

হাশিয়ায়ে তাহ্‌তাবী কিতাবে দুর্‌রোল মুস্তাকা হইতে লিখিত আছে- রাতের ছয় ভাগের একভাগ থাকিতে খাওয়ার নাম সাহ্‌রী।

বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে যে, সাহ্‌রী খাওয়া সুন্নাত কি মুস্তাহাব, ইহাতে মতভেদ

আছে। কেহ মুস্তাহাব এবং কেহ সুন্নাত বলিয়াছেন। বাদায়ে নামক কিতাবে উহা সুন্নাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাহরুর রায়েক কিতাবে আরও উল্লেখ আছে যে, শেষ রাত্রির খানাকে সাহ্‌রী বলে। রাত্রির ছয় ভাগের একভাগ থাকিতে উক্ত সাহ্‌রীর সময় হয়। গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিত আছে যে, শুধু পানি দ্বারা সাহ্‌রীর সুন্নাত আদায় হইবে কিনা, ইহা স্পষ্ট দেখতে পাই নাই। কিন্তু আহমদ কর্তৃক বর্ণিত জাহের হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শুধু পানি পান করিলেই সাহ্‌রীর সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে।

"বাদায়ে" কিতাবে (১/১৩৫ পৃঃ) রোযার সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং মাক্‌রূহের বয়ানে লিখিত আছে যে, রোযা পালনকারীর জন্য সাহ্‌রী সুন্নাত এবং ঐ কিতাবে হযরত আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সাহ্‌রী বিলম্বে খাওয়াও সুন্নাত। মোট কথা, সাহ্‌রী খাওয়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব, উভয় দিকেই মত পাওয়া যায়। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহাতে বিশেষ ছওয়াব ও বরকত রহিয়াছে। ইহা যে সকল কিতাবে সুন্নাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে উহা "সুন্নাতে যায়েদাহ বলিয়া বুঝা যাইতেছে।"

সন্দেহের সময় সাহরী খাওয়া

মাসয়ালা- রাত্রি নাই বলিয়া সন্দেহ হইলে সাহ্‌রী খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, ইহা আফজাল। (আলমগীরী ১ম খন্ড) যদি ঐরূপ সন্দেহের সময় কেহ সাহ্‌রী খায় এবং পরে নিশ্চিত ভাবে জানিতে পারে যে, ফজর হইয়া গিয়াছিল, তখন ঐ রোযাটির কাজা করিতে হইবে। আর যদি সন্দেহ থাকিয়া যায়, তবে ঐ রোযাটি মাকরূহের সহিত আদায় হইবে। শামী ও বাদায়ে কিতাবে লিখিত আছে যে, রোযাদার ব্যক্তির কষ্ট লাঘবের জন্য বিলম্ব করিয়া সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু রাত্রি নাই বলিয়া সন্দেহ হইলে তখন সাহ্‌রী খাওয়া মাকরূহ হইবে। কিন্তু উক্ত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, এই অবস্থায় রোযা কাজা করা সতর্কতা।

মাসয়ালা- রাত্রি আছে মনে করিয়া কেহ সাহ্‌রী খাওয়ার পর স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল যে, তখন ফজর হইয়া গিয়াছিল; এই অবস্থায় উক্ত রোযার কাজা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু উহার কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে না। (আলমগীরী ১ম খন্ড)

মাসয়ালা- দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, ছোবহে ছাদেক হইয়া গিয়াছে। অপর দুইজন সাক্ষ্য দিল যে, ছোবহে ছাদেক হয় নাই, এই অবস্থায় যদি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলার পরে ছোবহে ছাদেক হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, তবে তাহার প্রতি কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয় ওয়াজিব হইবে। কেননা রাত্রি অবশিষ্ট থাকা সম্বন্ধে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত ছিল। সে স্থলে এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া যে দুইজন রাত্রি নাই বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহাদের সাক্ষ্য অনুসারে রোযা ভঙ্গ করায় কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই আদায় করিতে হইবে।

এইরূপ যদি এক ব্যক্তি রাত্রি থাকার সাক্ষ্য দেয় এবং অপর এক ব্যক্তি রাত্রি নাই বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, সেই অবস্থায় রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলার পরে জানিতে পারে যে, তখন 'ফজর' হইয়া গিয়াছিল এই অবস্থায় কেবল কাজা করিতে হইবে। কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে না। কেননা এস্থলে ফজর হওয়া সম্পর্কে একজনের সাক্ষ্য পূর্ণ প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে না।

(আলমগীরী ১/৩০৬ পৃঃ)

মাসয়ালা-এক ব্যক্তি স্ত্রীকে বলিল 'দেখ' ফজর হইয়াছে কিনা? ইহাতে স্ত্রী বলিল, "না ফজর হয় নাই" ইহার পর তাহারা সহবাস করিল। পরে দেখা গেল যে, সেই সময় ফজর হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় ছহীহ্ কওল মতে স্বামীর উপর কেবল কাজাই ওয়াজিব হইবে, কাফ্ফারা নহে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি হুকুম এই যে, সে যদি ফজর হইয়াছিল বলিয়া জানিয়াও ঐরূপ বলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রতি কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই বর্তিবে। (আলমগীরী ১ম খণ্ড)

সময় অনুমান করিয়া সাহ্‌রী খাওয়া

মাসয়ালা- নিজে অথবা অপরের সাহায্যে সাহ্‌রীর সময় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে সেই সময় অনুমান দ্বারা সময় নির্দ্ধারণ করিয়া সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয হইবে। কিন্তু যাহার অনুমান দ্বারা সময় নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই, সে সাহ্‌রী না খাইয়া রোযা রাখিবে। (আলমগীরী ১ম খণ্ড)

মাসয়ালা- দেশময় নাকারা-টিকারা দ্বারা সাহ্‌রীর সময় ঘোষণার ব্যবস্থা থাকিলে এই অবস্থায় যদি সর্বত্র নাকারা-টিকারার ধ্বনী শুনা যায় তবে (নিঃসন্দেহে) সাহ্‌রী খাইতে পারে। আর যদি একস্থানে মাত্র নাকারার ধ্বনী শুনা যায় এবং উহা ঠিক সময় করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তবে উহার উপর নির্ভর করিয়া সাহ্‌রী খাওয়া যাইবে। যদি উক্ত শব্দের উপর নির্ভর করিতে না পারে, তবে সেই অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং সাহ্‌রী খাইবে না। (আলমগীরী ১/২০৭পৃঃ)

উপরোক্ত মাসয়ালা হিসাবে আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ব্যবস্থায় যেমন সাইরেন বাজান, তোপধ্বনি, ষ্টিমারের হুইসেল, ঘন্টা ধ্বনি ইত্যাদি সম্পর্কেও একই হুকুম হইবে।

কি কি দ্রব্য দ্বারা সাহ্‌রী খাইবে

সাহ্‌রী খাওয়ার নিয়তে শেষ রাত্রে যে কোন খাদ্য, পানীয় এমন কি ফল-ফলাদি চা পান ইত্যাদি কিছু খাইলেই সাহ্‌রী খাওয়ার সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে।

রোযার শর্ত সমূহ

প্রত্যেক বয়োপ্রাপ্ত মুসলমান নরনারীর প্রতি সজ্ঞান অবস্থায় রোযা ফরজ হয়। যাহাদের প্রতি রোযা রাখা ফরজ বর্তিয়াছে, তাহাদের আবার সুস্থ, মুকীম (শরীয়ত মতে প্রবাসী নহে) হওয়া রোযা রাখা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। এতদ্ব্যতীত রোযা রাখা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত এবং স্ত্রীলোকদের হায়েজ ও নেফাস হইতে পাক হওয়াও শর্ত।

(আমলগীরী-১/১০ পৃঃ)

রোযার নিয়ত

মনে মনে রোযা রাখার সঙ্কল্পকে নিয়ত বলে। এই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা সুন্নাত। শামী প্রভৃতি কিতাবে লিখিত আছে-নিয়ত সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট বাক্য হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত নাই। ইহা 'মাশায়েখে ইসলামগণের'

নীতি। আমরা মনে করি যে, নিয়ত সম্পর্কে প্রচলিত নিয়মে যে কথা পাঠ করা হয়, অর্থ জানিয়া করিলে উহাই যথেষ্ট।

মাসয়ালা- রমজানের প্রত্যেকটি রোযার জন্য নিয়ত করা জরুরী। রোযা রাখার মানসে সাহ্‌রী খাইলে উহাই নিয়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (আলমগীরী)

এইরূপ রমজান মাসে অন্য কোনও রোযার নিয়ত করিলে রমজানের রোযাই আদায় হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি সাহ্‌রী খাইয়া এইরূপ নিয়ত করে যে, আগামী দিন রোযা রাখিব না, তবে তাহার নিয়ত দুরস্ত হইবে না।

মাসয়ালা- যদি রাত্রে নিয়ত করে এবং ছোবহে ছাদেকের পূর্বে রোযার নিয়ত ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার নিয়ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। সুতরাং এই অবস্থায় রোযা রাখিলে উহা দ্বারা রোযা আদায় হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কেহ মুখে বলে যে, আমি ইনশাআল্লাহ আগামী দিন রোযা রাখিব, ইহাতে রোযা শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কোনও রোযাদার ব্যক্তি মনে মনে ধারণা করে যে, সে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু কার্যতঃ সে পানাহার বা রোযা ভঙ্গের কোনও কাজই করে নাই। ইহাতে তাহার পূর্ব নিয়ত নষ্ট হইবে না। বরং রোযা আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

নিয়তের সময়

মাসয়ালা- সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হইতেই পরবর্তী দিনের রোযার নিয়ত করা শুদ্ধ হইবে না। যদি কোনও ব্যক্তি পরদিন রোযা রাখিবে বলিয়া বেলা থাকিতে নিয়ত করিয়া অজ্ঞান, নিদ্রিত, কিংবা পাগল হইয়া পরদিন শরয়ী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাকে, তবে উক্ত নিয়ত দ্বারা তাহার রোযা আদায় হইবে না। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে নিয়ত করিয়া উক্তরূপ অজ্ঞান হইয়া দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকিলেও তাহার নিয়ত দ্বারা রোযা শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রমজানের রোযা, নির্দিষ্ট দিনের মান্নত রোযা এবং নফল রোযা এইসব রোযা আদায় হইবে যদি সূর্যাস্তের পর হইতে পরবর্তী দিনের দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়ত করে। এমনকি নফল রোযা বা সাধারণ রোযার (মতলক রোযার) নিয়ত দ্বারাও ঐসব রোযা আদায় হইয়া যাইবে। মুসাফির, মুকীম, সুস্থ ও অসুস্থ সকলের নিয়তের ক্ষেত্রে ঐ একই নিয়ম ধর্তব্য। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রোযার জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়ত করিলে দিনের প্রথম হইতে রোযা রাখিতেছি, এইরূপ নিয়ত করিতে হইবে। সুতরাং যদি কেহ দ্বিপ্রহরের পূর্বে এরূপ নিয়ত করে যে, আমি এখন হইতে রোযার নিয়ত করিলাম তাহার রোযা শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রমজানের রাত্রে কিংবা দিনের বেলায় কেহ বেহুঁশ বা উন্মাদ হইয়া পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে স্বজ্ঞান হয় এবং সেই সময় রোযার নিয়ত করে, তবে তাহার নিয়ত ছহীহ হইবে। (আলমগীরী)

এইরূপ কোনও ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে মোরতাদ (ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যাওয়া) হইয়া পুনঃ দ্বিপ্রহরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ঐ সময় রোযার নিয়ত করে, তবে তাহার নিয়ত ছহীহ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যে সকল রোযার নিয়ত দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করা জায়েয, সেই সকল রোযায় রাত্রিতেই নিয়ত করা উত্তম। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রমজান মাসে অন্য কোনও ওয়াজিব রোযার নিয়ত করিলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে মুকীম বা মুসাফির সকলের পক্ষেই রমজানের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মতে মুসাফির ব্যক্তি রমজানের অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করিলে উক্ত ওয়াজিবই আদায় হইবে।

(আলমগীরী)

মাসয়ালা- রমজান মাসে কেহ নফল রোযা আদায় করিলে উহাতে দুইটি মত আছে। কিন্তু ছহীহ কওল মতে রমজানের রোযাই আদায় হইয়া যাইবে।

যদি পীড়িত ব্যক্তি রমজান মাসে অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করে,তবে রমজানের রোযাই আদায় হইবে।

মাসয়ালা- রমজান মাসে পীড়িত ও মুসাফির ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট রোযার নিয়ত না করিয়া শুধু রোযা রাখিবে, এই নিয়ত করিয়া রোযা রাখিলে তাহাতে রমজানের রোযাই আদায় হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- নির্দিষ্ট মান্নত রোযার দিনে অন্য কোনও ওয়াজিব রোযার নিয়ত করিলে যেমন কাফ্ফারা ও কাজা রোযার নিয়ত করিলে এই ওয়াজিব রোযাই আদায় হইয়া যাইবে এবং উক্ত নির্দিষ্ট মান্নত রোযা অন্যদিন কাজা করিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কাফ্ফারা এবং অনির্দিষ্ট মান্নত রোযা সমূহের নিয়ত ছোবহে ছাদেকের পূর্বেই করিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কয়েদ বা অবরুদ্ধ ব্যক্তি রমজান মাস ঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে না পারিয়া যদি অনুমান করিয়া রোযা রাখিয়া থাকে তবে-

(১) রাত্রি হইতে নিয়ত করিয়া থাকিলে, (২) দুই ঈদ এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিন সমূহ বাদ পড়িয়া থাকিলে; (৩) রমজান মাসের পরে রোযা রাখিয়া থাকিলে, উক্ত কয়েদী বা অবরুদ্ধ ব্যক্তির রোযা কাজা স্বরূপ আদায় হইবে। আর যদি তাহার রোযা অনুমানের ভুলবশতঃ রমজান মাসের পূর্বে শাবানের রোযা রাখা হইয়া থাকে তবে তাহার রোযা আদায় হইবে না। কেননা রমজান মাস আসার পূর্বে রোযা রাখার দরুন উহা আদায় হয় নাই।

মাসয়ালা- একাধিক ফরজ রোযার 'কাজা' করিবার কালে প্রথমটির নিয়ত করাই

বাঞ্ছনীয়। তবে এইরূপ নির্দিষ্ট নিয়ত না করিলেও রোযা আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি বিভিন্ন বৎসরে একাধিক রোযার 'কাজা' থাকিয়া থাকে, এই অবস্থায়ও প্রথমটির প্রথমে নিয়ত করা উচিত। তবে নির্দিষ্ট না করিয়া নিয়ত করিলেও 'কাজা' শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মাসয়ালা- নিয়ত নির্দিষ্ট না করিয়া কাজা ও কাফ্ফারার একষট্টিটি রোযা একত্রে রাখিয়া ফেলিলে উহা জায়েয হইবে।

মাসয়ালা- দুইটি সমান মর্যাদার রোযার নিয়ত একই দিনে করিলে কোনটিও আদায় হইবে না। কিন্তু যদি উহার মধ্যে একটি গুরুত্ব ও মর্যাদা হিসাবে বড় হয়, তবে সেইটি আদায় হইবে।

মাসয়ালা- যদি রমজানের কাজা এবং মান্নতের রোযার নিয়ত একত্রে করিয়া থাকে, তবে রমজানের কাজাই আদায় হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- এইরূপ দিনে ও রাত্রে যে কোন সময়ে নির্দিষ্ট মান্নত এবং নফল রোযার নিয়ত করিলে কিংবা নির্দিষ্ট এবং কাফ্ফারার রোযা রাত্রি হইতে নিয়ত করিলে এই উভয় অবস্থায় কেবল নির্দিষ্ট মান্নতই আদায় হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- এইরূপ রমজানের কাজা ও জেহারের কাফ্ফারা এই দুইটির নিয়ত একত্রে করিলে এই অবস্থায় রমজানের কাজা আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- এইরূপ রমজানের 'কাজা' এবং নফল রোযা একত্রে নিয়ত করিলে রমজানের কাজা আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- জেহারের এবং কতলের কাফ্ফারা কিংবা রমজানের কাজা এবং কতলের কাফ্ফারার রোযার একত্রে নিয়ত করিলে এই উভয় অবস্থায় সকলের মতে কতলের কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কাফ্ফারা এবং নফল রোযা একত্রে নিয়ত করিলে সে ক্ষেত্রে কাফ্-ফারার রোযা আদায় হইবে।

মাসয়ালা- হায়েজওয়ালী (ঋতুবতী) স্ত্রীলোক যদি 'হায়েজ' চলিতে থাকাকালীন রাত্রে রোযা রাখার নিয়ত করিয়া থাকে, এবং ছোবহে ছাদেক হইবার পূর্বে ঋতু শেষ হয়, তবে তাহার নিয়ত শুদ্ধ হইবে এবং রোযা আদায় হইয়া যাইবে।

মাসয়ালা- রমজানের 'কাজা' এবং কসমের কাফ্ফারা এই দুইটির একত্রে নিয়ত করিলে দুইটির সম মর্যাদার জন্য একটিও আদায় হইবে না বরং রোযাটি নফল হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রমজানের কাজা ছোবহে ছাদেকের পরে নিয়ত করিয়া থাকিলে উহাতে 'কাজা' আদায় হইবে না; বরং নফল হইয়া যাইবে। এই নফল রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহারও 'কাজা' করিতে হইবে। (আলমগীরী)

রমজানের চাঁদ দেখা

শা'বান মাসের ২৯ তারিখ রমজানের চাঁদ অনুসন্ধান করা ওয়াজিব। ঐ দিন চাঁদ দেখা গেলে রমজানের রোযা রাখিবে। যদি সে দিন চাঁদ দেখা না যায়, কিংবা আকাশে মেঘ থাকে তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করিয়া রমজানের রোযা রাখিবে। এই ভাবে শা'বান মাসের চাঁদ অনুসন্ধান করা উচিত।

মাসয়ালা- শরীয়তে যাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় এমন ব্যক্তি যদি জ্যোতিষ গণনা দ্বারা চাঁদ উঠার সংবাদ দেয় উহা গ্রাহ্য হইবে না। ইহাই ছহীহ! এমন কি জ্যোতিষী নিজের ব্যাপারেও গণনার উপর নির্ভর করিয়া চাঁদ উঠা সাব্যস্ত করিতে পারিবে না।

মাসয়ালা- অন্যকে দেখাইবার জন্য আকাশের চাঁদ আঙ্গুল দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেখান মাকরূহ, যেহেতু উহা বেদ্বীনগণের রীতি ছিল। (শামী)

মাসয়ালা- দ্বিপ্রহরের পূর্বে কিংবা পরে নূতন চাঁদ দেখা গেলে উহা পরবর্তী দিনের চাঁদ বলিয়া গণ্য হইবে। সেই দিন রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে না।

(আলমগীরী)

মাসয়ালা- আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে রমজানের চাঁদ উঠা প্রমাণের জন্য একজন মুসলমান, আদেল, সজ্ঞান, বালেগ, স্বাধীন, কিংবা ক্রীতদাস স্ত্রী কি পুরুষ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে রোযা রাখিতে হইবে। এইরূপ যদি একজনের সাক্ষ্য শুনিয়া আর একজনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, কিংবা যে ব্যক্তি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিয়া শরীয়তের সাজা প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিও যদি তাওবাহ করার পরে রমজানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তবে উহা গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু অজ্ঞাত চরিত্র ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে জাহের রেওয়ায়েত মতে সাক্ষ্য কবুল হইবে না। কিন্তু হাসান আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তাহার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে। ইহাই বিশুদ্ধ মত। ইমাম হালওয়ায়ী এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মোরাহেক অর্থাৎ বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী বয়োপ্রাপ্ত বালকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য কবুল হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রমজানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যে শব্দ প্রয়োগ করা কিংবা দাবীদার হওয়া শর্ত নহে। এমনকি যদি কোন আদেল ব্যক্তি কাজীর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজীর নিকট সাক্ষ্য দিবার পূর্বেই উহা কেহ শুনিলে তাহার প্রতি রোযা রাখা ফরজ হইবে। কাজীর হুকুম শোনার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না। উক্ত সাক্ষ্যদাতাকে আদেল বলিয়া মনে করিলেই চলিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- চাঁদ কি অবস্থায় দেখা গিয়াছে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা আবশ্যক কিনা; আবূ বকর আসকাফ বলিয়াছেন যে, শহরের (কি গ্রামের) বাহিরে মাঠের মধ্যে অথবা নগরীতে বসিয়া মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখিয়াছে এরূপ বর্ণনা গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু জাহের

রেওয়ায়েত মতে এরূপ বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে। এই মতই আমাদের মাযহাবের অনুকূল। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কাজী কিংবা ইমাম যদি নিজেরাই রমজানের চাঁদ দেখে তবে অন্য লোককে সাক্ষী স্থির করা কিংবা নিজেরাই রোযা রাখার হুকুম দিয়া দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার চাঁদের বেলায় এরূপ করা চলিবে না।

মাসয়ালা- কোন ফাসেক ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখিলে কাজীর নিকট সাক্ষ্য দান করিবে, কিন্তু কাজী তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না।

মাসয়ালা- গ্রামদেশে কোনও ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখিলে এবং সেখানে সাক্ষ্য গ্রহণের উপযুক্ত কোনও শরয়ী হাকিম বা প্রতিনিধি না থাকিলে এই অবস্থায় মহল্লার মসজিদে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিবে। উক্ত ব্যক্তি 'আদেল' হইলে সকলে তাহার সাক্ষ্য অনুসারে রোযা রাখিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- এক ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখিয়া সাক্ষ্য দিল। কিন্তু তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইল, এমতাবস্থায় তাহার নিজের উপরে রোযা রাখা ফরজ হইবে। যদি তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ার পূর্বে বা পরে সে রোযা ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা হইলে ছহীহ কওল মতে ঐ রোযার মাত্র কাজা করিতে হইবে। কাফ্ফারা দিতে হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া কাজী যদি রোযা রাখার হুকুম দেয় অতঃপর যদি সেই ব্যক্তি নিজে কিংবা অপর কেহ রোযা ভঙ্গ করে তবে উক্ত ফাসেক কিংবা অপর যে কেহ রোযা ভঙ্গ করিয়াছে, সকল ইমামের মতে তাহাদের সকলের প্রতি রোযার কাফ্ফারা বর্তিবে। যদি উক্ত ব্যক্তির রোযা ত্রিশটি পূর্ণ হইয়াও যায় তবুও সে রোযা ভাঙ্গিবে না; বরং সকলের সঙ্গে ঈদ করিবে।

মাসয়ালা- স্বাধীন কিংবা গোলাম পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক কিংবা পর্দানশীন বাঁদী রমজানের চাঁদ দেখিয়া বসিলে সেই রাত্রেই তাহাদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব।

(আলমগীরী)

গায়াতুল আওতার কিতাবে লিখিয়াছে যে, স্বাধীন স্ত্রীলোকদের প্রতিও এই হুকুম। শামী কিতাবে লিখিত আছে যে, যখন উক্ত স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যের উপরে চাঁদ উঠার প্রমাণ নির্ভর করে তখনই তাহাদের সাক্ষী দেয়ার জন্য বাহির হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় তাহারা বাহির হইবে না।

মাসয়ালা- নগরের বাহির হইতে কিংবা উঁচু স্থান হইতে আসিয়া একজনও চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে উহা গ্রাহ্য হইবে। (আলমগীরী)

ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য-প্রমাণ

ঈদুল ফিতরের চাঁদ রমজান মাসের ২৯ তারিখ তালাশ করিবে। যদি কেহ একাকী চাঁদ দেখে, তবে ইবাদতে সাবধানতার জন্য সে রোযা ভাঙ্গিবে না। যদি ভঙ্গ করে, তবে একটি রোযা কাজা করিবে। উহার কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

যদি কেহ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় এবং উহা অগ্রাহ্য হয় তবুও তাহার প্রতি ঐ একই হুকুম বর্তিবে। উক্ত এক ব্যক্তির সাক্ষ্য বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ রোযা ভঙ্গ করে, তাহারও একটি রোযা কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কাজী অথবা ইমাম অথবা তার অবর্তমানে শরয়ী বিষয় সমূহে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শাওয়ালের চাঁদ দেখিলেন কিন্তু অন্য কেহ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলনা এমতাবস্থায় তাহারা ঈদগাহে যাইবে না। অপরকে ঈদগাহে যাইবার আদেশ দিবে না। এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে রোযা ভাঙ্গিবে না।

মাসয়ালা- আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে সেই অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য স্বাধীন, বালেগ, দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক "আমি কিংবা আমরা সাক্ষ্য দিতেছি" এরূপ বলা শর্ত।

মাসয়ালা- আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় যদি নগরীর বাহির হইতে দুইজন লোক আসিয়া ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তবে উক্ত সাক্ষ্যদ্বয় 'আদেল হইতে হইবে।'

মাসয়ালা- কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে যদি শরীয়তে সাজাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এমনকি তাওবাহ করিলেও না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- আকাশ পরিস্কার থাকিলে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার প্রমাণের জন্য বহু সংখ্যক লোকের সাক্ষ্য প্রয়োজন হইবে। শায়খুল ইসলাম বলিয়াছেন যে, অপর স্থান হইতে দুইজন আদেল ব্যক্তি আসিয়া চাঁদ উঠার সাক্ষ্য দিলে উহা গ্রাহ্য হইবে, ঈদুল আজহার চাঁদ উঠার প্রমাণের বেলায়ও এই একই হুকুম প্রযুক্ত হইবে। এইরূপ হেদায়া কিতাবে আছে। বৎসরের অন্যান্য মাসের চাঁদ উঠার প্রমাণের জন্য আকাশ পরিস্কার থাকা অবস্থায় দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ দুইজন স্ত্রীলোক, স্বাধীন বালেগ ও আদেল হওয়া চাই এবং শরীয়তে হদ প্রাপ্ত না হওয়া চাই। (আলমগীরী)

মাসয়ালা– রমজানের চাঁদ রাতে আকাশে মেঘ থাকা অবস্থায় একজনের সাক্ষ্যে রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। পরে ঈদের চাঁদের সময়ও মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না গেলে রোযা ত্রিশটি পূর্ণ করিয়া ঈদ করিবে। কিন্তু আকাশ পরিস্কার থাকা অবস্থায় যদি চাঁদ দেখা না যায় তবে রোযা ৩০টি পূর্ণ হইয়া গেলেও ভঙ্গ করিবে না। কিন্তু প্রথমে যদি দুইজন সাক্ষীর চাঁদ দেখার সাক্ষ্যে রোযা রাখিয়া থাকে, তবে ৩০টি পূর্ণ হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ করিয়া ঈদ করিবে।

মাসয়ালা- রমজানের ২৯ তারিখে বহু সংখ্যক লোক আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা একদিন পূর্বেই চাঁদ দেখিয়াছে। উক্ত সাক্ষ্যদাতাগণ যদি স্থানীয় লোক হয়, তবে তাহাদের সাক্ষ্য কবুল করা যাইবে না। কেননা তাহারা যথাসময়ে সাক্ষ্য না দেওয়ায় দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। আর যদি উক্ত লোকগণ দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া থাকে, তবে তাহারা আদেল হইলে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- পশ্চিম দেশে চাঁদ উঠার সংবাদ বা সাক্ষ্য যদি শরীয়ত সম্মত পন্থায় সাব্যস্ত হয়ে যথারীতি পূর্বদেশীয় লোকের নিকট পৌঁছে তাহলে তাদের প্রতি রোযা রাখা ফরজ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রমজানের ২৯ তারিখে একদল লোক বলিল যে, কোন দেশের লোকগণ একদিন আগে চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখিয়াছে। অদ্য তাঁহাদের রোযা ৩০টি হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনাকারীরা নিজেরা চাঁদ দেখে নাই। এই অবস্থায় ইহাদের কথা মতো পরদিনের রোযা এবং তারাবীহ তরক করা যাইবে না। কেননা ঐ বর্ণনাকারীরা নিজেরা চাঁদ দেখিয়া কিংবা অন্য কাহারও দেখার সাক্ষ্য দিতেছে না। তাহারা কেবল অপরের নিকট শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

মাসয়ালা- গ্রামে দুই ব্যক্তি আদেল ঈদের চাঁদ দেখিল, আকাশ পরিস্কার ছিল না। এই অবস্থায় যদি সেখানে সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত কেহ না থাকে, তবে গ্রামবাসীর নিকট জানাইবে এবং সেই সাক্ষ্যে ঈদ করিবে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা- রমজানের চাঁদ দেখা গেল না, সুতরাং শা'বানের ৩০ দিন পূর্ণ করিয়া রোযা শুরু করিল, কিন্তু ২৮শে রোযার দিন ঈদের চাঁদ দেখা গেল। এমতাবস্থায় শা'বানের মাস চাঁদ দেখিয়া ৩০ দিন সাব্যস্ত করিলে একটি রোযা কাজা করিবে, আর যদি শা'বানের চাঁদও দেখা গিয়া না থাকে তবে রজব মাসের হিসাব দেখিবে, যদি রজব মাস ৩০ দিন পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে দুইটি রোযা কাজা করিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- ২৯ দিন বিশিষ্ট কোনও রমজান মাসে কেহ রোগের কারণে রোযা রাখিতে না পারিয়া থাকিলে সে ভাল হইয়া ২৯ টি রোযাই কাজা করিবে। আর যদি রমজান মাস কতদিনের ছিল, তাহা ঠিক না পায়, তবে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ৩০টি রোযাই কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- কোনও মাসের প্রথম চাঁদ যদি দিবাভাগে কিংবা দ্বিপ্রহরের পূর্বেও দেখা যায়, তবে উহা পরবর্তী রাত্রের চাঁদ ধরিতে হইবে এবং যথা নিয়মে পরদিন মাসের প্রথম হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ রমজানের ৩০ তারিখ দিনের বেলায় চাঁদ দেখা গেলে উক্ত দিন রমজানের মাসের মধ্যে ধরা হইবে, শাওয়ালের দিন নহে ।

যে সকল কারণে রোযা কাজা হইবে

মাসয়ালা- ছোবহে ছাদেক হয় নাই মনে করিয়া কেহ পানাহার কিংবা স্ত্রী সহবাস করিল। পরে জানিল যে, ছোবহে ছাদেক হইয়া গিয়াছিল। তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে এবং উক্ত রোযা কাজা করিতে হইবে। কাফ্ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু ভুলে উক্ত কাজ সমূহ করিলে তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। ফরজ, ওয়াজিব, নফল সকল রোযাতেই এই একই হুকুম। (আলমগীরী, দুররুল, মোখতার)

মাসয়ালা- হুক্কা, বিড়ি সিগারেট, সেবন করিলে যদি সেবনকারী মনে করে যে, ধোঁয়া কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে নাই, তবুও রোযা ভঙ্গ হইবে।

মাসয়ালা- কোনও ব্যক্তি রোযার দিনে ভুলে খাওয়া আরম্ভ করিলে যদি কেহ স্মরণ করাইয়া দিলেও তাহার স্মরণ না হয় এই অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হইবে। তাহার রোযা কাজা করিতে হইবে। কাফ্ফারা করিতে হইবে না।

যদি দুর্বল বা বৃদ্ধ ব্যক্তি এইরূপ ভুলে খাইতে থাকে, তবে তাঁহার স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক নহে। যদি শক্তিমান ব্যক্তি রোযার দিনে এইরূপ ভুলে পানাহার করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে স্মরণ করাইয়া না দেওয়া মাকরূহ। (আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- কেহ জোরপূর্বক শক্তিমান ব্যক্তিকে খাওয়াইলে, কিংবা রোযা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছা পূর্বক খাইয়া বসিলে তাহাতে শুধু 'কাজা' বর্তিবে, কাফ্ফারা নহে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কুলি করিতে বা নাকে পানি দিতে যদি পানি পেটে চলিয়া যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে, ইহাতে কেবল কাজা বর্তিবে। ভুলক্রমে এরূপ ঘটিলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কেহ কিছু নিক্ষেপ করিলে যদি রোযাদার ব্যক্তির পেটে চলিয়া যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে, এইরূপ গোসল করিতে যদি হঠাৎ পেটে পানি যায়, তাহারও এই হুকুম। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- ঘুমন্ত ব্যক্তি পানি পান করিলে রোযা ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- পাথর বা মাটি ইত্যাদি যাহা খাদ্য বা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় না, উহা চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিলে রোযা ভঙ্গ হইবে, কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা নহে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- এইরূপ পাথরের কুঁচা, বীচি, পাথর, ঢিলা, তুলা, ঘাস এবং কাগজ ইত্যাদি গিলিয়া ফেলিলেও রোযা নষ্ট হইবে, উহার কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা করিতে হইবে না।

মাসয়ালা- শুষ্ক বাদাম, শুষ্ক আখরোট খোসাসহ ডিম, খোসাসহ বেদানা ইত্যাদি গিলিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না।

মাসয়ালা- তরমুজের শুষ্ক খোসা, যাহা খাইতে প্রবৃত্তি হয় না উহা গিলিয়া ফেলিলে রোযা কাজা করিতে হইবে না। কাফ্ফারাও করিতে হইবে না।

মাসয়ালা- চাউল, বাজরা, মশুরী ও মাসকলাই গিলিয়া ফেলিলেও ঐ একই হুকুম হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- সাজি (খড়ি) মাটি খাইলে রোযা ভঙ্গ হইবে এবং কাজা করিতে হইবে। উহা খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে খাদ্যের মধ্যে গণ্য হইবে এবং কাজা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব্ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- দাঁতের ফাঁকা হইতে খাদ্য কনা বাহির করিয়া খাইলে যদি চনা ও বুটের চেয়ে ক্ষুদ্র হয়, তাহাতে রোযা যাইবে না, কিন্তু চনা ও বুটের পরিমাণ বা বড় হইলে তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে। উহা বাহির করিয়া হাতে লইয়া পুনরায় খাইলে উহাতে রোযা ফাসেদ হইবে, তবে কাফ্ফারা হইবে কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। ছহীহ কওল মতে কাফ্ফারা হইবে না।

মাসয়ালা- দাঁতে আবদ্ধ তিল গিলিয়া ফেলিলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু বাহির হইতে এরূপ একটি তিল মুখে দিয়া গিলিয়া ফেলিলে তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে। ইহাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে কিনা, এ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। গ্রহণযোগ্য মতে না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

ফতহুল কাদীর কিতাবে লিখিত আছে-তিল চিবাইয়া গিলিলে যদি উহার শাঁস কণ্ঠ নালীতে টের পায় তবে রোযা নষ্ট হইবে। ইহা অতি সুন্দর মত এবং রোযাদার ব্যক্তি ক্ষুদ্র জিনিষ চিবাইয়া খাইলে তখন উক্ত নীতি প্রযোজ্য হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- গমের দানা চিবাইয়া খাইলে উহাতে রোযা নষ্ট হইবে না।

মাসয়ালা- অন্যের জন্য খাদ্য চিবাইলে যদি উহা গলার ভিতরে চলিয়া যায়, তবে, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে। কিন্তু কাফ্ফারা লাগিবে না।

মাসয়ালা- সাহ্রীর লোক্মা মুখে থাকিতে 'ফজর' হইলে কিংবা ভুল বশতঃ মুখে রুটি দিয়া চিবাইবার সময় রোযার কথা স্মরণ হইল এই অবস্থায় যদি উহা মুখে থাকিতে গিলিয়া ফেলে তবে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই লাগিবে। আর যদি উহা মুখ হইতে বাহির করিয়া পুনঃ গিলিয়া ফেলে তবে রোযার কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। ইহাই ছহীহ। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- অপরের থুথু খাইলে রোযা নষ্ট হইবে। শুধু কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। কিন্তু প্রিয়জনের মুখের থুথু খাইলে উহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই আবশ্যক হইবে। কেননা উহাতে খাদ্যের স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে।

(আলমগীরী)

মাসয়ালা- নিজের মুখের থুথু বাহির করিয়া পুনঃ খাইলে উহাতে রোযা কাজা করিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কথা বলিবার সময় অথবা আপনা আপনি যদি থুথুতে মুখ ভরিয়া যায়, তবে উক্ত থুথু গিলিয়া ফেলিলে উহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মুখের মধ্য হইতে লালাস্রাব প্রবাহিত হইয়া থুঁতনী পর্যন্ত আসিলে যদি উহা আকর্ষণ করিয়া মুখে নিয়া গিলিয়া ফেলে, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। তবে যদি উক্ত লালা স্রোত মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে পরে উহা আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কাহারও মুখ হইতে অনবরত পানি বাহির হওয়ার ব্যাধি থাকে, উহা কণ্ঠ নালিতে চলিয়া যায় তবে উহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। এইরূপ যদি কুলি করার পরে মুখের আর্দ্রতা থুথুর সঙ্গে পেটে চলিয়া যায় তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। নাকের সর্দি উপরে টানিতে যদি পেটে চলিয়া যায়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না।

মাসয়ালা- রক্ত খাইলে ছহীহ্ কওল মতে রোযা নষ্ট হইবে, কাজা করিতে হইবে কাফ্ফারা করিতে হইবে না। দাঁতের রক্ত থুথুর সমপরিমাণ বা বেশী গিলিয়া ফেলিলে তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে। যদি রক্তের ভাগ থুথুর চেয়ে কম হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রেশমের কারখানায় কাজ করিতে গিয়া রেশম মুখে ঢুকিয়া যদি থুথু রঙ্গিন হইয়া যায়, রোযা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি ঐ থুথু গিলিয়া ফেলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে। কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- হরতকী চুষিলে যদি উহার পানি গলার ভিতরে যায়, তাহাতে রোযা যাইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মিশ্রীর শিরা চুষিলে যদি উহার শিরা গলার ভিতরে যায়, তাহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই বর্তিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যাহা খাদ্য নহে এরূপ জিনিস যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গেলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে। কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- হাই তোলার সময় উপরের দিকে মুখ তুলিতে মুখের ভিতর এক ফোঁটা পানি পেটে গেলে তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে। শুধু কাজা করিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- আটা, চাউল, ডাল ইত্যাদি পিষিবার কালে বায়ুর সহিত উহার ধূলা, রেণু, ঔষধের ঝাঁজ বা স্বাদ বা ধূলা কিংবা উৎক্ষিপ্ত ধূলি বালি ইত্যাদি গলার ভিতরে প্রবেশ করিলে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

মাসয়ালা- চোখের পানি দুই এক ফোঁটা পরিমাণ মুখে গেলে তাহাতে রোযা যাইবে না। কিন্তু যদি এরূপ বেশী পরিমাণ মুখে যায় যে, সারা মুখ লবণাক্ত হইয়া যায়, উহা গিলিয়া ফেলিলে রোযা ভঙ্গ হইবে। মুখমণ্ডলের ঘাম সমন্ধেও ঐ হুকুম।

মাসয়ালা- শরীরে মর্দিত তৈল শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ

হইবে না।

মাসয়ালা- গোসল করায় শরীরে ঠাণ্ডা অনুভূত হইলে তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না।

মাসয়ালা- চক্ষে ঔষধ দিলে উহার স্বাদ গলায় টের পাওয়া গেলেও তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। সেইরূপ সুরমা চোখে দিলে উহার রং বা সুরমা থুথুর সহিত দেখা গেলে তাহাতে সর্বসাধারণ ফকীহগণের মতে রোযা নষ্ট হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মুখ ভরিয়া বমি উঠিলে যদি উহা ফেলিয়া দেয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু উহা গিলিয়া ফেলিলে রোযা ভঙ্গ হইবে। আর যদি উহা আপনা আপনি গিলিয়া যায় তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। বমি কম হউক, বেশী হউক, ইচ্ছা করিয়া গিলিলে কিংবা মুখ ভরিয়া ইচ্ছা করিয়া বমি আনিলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে। অন্য কোনও অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হইবে না।

এতদ্ব্যতীত মুখ ভরিয়া কিংবা উহার কম বমি আসিলে যদি ফেলিয়া দেয় কিংবা আপনা আপনি ভিতরে চলিয়া যায়, তাহাতে রোযা যাইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- উপরের মাসয়ালায় বমির অর্থ এই যে, যদি খাদ্য পানি ও পিত্ত ইত্যাদি বমি করিয়া থাকে, তবেই উপরোক্ত হুকুম হইবে। যদি কাশি বা কফ হয়, তাহাতে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে মুখ ভরা কফ হইলে তাহাতে উপরোক্ত হুকুম হইবে। ফতহুল কাদীরের মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর কওল ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল অপেক্ষা উত্তম। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- ভুস লইলে কিংবা নাকের বা কানের ছিদ্রে তৈল দিলে রোযা ভঙ্গ হইবে, ইহাতে কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা হইবে না।

মাসয়ালা- এইরূপ আপনা আপনি নাক-কানের ছিদ্র দিয়া ভিতরে তৈল প্রবেশ করাইলে রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক নাকে পানি দিলে তাহাতে রোযা যাইবে না। এইরূপ কানের ছিদ্রে পানি দিলেও তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- পুংলিঙ্গের ছিদ্রে তৈল বা পানি প্রবেশ করাইলে যদি উহা অণ্ডকোষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়া থাকে তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। আর যদি পানি বা তৈল মাছানা (অণ্ডকোষ) পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, তবুও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি স্ত্রীলোকের প্রস্রাবের রাস্তায় তৈল অথবা পানি প্রবেশ করায়, তাহাতে সকলের মতেই রোযা ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- পেট অথবা মাথার জখমে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ শুষ্ক অথবা তরল হউক ভিতরে প্রবেশ করিলে সকলের মতেই রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ঔষধ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে কিনা, তাহা বুঝিতে না পারিলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মতে তরল ঔষধের বেলায় রোযা ভঙ্গ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রোযাদারকে তীর অথবা বর্শা দ্বারা পেটে আঘাত করিলে উহার ফলক যদি পেটের ভিতরে থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে। আর যদি উহার এক প্রান্ত বাহিরে থাকে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

মাসয়ালা- সূতা দ্বারা বাঁধিয়া গোশ্ত গিলিয়া ফেলিয়া যদি সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু যদি কিছু সময় উহা পেটে থাকে, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে। এইরূপ যদি এক দিক হাতে রাখিয়া কাঠ গিলিয়া ফেলে এবং এক প্রান্ত হাতে থাকে এবং বাহির করিয়া ফেলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। আর যদি সম্পূর্ণ গিলিয়া ফেলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে।

মাসয়ালা- যদি পুরুষ মলদ্বারে এবং স্ত্রী লোক স্ত্রী-লীঙ্গে অঙ্গুলী প্রবেশ করায় তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু যদি অঙ্গুলী পানি দ্বারা কিংবা তৈল দ্বারা সিক্ত হয়, তবে তৈল ও পানি ভিতরে পৌঁছার দরুন রোযা ভঙ্গ হইবে। এই হুকুম রোযা স্মরণ অবস্থায় প্রযুক্ত হইবে।

মাসয়ালা- মলদ্বার বাহির হইয়া পড়িলে রোযাদার ব্যক্তি উহা মুছিয়া না শুকান পর্যন্ত স্থান ছাড়িয়া উঠিবে না। কেননা উহাতে পানি পেটের ভিতরে যায়, এই কারণে রোযাদার ব্যক্তি পায়খানা শৌচের সময় শ্বাস প্রশ্বাস করিবে না, কারণ উহাতে পানি ভিতরে গেলে রোযা নষ্ট হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রোযাদার ব্যক্তি বেশী সময় শৌচ করায় যদি শৌচনালীতে পানি পৌঁছে, তবে রোযা নষ্ট হইবে, কাজা করিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রোযার সময় দিনের বেলায় সহবাস করিতে বাধ্য হইলে কিংবা স্ত্রী জোর পূর্বক স্বামীকে বাধ্য করিলে পুরুষের প্রতি কেবল কাজা বর্তিবে, কাফ্ফারা নহে।

মাসয়ালা- ছোবহে ছাদেকের পূর্বে কেহ স্ত্রী সহবাস শুরু করিয়াছিল, কিন্তু ছোবহে ছাদেক হওয়ার ভয়ে ছোবহে ছাদেকের পূর্বেই পৃথক হইয়া গেল কিন্তু ছোবহে ছাদেক হইবার পর বীর্য স্খলন হইলে, ইহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করায় যদি বীর্যপাত হয় তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। এইরূপ কল্পনার কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না।

মাসয়ালা- রোযাদার ব্যক্তি রোযার কথা ভুলিয়া গিয়া ছোবহে ছাদেকের সময় সহবাস আরম্ভ করিল। কিন্তু রোযার কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই পৃথক হইয়া গেল, ইহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। কিন্তু ঐ রোযা স্মরণ হওয়ার পরে যদি কিছুমাত্র বিলম্ব করে, তবে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই বর্তিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- স্ত্রী, বাঁদী কিংবা গোলামকে চুম্বন করার কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু কাফ্ফারা বর্তিবে না। এইরূপ স্ত্রী যদি স্বামীকে চুম্বন করে এবং ইহাতে স্ত্রীর লিঙ্গে আর্দ্রতা অনুভব করে, তবে সর্ববাদী সম্মত মতে রোযা ভঙ্গ হইবে। রোযা কাজা করিবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। কিন্তু যদি আর্দ্রতা অনুভব না করে,

বরং শুধু আনন্দ অনুভব করে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

মাসয়ালা- স্পর্শন, আলিঙ্গন, করমর্দন ইত্যাদি সবই চুম্বনের ন্যায় হুকুম হইবে।

মাসয়ালা- কাপড়ের উপর দিয়া স্ত্রী লিঙ্গ স্পর্শ করার কারণে যদি বীর্য স্খলন হয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- স্ত্রীর স্পর্শের কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। স্বামী যদি এইরূপ করিতে বাধ্য করিয়া থাকে, তবে তাহাতে মতভেদ আছে।

মাসয়ালা- পশুর লিঙ্গ স্পর্শ করার কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- নিজহাতে বা স্ত্রীর হাতে লিঙ্গ হেলানের কারণে যদি বীর্য স্খলন হয়, তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না।

মাসয়ালা- নিদ্রিতা ও সাময়িক উম্মাদিনী সহবাসকৃতা হইলে তাহাদের রোযা নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু কাফ্ফারা লাগিবে না।

মাসয়ালা- দুইজন স্ত্রীলোক পরস্পরের মিলনের কারণে যদি উভয়ের রেতপাত হয়, তাহাতে উভয়ের রোযা নষ্ট হইবে। ইহাতে কাজা লাগিবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। যদি রেতপাত না হয়, তাহাতে রোযা নষ্ট হইবে না।

যে সকল কাজে রোযার কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই আবশ্যক

মাসয়ালা- রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক যে কোনও অঙ্গে সংগম করিলে তাহাতে 'কাজা' ও কাফ্ফারা উভয়ই ফরজ হইবে। ইহাতে বীর্যপাত হওয়া শর্ত নহে। সহবাসে স্ত্রী যদি ইচ্ছাপূর্বক বাধ্য হয়, তবে তাহার প্রতিও রোযার কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই বর্তিবে। তবে যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক সংগম করা হয়, তাহাতে স্ত্রীর প্রতি কেবল 'কাজা' ফরজ হইবে, কাফ্ফারা ফরজ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- বালক অথবা পাগল দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক সহবাস করাইলে তাহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই আবশ্যক হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- খাদ্য এবং ঔষধ জাতীয় জিনিস ইচ্ছাপূর্বক খাইলে তাহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই বর্তিবে। কিন্তু উহা যদি খাদ্য কিংবা ঔষধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হইয়া থাকে, তবে কাজা হইবে, কাফ্ফারা হইবে না। সুতরাং খাদ্য হিসাবে রুটি, ভাত, দুধ ইত্যাদি এবং ঔষধ হিসাবে হরতকী, মেশক, কর্পুর ইত্যাদি আহার করিলে তাহাতে 'কাজা' ও কাফ্ফারা উভয়ই লাযেম হইবে। এইরূপ যদি সিরকা, কাঁজী বা টক তরকারী ও তরমুজের পানি, কাক্ড়ি, আঙ্গুর লতার পানি ইত্যাদি পানাহার করে, তাহাতেও কাজা কাফ্ফারা উভয়ই হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- ঔষধ হিসাবে কোন মাটি, ভাজা বা পোড়া মাটি, কাঁচা আটা খাইলে,

কিংবা ইচ্ছাপূর্বক তরমুজ গিলিয়া ফেলিলে কিংবা গোশ্‌ত বা চর্বি খাইলে তাহাতেও কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয় বর্তিবে। এইরূপ ভাজা বা ভুনা যব খাইলে কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই লাগিবে। কিন্তু কাঁচা যব খাইলে শুধু 'কাজা' করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা লাগিবে না। কেননা উহা সাধারণতঃ খাওয়া হয় না।

মাসয়ালা- বৃক্ষের পাতা ও রস যাহা সাধারণতঃ লোকে খাইয়া থাকে, যেমন আঙ্গুরের পাতা, উহা খাইলে কাজা কাফ্‌ফারা উভয়ই করিতে হইবে। কিন্তু পাকা পাতা যাহা সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় না, উহা খাইলে শুধু 'কাজা'ই করিতে হইবে। যাবতীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে এই একই হুকুম হইবে।

মাসয়ালা- আঙ্গুরের দানা চিবাইয়া খাইলে সকল ইমামের মতে 'কাজা' ও কাফ্‌ফারা উভয়ই লাগিবে। আর যদি উহা আস্তা গিলিয়া ফেলে, ঐ অবস্থায় খোশা থাকিলে ছহীহ কওল মতে শুধু 'কাজা', খোশা না থাকিলে কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই বর্তিবে।

মাসয়ালা- কাঁচা বাদাম গিলিয়া ফেলিলে কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই লাগিবে।

মাসয়ালা- যদি কোনও ব্যক্তি রোযার দিনে স্ত্রীর সহিত সহবাস করে এবং তাহাতে বাধ্য হইয়া কোনও রাজকার্য্যে সফরে যাইতে হয়, তবে তাহার উপর হইতে কাফ্‌ফারা রহিত হইবে না।

যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

মাসয়ালা- শরীয়ত অনুযায়ী সফরে গমন করিলে উহাতে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে। কিন্তু রোযা অবস্থায় ভ্রমণ শুরু করিলে সেইদিন রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভ্রমণে বাহির হয় এবং রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে শুধু মাত্র রোযা কাজা করিতে হইবে। কাফ্‌ফারা করিতে হইবে না। কিন্তু সফর করিবে মনে করিয়া যদি সেই দিনই প্রথমে রোযা ভঙ্গ করিয়া পরে সফরে বাহির হয়, তবে তাহার প্রতি কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই বর্তিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কোনও ব্যক্তি রোযার দিনে ভোরে ইচ্ছাপূর্বক কিছু খায়, অতপর সরকার যদি তাহাকে সফরে যাইতে বাধ্য করে, তবে জাহের রেওয়ায়েত মতে তাহার উপর হইতে কাফ্‌ফারা রহিত হইবে না। যদি ইচ্ছা পূর্বক সফর করে তবু সর্ববাদী সম্মত মতে তাহার কাফ্‌ফারা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- কোন ব্যক্তি রমজান মাসে প্রবাসে বাহির হওয়ার পরে পুনরায় কোন জিনিস লইবার জন্য বাড়ীতে ফিরিয়া আসে এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া পুনঃ সফরে বহির্গত হয়, তাহার প্রতি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে। পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসার দরুণ তাহার সফর বাতিল হইয়া গিয়াছে।

রোগ ব্যধির কারণে রোযা ভঙ্গ করা

মাসয়ালা- রোগের কারণে জীবন বিপন্ন অথবা অঙ্গহানি হওয়ার ভয় হইলে সকলের মতে রোযা ভঙ্গ করা বৈধ। আর যদি রোগ বৃদ্ধি হওয়ার ভয় হয়, এমতাবস্থায়ও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে এবং উভয় অবস্থায় রোযার কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- রোগ বৃদ্ধি কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কথা রোগী নিজ অনুমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা স্থির করিবে। লক্ষণ পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা প্রকাশ্য ফাসেক নহে, এরূপ কোন মুসলমান চিকিৎসক দ্বারা ইহা নির্ণয় করিতে হইবে।

মাসয়ালা- সুস্থ ব্যক্তির রোযা রাখার দরুন রোগগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা হইলে এরূপাবস্থায় তাহার প্রতি রোগীর হুকুম প্রযোজ্য হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কাহারও পালাজ্বর থাকিলে তারিখের দিন জ্বর থামিবার পূর্বে কিছু খাইলে তাহাতে রোযার কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না, মাত্র কাজা করিতে হইবে।
(আলমগীরী)

মাসয়ালা- কাহারও একদিন অন্তর জ্বর আসার নিয়ম ছিল বলিয়া সে উক্ত নির্দিষ্ট দিনে জ্বর আসার পূর্বে রোযা ভঙ্গ করিল। কিন্তু তাহার জ্বর আসিল না, ইহাতে উক্ত ব্যক্তির প্রতি কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই 'লাযেম' হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- গর্ভবতী তাহার জীবনের আশঙ্কা করিলে কিংবা সন্তানের মাতা এরূপ আশঙ্কা করিল যে, সন্তান দুধ পাইবে না, এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ। তবে উভয়েরই রোযা কাজা করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা করিতে হইবে না।
(আলমগীরী)

মাসয়ালা- হায়েজ এবং নেফাস (প্রসবজনিত স্রাব) কালে রোযা রাখিবে না।

মাসয়ালা- কোনও স্ত্রীলোকের ঋতু আসার ধারণার পূর্বেই রোযা ভঙ্গ করিল। কিন্তু তাহার ঋতু হইল না, এমতাবস্থায় তাহার প্রতি কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই বর্তিবে।
(আলমগীরী)

মাসয়ালা- অভ্যাস বশতঃ নুন খাইলে ছহীহ কওল মতে 'কাজা' ও কাফ্‌ফারা উভয়ই প্রয়োজন হইবে। গ্রহণীয় কওল মতে, নুন খাইলে 'কাজা' ও কাফ্‌ফারা উভয়ই করিতে হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ ভুলে পানাহার কিংবা সহবাস করার পর মনে করে যে, তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়াছে; অতপর ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করে তাহাতে শুধু রোযার কাজা বর্তিবে, কাফ্‌ফারা হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মতে ভুলে পানাহার করায় রোযা ভঙ্গ হয় না। ইহা জানা সত্ত্বেও যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করে, তাহাতে মাত্র কাজাই করিতে হইবে, কাফ্‌ফারা লাগিবে না। ইহাই ছহীহ।

মাসয়ালা- যদি বমি হওয়ার পরে মনে করে যে, রোযা নষ্ট হইয়াছে তৎপর ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করে তাহাতে 'কাজা' হইবে কাফ্‌ফারা হইবে না। যদি সে জানিয়া

থাকে যে, বমি হওয়ায় রোযা ভঙ্গ হয় না; তৎপর ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করে, ইহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই বর্তিবে।

মাসয়ালা- শরীরে সিঙ্গা লাগাইয়া মনে করিল যে, রোযা নষ্ট হইয়াছে, অতঃপর স্বেচ্ছায় পানাহার করিল, ইহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই হইবে।

মাসয়ালা- সুরমা কিংবা তৈল ব্যবহার করিয়া মনে করিল যে, রোযা নষ্ট হইয়াছে, তৎপর ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করে, তাহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই করিতে হইবে। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি কাহারও ভুল ফতোয়ার কারণে এইরূপ ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করিয়া থাকে, তাহাতে শুধু কাজা হইবে, কাফ্ফারা হইবে না।

মাসয়ালা- প্রবাসী ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে মুকীম হইয়া রোযার নিয়ত করিল ; কিন্তু পরে ইচ্ছাপূর্বক সহবাস করিল, ইহাতে রোযার কাজাই করিতে হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। এইরূপ যদি পাগল দ্বিপ্রহরের পূর্বে জ্ঞান লাভ করে এবং ইচ্ছাপূর্বক সহবাস করে, তাহাতে মাত্র কাজাই করিতে হইবে, কাফ্ফারা করিতে হইবে না।

মাসয়ালা- দিনের প্রথম ভাগে রোযার নিয়ত করে নাই পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করে, তাহাতে শুধু কাজা করিতে হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না। এইরূপ কোন ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করার পর যদি এরূপ রুগ্ন হইয়া পড়ে যে, সে রোযা রাখিতে পারিত না। তাহার উপর হইতে কাফ্ফারা রহিত হইয়া যাইবে কেবল কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- রোযাদার ব্যক্তি দিনের শেষ ভাগে এমন অবস্থায় পৌছে, যে অবস্থা দিনের প্রথম ভাগে হইলে তাহার রোযা ভঙ্গ করা জায়েব হইত, এই অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করিলে তাহার শুধু কাজাই করিতে হইবে, কাফ্ফারা লাগিবে না।

মাসয়ালা- যদি কেহ মেসওয়াক করিয়া মনে করে যে, তাহার রোযা ভঙ্গ হইয়াছে, অতপর ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করিল। ইহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই করিতে হইবে। এইরূপ যদি কেহ পরনিন্দা করিয়া মনে করে যে, তাহার রোযা নষ্ট হইয়াছে, অতঃপর ইচ্ছাপূর্বক পানাহার করে, তাহাতে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই লাগিবে।

মাসয়ালা- রোযা ভঙ্গ করার পর যদি স্ত্রীলোকের ঋতু দেখা দেয়, কিংবা রোযা ভঙ্গ করার পর যদি বেহুঁশ হয়, তবে তাহাদের প্রতি কেবল কাজাই করিতে হইবে, কাফ্ফারা করিতে হইবে না।

মাসয়ালা- কেহ যদি ইচ্ছাপূর্বক নিজকে যখম করার ফলে যদি রোযা রাখিতে অসমর্থ হয়, তবে অনেকের মতে কাফ্ফারা করিতে হইবে না, ইহাই ছহীহ।

মাসয়ালা- যদি কেহ জানওয়ার কিংবা মুর্দারের সঙ্গে সঙ্গম করে এবং রোযা ভঙ্গ হইয়াছে মনে করিয়া পানাহার করে, তবে তাহার প্রতি কাফ্ফারা বর্তিবে। ইহা শুধু মাসয়ালা জানা সত্ত্বেও এরূপ করিলে, তাহাতেই কাফ্ফারা হইবে যদি অজ্ঞতা বশতঃ করিয়া থাকে, তবে শুধু কাজা হইবে, কাফ্ফারা হইবে না।

মাসয়ালা- কাহাকেও হত্যা করার জন্য নেওয়া হইলে সে যদি চাহিয়া পানি পান করে এবং সে যদি ঐ অবস্থায় মুক্তি পায়, তবে তাহার প্রতি কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই বর্তিবে।

মাসয়ালা- যদি পূর্ণ দশ দিন হায়েজের পর রাত্রে পাক হয়, তবে ছোবহে ছাদেক হইতে রোযা রাখিবে। আর যদি দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এই পরিমাণ রাত্রি থাকিতে পাক হয় যে, ছোবহে ছাদেকের পূর্বেই গোসল করিয়া সারিতে পারে, তবে পরদিন রোযা রাখিবে। যদি গোসল করার মধ্যেই ছোবহে ছাদেক হইয়া যায়, তবে ঐ দিন রোযা রাখিবে না। কেননা দশ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে হায়েজ হইতে পাক হইলে গোসলের সময়টিও হায়েজের মধ্যে গণ্য হয়।

মাসয়ালা- রোজার মধ্যে যদি এরূপ ক্ষুধা বা পিপাসা হয়, যাহাতে মৃত্যু অথবা জ্ঞান লোপ হওয়ার আশংকা হয়, উহাতে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয।

মাসয়ালা- এরূপ কোনও সরকারী কাজে যাইতে বাধ্য হইলে যদি জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয় থাকে, তাহাদের উপর রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মৃতকল্প বৃদ্ধ রোযা রাখিতে অসমর্থ হইলে তাহার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয হইবে। কিন্তু প্রত্যেক রোযার জন্য একজন মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়াইবে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের প্রতিও অনুরূপ হুকুম।

প্রকাশ থাকে যে, মৃতকল্প বৃদ্ধ বলিতে প্রতিদিন যাহার দুর্বলতা বাড়িতে থাকে, তাহাকে বুঝিতে হইবে।

এরূপ লোক রোযার ফেদিয়া ইচ্ছা করিলে রমজানের প্রথম ভাগে কিংবা রমজানের শেষে একত্রে দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কিন্তু বৃদ্ধ লোকের রোযার ফেদিয়া আদায় করার পরে যদি রোযা রাখিতে সক্ষম হয়, তবে ফেদিয়া বাতিল হইয়া যাইবে এবং রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- কাহারও উপর কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা কিংবা কতলের কাফ্ফারার রোযা ছিল, কিন্তু মৃতকল্প বৃদ্ধ হওয়ার কারণে যদি সেই উক্ত রোযা সমূহ রাখিতে অক্ষম হয়, এমতাবস্থায় মিসকীনকে খানা খাওয়াইলে উক্ত কাফ্ফারা আদায় হইবে না। এই মাসয়ালার ওছুল (নীতি) এই যে, রোযা আল্লাহর তরফ হইতে নির্দ্ধারিত হওয়ায় ফরজ হইয়াছে, অন্য কোনও কিছুর পরিবর্তে ফরজ হয় নাই। সেই সকল রোযার জন্য মিসকীনকে খাওয়ান জায়েয হইবে। কিন্তু যে রোযা অন্য কিছুর পরিবর্তে ফরজ হইয়াছে, তাহার জন্য মিসকীনকে খানা খাওয়ান জায়েয হইবে না, যেমন কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা স্বরূপ কাহারও উপর রোযা ফরজ থাকিলে যদি সে বার্দ্ধক্যের কারণে উহা আদায় করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে এই কাফ্ফারার পরিবর্তে মিসকীনকে খাওয়ান জায়েয হইবে না।

অর্থাৎ মিসকীন খাওয়ান দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হইবে না। কেননা এই রোযা আল্লাহ

তায়ালা ফরজ করেন নাই। বরং নিজের অপরাধের জন্য ইহা ফরজরূপে বর্তিয়াছে। কিন্তু জেহার এবং রমজানের রোযার কাফ্ফারার বেলায় অর্থাভাবের দরুন যদি গোলাম আজাদ করিতে কিংবা বার্দ্ধক্যের জন্য রোযা রাখিতে অসমর্থ হয় উহার পরিবর্তে ৬০ জন মিসকীনকে খানা খাওয়ান জায়েয হইবে। কেননা ইহা কুরআন শরীফের স্পষ্ট দলীলে উল্লেখ আছে।

মাসয়ালা- যদি কাহারও রমজানের রোযা রোগ কিংবা বিদেশ ভ্রমণের কারণে ভঙ্গ হইয়া থাকে এবং সে সেই রোগে কিংবা সফরের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার উপর রোযার কাজা করা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু যদি সে তাহার রোযার ফেদিয়া স্বরূপ মিসকীন খাওয়াইবার জন্য অসিয়ত করিয়া থাকে, তবে উক্তরূপ অসিয়ত করা ওয়াজিব না হইলেও উহা জায়েয হইবে এবং তাহার পরিত্যক্ত মালের তিন ভাগের একভাগ দ্বারা মিসকীন ইত্যাদি খাওয়াইয়া অসিয়ত পালন করিবে। কিন্তু এই রুগ্ন ব্যক্তি যদি সুস্থ হয় কিংবা মুসাফির সফর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসে এবং কাজাগুলি পূর্ণ করিবার সময় পায় তবে তাহার প্রতি সব রোযার কাজা ওয়াজিব হইবে। যদি তাহার এই কাজা সমূহ আদায় করিবার পূর্বে মৃত্যু আসিয়া যায়, তবে তাহার প্রতি রোযার ফেদিয়া আদায় করিবার জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব এবং তাহার পক্ষ হইতে ওয়ারিসগণ প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে অৰ্দ্ধ-ছা (পৌণে দুই সের পরিমাণ) আটা কিংবা এক ছা পরিমাণ খেজুর অথবা যব দিবে। যদি উক্ত ব্যক্তি অসিয়ত না করিয়া থাকে এবং তাহার ওয়ারিসগণ নিজেদের পক্ষ হইতে ফেদিয়া আদায় করে, উহা জায়েয। তবে মৃত ব্যক্তি ওয়ারিসগণকে অসিয়ত করিয়া না গেলে তাহাদের প্রতি ফেদিয়া আদায় করা ওয়াজিব নহে।

মাসয়ালা- মৃতের অলী তাহার পক্ষ হইতে রোযা রাখিতে পারে। কিন্তু রোগী সুস্থ হইলে কিংবা মুসাফির গৃহে ফিরিলে তখনই তাহাদের প্রতি রোযা রাখা ওয়াজিব।

মাসয়ালা- এক বৎসরের রোযা কাজা করিবার পূর্বে যদি পর বৎসরের রোযা আসিয়া উপস্থিত হয় তবে কাজা ছাড়িয়া নূতন রোযা আদায় করিবে।

ইমাম রাজী বলিয়াছেন- নফল রোযা রাখিয়া বিনা ওজরে ভাঙ্গা জায়েয হইবে না। ইহাই অধিকতর ছহীহ। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন- জিয়াফত ওজরের মধ্যে গণ্য। ফকীহগণ বলিয়াছেন, ছহীহ মত এই যে, শুধু উপস্থিত হইলেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু না খাইলে দুঃখিত হয় না, এই অবস্থায় নফল রোযা ভাঙ্গিবে না। আর যদি এইরূপ বিশ্বাস হয় যে, না খাইলে দুঃখিত হইবে, তবে নফল রোযা ভাঙ্গা জায়েয হইবে। কিন্তু পরে উহা 'কাজা' করিতে হইবে। শামসুল আয়েম্মা হাল্ওয়ায়ী বলিয়াছেন যে- এই মাসয়ালায় সর্বাপেক্ষা উত্তম কৌল এই যে, যে ব্যক্তি নফল রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে পুনঃ কাজা করার নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস রাখে সে নিমন্ত্রিত মুসলমান ভাইয়ের মন সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নফল রোযা ভাঙ্গিতে পারে। পুনরায় কাজা করা সম্পর্কে যাহার

পূর্ণ বিশ্বাস নাই সে অপরের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রোযা ভাঙ্গিবে না। উল্লিখিত সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কেবল দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গিতে পারে। দ্বিপ্রহরের পরে কোনও ক্রমেই নফল রোযা ভাঙ্গিতে পারে না। কিন্তু যদি ইহাতে পিতামাতার অবাধ্য হইতে হয় তখনই মাত্র নফল রোযা ভাঙ্গিতে পারিবে।

মাসয়ালা- শরহে বেকায়া কিতাবে লিখিয়াছে যে, জিয়াফত নিমন্ত্রণকারী ও নিমন্ত্রিত উভয়েরই জন্য ওজর বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ওয়াজিব রোযা সমূহে জিয়াফত কোনও ওজর বলিয়া গণ্য হইবে না। ইহা নেহায়া কিতাবে আছে।

মাসয়ালা- উম্মাদ ব্যক্তি রমজান মাসের কোন একদিনে হুঁশ প্রাপ্ত হইলে পিছনের রোযাগুলির 'কাজা' করিতে হইবে। সম্পূর্ণ মাস পাগল থাকিলে তাহার উপর 'কাজা' বর্তিবে না। তদ্রূপ যদি রমজানের শেষদিনে দ্বিপ্রহরের পরে উম্মাদ ব্যক্তি হুঁশ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার প্রতি 'কাজা' ওয়াজিব হইবে না।

মাসয়ালা- যদি সমস্ত রমজান মাস কাহারও বেহুঁশ অবস্থায় অতিবাহিত হয়, তবে সর্ব্বাদিসম্মত মতে তাহার রোযা কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- কোনও ব্যক্তি যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে বেহুঁশ কিংবা উম্মাদ হয়, এই অবস্থায় যদি কয়েকদিন অতিবাহিত হয়, তবে যে রাত্রে বেহুঁশ কিংবা উম্মাদ হয় তাহার পরের দিনের রোযা কাজা করিতে হইবে না। কেননা যদি তাহার স্মরণ থাকে যে পরবর্তী দিনের রোযার নিয়ত করিয়াছিল, তবে নিসন্দেহে তাহার রোযা আদায় হইয়াছে। আর যদি নিয়তের কথা মনে নাও থাকে তবে নিয়ত করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ্য ধরিয়া লইতে হইবে। যেহেতু প্রকাশ্য অবস্থাদৃষ্টে আমল করাই ওয়াজিব।

কিন্তু যদি মুসাফির বা এমন ব্যক্তি হয়, যাহার রমজানের রোযা ভঙ্গ করার অভ্যাস আছে, তাহার প্রতি কাজা করা ওয়াজিব হইবে, কেননা এই অবস্থায় প্রকাশ্য যে নিয়ত করিয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না।

মাসয়ালা- ধর্ম যোদ্ধা যদি মনে করে যে, যুদ্ধে সে দুর্বল হইয়া পড়িবে এমতাবস্থায় তাহার পক্ষে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি যুদ্ধ নাও হয় তবুও তাহার প্রতি কাফ্ফারা হইবে না। কেননা যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পূর্বে আহার করা প্রয়োজন ছিল।

মাসয়ালা- ব্যবসায়ী ব্যক্তি যদি এরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, ব্যবসা না করিলে তাহার অনটনে পড়িতে হইবে। কিন্তু সে তাহার কাজে লিপ্ত না হইলে যদি মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাহার রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হওয়ার অবস্থায় গিয়া পৌঁছিবে, এরূপ অবস্থায় না পৌঁছা পর্যন্ত তাহার পক্ষে রোযা ভঙ্গ করা হারাম হইবে।

যে সকল কাজে রোযা মাকরূহ হয় তাহার বয়ান

মাসয়ালা- বিনা ওজরে জিহ্বা দ্বারা কোন জিনিসের স্বাদ লওয়া কিংবা চর্বণ করা মাকরূহ। বদমেজাজ স্বামী কিংবা মুনীবের ভয়ে স্ত্রী বা দাসী যদি শোরবার স্বাদ গ্রহণ করে তবে উহা ওজরের মধ্যে গণ্য হইবে। স্বাদ গ্রহণের অর্থ জিহ্বার উপর খানিকটা রাখিয়া উহার স্বাদ অনুভব করিবে। কিন্তু গিলিবে না, বরং থুথু ফেলিয়া দিবে। যদি গিলিয়া ফেলে তবে রোযা নষ্ট হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কোনও স্ত্রীলোক যদি নিজ শিশুকে খাদ্য চিবাইয়া দিবার জন্য হায়েজ নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক কিংবা ঐরূপ বেরোযাদার না পায়, কিংবা পাকান নরম খাদ্য কিংবা দুধ না পাওয়া যায় তখন সে শিশুর খাদ্য চিবাইয়া নরম করিয়া দিলে মাকরূহ হইবে না। (আলমগীরী) তান্‌জীহ কিতাব হইতে উক্ত হইয়াছে যে, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ কেবল ফরজ রোযার বেলায়ই মাকরূহ। কিন্তু নফল রোযার বেলায় মাকরূহ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রোযাদার ব্যক্তি মধু কিংবা তৈল খরিদ করিবার সময় উহার ভালমন্দ বিচার করিবার জন্য স্বাদ অনুভব করা মাকরূহ। কিন্তু জাহেদী কিতাব হইতে আলমগীরী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও মতে প্রতারিত হইবার ভয় থাকিলে কিংবা উহা খরিদ করা অত্যধিক প্রয়োজন হইলে উক্তরূপ জিহ্বা দ্বারা স্বাদ লওয়ায় দোষ নাই।

মাসয়ালা- এস্তেঞ্জার (শৌচক্রিয়া) সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা মাকরূহ। ঐরূপ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বেলায়ও অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা মাক্‌রূহ।

মাসয়ালা- রোযাদার ব্যক্তি পানির মধ্যে বেগে কিংবা নিঃশব্দে বায়ু ত্যাগ করিলে উহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ।

মাসয়ালা- ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মতে অজু ও গোসলের সময় ব্যতীত অন্য সময় কুলী করা ও নাকে পানি দেওয়া মাকরূহ। এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শরীরে ও মাথায় পানি দেওয়া, পানির মধ্যে শরীর ডুবাইয়া বসা বা ভিজা কাপড় শরীরে জড়ান মাকরূহ। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে এইগুলি মাকরূহ নহে। ইহা অধিকতর প্রসিদ্ধ মত। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মুখে থুথু জমা করিয়া গিলিয়া ফেলা রোযাদারের জন্য মাকরূহ।

মাসয়ালা- দ্বিপ্রহরের পূর্বে বা পরে কাচা বা সুখনা বৃক্ষের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা মাকরূহ নহে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, মেসওয়াক ভিজাইয়া লওয়া মাক্‌রূহ, কিন্তু জাহের রেওয়ায়েত মতে উহাতেও কোন দোষ হইবে না।

মাসয়ালা- সুরমা বা তৈল ব্যবহার করা মাকরূহ নহে।

মাসয়ালা- রোযাদার ব্যক্তি রক্ত মোক্ষণ করাইলে যদি দুর্বলতার জন্য রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তবে উহা মাকরূহ।

মাসয়ালা- সংগমে পতিত হওয়া কিংবা বীর্য স্খলনের ভয় না থাকিলে চুম্বনে কোন

দোষ নাই, কিন্তু যদি উহার ভয় থাকে তবে মাকরূহ হইবে।

মাসয়ালা- সংগমে পতিত হওয়া কিংবা বীর্যপাতের ভয় থাকুক বা নাই থাকুক রোযাদার ব্যক্তির জন্য ওষ্ঠ চুম্বন করা মাকরূহ।

মাসয়ালা- এইরূপ বীর্যপাতের আশঙ্কা না থাকিলে যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র সহবাস কিংবা যৌনক্রিয়া করা জাহের রেওয়ায়েত মতে চুম্বনের অনুরূপ। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ভয় না থাকিলে ও মোবাশেরাতে ফাহেশা (উলঙ্গ দেহে পরস্পর আলিঙ্গন কিংবা যৌনাঙ্গ পরস্পর সন্নিহিত করা) নির্দ্বিধায় মাকরূহ।

মাসয়ালা- নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তির কোলাকুলি বা আলিঙ্গনে কোন ভয় নাই, অর্থাৎ মাকরূহ হইবে না।

মাসয়ালা- জানাবাত (নাপাকি) অবস্থায় ভোর হইয়া গেলে কিংবা দিবা ভাগে স্বপ্নদোষ হইলে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব। রাত্রির শেষ ভাগে উহার সময়। ফকীহ আবূ লাইছ বলিয়াছেন যে, রাত্রির ছয় ভাগের এক ভাগ থাকিতে উহা খাওয়া শেষ করিবে। তবে সময় থাকিতে শেষ ভাগে সাহ্‌রী খাওয়া মুস্তাহাব।

পক্ষান্তরে সন্দেহ জনিত সময় পর্যন্ত সাহ্‌রীর জন্য বিলম্ব করা মাকরূহ।

(আলমগীরী)

মাসয়ালা- ইফতারের ওয়াক্ত হইলে তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব। ইফতারের সময় নিম্ন লিখিত দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

মাসয়ালা- দিনটি শা'বান কিংবা রমজান মাসের, এই সন্দেহ হইলে সেই দিন রমজানের কিংবা অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করা মাকরূহ। কিন্তু রমজান ব্যতীত অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করিলে উহাতে অপেক্ষাকৃত কম দোষ হইবে। কিন্তু পরে যদি জানা যায় যে, উক্ত দিনটি রমজানেরই দিন ছিল তবে তাহার রমজানের রোযা আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি উহা শা'বান মাসের দিন হয় তবে রমজানের নিয়ত করিয়া থাকিলে উহা নফল রোযায় পরিণত হইবে এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কাজা করিতে হইবে না।

কিন্তু যদি উক্ত দিনে ওয়াজিব রোযার নিয়ত করিয়া থাকে তবে উহাই আদায় হইয়া যাইবে। যদি উক্ত দিন শা'বান কি রমজান মাস তাহা কিছুই স্থির না হয় এমতাবস্থায় ওয়াজিব রোযার নিয়ত করিয়া থাকে তবে উহা আদায় হইবে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে, উক্ত দিনটি রমজান মাসের ছিল তবে রমজানের রোযা আদায় হইবে। আর শা'বানের দিন বলিয়া স্থির হয় তবে রোযাটি নফল হইয়া যাইবে। উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কাজা করিতে হইবে।

উক্ত সন্দেহের দিবসে নিয়ত নির্দিষ্ট না করিয়া শুধু রোযা রাখিলে উহা মাকরূহ হইবে। অতপর যদি উহা শা'বানের দিন বলিয়া প্রকাশ পায় তবে উহা নফল হইবে। আর যদি উক্ত দিন রমজান মাস সাব্যস্ত হয় তবে রমজানের রোযা আদায় হইবে। যদি সন্দেহের দিবসে রোযা

রাখার জন্য এরূপ নিয়ত করে যে, যদি আগামী দিন রমজানের মাস হয় তবে রমজানের রোযা রাখিব আর যদি শা'বান মাস হয় তবে কোন নিয়ত করিলাম না; এরূপ অবস্থায় সে মোটেই রোযাদার হইবে না। কেননা তাহার নিয়তেই সন্দেহ রহিয়াছে। আর যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি আগামীকল্য রমজান মাস হয় তবে রমজানের নিয়ত করিলাম। আর যদি শা'বানের দিন হয় তবে একটি ওয়াজিব বা নফলের নিয়ত করিলাম; এরূপ নিয়ত করা মাকরূহ হইবে।

পরে যদি উক্ত দিন রমজানের দিন বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে উভয় নিয়তেই রমজানের রোযা আদায় হইবে। আর যদি উক্ত দিবস শা'বান মাসের প্রমাণ হয় তবে ওয়াজিব রোযার নিয়ত করিয়া থাকিলে উহা আদায় হইবে না। কিন্তু নফল রোযার নিয়ত করিয়া থাকিলে উহা আদায় হইবে, ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কাজা করিতে হইবে না।

সন্দেহের দিবসের প্রমাণ

(ক) আসমান মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে উনত্রিশ তারিখের রাতে যদি চাঁদ উঠার প্রমাণ পাওয়া না যায়।

(খ) কিংবা একজন লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ায়।

(গ) কিংবা দুইজন ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হওয়ায়; কিন্তু আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা না গেলে সেদিন সন্দেহের দিবস বলিয়া গণ্য হইবে না।

সন্দেহের দিবসে রোযা রাখার হুকুম

মাসয়ালা- সন্দেহের দিবসে রোযা রাখা সম্পর্কে কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেহ শা'বানের পূর্ণ মাস রোযা রাখিয়া থাকে অথবা তাহার নিয়মিত রোযার পর্যায়ভুক্ত হয়, তবে উক্ত দিন রোযা রাখা আফ্‌জল। এইরূপ যদি কেহ শাবান মাসের শেষ তিন দিন রোযা রাখিয়া থাকে, তাহার পক্ষে ঐ দিন রোযা রাখা আফ্‌জল। কিন্তু যদি উক্তরূপ রোযা রাখার অভ্যাস না থাকে তবে সন্দেহের দিবসে রোযা রাখা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে গ্রহণীয় মত এই যে, সন্দেহের দিবসে রোযা রাখা সম্বন্ধে ওয়াকেফ্‌হাল ব্যক্তি উক্ত দিবসে নফল রোযা রাখিতে পারে এবং সাধারণ লোকজন উক্ত দিবসে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দিন সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিবে, তৎপর রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। উক্ত দিনে রোযা রাখার অভ্যস্ত ব্যক্তিরা নফল নিয়তেই রোযা রাখিবে। এরূপ ধারণা করিবে না যে, যদি উক্ত দিন রমজান হয়, তবে রমজানের রোযাই রাখিব।

মাসয়ালা- সন্দেহের দিবসে দিন স্থির হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকা অবস্থায় দ্বিপ্রহরের পূর্বে যদি ভুলে খানা খাইয়া ফেলে তৎপর সে দিন রমজান বলিয়া প্রকাশ পাওয়ায় রমজানের রোযার নিয়ত করিলে উহা দ্বারা রমজানের রোযা আদায় হইবে না।

মাসয়ালা- ঈদ, কুরবানী ও তাশরীকের তিন দিন মোট পাঁচ দিন রোযা রাখা মাকরূহ তাহরীম; তবে যদি কেহ ঐ দিন সমূহে রোযা রাখিয়া থাকে, তবে মাকরূহ তাহরীমের সঙ্গে রোযা আদায় হইবে। যদি কেহ ঐ দিন সমূহে রোযা রাখিয়া পুনঃ ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে তাহার প্রতি উহার 'কাজা' বর্তিবে না। ইহাই জাহের রেওয়ায়েত।

ছওমুল বেছাল

নিষিদ্ধ দিনগুলিসহ সারা বৎসর রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু নিষিদ্ধ দিন সমূহে ভাঙ্গিয়া বৎসরের অন্যান্য দিন সমূহে রোযা রাখায় দোষ নাই।

মাসয়ালা- দিবা রাত্রিতে মোটেই ইফতার না করিয়া কয়েকদিন ক্রমাগত রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু একদিন অন্তর রোযা রাখা ভাল।

শনিবার ও রবিবারের রোযা

প্রতি শনিবার ও রবিবার রোযা রাখা সম্পর্কে আলমগীরী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ঐ দিবস দ্বয়ের সম্মানের জন্য না হইলে উহাতে কোনও দোষ নাই। (আলমগীরী)

বৎসরের প্রথম দিন ও বে-দ্বীন জাতীর পর্ব বিশেষে রোযা রাখা

মাসয়ালা- বে-দ্বীনের পর্বদিনে ইচ্ছা করিয়া রোযা রাখা মাকরূহ হইবে। কিন্তু যদি পূর্ব আদত অনুসারে উক্ত দিবসে রোযা পড়িয়া বসে তবে মাকরূহ হইবে না। এ দিনে রোযা রাখার ফজীলত সম্পর্কে কথা এই যে, যদি পূর্বে ঐরূপ নফল রোযা রাখার অভ্যাস অনুসারে উক্ত দিবসে রোযা পড়িয়া থাকে, তবে রাখাই-ভাল, নতুবা ঐ দিনে রোযা রাখা ভাল নহে। কেননা উহাতে বে-দীনের পর্বদিনকে সম্মান দেখান হয়। ইহা হারাম।

(আলমগীরী)

ছওমে ছামৎ বা নির্বাক রোযা

মাসয়ালা- রোযা রাখিয়া একদম কথা বন্ধ করা, এইরূপ রোযা রাখা মাক্রূহ।

(আলমগীরী)।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর রোযা রাখা

মাসয়ালা- স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল রোযা রাখা মাকরূহ, তবে যদি স্বামী রুগ্ন, রোযাদার অথবা প্রবাসের অবস্থায় থাকে, তবে স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও রোযা রাখিতে পারিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- স্ত্রী স্বামীর আদেশে নফল রোযা ভাঙ্গিলে যখন স্বামী পুনঃ অনুমতি দিবে, কিংবা তালাকে বাইন প্রাপ্ত হইবে, তখন উক্ত রোযা 'কাজা' করিতে হইবে।

শ্রমিকের নফল রোযা

মাসয়ালা- মজুর নিয়োগকারীর কাজে ক্ষতি না হইলে নিয়োগকারীর অনুমতি ব্যতীতই মজুর ব্যক্তি নফল রোযা রাখিতে পারিবে। কিন্তু কাজের ক্ষতি হইলে নিয়োগকারীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযা রাখিতে পারিবে না।

মাসয়ালা- মুসাফিরের রোযা রাখায় বিশেষ কষ্ট হইলে রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু যদি কষ্ট না হয় এবং ছফরের সঙ্গীগণ সকলেই রোযাদার হয়, তাহা হইলে রোযা রাখা মাকরূহ হইবে না। আর যদি সঙ্গীগণ রোযাদার না হয় তাহাদের খাদ্য ও পানীয় একত্রে থাকে তবে তাহার রোযা না রাখাই উত্তম।

মাসয়ালা- প্রবাসী ব্যক্তি রোযাদার অবস্থায় নিজ গ্রামে কিংবা একামতের স্থানে উপস্থিত হইলে অবশিষ্ট দিন রোযা ভাঙ্গা মাকরূহ।

মাসয়ালা- যাহার উপর রমজানের কাজা বাকী রহিয়াছে তাহার নফল রোযা রাখা মাকরূহ নহে।

মাসয়ালা- প্রতি চাঁদের ১৩, ১৪, এবং ১৫ তারিখে আইয়্যাম বীজের রোযা রাখা মুস্তাহাব।

মাসয়ালা- সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ন্যায় প্রতি জুমাবারে একটি রোযা রাখা মুস্তাহাব।

মাসয়ালা- যুলকাদাহ, যুলহাজ্জ, মোহার্‌রম ও ছফর এই চারটি মাসের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারগুলিতে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

মাসয়ালা- যুলহাজ্জ মাসের প্রথম নয় তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাজীদের জন্য ৯ই যুলহাজ্জ দুর্বল হইয়া পড়িবার ভয় থাকিলে রোযা রাখা মাকরূহ হইবে। এইরূপ দুর্বলতার ভয় থাকিলেই ৮ই যুলহাজ্জ রোযা রাখা হাজীদের জন্য মাকরূহ হইবে।

মুস্তাহাব রোযা কয়েক প্রকার। যথা-

(১) মোহার্‌রমের ১০ তারিখ পর্যন্ত (২) রজব মাসের রোযা (৩) শা'বান মাসের রোযা (৪) ৯ই তারিখ সহ আশুরার রোযা। আশুরার একটি রোযা রাখা মাকরূহ।

মান্নত রোযা সমূহের বয়ান

মান্নত রোযার শর্ত সমূহঃ

১। শরীয়তে যে বস্তু দ্বারা কোন ওয়াজিব আদায় হয় এইরূপ যে কোন জিনিস বা বিষয় মান্নত করিলে উহা আদায় করা ওয়াজিব হইবে। সুতরাং রোগী পরিচর্যার মান্নত করিলে ঐ মান্নত শুদ্ধ হইবে না এবং উহা আদায় করাও ওয়াজিব হইবে না।

২। এমন জিনিস বা বিষয়ের মান্নত করিতে হইবে যাহা কোন নির্দিষ্ট ইবাদত হয়। ইবাদতের উপলক্ষ বা উপকরণ দ্বারা মান্নত শুদ্ধ হইবে না। সুতরাং অজু কিংবা তেলাওয়াতে সিজদাহ মান্নত করিলে সেই মান্নত আদায় করা ওয়াজিব হইবে না।

৩। যে কাজ বর্তমানে কিংবা পরে আদায় করা ওয়াজিব রহিয়াছে এরূপ কার্য মান্নত করিলে উহা আদায় করা ওয়াজিব হইবে না। সুতরাং কেহ যদি জোহরের বা অন্য কোন ওয়াক্তের ফরজ রোযার মান্নত করে তবে উক্ত মান্নত শুদ্ধ হইবে না।

৪। যে কাজ করা গুনাহ এমন কাজের মান্নত করিলে উহা শুদ্ধ হইবে না। যদি

কোরবানীর দিবসে রোযা রাখার মান্নত করে; তবে সে দিন রোযা রাখিবে না বরং অন্যদিন উহার কাজা করিবে। এই মান্নত শুদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, রোযা রাখার মান্নত করা গুনাহের কাজ নহে। কেবল কোরবানীর দিনের জন্য উহা নিষিদ্ধ ছিল। তবে যদি কেহ ঐ দিন মান্নতের রোযা রাখিয়া থাকে তবে তাহার মান্নত আদায় হইবে।

৫। মান্নত ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরও একটি শর্ত এই যে, উহা করা অসম্ভব না হওয়া। সুতরাং কেহ যদি মান্নত করে যে, আমি গতদিন রোযা রাখিব, তবে ইহাতে তাহার মান্নত শুদ্ধ হইবে না।

মাসয়ালা- যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বলে যে, অমুক ব্যক্তি যে দিন আসিবে সেদিন আমি আল্লাহর নামে একটি রোযা রাখিব, এখন, উক্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যখন আসিল তখন সে খানা খাওয়া শেষ করিয়াছে। কিম্বা সে যদি স্ত্রীলোক হয় এবং সেদিন সে ঋতুবতী থাকে তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে উক্ত মান্নতকারীণীর উপরে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। ইহাই গ্রহণীয় মত।

মাসয়ালা- কেহ যদি এরূপ মান্নত করে যে, অমুক ব্যক্তি যে দিন আসিবে আমি সেদিন আল্লাহর নামে একটি রোযা রাখিব; অতপর উক্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি দিন ছাড়াইয়া রাত্রে আসে তবে তাহার প্রতি মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে আসে এবং সেই পর্যন্ত সে পানাহার না করিয়া থাকে তবে সে রোযা রাখিবে।

মাসয়ালা- যদি কোন ব্যক্তি এরূপ নিয়ত করে যে, অমুক ব্যক্তি যে দিন আসিবে, সারা জীবন আমি সেই দিন রোযা রাখিব। অতপর উক্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এমন দিনে আসিল যেদিনে নিয়তকারী খানা খাইয়া ফেলিয়াছে। এমতাবস্থায় এই দিন মান্নতকারীর প্রতি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে ঐদিন সারাজীবন রোযা রাখিতে হইবে।

মাসয়ালা- কেহ মান্নত করিল যে, অমুক ব্যক্তি যেদিন আসিবে সেদিন আমি সারা জীবন রোযা রাখিব। পুনঃ মান্নত করিল যে, যেদিন অমুক ব্যক্তির রোগ ভাল হইবে সেদিন সারা জীবন রোযা রাখিব। অতঃপর যেদিন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আসিল সেই দিনই অপর কথিত ব্যক্তির অসুখও ভাল হইল। এরূপ অবস্থায় ঐ একদিনই তাহার উপরে সারা জীবন রোযা ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি একটি রোযা রাখিব, তবে তাহার প্রতি একটি মাত্র রোযা ওয়াজিব হইবে। যেদিন ইচ্ছা করে সেদিনই ঐ রোযা আদায় করিতে পারিবে।

মাসয়ালা- কেহ যদি অর্দ্ধ দিনের রোযার মান্নত করে তবে ঐ মান্নত শুদ্ধ হইবে না।

মাসয়ালা- যদি কেহ দুই তিন কিংবা দশ দিনের রোযার মান্নত করে তবে তাহার প্রতি উক্ত পরিমাণ রোযাই ওয়াজিব হইবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে সময় নির্দিষ্ট করিয়া

একত্রে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া রোযা আদায় করিতে পারে। যদি সে একাদিক্রমে রাখিবার নিয়ত করিয়া থাকে তবে একাদিক্রমেই আদায় করিবে। একাদিক্রমে মান্নত রোযা আদায় করিবার নিয়ত করিয়া থাকিলে যদি মধ্য হইতে একদিন রোযা ছুটিয়া যায় কিংবা স্ত্রীলোকের বেলায় ঋতু আসিয়া পড়ে তবে আবার প্রথম হইতে সকল রোযা রাখিতে হইবে। যদি মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া রোযা রাখার মান্নত করিয়া থাকে এবং একাদিক্রমে আদায় করিয়া ফেলে তাহাও জায়েয হইবে।

মাসয়ালা- কেহ বলিল আমি আল্লাহর জন্য একাদিক্রমে দশ দিন রোযা রাখিব, অতপর সে পনর দিন রোযা রাখিল এবং মাঝে একদিন রোযা ভঙ্গ করিল। উক্ত রোযা ভঙ্গের দিন প্রথম দশ দিনের মধ্যে কিংবা শেষের পাঁচ দিনের মধ্যে ইহা স্মরণ নাই এমতাবস্থায় উক্ত মান্নতকারী আরও পাঁচটি রোযা পরস্পর রাখিবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ এরূপ মান্নত করে যে, আমি একদিন রোযা রাখিব তাহার উপর একদিনের রোযাই ওয়াজিব হইবে। যদি ইহা দ্বারা আজীবন রোযা রাখার নিয়ত করিয়া থাকে তবে আজীবনই রোযা রাখিতে হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে যে, আমি রোযা রাখিব তাহার প্রতি একটি রোযা ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- যদি মান্নত করে যে, আমি কয়েকটি রোযা রাখিব, তাহার অন্তত তিনটি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে। যদি উক্ত নিয়তের দ্বারা তিন দিনের বেশী নিয়ত করিয়া থাকে তবে তাহাই আদায় করিবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে, আমি অনেক দিন রোযা রাখিব। ইহা দ্বারা অন্য কোন নিয়ত না করিয়া থাকে তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর নিকট দশ দিন এবং ছাহেবাইনের মতে সাত দিন রোযা রাখিতে হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে যে, আমি এক জুম্‌আ রোযা রাখিব, তাহার প্রতি সাতটি রোযা ওয়াজিব হইবে। (যেখানে এক জুম্‌আ বলিতে এক সপ্তাহ বুঝায় সেইখানে এই মাসয়ালা খাটিবে) যদি সে নির্দিষ্ট করিয়া জুম্‌আর দিনের নিয়ত করিয়া থাকে তবে তাহার প্রতি মাত্র শুক্রবার দিনের রোযাই ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ এইরূপ নিয়ত করে যে, আমি অনেক জুম্‌আ রোযা রাখিব। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে দশ সপ্তাহের রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে এবং ছাহেবাইনের মতে সারা জীবনের জুম্‌আবার রোযা রাখিতে হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে যে, আমি বৃহস্পতিবার রোযা রাখিব যদি সারা জীবন বৃহস্পতিবার রোযা রাখার মান্নত না করিয়া থাকে তবে নিকটবর্তী বৃহস্পতিবার রোযা রাখা বুঝিতে হইবে। সারা জীবনের বৃহস্পতিবার বুঝাইবে না।

মাসয়ালা- যদি কেহ এরূপ মান্নত করে যে, আমি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রোযা রাখিব, ইহাতে তাহার আজীবন প্রতি বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতে হইবে। যদি কোন

বৃহস্পতিবার রোযা ভঙ্গ করে তবে উহার কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- মৃতকল্প বৃদ্ধ হওয়ার কারণে যদি কাজা রোযা রাখিতে অসমর্থ হয় কিংবা সারা জীবনের মান্নত রোযা উক্ত কারণে আদায় করিতে অসমর্থ হয়, কিংবা কঠিন পরিশ্রমে জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হওয়ার কারণে উক্ত মান্নত রোযা আদায় করিতে না পারে, এরূপ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করিয়া যথা নিয়মে একজন মিসকীন খাওয়ান জায়েয হইবে। যদি অর্থাভাবে মিসকীন খাওয়াইতে না পারে তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ মাফ করনেওয়ালা। আর যদি গ্রীষ্ম ইত্যাদি প্রতিকূল ঋতুর কারণে উক্ত মান্নত বা কাজা রোযা রাখিতে অসমর্থ হয় তবে অনুকূল ঋতুতে রোযা কাজা করিবে। কিন্তু সারা জীবনের মান্নত রোযা হইলে সে অবস্থায় ইহা চলিবে না।

মাসয়ালা- যদি কেহ একদিনের রোযা মান্নত করার ধারণায় ভুলক্রমে"একমাস রোযা রাখিয়া ফেলিব" বলিয়া ফেলে তবে তাহার প্রতি একমাস রোযা রাখাই ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ একমাস রোযা রাখার মান্নত করে তাহার প্রতি ত্রিশ দিন রোযা রাখাই ওয়াজিব হইবে। যে কোন মাসে উহা আদায় করা চলিবে। দেরীর জন্য গুনাহগার হইবে না।

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে যে, আমি এই মাসের রোযা রাখব; সে যদি মাসের মধ্যভাগে কিংবা শেষ ভাগে মান্নত করিয়া থাকে তবে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি রোযা রাখিতে হইবে। আর যদি পূর্ণ কোন একমাস রোযা রাখার নিয়ত করিয়া থাকে, তবে তাহার নিয়ত অনুসারে রোযা রাখিবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ ধারাবাহিক ভাবে একমাস রোযা রাখার মান্নত করিয়া থাকে তবে রোযা সেইরূপ ভাবেই রাখিতে হইবে। আর যদি ধারাবাহিক ভাবে রাখিবার নির্দিষ্ট মান্নত না করিয়া থাকে তবে ইচ্ছানুযায়ী ধারাবাহিক কিংবা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রোযা রাখিতে পারে।

মাসয়ালা- যদি নির্দ্ধারিত মাসে রোযা রাখার মান্নত করিয়া মাঝে একটি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে ঐ রোযাটির কাজা করিতে হইবে, প্রথম হইতে রাখিতে হইবে না। যদি পূর্ণ মাসে রোযা না রাখিয়া থাকে তবে ধারাবাহিক ভাবে কিংবা ভাঙ্গিয়া কাজা করা তাহার ইচ্ছাধীন।

মাসয়ালা- যদি কেহ শাওয়াল, যুলকাদা ও যুলহাজ্জ এই তিন মাসের রোযা রাখার মান্নত করিয়া থাকে তবে তাহার প্রতি দুই ঈদ এবং আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিন মোট এই পাঁচ দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে না। যদি মান্নতের সময় মাস নির্দ্ধারিত না করিয়া থাকে, এবং পরে শাওয়াল, যুলকাদা এবং যুলহাজ্জ এই তিন মাস রোযা আদায় করিবার জন্য স্থির করে, এই অবস্থায় ত্রিশ দিনের হিসাবে মাস ধরিতে হইবে এবং ত্রিশ দিনের পূর্বে মাস শেষ হইলে যে কয়দিন কম হইবে, সেই কয়দিনের রোযা কাজা

করিতে হইবে। যেমন উক্ত অবস্থায় শাওয়াল মাস ২৯ দিনে শেষ হইল, তখন উক্ত দুই ঈদ, এবং আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন এবং শাওয়াল মাসের কম একদিন ধরিয়া ছয় দিনের রোযা কাজা করিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে যে, আমি রমজানের ন্যায় এক মাসের রোযা রাখিব উহা দ্বারা যদি সে ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখার নিয়ত করিয়া থাকে, তবে ধারাবাহিক ভাবে রাখিবে। আর যদি সংখ্যা হিসাবে রাখিবার নিয়ত করিয়া থাকে বা কিছুই নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে ধারাবাহিক কিংবা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ত্রিশ দিন রোযা আদায় করিতে হইবে। আর যদি উক্ত নিয়ত দ্বারা রমজানের ফরজের ন্যায় তুলনা করিয়া থাকে তবে তাহার ঐ রোযা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রাখা জায়েয হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কেহ মান্নত করে যে, আমি আমার প্রতি এই বৎসরের রোযা ওয়াজিব করিলাম। ইহাতে সারা বৎসরের রোযা তাহার প্রতি ওয়াজিব হইবে। কেবল দুই ঈদ এবং আইয়্যামে তাশ্‌রীকের তিন দিন, মোট পাঁচ দিনের রোযা পরে কাজা করিতে হইবে। কিন্তু যদি ঈদুল ফিতরের কিংবা ঈদুর আজহার ও আইয়্যামে তাশ্‌রীকের পরে উক্তরূপ মান্নত করিয়া থাকে, তবে উক্ত রোযা সমূহের কাজা করিতে হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কেহ এরূপ মান্নত করে যে, আমি কোন এক বৎসর রোযা রাখিব, সাল নির্দিষ্ট না করিয়া এরূপ মান্নত করিলে তাহার উপর চাঁদের হিসাবে পূর্ণ এক বৎসর এবং রমজান মাসের ত্রিশটি এবং দুই ঈদ ও আইয়্যামে তাশ্‌রীকের পাঁচটি মোট পঁয়ত্রিশটি রোযা কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ এক বৎসরের রোযা মান্নত করে, তবে তাহার প্রতি রমজানের রোযা কাজা করা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু যদি কোনও স্ত্রীলোক কোনও নির্দিষ্ট বৎসরের রোযা মান্নত করে, তবে তাহার প্রতি পূর্ণ এক বৎসরের রোযা ছাড়াও ঋতু কালীন দিন সমূহের রোযা কাজা করিতে হইবে। কেননা স্ত্রীলোকের ঋতু ছাড়াও বৎসর অতীত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ণ বৎসরের রোযার নিয়ত শুদ্ধ হইয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কোনও শর্ত সাপেক্ষ রোযা মান্নত করিলে যতক্ষণ সেই শর্ত পূর্ণ না হয় ততক্ষণ রোযা রাখা জায়েয হইবে না। সুতরাং- যদি কেহ মান্নত রোযা আদায় করিবার কোনও মাস নির্দিষ্ট করিয়া থাকে, যেমন কেহ মান্নত করিল যে, আমি আগামী রজব মাসে রোযা রাখিব, তাহার পরিবর্তে রবিউল আউয়াল মাসে রোযা আদায় করিল, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ইহা জায়েয হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এরও এই মত। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কেহ বলে যে, আমার অপরাধ মাফ হইলে আমি এই পরিমাণ রোযা রাখিব। কিন্তু যতক্ষণ সে এরূপ না বলে যে, আমি আল্লাহর জন্য এই রোযাগুলি আমার উপর ওয়াজিব করিলাম কিম্বা আল্লাহর নামে রোযা মান্নত করিলাম ততক্ষণ রোযা আদায় করা কেয়াস অনুসারে আদায় হইবে না। কিন্তু মুস্তাহ্‌সান এই যে উহা আদায় করা ওয়াজিব।

মাসয়ালা- কোন শর্ত সাপেক্ষে মান্নত না করিলে উক্ত মান্নত আদায় করা ওয়াজিব হয় না।

মাসয়ালা- যদি কেহ নির্দিষ্ট কিংবা অনির্দিষ্ট একমাস রোযা রাখার মান্নত করে এবং একমাস গত হইবার পূর্বেই মৃত্যু আসিয়া যায় তবে তাহার প্রতি রোযা ওয়াজিব বর্তিবে এবং তাহার এইজন্য অসিয়ত করিয়া যাওয়া জরুরী। সুতরাং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে মিসকীনকে অর্দ্ধ-ছা পরিমাণ আটা দান করিবে।

মাসয়ালা- কোন রোগী যদি এরূপ মান্নত করে যে, আমি আল্লাহর নামে একমাস রোযা রাখিব। সে যদি রোগ সারিবার পূর্বে মরিয়া যায় তবে তাহার কিছুই ওয়াজিব হইবে না। আর যদি সুস্থ হইয়া একদিনও বাঁচিয়া থাকে তবে তাহার প্রতি পূর্ণ মাসের ফেদিয়া দেওয়ার অসিয়ত করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে যতদিন সুস্থ ছিল ততদিনের ফেদিয়ার অসিয়ত করা ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- যদি কেহ এরূপ মান্নত করে যে, মাসের প্রথম এবং শেষ এই দুইদিন পরপর রোযা রাখিব, তাহার প্রতি মাসের ১৫ এবং ১৬ই তারিখে রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- কেহ রজব মাসে রোযা রাখার মান্নত করিল; অতপর সে জেহারের কাফ্-ফারা আদায় করিবার জন্য দুই মাস ধারাবাহিক রোযা রাখিতে শুরু করিল, উহার একমাস রজব ছিল, এমতাবস্থায় রজব মাসের রোযা কাজা করা তাহার প্রতি ওয়াজিব হইবে।

এ'তেকাফের বয়ান

এ'তেকাফ কাহাকে বলে?

ছওয়াবের নিয়তে সকল প্রকার পার্থিব সংশ্রব ত্যাগ করতঃ নির্দিষ্ট সময় মসজিদে অবস্থানের নাম এ'তেকাফ।

মাসয়ালা- এ'তেকাফ তিন প্রকারঃ (১) ওয়াজিব, (২) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও (৩) মুস্তাহাব।

এ'তেকাফের শর্ত সমূহ

(১) নিয়তঃ- বিনা নিয়তে এ'তেকাফ করিলে সর্ববাদীসম্মত মতে উহা শুদ্ধ হইবে না।

(২) **জামায়াতের মসজিদঃ-** যে মসজিদে নিয়মিত আযান একামত হয়, সেই মসজিদে এ'তেকাফ জায়েয হইবে। এ'তেকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ বায়তুল্লাহ, তৎপর মসজিদে নববী, তৎপর মসজিদে আকসা, (বায়তুল মোকাদ্দাছ) তৎপর জামে মসজিদ, তৎপর যে মসজিদে মুছল্লি সংখ্যা অধিক। স্ত্রীলোকগণ গৃহের মসজিদে, (নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে) এ'তেকাফ করিবে। তাহারা গৃহের মধ্যে এ'তেকাফের সময় স্বাভাবিক হাজাত ব্যতীত বাহির হইবে না। জামায়াতের মসজিদে স্ত্রী লোকগণের এ'তেকাফ করা মাকরূহ। তাহাদের জন্য ঘরের মধ্যেই এ'তেকাফ করা উত্তম।

স্ত্রীলোকগণ নামাযের নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া ঘরের অন্য স্থানেও এ'তেকাফ করিতে পারিবে।

এ'তেকাফের তৃতীয় শর্ত রোযা রাখাঃ- ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। জাহেরে রেওয়ায়েত মতে নফল এ'তেকাফকারীর জন্য রোযা শর্ত নয়। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে নফল এ'তেকাফকারীর জন্যও রোযা রাখা শর্ত। এ মতের উপরই ফতোয়া। (কাজীখান- ১ম খণ্ড-১০৪পৃষ্ঠা)

মাসয়ালা- যদি কেহ রোযা ব্যতীত একমাস এ'তেকাফ মান্নত করে, তাহার প্রতি রোযা ব্যতীত একমাস এ'তেকাফ ওয়াজিব হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মান্নত এ'তেকাফের জন্য রোযার অবস্থায় যদি এ'তেকাফ আদায় করে উহাতেই এ'তেকাফ আদায় হইবে। সুতরাং যদি কেহ রমজান মাসে এ'তেকাফ মান্নত করে, উহাতে এ'তেকাফ ছহীহ হইবে, পুনঃ ভিন্ন রোযা রাখিতে হইবে না। কিন্তু রমজান মাসে মান্নত আদায় না করিলে পরে রোযার সহিত উক্ত এ'তেকাফ আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালা- উক্ত রমজান মাসের মান্নত এ'তেকাফ যদি রমজানের পরে রোযাসহ পালন না করিয়া থাকে, এমনকি পরবর্তী রমজান আসিয়া পড়ে, তবে এই রমজানের রোযা দ্বারা এ'তেকাফ আদায় করিতে চাহিলে উহাতে এ'তেকাফ আদায় হইবে না। বরং ভিন্ন সময় রোযাসহ এ'তেকাফ আদায় করিতে হইবে। কেননা, রমজানের রোযার সহিত এ'তেকাফ আদায় না করার কারণে উক্ত এ'তেকাফ রোযা সহ তাহার প্রতি পৃথক ভাবে ওয়াজিব হইয়া যায়, তাহা কোনও উপলক্ষ্যে আদায় করিলে তাহাতে আদায় হয় না।

যেমন যদি কেহ রমজান মাস ব্যতীত অন্য মাসে এ'তেকাফ মান্নত করে, আর যদি উহা রমজান মাসে আদায় করে, ইহাতে এ'তেকাফ আদায় হইবে না। মান্নত এ'তেকাফসহ রমজানের রোযা না রাখিয়া থাকিলে পরে উহা কাজা করিবার সময় এ'তেকাফ আদায় করিলে উহাতে এ'তেকাফ আদায় হইবে।

মাসয়ালা- নফল রোযা রাখিয়া দিনের কিছু অংশ চলিয়া যাওয়ার পর এ'তেকাফ মান্নত করিলে উহাতে এ'তেকাফ আদায় হইবে না। কেননা, এ'তেকাফ নফল রোযা ব্যতীত জায়েয হয় না।

এ'তেকাফের ৪র্থ শর্ত

জ্ঞান সম্পন্ন (পাগল বা বেহুঁশ নহে) মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষের জানাবাত ও হায়েজ নেফাস হইতে পাক হওয়া। কিন্তু এ'তেকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত নহে। সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন বালকের এ'তেকাফ ছহীহ হইবে।

মাসয়ালা- স্ত্রীলোক স্বামীর এবং ক্রীতদাস মুনীবের অনুমতি লইয়া এ'তেকাফ করিবে। যদি স্বামী স্ত্রীকে এ'তেকাফের অনুমতি দান করিয়া ফেলে পরে উহা নিষেধ করিতে পারে না। মনীব যদি ক্রীতদাসকে অনুমতি দেওয়ার পরে এ'তেকাফ করিতে নিষেধ করে, তবে ক্রীতদাসের বেলায় এ'তেকাফ ছহীহ হইবে না। কিন্তু এরূপ নিষেধ করায় মুনীব গুনাহগার হইবে।

মাসয়ালা- স্ত্রী অথবা ক্রীতদাস-দাসী এ'তেকাফের মান্নত করিলে স্বামী অথবা মনীব উহা নিষেধ করিতে পারে। তবে স্ত্রী পরিত্যক্তা বা বিধবা এবং দাসদাসী আজাদ হইলে উহার কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- স্ত্রীকে যদি স্বামী এক মাসের এ'তেকাফ করিতে অনুমতি দেয় এবং স্ত্রী যদি না ভাঙ্গিয়া লাগাতর এ'তেকাফ করিতে ইচ্ছা করে সে ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া স্ত্রীকে এ'তেকাফ করিতে বলা স্বামীর ইচ্ছাধীন। কিন্তু স্ত্রীকে নির্দিষ্ট মাসের এ'তেকাফের এজাযত দেওয়ার পর স্ত্রী যদি লাগাতর এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এ'তেকাফ করিতে বলা স্বামীর পক্ষে জায়েয হইবে না।

(আলমগীরী)

এ'তেকাফের আদাব বা পালনের নীতি সমূহ

এ'তেকাফের অবস্থায় পুণ্যজনক কথাবার্তা ব্যতীত অন্য কোনও কথা বলিবে না, এবং রমজান মাসের শেষ দশ দিন এ'তেকাফের জন্য নির্দিষ্ট করিবে।

এ'তেকাফের জন্য উত্তম মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম অথবা জামে মসজিদ নির্দ্ধারণ করিবে। এ'তেকাফের অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিবে এবং হাদীস শরীফ ও ধর্ম বিষয় চর্চ্চা এবং হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী ও নেককার লোকগণের জীবনী এবং দ্বীনী বিষয় সমূহ লেখা-পড়া করিবে। যে কথায় গুনাহ হয়না, এরূপ কথা বলায় কোনও দোষ হইবে না।

এ'তেকাফের সৌন্দর্য

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সর্বতোভাবে নিজেকে ইবাদতে নিয়োজিত করাই এ'তেকাফের সৌন্দর্য্য। যে সকল পার্থিব কার্য মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য হইতে দূরে রাখে, এ'তেকাফ দ্বারা সেই ব্যবধান দূর হয়, যেন এ'তেকাফকারী সর্বক্ষণের জন্যই নামাযে লিপ্ত হয়, কেননা এ'তেকাফকারী ব্যক্তি হয়তো নামাযেই থাকেন, কিম্বা নামাযের জামায়াতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন "যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলিয়াছেন" তাহারা আল্লাহর নাফরমানী করেন না বরং আল্লাহ যাহা নির্দেশ করেন তাহাই করেন-"তাহাদের সঙ্গেই তুলনীয় হন, যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলিয়াছেন- "তাহারা দিবারাত্রি আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ্ পাঠ করিতে থাকেন, কখনও ক্লান্ত হন না। এ'তেকাফের আর একটি সৌন্দর্য এই যে, এ'তেকাফকারী রোযা রাখিয়া থাকেন। রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহর মেহ্-মান হইবেন।

এ'তেকাফ নষ্ট হইবার কারণ সমূহ

মাসয়ালা- এ'তেকাফকারী বিনা কারণে মসজিদ হইতে এক মুহূর্তের জন্যও বাহির হইবে না; যদি ইচ্ছায় কিংবা ভুলে বাহির হয়, তাহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু সঙ্গত ওজরে বাহির হইলে তাহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না।

মাসয়ালা- স্ত্রী লোকগণ নিজ গৃহের এ'তেকাফের নির্দিষ্ট স্থান হইতে বাহির হইবে না। ওজর বশতঃ যাইতে পারিবে।

এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদ হইতে বাহির হইবার সঙ্গত কারণ সমূহ

১। পায়খানা, প্রস্রাব এবং জুম্‌আ পড়িবার জন্য মসজিদের বাহিরে বাহির হইতে পারিবে। বাহিরে, 'হাজত' সমাধা করিয়া অজু করতঃ অবিলম্বে মসজিদে প্রবেশ করিবে। যদি বাহিরে কোথাও সামান্য সময়ও দেরী করে, তাহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে।

২। মসজিদের নিকটে পরিচিত লোকের বাড়ীতে পায়খানা প্রস্রাবের জন্য গেলে উহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না।

৩। নিজের একাধিক বাড়ী থাকিলে নিকটবর্তী বাড়ীতে 'হাজত সারিবে,' যদি দূরবর্তী বাড়ীতে যায়, তাহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে।

৪। 'হাজত' সারিবার জন্য ধীর স্থির ভাবে চলা-ফেরা জায়েয হইবে।

৫। পানাহার, শয়ন ও বিশ্রাম, ইহা মসজিদে হইতে পারে, সুতরাং ইহা মসজিদেই করিবে; এইজন্য বাহিরে থাকিবে না।

৬। এ'তেকাফের মসজিদ হইতে ভিন্ন মসজিদে গমন করিয়া জুম্‌আর নামায পড়িতে হইলে খুৎবা পাঠের পূর্বে সেখানে পৌছিয়া চারি রাকয়াত কাবলাল জুম্‌আর নামায পড়িতে পারে, এই পরিমাণ সময় থাকিতে মসজিদ হইতে বাহির হইবে এবং পরে চারি রাকয়াত বা ছয় রাকয়াত নামায পড়িয়াই এ'তেকাফের মসর্জিদে চলিয়া আসিবে। তবে উক্ত জুমআর মসজিদে যদি একদিন-রাত্রি এ'তেকাফ করে, কিংবা এ'তেকাফ পূর্ণ করে, তবে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না, কিন্তু মাকরূহ হইবে। কিন্তু যদি এ'তেকাফের মসজিদ ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিংবা এ'তেকাফকারীকে জোর পূর্বক বাহির করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য মসজিদে যাইয়া এ'তেকাফ করে তবে তাহার এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না। যদি জান-মালের ভয়ে এ'তেকাফের মসজিদ পরিত্যাগ করিতে হয়, তবু এই একই হুকুম হইবে।

৭। এ'তেকাফকারীকে পায়খানা প্রস্রাবের পথে পাওনাদার তাগাদা করিতে যাইয়া এ'তেকাফকারীকে আটকাইয়া বিলম্ব করাইল, ইহাতে ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর মতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে। কিন্তু ছাহেবাইনের মতে নষ্ট হইবে না। ইমাম ছুরুখছী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, ছাহেবাইনের মত মুসলমানদের জন্য অধিক সহজ।

মাসয়ালা- রোগী দেখিতে বাহির হইলে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে। এইরূপ মৃতের কাফন

কিংবা জানাযার নামাযের জন্য বাহির হইলে এমনকি এ'তেকাফকারী ছাড়া যদি জানাযার নামায পড়াইবার অন্য লোক না থাকে, তবুও এ'তেকাফ ছুটিয়া যাইবে।

যদি কেহ পানিতে ডুবিয়া যাইতে থাকে, কিংবা আগুনে পুড়িয়া যাইতে থাকে, এই অবস্থায় এ'তেকাফ ছাড়িয়া উক্ত লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বাহির হইলে এ'তেকাফ ছুটিয়া যাইবে।

জিহাদের জন্য দেশময় সর্বসাধারণকে ব্যাপক আহবানে বাহির হইতে হইলে কিংবা সাক্ষ্য দিতে বাহির হইলে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে। যদি রোগের কারণেও কিছু সময়ের জন্য হয়, তবেও এ'তেকাফ নষ্ট হইবে।

মাসয়ালা- এ'তেকাফের মান্নত করিবার সময় শর্ত করিল যে, রোগী দেখিতে, জানাযার নামাযে বা এলেমের মজলিসে যাইতে পারিবে, তবে যাওয়া জায়েয হইবে।

মাসয়ালা- এ'তেকাফকারী আযান দেওয়ার জন্য মিনারায় উঠিলে যদি মিনারায় প্রবেশদ্বার মসজিদের বাহিরে হয়, ইহাতে সকলের মতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না। উক্তাবস্থায়, এ'তেকাফকারী মোয়ায্যিন হউক বা না হউক সকলের এক হুকুম।

মাসয়ালা- মাথা ধোয়াইবার জন্য মসজিদের ভিতর হইতে কোন আপন জনের ঘরের দিকে মাথা বাহির করিয়া দিলে তাহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না। মসজিদ হইতে বাহির হওয়া সংক্রান্ত উপরোক্ত মাসয়ালাগুলি ওয়াজিব এ'তেকাফের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু নফল এ'তেকাফের বেলায় ওজরে বা বিনা ওজরে বাহির হইলে তাহাতে কোনও দোষ নাই, যেমন রোগী দেখিতে যাওয়া বা জানাযায় শরীক হওয়া।

এ'তেকাফের অবস্থায় সহবাস ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যসমূহ

মাসয়ালা- এ'তেকাফের সময় সহবাস করা হারাম। সহবাস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ যেমন-কোলাকোলী, চুম্বন, স্পর্শ ও যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য স্থানে সংগম করা ইত্যাদিও হারাম। ঐ সকল কাজ দিনে বা রাত্রে যে সময়ই করুক, হারাম হইবে।

মাসয়ালা- সহবাস দিনে হউক বা রাত্রে হউক, ইচ্ছায় হউক বা ভুলে হউক, এনজাল (বীর্যপাত) হউক বা না হউক, উহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সহবাসের সংশ্লিষ্ট কাজ সমূহ করিলে এনজাল হইলে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে। আর এনজাল না হইলে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না।

মাসয়ালা- কাহাকেও দেখিয়া বা সহবাসের চিন্তা করায় বা স্বপ্নদোষ হইলে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না।

মাসয়ালা- এ'তেকাফ অবস্থায় গোসল ফরজ হইলে যদি মসজিদ নষ্ট না করিয়া মসজিদে গোসল করা যায়, তবে মসজিদে বসিয়া গোসল করায় কোনও দোষ হইবে না। অন্যথায় বাহিরে গোসল করিয়া তাড়াতাড়ি মসজিদে প্রবেশ করিবে। মসজিদের মধ্যে অজু করিবারও ঐ হুকুম।

বে-হুঁশ ও উম্মাদের এ'তেকাফ

মাসয়ালা- বে-হুঁশী এবং উম্মাদ রোগ, দীর্ঘ স্থায়ী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উহাতে এ'তেকাফ ভঙ্গ হয় না।

মাসয়ালা- পরস্পর কয়েকদিন যাবত বে-হুঁশ বা উম্মাদ থাকিলে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে। ভাল হওয়ার পরে নূতন এ'তেকাফ দ্বারা 'কাজা' করা ওয়াজিব। এইরূপ কয়েক বৎসর উম্মাদ থাকিলেও হুঁশ হওয়ার পর ঐ এ'তেকাফ 'কাজা' করা ওয়াজিব।

মাসয়ালা- মাতুহ (যে ব্যক্তির জ্ঞান শক্তি কমিয়া গিয়াছে, কথাবার্তা এলোমেলো বলে, কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে অক্ষম, অথচ কাহাকেও গালাগালি করে না বা মারপিট করে না।) এই অবস্থায় এ'তেকাফ করা ছহীহ হইবে না।

এ'তেকাফের সময় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ

মাসয়ালা- এ'তেকাফের সময় নির্বাক থাকাকে ইবাদত মনে করিয়া নির্বাক থাকা মাকরূহ। তবে উহাকে ইবাদত মনে না করিয়া বরং গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার এক উপায় মনে করিয়া চুপ থাকিলে বিশেষ ছওয়াব হইবে।

মাসয়ালা- গালি দেওয়ায় বা মারপিট করায় এ'তেকাফ নষ্ট হয় না। উহার ছওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- এ'তেকাফ অবস্থায় ভুলক্রমে খানা খাইলে তাহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হয় না। কেননা এ'তেকাফ অবস্থায় দিনের বেলা খাওয়া রোযার জন্য নিষিদ্ধ, এ'তেকাফের জন্য নহে। মূল কথা এই যে, যে কাজ এ'তেকাফ অবস্থায় করা নিষিদ্ধ উহা দিনে রাত্রে ইচ্ছায় কিংবা ভুলে করুক না কেন, যেমন সহবাস করা কিংবা মসজিদ হইতে বাহির হওয়া ইত্যাদি ইহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে। (শামী, আলমগীরী)

মাসয়ালা- এ'তেকাফকারী যদি খাদ্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় কিংবা বিক্রয় করে,উহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হইবে না; কিন্তু যদি ব্যবসার নিয়ত করে তবে মাকরূহ হইবে।

মাসয়ালা- এ'তেকাফ অবস্থায় বিবাহ করা এবং তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে রেজয়াত (পুনঃ গ্রহণ) করা জায়েয হইবে।

মাসয়ালা- এ'তেকাফকারীর উত্তম পোশাক পরিধান, সুগন্ধি এবং তৈল ব্যবহার করা জায়েয হইবে।

মাসয়ালা- এ'তেকাফকারী রাত্রে নেশার দ্রব্য পানাহার করিলে উহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হয় না। কেননা, ইহা এ'তেকাফের জন্য নিষিদ্ধ নহে বরং শরীয়তে নিষিদ্ধ: সুতরাং এ'তেকাফ অবস্থায় কেহ উহা যেন না করে। যেমন চুরি করা দ্রব্য খাইলে উহাতে এ'তেকাফ নষ্ট হয় না। কিন্তু শরীয়তে উহা হারাম। এইরূপ কার্য

করিলে এ'তেকাফের ছওয়াব নষ্ট হইয়া যাইবে।

মাসয়ালা- ওয়াজিব এ'তেকাফ নষ্ট হইয়া গেলে উহার কাজা করা ওয়াজিব।

মাসয়ালা- কোন নির্দিষ্ট মাসের এ'তেকাফের নিয়ত করিয়া আদায় করিল। কিন্তু মধ্যে একদিন রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিল; ইহাতে ঐদিনের রোযা ও এ'তেকাফ কাজা করিবে।

মাসয়ালা- অনির্দিষ্ট কতক দিনের এ'তেকাফ মান্নত করিয়া উহা আদায়ের সময় বিনা ওজরে কিংবা ওজরে এ'তেকাফ ভাঙ্গিয়া ফেলিল বা ভঙ্গ হইয়া গেল, ইহার সকল অবস্থায়ই পুনঃ প্রথমাবধি এ'তেকাফ করিতে হইবে। এই মাসয়ালায় বিনা ওজরে এ'তেকাফ ভাঙ্গার উদাহরণ, মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া, সহবাস করা অথবা দিবাভাগে কিছু পানাহার করা। ওজরে এ'তেকাফ ভঙ্গ হইয়া যাওয়ার উদাহরণ, রোগের কারণে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া। এ'তেকাফ ভঙ্গ হইয়া যাওয়ার উদাহরণ হায়েজ হওয়া, পাগল হওয়া বা কয়েকদিনের জন্য বেহুঁশ হওয়া।

এ'তেকাফের সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা সমূহ

মাসয়ালা- এ'তেকাফ মান্নত করিতে মনে মনে বলার সঙ্গে মুখে মান্নতের কথা উচ্চারণ করিতে হইবে। শুধু মনে মনে নিয়ত করিলেই এ'তেকাফ ওয়াজিব হইবে না।

মাসয়ালা- যদি কেহ দ্বিবচন বা বহু বচন যোগে এরূপ মান্নত করে যে, আমি দুই দিন কিংবা বহুদিন এ'তেকাফ করিব। সেই সঙ্গে রাত্রিতেও এ'তেকাফ করিবে কি না, এরূপ কিছু না বলিয়া থাকে তাহাতে রাত্রিও ভুক্ত হইবে অর্থাৎ রাত্রিতেও এ'তেকাফ করিতে হইবে। এরূপ যদি কেহ মান্নত করে যে, আমি দুই কিংবা বহুরাত্রি এ'তেকাফ করিব, এবং দিবাভাগে এ'তেকাফ করিবে কি না তাহা কিছু নির্দিষ্ট করিয়া না বলে তাহাতে দিবাভাগ সমূহ শামিল হইয়া যাইবে এবং দিবাভাগেও এ'তেকাফ করিতে হইবে। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করিয়া শুধু দিনের বেলা সমূহের মান্নত করে, কিংবা শুধু রাত্রি বেলা সমূহের এ'তেকাফ মান্নত করে তাহার মান্নত শুদ্ধ হইবে। এই অবস্থায় দিনের বেলার নিয়তে শুধু দিনের বেলার এ'তেকাফ বর্তিবে এবং রাত্রি বেলার নিয়তে কিছুই বর্তিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- যদি কেবল এক দিবাভাগের এ'তেকাফের মান্নত করে, উহাতে রাত্রির ভাগ শামিল হইবে না।

মাসয়ালা- রাত্রিভাগ বাদ দিয়া কেবল মাত্র দিবাভাগ সমূহের এ'তেকাফ মান্নত করিলে উহা একাদিক্রমে আদায় না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিনে আদায় করাও জায়েয হইবে। কিন্তু দিবারাত্র সমূহ উভয়কে শামিল করিয়া যে মান্নত করা হয়, উহা ধারাবাহিকরূপে আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালা- যদি নির্দিষ্ট কোনও মাসের বা অনির্দিষ্ট কোনও মাসের ত্রিশ দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে তবে ক্রমাগত আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালা- এ'তেকাফের মান্নতে মাস নির্ধারণ না করিলে যে কোন মাসে আদায় করিলেই চলিবে।

মাসয়ালা- দিবা রাত্রের অর্থাৎ পূর্ণ দিনের এ'তেকাফ মান্নত করিলে রাত্রির প্রারম্ভ হইতেই এ'তেকাফ শুরু করিবে। কেননা, গোটা রাত্রি পরবর্তী দিবসের অন্তর্গত।

মাসয়ালা- যদি কেহ দুইদিনের এ'তেকাফ মান্নত করে, তবে সে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করিবে। সেই রাত্রি, পরবর্তী দিন তৎপরবর্তী রাত্রি এবং দিন মসজিদে অবস্থান করতঃ সূর্যাস্তের পর মসজিদ হইতে বাহির হইবে। বহুদিনের এ'তেকাফের নিয়তেও এইরূপ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিবে।

মাসয়ালা- ঈদের দিনে এ'তেকাফ মান্নত করিয়া থাকিলে অন্য দিনে কাজা করিবে। কেননা, ঈদের দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

মাসয়ালা- কসমের কাফ্ফারার রোযার সঙ্গে মান্নত এ'তেকাফ আদায় করিলে এ'তেকাফ আদায় হইবে। কিন্তু গুনাহ হইবে।

মাসয়ালা- ওয়াজিব ব্যতীত অন্য এ'তেকাফের সময় মসজিদ হইতে বাহির হইলে এ'তেকাফের কাজা করিতে হইবে না।

মাসয়ালা- কোন নির্দিষ্ট দিন বা মাসের এ'তেকাফের মান্নত করিয়া উহার পূর্বে আদায় করিলে কিংবা কাবা শরীফে এ'তেকাফ করিবার মান্নত করিয়া অন্য কোনও মসজিদে আদায় করিলে জায়েয হইবে।

মাসয়ালা- বিগত কোনও মাসের বা দিনের এ'তেকাফের মান্নত করিলে উহা শুদ্ধ হইবে না।

মাসয়ালা- কেহ এ'তেকাফ মান্নত করিবার পর মোরতাদ হইয়া গেল, পুনঃ মুসলমান হইল; অত্রাবস্থায় তাহার উক্ত এ'তেকাফ পুনঃ বর্তিবে না।

মাসয়ালা- কেহ এ'তেকাফ মান্নত করিয়া উহা আদায়ের পূর্বে মরিয়া গেল। যদি সে অসিয়ত করিয়া গিয়া থাকে, তবে প্রতিদিনের এ'তেকাফের বদলে অর্দ্ধছা গম কিংবা একছা' যব বা খুরমা ফেদিয়া দিবে। এরূপ অবস্থায় মান্নতকারীর উপর অসিয়ত করা ওয়াজিব। আর যদি অসিয়ত না করিয়া মরিয়া যায়, তবে ওয়ারিসগণের সম্মতিক্রমে ফেদিয়া আদায় করা জায়েয হইবে।

মাসয়ালা- পীড়িত অবস্থায় এ'তেকাফের মান্নত করার পর আরোগ্য না হইয়া মরিয়া গেলে তাহার প্রতি কিছুই বর্তিবে না। কিন্তু একদিনের জন্যও আরোগ্য হইয়া পরে মারা গেলে তাহার পক্ষ হইতে প্রতিদিনের এ'তেকাফের ফেদিয়া আদায় করিতে হইবে। (আলমগীরী)

ছদকাতুল ফিতর

মাসয়ালা- যে ব্যক্তি এইরূপ মালদার যে, তাহার প্রতি যাকাত আদায় করা ফরজ এইরূপ ব্যক্তি কিংবা যাহার নিকট সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই পরিমাণ জিনিষ পত্র রহিয়াছে; যাহার মূল্য হিসাব করিলে যাকাতের নেছাবের পরিমাণ হয়, এরূপ ব্যক্তির প্রতি ঈদের দিনে ছদকায়ে ফিতর দান করা ওয়াজিব। উক্ত মাল পত্র তেজারতের কিংবা সারা বৎসর ধরিয়া থাকা শর্ত নহে।

মাসয়ালা- কাহারও বাস করিবার জন্য দামী ঘর, ব্যবহারের দামী কাপড় এবং ২/৪ জন খেদমতগার এবং নিত্য ব্যবহার্য অনেক টাকার আসবাবপত্র রহিয়াছে। কিন্তু সোনা-রূপার গহণাপত্র নাই, কিংবা প্রয়োজনের বাহিরে কিছু আসবাবপত্র বা গহণা আছে। কিন্তু উহাতে যাকাতের নেছাবের পরিমাণ হয় না, এইরূপ ব্যক্তির প্রতি ফিতর ওয়াজিব নহে।

মাসয়ালা- কাহারও দুইখানা গৃহ আছে; একখানায় বাস করে এবং একখানা খালী পড়িয়া থাকে, কিংবা ভাড়ায় খাটান হয়, এই গৃহের মূল্য নেছাব পরিমাণ হইলে তাহার ফিতর ওয়াজিব হইবে। কিন্তু এই ঘরের ভাড়া জীবিকার জন্য প্রয়োজন হইলে ফিতরা ওয়াজিব হইবে না।

মাসয়ালা- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের পরিমাণ মাল থাকিলে তাহার উপর ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হইবে না।

মাসয়ালা- ঈদের দিন ফজরের সময় ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুতরাং যে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহার প্রতি ছদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হইবে না এবং তাহার মাল হইতেও ফিতরা দেওয়া যাইবে না।

মাসয়ালা- ঈদের নামাযের জন্য ময়দানে রওয়ানা হইবার পূর্বেই ফিতরা আদায় করা উত্তম, যদি তাহা না করে, তবে নামাযের পরে কিংবা তৎপরে যে কোন সময় দিতে হইবে।

মাসয়ালা- ঈদের দিনের পূর্বে রমজানের মধ্যে ফিতরা আদায় করিলে পরে পুনঃ দিতে হইবে না।

মাসয়ালা- স্ত্রীলোকের প্রতি কেবল নিজের পক্ষ হইতে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু পুরুষের তাহার নিজের এবং তাহার নাবালেগ সন্তানের পক্ষ হইতে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব হইবে।

মাসয়ালা- শিশুর নিজস্ব নেছাব পরিমিত মাল থাকিলে তাহার নিজ মাল হইতেই ফিতরা আদায় করিবে। কিন্তু যে শিশু ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পরে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার প্রতি ফিতরা ওয়াজিব হইবে না।

মাসয়ালা- যে ব্যক্তি কোনও কারণে রমজানের রোযা রাখিতে পারে নাই। এবং যে ব্যক্তি রমজানের রোযা রাখিয়াছে, নেছাব বর্তিলে উভয়ের প্রতিই ফিতরা ওয়াজিব হইবে। তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য হইবে না।

মাসয়ালা- গম এবং গমের আটা অর্দ্ধ-ছা পরিমাণ এবং যব কিংবা যবের আটা কিংবা খোরমা দ্বারা ফিতরা আদায় করিলে একছা' পরিমাণ দিতে হইবে।

মাসয়ালা- কিস্‌মিস (অথবা মোনাক্কা) দ্বারা ফিতরা আদায় করিলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর এক কওল মতে অর্দ্ধ-ছা' দিতে হইবে, কিন্তু ইমাম ছাহেবের অন্য এক কওল এবং ছাহেবাইনের মতে কিসমিস একছা' পরিমাণ দিতে হইবে।

দুররুল মোখতার কিতাবে শরাম্বালালিয়া হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শেষোক্ত কওলের উপরই ফতোয়া। দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- তরীকুল ইসলাম ১ম অধ্যায় গোসলের মুস্তাহাবের বয়ানে একছা'র পরিমাণ আলমগীরী ও গায়াতুল আওতার কিতাব হইতে লিখিত আছে, অথাৎ একছা' ২৭০ তোলার সমান। ৮০ তোলায় সের হিসাবে ২৭০ ভাগ ৮০ = ৩ সের ছয় ছটাক; ইহার অর্ধেক ১ সের ১১ ছটাক।

বিবিধ মাসয়ালা

মাসয়ালা- দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণের পর রোযা ফরজ হওয়ার হুকুম রমজান মাস গত হওয়ার পরে জ্ঞাত হইলে বিগত রোযার কাজা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু যদি রমজান মাসের মধ্যে রোযা ফরজ হওয়ার মাসয়ালা জ্ঞাত হয়, তবে পাগলের প্রতি যে হুকুম হয় উহাই বর্তিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কোন ব্যক্তি দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণের পরে যতগুলি রমজান মাস অতীত হইয়াছে উহার কাজা করিতে হইবে; চাই সে রোযা ফরজ হওয়ার হুকুম জ্ঞাত হউক কি নাই হউক।

মাসয়ালা- কোন ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং ঐ পর্যন্ত সে কিছু পানাহার করে নাই, অত্রাবস্থায় সে যদি নফল রোযা রাখে তবে ঐ রোযা হইবে না। কারণ দিনের প্রথম ভাগে কাফের থাকার কারণে তাহার রোযা রাখার উপযুক্ততা ছিলনা। কিন্তু কোনও মুসলমান বালক দ্বিপ্রহরের পূর্বে বালেগ হইলে সে পর্যন্ত যদি সে পানাহার না করিয়া থাকে তবে নফল রোযার নিয়ত করিলে ছহীহ কওল মতে রোযা জায়েয হইবে।

ইমাম রাজী বলিয়াছেন, বালক-বালিকা রোযা রাখিতে সমর্থ হইলে তাহাদিগকে রোযা রাখার হুকুম করিবে। কিন্তু যদি রোযা রাখিলে অধিক দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাহাদিগকে হুকুম করিবে না। হুকুম করার পরেও যদি বালক বালিকা রোযা না রাখে তবে তাহাদের প্রতি কাজা ওয়াজিব হইবে না। দশ বৎসর বয়সে বালক- বালিকা রোযা না রাখিলে তাহাদিগকে প্রহার করা হইবে কিনা, এই কথার উত্তরে আবূ হাফ্স বলেন, ইহাতে মতভেদ আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, রোযার জন্যও নামাযের ন্যায় তাম্বীহ করিতে হইবে।

মাসয়ালা- রমজানের রোযায় কোন ব্যক্তির ভোর বেলায় এরূপ ওজর ছিল যে কারণে তাহার প্রতি রোযা ওয়াজিব ছিল না, কিংবা রোযা ভঙ্গ করা ওয়াজিব ছিল। পরে ঐ সকল ওজর দূর হইয়া এরূপ হইল যে, ঐ অবস্থা যদি তাহার ভোরবেলা থাকিত তবে তাহার প্রতি রোযা ওয়াজিব হইত। যেমন দিনের কোনও সময় বালক বালেগ হইল, কিংবা কাফের মুসলমান হইল অথবা পাগল চেতনা প্রাপ্ত হইল বা ঋতুবতী পাক হইল কিংবা মুসাফির মুকীম হইল এবং তাহারা ঐ অবস্থায় রোযা রাখিতে অসমর্থ হইলে দিনের অবশিষ্ট সময় রোযা ভঙ্গের সকল কার্য হইতে বিরত থাকিবে। এইরূপ দিনের প্রথম ভাগে যাহার উপর রোযা ফরজ ছিল, অর্থাৎ রোযা ফরজ হওয়ার কারণ এবং উপযুক্ততা উভয়ই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সে রোযা রাখিতে পারে নাই, যেমন ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা সন্দেহের দিবসে ভোরে কিছু খাইয়া

ফেলিয়াছে, পরে প্রকাশ পাইল যে, সেদিন রমজানই ছিল, কিংবা সাহরী খাইবার সময় ধারণা হইল যে, রাত্রি অবশিষ্ট আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাত্রি ছিল না, এই সকল অবস্থায় রোযাদারগণের অনুকরণের জন্য রোযাদারগণের প্রতি যে সকল কার্য নিষিদ্ধ উহা হইতে বিরত থাকা ওয়াজিব।

মাসয়ালা- সূর্য অস্ত গিয়াছে মনে করিয়া কেহ খাইল, পরে দেখা গেল যে, সূর্য অস্ত যায় নাই। এইরূপ ত্রুটি বশতঃ কিংবা কাহারও জবরদস্তীর কারণে যদি রোযা ভঙ্গ করিয়া ফেলে তাহার প্রতিও ঐ হুকুম। অর্থাৎ রোযাদারগণের ন্যায় সকল নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিবে। কিন্তু হায়েজ, নেফাস, রোগ ও প্রবাস অবস্থায় রোযাদারগণের অনুকরণে পানাহার ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা ওয়াজিব নহে। ইহা খোলাছা কিতাবে আছে। ঋতুবতী স্ত্রীলোক গোপনে কি প্রকাশ্যে খাইবে, সে বিষয় উভয় মতই পাওয়া যায়। কিন্তু মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তির প্রকাশ্যে খাওয়া সকলের মতে জায়েয। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- নফল রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহার কাজা করিতে হইবে। চাই নিজে ইচ্ছা করিয়া কিংবা অনিচ্ছায় ভাঙ্গা হউক যেমন নফল রোযা শুরু করার পর যদি কোনও স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব আসিয়া পড়ে, তবে ছহীহ রেওয়ায়েত মতে ঐ রোযার কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- রোযা মান্নত ছিল বলিয়া সন্দেহবশতঃ রোযা রাখিয়া পরে বিশ্বাস হইল যে, তাহার কোন রোযা মান্নত ছিল না। সুতরাং সে ইচ্ছা পূর্বক রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এই অবস্থায় সকলের মতে উক্ত রোযা কাজা করিতে হইবে না, তবে ঐ রোযাটি রাখিয়া ফেলা আফজল।
(আলমগীরী)

মাসয়ালা- ছোবহে ছাদেকের পরে কাজা রোযার নিয়ত করিলে উহাতে কাজা শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু উহাতে নফল শুদ্ধ হইবে কিনা; এই কথার জওয়াবে ইমাম নছফী বলেন যে, নফল শুদ্ধ হইবে। এই রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- সারা রমজানে রোযা রাখার কিংবা ইফতারের কোন নিয়ত না করিলে তাহার সমুদয় রোযাই কাজা করিতে হইবে।

মাসয়ালা- রমজানের রোযা ব্যতীত অন্য যে কোন রোযা ভাঙ্গিলে তাহার জন্য কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

মাসয়ালা- রমজানের রোযা ও জেহারের কাফ্ফারা একই। যথা- একটি মুসলমান অথবা কাজের গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করিয়া দেওয়া, যদি ইহাতে অক্ষম হয়, তবে মধ্যে না ভাঙ্গিয়া ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখিবে, ইহাতেও অসমর্থ হইলে ৬০ জন মিসকীনকে পেট ভরিয়া দুই বেলা খাওয়াইবে, (বাহরে শরীয়ত) কিংবা একছা' পরিমাণ খুরমা অথবা যব বা অর্দ্ধ ছা' পরিমাণ গম বা ময়দা দিতে হইবে।

মাসয়ালা- কাফ্ফারা আদায় করিবার সময় আদায়কারীর নিজ অবস্থা অনুসারে আদায় করিবে। ধনী ব্যক্তির কাফ্ফারা হইলে আদায়ের সময় যদি সে গরীব হয়, তবে গোলাম আজাদ করিবার স্থলে রোযা রাখিলে কাফ্ফারা আদায় হইবে।

মাসয়ালা- যদি বিভিন্ন রমজানে দিনের বেলায় কয়েকবার সহবাস করিয়া থাকে এবং প্রথমটার জন্য কাফ্ফারা না দিয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক রোযার জন্য ভিন্ন ভিন্ন

কাফ্ফারা দিতে হইবে। আর যদি প্রত্যেক রোযার জন্য প্রথম বারের কাফ্ফারা দিয়া থাকে, তবে পরবর্তী বারের জন্য পুনঃ কাফ্ফারা দিতে হইবে।

মাসয়ালা- একই রমজানে বিভিন্ন দিনে দিনের বেলায় সহবাস করিলে যদি প্রথম বারের কাফ্ফারা আদায় না করিয়া থাকে, তবে একবারের কাফ্ফারাই যথেষ্ট হইবে।

ফরজ রোযার শ্রেণী বিভাগ

মাসয়ালা- রমজান মাস ও অন্যান্য কারণে যে সকল রোযা ফরজ হয়, উহা তের প্রকার।

তন্মধ্যে সাত প্রকার রোযা মধ্যে না ভাঙ্গিয়া একাদিক্রমে রাখিতে হয়।

যথাঃ- ১। রমজানের রোযা, ২। খুনের কাফ্ফারার রোযা, ৩। জেহারের কাফ্ফারার রোযা, ৪। কসমের কাফ্ফারার রোযা, ৫। রমজানের কাফ্ফারার রোযা, ৬। নির্দ্ধারিত মান্নত রোযা, ৭। নির্দ্ধারিত কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার রোযা। এতদ্ব্যতীত আর ছয় প্রকার রোযা যাহা পরস্পর রাখা শর্ত নহে।

যথা- ১। রমজানের কাজা, ২। হজ্জের সময় তামাত্তো'র রোযা, ৩। এহরাম অবস্থায় কেশ মুণ্ডন করিলে উহার কাফ্ফারার রোযা, ৪। এহরামের অবস্থায় পশুপাখি শিকার করিলে উহার কাফ্ফারা। ৫। অনির্দিষ্ট মান্নত রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা, ৬। যদি এইরূপ মান্নত করে যে, কোন এক মাস রোযা রাখিব, এই সকল অবস্থায় পরস্পর রোযা রাখা শর্ত নহে।

আলমগীরী কিতাবে লিখিত আছে যে, রমজানের কাজা রোযা যদিও পরস্পর রাখা শর্ত নহে, তথাপি ফরজ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য উহা যথাসম্ভব শীঘ্র আদায় করার চেষ্টা করা উচিত।

লাইলাতুল কদর

কদরের রাত্রি তালাশ করা মুস্তাহাব। উহা বছরের শ্রেষ্ঠ রাত্রি। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলিয়াছেন, উহা রমজান মাসের কোন এক অনির্দিষ্ট রাত্রিতে নিহিত রহিয়াছে। উহা কোনও বৎসর অগ্রে এবং কোন ও বৎসর পরে আসিয়া থাকে। ছাহেবাইনের মতে উহা নির্দিষ্ট রাত্রিতেই আসিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(যাকাতের মাসয়ালা)

যাকাতের ফজীলত

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

الٓمّٓ - ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ -

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ *

অর্থাৎ সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহা মুত্তাকীগণের পথ প্রদর্শক যাহারা গায়েবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায কায়েম করে ও আমি যে ধন সম্পদ দিয়াছি তাহা হইতে যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ পাক আরও বলেন-

قَدْاَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ——وَالَّذِيْنَ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ-

অর্থাৎ- যে সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণ ------- এবং যাহারা যাকাত আদায় করে তাহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। অন্য আয়াতে আছে-

وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَخَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ-

অর্থাৎ এবং তোমরা যে যাকাত দিবে আল্লাহ উহার বদলে আরও অধিক দান করিবেন এবং তিনিই উত্তম জীবিকা দাতা। আর এক আয়াতে আছে-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُحَبَّةٍ-وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ

يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ

اللّٰهِ ثُمَّ لَايُتْبِعُوْنَ مَاۤاَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا اَذًى- لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ

خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى- وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ-

অর্থাৎ যাহারা তাহাদের অর্থ সম্পদের যাকাত আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাহাদের দানের উদাহরণ যেমন একটি দানা সাতটি শীষ উৎপাদন করিল। উহার প্রত্যেকটি শীষে একশতটি করিয়া শস্য হইল (অর্থাৎ শত শত গুণ ছওয়াব)। আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন এইরূপ বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেন। আল্লাহ প্রসারতা দানকারী ও সর্বজ্ঞাতা। যাহারা আল্লাহর রাস্তায় তাহাদের ধন সম্পদ (যাকাত) দান করিয়া উহা বলিয়া বেড়ায় না বা মনে কষ্ট দেয় না আল্লাহর নিকটে তাহাদের পুরস্কার রহিয়াছে। তাহাদের কিয়ামতে কোন ভয় নাই, তাহারা চিন্তিত হইবে না। দানের পর মনোপীড়া দেয়ার চেয়ে মধুর বাক্যালাপ ও ক্ষমা অনেক ভাল। আল্লাহ ঐশ্বর্য্যশালী ও ভদ্র। (বাকারা-২৬৩) অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ- وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ- وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا- وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا- وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমদিকে মুখ করিলেই নেককার হও না বরং তাহারাই নেককার যাহারা আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদের অর্থ তাহারই মহব্বতে আত্মীয়গণ, এতীমগণ, মিসকীনগণ ও ভিক্ষুকগণকে এবং গ্রীবামুক্ত করিতে দান করিয়াছে। নামায কায়েম করিয়াছে ও যাকাত দান করিয়াছে এবং ওয়াদা করিয়া যাহারা উহা পূর্ণ করিয়াছে। কষ্ট মুছীবতের সময় ও যুদ্ধের সময় যাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই মুত্তাকী। **(বাকারা।১৭৬)** আর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ- سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

(سورة ال عمران)

অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া ঐশ্বর্য্য লইয়া যাহারা কৃপণতা করে তাহারা যেন উহা তাহাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে বরং উহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকর। যে ধন-সম্পদ নিয়ে কৃপনতা করে কিয়ামতের দিন তাদের ঐ ধন-সম্পদ নিজ গলদেশে বেড়ী করিয়া দেওয়া হইবে। (আল ইমরান-১৭৯) অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى

بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَامَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ

فَذُوْقُوْامَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-(سورة توبة)

অর্থাৎ যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় উহার যাকাত দেয় না, আপনি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দিন। কিয়ামতে উহা দোযখের অগ্নিতে তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পাঁজর ও পৃষ্ঠদেশে দাগ লাগানো হইবে। "ইহাই তোমাদের নিজেদের জন্য জমা করা ধন। এখন সেই কার্পণ্য সঞ্চিত ধনের স্বাদ উপভোগ কর।" (সূরা তাওবা-৩৩) হাদীস শরীফে আছে-

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ

زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ

يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ

وَكَنْزُكَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

অর্থাৎ হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ধন দিয়েছেন সে যদি উহার যাকাত আদায় না করে তবে কিয়ামতে তাহার ধনকে নেড়ে সাপে পরিণত করা হইবে। উহার দুই চক্ষুর উপরিভাগে দুইটি হলদে দাগ থাকিবে। ঐ সাপ কিয়ামতে উহার মালিকের গলদেশ জড়াইয়া ধরিবে ও দুই চোয়াল ধরিয়া বলিবে আমিই তোমার ধন সম্পদ ও গোলা গঞ্জিনা। (বুখারী)

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন-

مَا تَلِفَ مَالٌ فِىْ بَرٍّ وَّلَا بَحْرٍ اِلَّا بِحَبْسِ الزَّكٰوةِ- رَوَاهُ

الطَّبْرَانِى-

অর্থাৎ জলভাগে ও স্থলভাগে মানুষের যে ধন-দৌলত বিনষ্ট হয় তাহা শুধু যাকাত বন্ধ করার কারণেই হইয়া থাকে। (তিবরানী)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন-

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكٰوةَ اِلَّا حَبَسَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ- رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ-

অর্থাৎ- মানব জাতির যে দলই যাকাত আদায় হইতে বিরত রহিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাক বৃষ্টিপাত বন্ধ করিয়াছেন। (তিবরানী)

যাকাত শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য

যাকাত শব্দটি আরবী (تزكية) তাযকিয়া হইতে গৃহীত। অর্থ- পবিত্র করা এবং বৃদ্ধি করা। মালের মহব্বতে মানব অন্তরে কৃপণতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই অপবিত্র কৃপণতা হইতে মানুষকে পবিত্র করা এবং মালের ভিতর বরকত এবং উহার উন্নতি সাধনের জন্যই আল্লাহ পাক যাকাত ফরজ করিয়াছেন।

যাকাত আদায় করিলে মালের হিফাজত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উহাতে মাল কমে না বরং বাড়িয়া যায় এবং আখেরাতে উহার প্রতিফল যাহা পাওয়া যাইবে তাহাতো আছেই। হিজরী দ্বিতীয় সনে যাকাত ফরজ হয়। যাকাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- (سورة توبة)

অর্থাৎ- তাহাদের মাল হইতে যাকাত আদায় করুন, যাহার দ্বারা তাহাদিগকে আপনি পাক ছাফ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের জন্য দোয়া করুন'। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাহাদের জন্য শান্তির বস্তু। এবং আল্লাহ তায়ালা মহা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

যাকাত আদায় করিলে মাল নিরাপদ থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। কেননা যখন কোন দরিদ্র বিপন্ন ব্যক্তি যাকাতের মাল পাইয়া স্বীয় প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে সক্ষম হয় তখন তার প্রাণখোলা দোয়া মালদারের জন্য ওয়াকফ হয় এবং তাহার মালের স্থায়িত্বের কামনা করে।

একদা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! লোকের ভিতর আপনি কাহাকে বেশী ভালবাসেন? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন- -اَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ- যিনি লোকদের বেশী উপকার করেন। তৎপর জিজ্ঞাসা করা হইল, উৎকৃষ্ট আমল কি? এরশাদ করিলেন- - اِدْخَالُ السُّرُوْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ

"মুমিনকে খুশী করা" তাহার ক্ষুধা নিবারণ করা, তাহার মুছীবত দূর করা। তাহাকে করজের বোঝা হইতে নিস্কৃতি দেওয়া।

প্রকৃতপক্ষে যাকাত দরিদ্র অভাবগ্রস্ত এতীমগণের হক। এই হক তাহাদিগকেই দেওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন-

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

অর্থাৎ- অভাবগ্রস্ত মিসকীনগণ এবং যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং যাহাদের মন জয় করা দরকার, দাস সমূহের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে এবং করজ হইতে মুক্ত করিতে এবং আল্লাহর রাস্তায় মুসাফিরের জন্যই যাকাত। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে ধার্য্যকৃত। আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়। (সূরা তওবা-৫৯)

ইসলাম যে শক্তিশালী ভিত্তি সমূহের উপর স্থাপন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে মালের যাকাত আদায় করা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় নামাযের সঙ্গে সঙ্গে যাকাতের কথাও উল্লেখ আছে। বার বার ইহার কথা যত বর্ণনা করা হইয়াছে রোযা ও হজ্জের কথা ততবার উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নামাযের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত আদায় দ্বারা জাতীয় জীবনের প্রফুল্লতার সৃষ্টি হয়। ইহা দ্বারা মুসলমান দরিদ্রগণের জীবনের বিপদ সঙ্কুল মনজিলগুলির অতিক্রম সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। যদি নামায ব্যক্তিগত জীবনের সংশোধনের বস্তু হইয়া থাকে, তবে যাকাত জাতীয় এবং দলগত জীবনের বিরাট পরিবর্তনের সৃষ্টি করিয়া দেয়। ধনীদের সঙ্গে সঙ্গে অভাব অনটনে জর্জরিত বিরাট একটি দলের অভাব মোচন করতঃ তাহাদিগকে নিশ্চিত জীবন যাপনের একমাত্র সহায়ক হইতেছে যাকাত। আল্লাহর ইচ্ছা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অভাব দূর করতঃ জগতে একটা শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই জন্যই যাকাতের মাছরাফ বা ব্যয় করার স্থানও বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

আল্লামা আবদুর রউফ দানাপুরী তদীয় اصح السير কিতাবে লিখিয়াছেন, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করেন নাই যে তাহার অতি ঘনিষ্ট ফেরেশ্তা অথবা আসমানী কিতাব প্রাপ্ত নবী স্বীয় রায় দ্বারা যাকাতের মালের বন্টন করুক। বরং আল্লাহ তায়ালা নিজেই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন কোথায় কোথায় যাকাতের মাল ব্যয় করিতে হইবে। ইমাম রাজী (রহঃ) বলিতেছেন যে, এইসব তাকীদের উদ্দেশ্য এই যে যাকাতের মাল উক্ত আট দলের বাহিরে খরচ করা হারাম। আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের পূর্ণ অনুসরণ করার তওফীক দান করুন।

যাকাত কাহাকে বলে

মাসয়ালা- শরীয়ত কর্তৃক নির্দ্ধারিত পরিমাণ মাল মুসলমান ফকীরকে আল্লাহর ওয়াস্তে পুরাপুরি মালিক করিয়া দেওয়াকে যাকাত বলে।

উক্ত দরিদ্র হাশেমী অথবা কোন হাশেমী কর্তৃক মুক্তদাস হইতে পারিবে না।

(দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- যাকাত ফরজ, উহা যে এনকার করিবে সে কাফের হইবে। যে উহা আদায় করে না সে ফাসেক এবং কতল হওয়ার যোগ্য। যে ব্যক্তি যাকাত আদায়ে বিলম্ব করে সে গুনাহগার। তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- দরিদ্রকে যাকাতের মালিক করিয়া দিতে হইবে তাহার জন্য মোবাহ করিয়া দিলে চলিবে না। মোবাহ-যেমন যাকাতের নিয়তে ফকীরকে খানা খাওয়াইয়া দিল; কেননা ইহা দ্বারা ফকীরকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তাহাকে খানার মালিক করিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে যদি খাদ্য তাহাকে দিয়া দেয় সে খাউক বা নিয়া খাউক অথবা অন্য কাহাকেও দান করুক মোটের উপর সম্পূর্ণ মালিকানা যদি তাহার উপর অর্পণ করে, তবে যাকাত আদায় হইবে। অনুরূপ যাকাতের নিয়তে কোন ফকীরকে কাপড় দিয়া দিলে বা কাপড় পরাইয়া দিলে যাকাত আদায় হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- যাকাতের মাল হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করিতে হইবে। কেহ যদি যাকাতের নিয়তে কোন ফকীরকে একটি ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেয় তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না। কেননা সে ফকীরকে কোন মাল দেয় নাই বরং মালের লভ্যাংশ দিয়াছে।

মাসয়ালা- মালিক করিয়া দেওয়ার জন্য ইহাও দরকার যে, এমন ব্যক্তিকে দিবে যে গ্রহণ করিতে জানে। অর্থাৎ এমন না হয় যে, তাহাকে দিলে সে উহা ফেলিয়া দিবে অথবা ধোকায় পড়িয়া যাইবে। যেমন একেবারে শিশু অথবা পাগল, এহেন লোককে দিলে যাকাত আদায় হইবে না। তবে এহেন লোকের পিতা যদি হয় অথবা তাহার 'অছী' অথবা সে যাহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে সে উহার পক্ষ হইতে গ্রহণ করে তবে আদায় হইবে।(দুররুল-মোখতার)

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত

প্রথম শর্ত মুসলমান হওয়া

কাফেরের উপর যাকাত ফরজ নহে অর্থাৎ কোন মালদার কাফের যদি মুসলমান হয় তাহাকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বের বৎসর সমূহের যাকাত আদায় করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে না। কোন কাফের যদি দারুল-হরবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কতিপয় বৎসর সেখানে থাকার পর দারুল ইসলামে চলিয়া আসে এমন ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে মালদার মুসলমানের উপর যাকাত ফরজ তাহা হইলে উক্ত বৎসরগুলির যাকাত আদায় করিতে হইবে, অন্যথায় নহে। দারুল ইসলামে মুসলমান হইয়া যাকাত না দিয়া থাকিলে উক্ত যাকাত তাহার আদায় করিতেই হইবে, যদিও সে বলে যে, যাকাত ফরজ সম্বন্ধে আমার জানা ছিল না। কেননা দারুল ইসলামে অজ্ঞতা ওজর নহে। (আলমগীরী)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত বালেগ এবং জ্ঞানবান হওয়া

নাবালেগের উপর যাকাত ফরজ নহে। পূর্ণ বৎসর পাগল থাকিলে সেই বৎসরের যাকাত ফরজ নহে। বৎসরের প্রথম ও শেষে সুস্থ হওয়ার দিন হইতে মধ্য বৎসরে পাগল, এহেন ব্যক্তির উপরও যাকাত ফরজ। নাবালেগ অবস্থা হইতেই পাগল ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার দিন হইতে বৎসর আরম্ভ হইবে। অনুরূপ যদি নূতনভাবে পাগল হইয়া পুরা বৎসর থাকে তাহার হুঁশ হওয়ার পর হইতে বৎসর আরম্ভ হইবে।

কোন কারণবশতঃ বেহুঁশ হইয়া থাকিলে তাহার উপর যাকাত ফরজ, যদিও বেহুঁশ পুরা এক বৎসর পর্যন্ত থাকে।

৪র্থ শর্ত আযাদ হওয়া

গোলামের উপর যাকাত ফরজ নহে। যদিও তাহাকে তাহার মালিক ব্যবসা করার এজাযত দিয়া থাকে। যে গোলামের মালিক একাধিক-কোন মালিক তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়াছে। বাকী মালিকগণের মূল্য পরিশোধ করার জন্য তাহাকে উপার্জন করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর যে কোন রকমের গোলামের উপর যাকাত ফরজ নহে।

৫ম শর্ত

নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া চাই, নেছাবের কম মাল থাকিলে যাকাত ফরজ হইবে না।

৬ষ্ঠ শর্ত পূর্ণ মালিক হওয়া

মাল হাতে থাকা চাই। মাল হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ মালিক হয় না।

মাসয়ালা- যে মাল হারাইয়া গিয়াছে অথবা নদীতে পড়িয়া গিয়াছে অথবা কেহ লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গিয়াছে এবং তাহার নিকট ইহার সাক্ষী নাই, অথবা ময়দান-জঙ্গলে পুঁতিয়া রাখিয়াছে কিন্তু এখন উহার স্থান স্মরণ নাই, অপরিচিত লোকের নিকট আমানত রাখিয়াছে, এখন স্মরণ নাই সে কোন্ ব্যক্তি, অথবা ঋণ দিয়াছে কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী অস্বীকার করিতেছে এবং ঋণ দাতার নিকট কোন সাক্ষীও নাই। তৎপর এই সব মাল পাওয়া গিয়াছে, সেক্ষেত্রে যতবছর পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল না ততবছরের যাকাত আদায়করা ফরজ নহে। (দুররুল-মোখতার, রদ্দুল-মোহতার)

মাসয়ালা- দেনাদার পাওনা স্বীকার করে। কিন্তু দিতে বিলম্ব করে, অথবা দেনাদার গরীব, সে যে দরিদ্র তাহা কাজী রায় দিয়াছেন, অথবা দেনাদার দেনা অস্বীকার করে কিন্তু পাওনাদারের নিকট উহার সাক্ষী আছে, এ সব অবস্থায় মাল পাওয়ার পর পূর্ববর্তী বৎসরগুলির যাকাতও আদায় করিতে হইবে। (তানবীর ও শরহে বেকায়া)

মাসয়ালা- আত্মসাৎ করা মালের যাকাত আত্মসাৎকারীর উপর ফরজ নহে। কেননা, উহা তাহার মাল নহে। তাহার উপর উক্ত মাল ফিরাইয়া দেওয়াই ফরজ। তবে

লুণ্ঠনকারী যদি উক্ত মাল নিজের মালের সহিত এমনিভাবে মিশাইয়া থাকে যাহা চেনা দুস্কর এবং তাহার নিজস্ব মালও নেছাব পরিমাণ আছে। এমতাবস্থায় তাহার উপর সমস্ত মালেরই যাকাত আদায় করা ফরজ। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- মনে করুন এক ব্যক্তি হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া আনিল। পরে এই টাকাই আর একজন লুণ্ঠন করতঃ উহা হইতে নিয়া খরচ করিয়া ফেলিল এবং এই দুই লুণ্ঠনকারীর প্রত্যেকেই হাজার টাকার মালিক। এমতাবস্থায় প্রথম গছবকারীর উপর যাকাত ফরজ। দ্বিতীয় গছবকারীর উপর ফরজ নহে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- রেহেনে আবদ্ধ মালের যাকাত রেহেনদাতা এবং গ্রহীতা কাহারও উপর ফরজ নহে। কেননা যিনি মাল রাখিয়াছেন তিনি তো মালিক নহেন এবং যাহার মাল তাহার হাতে না থাকায় তিনি পূর্ণ মালিক নহেন। রেহেন ছাড়ানোর পর রেহেন অবস্থার বৎসরগুলির যাকাত ফরজ নহে। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসয়ালা- যে মাল ব্যবসার জন্য ক্রয় করিয়া পূর্ণ বৎসর পর্যন্ত হস্তগত করে নাই, এহেন অবস্থায় হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রয়কারীর উপর যাকাত ফরজ নহে এবং হস্তগত করার পর উক্ত বৎসরের যাকাত আদায় ফরজ হইবে।

(দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

৭ম শর্ত নেছাব করজ মুক্ত হওয়া চাই

মাসয়ালা- নেছাবের মালিক ঋণগ্রস্ত। ঋণ পরিশোধ করিলে নেছাব থাকে না। এমতাবস্থায় যাকাত ফরজ নহে। উক্ত করজ বান্দার হউক অথবা আল্লাহরই হউক। যে কোন অবস্থাতেই করজ পরিশোধ করার পর নেছাব যদি না থাকে তাহার উপর যাকাত ফরজ নহে। বান্দার হক যথা-করজ, কোন বস্তু ক্রয় করিয়াছে কিন্তু উহার মূল্য দেয় নাই বা জরিমানা। আল্লাহর হক যথা- যাকাত, খাজনা। যাকাত যেমন কোন ব্যক্তি শুধু একটি নেছাবের মালিক এবং দুই বৎসর ধরিয়া সে যাকাত দেয় নাই। এই অবস্থায় শুধু প্রথম বৎসরের যাকাত ফরজ, দ্বিতীয় বৎসরের নহে। কেননা প্রথম বৎসরের যাকাত তাহার উপর ঋণ হইয়া রহিয়াছে, উহা নেছাব হইতে বাহির করিলে নেছাব আর থাকে না। যেমন উক্ত ব্যক্তি শুধু ২০০ শত দেরহামের মালিক দুই বৎসর সে উহার যাকাত দেয় নাই, এখানে সে প্রথম বৎসরের যাকাত ৫ দেরহাম আদায় করিলে থাকে ১৯৫ দেরহাম। নেছাব রহিল না। অতএব দ্বিতীয় বৎসরের যাকাত তাহার দেওয়া লাগিবে না। ঐরূপ যদি ৩ বৎসর চলিয়া যায় তবে তৃতীয় বৎসরের একদিন বাকী থাকিতে তাহার আরও ৫ দেরহাম উপার্জন হইল এই অবস্থাতেও প্রথম বৎসরের যাকাত ফরজ। কেননা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরের যাকাত বাহির করার পর নেছাব বাকী নাই। অবশ্য যেদিন উক্ত ৫ দেরহাম উহার সহিত জমা হইল, সেদিন হইতে এক বৎসর পর্যন্ত নেছাব বাকী থাকীলে এই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত ফরজ হইবে। এইরূপ সে নেছাবের

মালিক ছিল এবং বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরও সে যাকাত দিল না। তৎপর সমস্ত মাল নষ্ট করিয়া দিল, ইহার পর অন্য আরও মাল নেছাব পরিমাণ হাছিল করিল। কিন্তু পূর্ব বৎসরের যাকাত যাহা তাহার উপর ঋণ রহিয়া গিয়াছে এই মাল থেকে আদায় করিলে নেছাব বাকী থাকে এই অবস্থায় এই নূতন বৎসরের যাকাত ফরজ হইবে না। পূর্বের মাল যদি সে ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট না করিয়া থাকে বরং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নষ্ট হইয়া যায়, এই অবস্থায় উহার যাকাত লাগিবে না। এই জন্য যে, উহার যাকাত ঋণ নহে। এই অবস্থায় উক্ত নূতন বৎসরের যাকাত ফরজ।

মাসয়ালা- নিজে ঋণগ্রস্ত নহে তবে ঋণগ্রস্তের টাকার জামিন এবং জামানতের টাকা বাহির করিলে নিজের নেছাব থাকে না। এই অবস্থায় তাহার উপর যাকাত ফরজ নহে। যথা- যায়েদের নিকট এক হাজার টাকা আছে এবং আমর কাহারো থেকে এক হাজার টাকা করজ গ্রহণ করিয়াছে। যায়েদ ইহার জামিন, এই অবস্থায় যায়েদের উপর যাকাত ফরজ নহে। কেননা যায়েদের টাকা থাকিলেও উহা আমরের টাকার জামানতে আবদ্ধ, করজদাতা ইচ্ছা করিলে যায়েদ থেকে তাগাদা করিতে পারে এবং টাকা না পাওয়া অবস্থায় সে যায়েদকে বন্দীও করিতে পারে। এই অবস্থায় যায়েদের টাকাগুলিও করজে ডুবন্ত। অতএব যায়েদের উপরও যাকাত ফরজ নহে। এমনকি আমরের জামিন যদি ১০ জনও হয় যাহাদের প্রত্যেকের এক হাজার টাকা আছে তখনও উহাদের কেহর উপর যাকাত ফরজ নহে। কেননা করজদাতা প্রত্যেককেই তাগাদা করিতে পারে এবং না পাওয়া অবস্থায় যাহাকে ইচ্ছা বন্দীও করিতে পারে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- ميعادي دين বা দিনকাল নির্দ্ধারিত দেনা, ছহীহ মাযহাব মতে যাকাত ফরজ হওয়া বন্ধ করে না। (রদ্দুল মোহতার)

যেহেতু মহরের দেনার সাধারণতঃ তাগাদা বা مطالبه হয় না অতএব স্বামীর জিম্মায় যতই মহরের দেনা থাকুক না কেন সে নেছাবের মালিক হইলে তাহার উপর যাকাত ফরজ। (আলমগীরী) বিশেষতঃ গায়ের তলব মহর যাহা এতদ্দেশে প্রচলিত যাহা আদায়ের কোন নিদিষ্ট দিন তারিখ ধার্য থাকে না। মৃত্যু অথবা তালাক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী এই তলব করার অধিকারীনীই নহে।

মাসয়ালা- স্ত্রীর খরচাদি স্বামীর উপর করজ রূপে গণ্য হইবে না। তবে কাজী বা হাকীমের পক্ষ হইতে হুকুম জারি করা হইলে অথবা স্বামী স্ত্রী কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর সিদ্ধান্ত নিলে উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ দেনা হিসাবে গণ্য হইবে। ইহার কোনটি না হইলে উহা ধর্তব্য হইবে না। অতএব ইহার যাকাত বন্ধ করিবে না।

মাসয়ালা- দেনা যাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বেকার হইলে দেনা যাকাত বন্ধ করিবে। কিন্তু পূর্ণ নেছাব এক বৎসরকাল জমা থাকার পর যদি দেনা হয় তবে উক্ত দেনার জন্য যাকাত আদায় রহিত হইবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- যে সব দেনার তাগাদা মানবের পক্ষ হইতে হয় না যথা- মান্নত, কাফ্ফারা, ফিতরা, হজ্জ ও কোরবানী। এই সব দেনা যাকাত বন্ধ করিবে না। নেছাব হইতে এই সবের খরচ বাহির করিলে যদি নেছাব নাও থাকে তবুও যাকাত ফরজ হইবে। ওশর, খাজনা দেনাদারের উপরও ফরজ। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- বৎসরের মধ্যাবস্থায় যে দেনা হইয়াছে অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দেনাগ্রস্ত ছিল না। তৎপর দেনা হইল। বৎসরের শেষভাগে দেনা ছাড়াই সে নেছাবের মালিক হইল এহেন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হইয়া গিয়াছে। যেমন করজদাতা মাফ করিয়া দিয়াছেন। এখন যেহেতু তাহার কোন দেনা রহিল না এবং বৎসরও পূর্ণ হইয়াছে। অতএব এখনই যাকাত দেওয়া ফরজ। করজ মাফ করিয়া দেওয়ার পর থেকে এক বৎসর ধরা হইবে না। বৎসরের প্রথম থেকে দেনাগ্রস্ত থাকিলে যদি বৎসর পূর্ণ হওয়ার মধ্যে মাফ করিয়া দেয় তাহা হইলে তখনই যাকাত ফরজ নহে। বরং মাফ করা হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে যাকাত আদায় করা ফরজ হইবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- এক ব্যক্তি দেনাগ্রস্ত কিন্তু বিভিন্ন মালে সে কতিপয় নেছাবের মালিক এবং যে কোন নেছাব দ্বারাই সে দেনা শোধ করিতে পারে। যথা- নেছাব পরিমাণ নগদ টাকা আছে এবং চড়া জানওয়ার নেছাব পরিমাণ আছে। এই অবস্থায় নগদ টাকাই দেনার মোকাবেলায় হইবে অর্থাৎ নগদ টাকার যাকাত ফরজ হইবে না। বাকী ব্যবসায় মাল এবং গরু মহিষ ইত্যাদির যাকাত দিতে হইবে। যদি নগদ টাকা না থাকে এবং পশুগুলির কতিপয় নেছাব আছে যেমন-৪০টি বকরী, ৩০টি গরু এবং ৫টি উট আছে। ইহার ভিতর যেগুলির যাকাত দেওয়া তাহার জন্য সহজ উহার যাকাত দিবে এবং বাকীগুলি দেনার মধ্যে গণ্য করিবে। এইখানে যদি বকরী এবং উটগুলির যাকাত দেয় তবে একটি বকরী দিতে হইবে। এবং গরুর যাকাতে এক বৎসরের গরুর বাচ্চা দিতে হইবে। এই অবস্থায় একটি বকরী দেওয়া গরুর বাচ্চা দেওয়ার চাইতে সহজ। অতএব বকরী দিতে পারে এবং উভয়ের হিসাব যদি সমান হয়, তাহা হইলে তাহার এখতিয়ার। যথা- ৫টি উট আছে এবং ৪০টি বকরী উভয়টির যাকাতই এক বকরী। এখানে তাহার ইখতিয়ার। সেগুলির যাকাত দান করুক এবং সেগুলি দেনার পরিবর্তে রাখুক। স্মরণ রাখিবে এইসব বিস্তারিত যাহা লেখা হইয়াছে ঐ সময় যখন বাদশার পক্ষ হইতে কেউ যাকাত উসূল করিতে আসে। অন্যথা যদি সে নিজ তরফ থেকে দিতে চাহে তখন প্রত্যেক অবস্থায়ই তাহার ইখতিয়ার যেটি দেনার পরিবর্তে রাখে এবং যেটির যাকাত দেয় তাহার ইচ্ছা। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- হাজার টাকা আছে এবং দেনাও হাজার টাকা উহা ছাড়া তাহার একটা ঘর এবং খেদমতের জন্য গোলাম আছে। ইহার উপর যাকাত ফরজ নহে। যদিও ঘর এবং ক্রীতদাসের মূল্য দশ হাজার টাকাই হউক না কেন। কেননা এই সব বস্তু তাহার হাজতে আছলী বা মানবীয় প্রয়োজীয় বস্তু এবং যখন টাকা আছে করজের পরিবর্তে টাকাই ধরা হইবে। ক্রীতদাস এবং ঘর নহে। (আলমগীরী)

৮ম শর্ত নেছাব হাজাতে আছলীর অতিরিক্ত হওয়া চাই

মাসয়ালা- হাজতে আছলীর অর্থাৎ জীবন যাপনের জন্য যে সব বস্তুর প্রয়োজন উহার যাকাত ফরজ নহে। যথা-বসবাস করার জন্য ঘর, শীত, গ্রীষ্মের পরিধান করার জন্য বস্ত্র, সাংসারিক আসবাব পত্র, সওয়ারির জানওয়ার, খিদমতের জন্য দাস-দাসী (খরীদা) যুদ্ধের সরঞ্জাম, পেশাদারদের যন্ত্রপাতি, বিদ্বানগণের দরকারী বই পুস্তক, খাওয়ার জন্য খোরাকাদি ইত্যাদি এই গুলির যাকাত নাই।

মাসয়ালা- আতর বিক্রেতা আতর বিক্রির জন্য শিশি খরিদ করিয়াছে ইহারও যাকাত দিতে হইবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- খরচ করার জন্য টাকা পয়সা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে ইহাও হাজতে আছলীর মধ্যে গণ্য হইবে। হাজতে আছলীতে খরচ করার জন্য টাকা রাখিয়া দিল। ইহা হইতে বৎসরের খরচ বাদ যদি নেছাব পরিমাণ অতিরিক্ত থাকে তাহা হইলে এই অতিরিক্ত টাকার যাকাত দিতে হইবে, যদিও নিয়ত ছিল যে, দরকার পড়িলে খরচ করিবে। অবশ্য বৎসর শেষ হওয়ার মধ্যেই হাজতে আছলীতে খরচ করার জরুরাত থাকিলে যাকাত লাগিবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- বিদ্বানের কিতাব পুস্তক সমূহ হাজতে আছলীভুক্ত। উহার যাকাত লাগিবে না। বিদ্যাহীন ব্যক্তির নিকট যদি উহা থাকে তখনও ব্যবসার জন্য না হইলে উহার যাকাত ফরজ হইবে না। পার্থক্য এই যে, বিদ্বান ব্যক্তির নিকট উক্ত কিতাব ছাড়া অন্য মাল নেছাব পরিমাণ না থাকিলে তিনি যাকাত গ্রহণ করিতে পারেন; এবং বিদ্যাহীন ব্যক্তির জন্য জায়েয হইবে না। যদি উক্ত কিতাবগুলির মূল্য অন্ততঃ ৫২.৫০ তোলা চান্দীর মূল্যের সমান হয়। (اهل) বা বিদ্বান বলিতে ঐ ব্যক্তিকে ধরা যাইবে, যাহার পড়ন, পড়ান অথবা শুদ্ধ (تصحيح) করার জন্য ঐ সব কিতাবের প্রয়োজন। এবং কিতাব পুস্তক বলিতে ধর্মীয় কিতাব ধরিতে হইবে। যথা- ফিকাহ্ বা মাসয়ালার কিতাব বা পুস্তক, তাফসীর এবং হাদীস। কোন কিতাবের একাধিক সংখ্যা থাকিলে এক সংখ্যাই দরকারী বাকী সংখ্যা একই হউক বা একাধিক। উহার মূল্য অন্ততঃ ৫২.৫০তোলা চান্দীর মূল্যের সমান হইলে এই আলেমের জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হইবে না। একই কিতাবের অতিরিক্ত সংখ্যা অথবা বিভিন্ন কিতাবের অতিরিক্ত কয়েক সংখ্যার মূল্য নেছাব পরিমাণ হউক একই কথা।

(দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- হাফেজের জন্য পবিত্র কুরআন শরীফ হাজতে আছলীভুক্ত নহে; এবং যিনি হাফেজ নহেন তাহার জন্য একখানার অতিরিক্ত হাজতে আছলীর বহির্ভূত।

(জওহারা, রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- চিকিৎসকের জন্য যে সব পুস্তক তাহার দেখার প্রয়োজন হয় সেগুলি

তাহার দরকারী। নাহু, ছরফ জ্যোতিষী পুস্তকাদি এ,বং দিওয়ান ও কিচ্ছা কাহিনীর কিতাবসমূহ হাজতে আছলীভুক্ত নহে। উছুলে ফিকাহ ইল্‌মে কালাম এবং আখলাক সম্বন্ধীয় কিতাব যথা- এহইয়ায়ে উলুম, কিমিয়ায়ে সায়াদাত ইত্যাদি হাজতে আছলীভুক্ত। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালা- কাফের এবং বদ মাযহাব লোকের রদ্দ এবং সুন্নাতুল জামায়াতের সাহায্যের জন্য যে সব কিতাব রাখা হয় সেগুলি হাজতে আছলীভুক্ত। অনুরূপ কোন আলেম যদি বদ মাযহাব লোকের কিতাব এই জন্য সংগ্রহ করেন যে,হা হইলে উহার রদ্দ করিবেন তখন এই সব কিতাবও তার হাজতে আছলীভুক্ত হইবে। যাহারা আলেম নহে তাহাদের জন্য ঐসব কিতাব দেখাই জায়েয নাই। কেননা বদ মাযহাবের লোকেরা তাহাদের কিতাব দ্বারা তাহাদের বদ মাযহাবকেই শুদ্ধ করিয়া দেখাইবে এবং অশিক্ষিত লোক না বুঝিয়া উহাই সত্য বলিয়া মনে করিয়া বিপদগামী হইবে। অতএব সাবধান! কোন কিতাব বা বই দেখার পূর্বে উক্ত কিতাব লিখকের পরিচয় ভাল ভাবে জানিয়া লইবে।

৯ম শর্ত মাল বর্ধনশীল হইতে হইবে

স্মরণ রাখিবে, যাকাত তিন রকমের সম্পদের উপর ফরজ-

১। সোনা চান্দী ২। ব্যবসার মাল ৩। (سائمة) বা চড়া পশু ইহার ভিতর স্বর্ণ রৌপ্য নেছাব পরিমাণ থাকিলেই যাকাত দিতে হইবে। যদিও মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হউক। উহা দ্বারা ব্যবসা করুক বা না করুক সকল অবস্থায়ই উহার যাকাত দিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য মালের যাকাত দিতে হইবে যদি সেগুলি ব্যবসার জন্য রাখা হয়; এবং গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি হইলে যদি ঐসব মাঠে জঙ্গলে উজাড়া চড়াইয়ে পালন করা হয় তবে নেছাব পরিমাণ হইলে ইহারও যাকাত দিতে হইবে।

মাসয়ালা- তেজারতের নিয়ত দুই রকম- প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য, যেমন-ক্রয় অথবা ইজারা রাখার সময় তেজারতের নিয়ত করিল এবং টাকা পয়সা অথবা কোন বস্তু রাখার সময় তেজারতের নিয়ত করিল। অপ্রকাশ্য, যথা-তেজারতের মালের পরিবর্তে কিছু খরিদ করিল অথবা যে ঘর তেজারতের জন্য ছিল উহা কোন বস্তুর পরিবর্তে কেরায়া দিল। এ অবস্থায় এই সব বস্তু ও ক্রয় করা বস্তু সবই তেজারতের জন্য ধর্তব্য হইবে। উহার যাকাত দিতে হইবে যদিও পরিস্কারভাবে তেজারতের নিয়ত করে নাই। অনুরূপ কাহার নিকট কোন বস্তু তেজারতের জন্য করজ লইলে ইহাও তেজারতের জন্য ধরা হইবে। যথা- সে ৫২.৫০তোলা চান্দীর মূল্যের মালিক এবং এক মণ গম বা চাউল ইত্যাদি করজ লইল, যদি সে এই মাল তেজারতের জন্য লইয়া না থাকে তবে তার উপর যাকাত ফরজ নহে। কেননা গম বা চাউল যাহা করজ লইয়াছে উহার মূল্য উক্ত ৫২.৫০ তোলাচান্দীর মূল্য হইতে বাদ দিলে নেছাব থাকে না। কিন্তু যদি উহা

তেজারতের জন্য লইয়া থাকে তবে যাকাত ফরজ হইবে। কেননা এই গম বা চাউল যাহা লইয়াছে উহার মূল্য৫২.৫০তোলা চান্দীর মূল্যের সঙ্গে যোগ হইবে এবং মোটের উপর হইতে করজ বাদ দিলেও পূর্ণ নেছাব অর্থাৎ ৫২.৫০তোলা চান্দীর মূল্যের টাকা থাকিয়া যায়, অতএব এই অবস্থায় যাকাত ফরজ হইবে। (আলমগীরী, দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যে সব বন্দন বা চুক্তির (عقد) ভিতর বদল নাই, যথা হেবা অসিয়ত, ছদকা এই সবের পরিবর্তে কোন মাল পাওয়া যায় না। অথবা যাহার বদল আছে কিন্তু উহা মাল নহে, যথাঃ মহর, খোলার বদল আছে ইত্যাদি। এই সবের বদল যেমন মহরের বদল স্ত্রী উপভোগ করিবার অধিকারী হয়, স্ত্রী তালাক পাওয়ার জন্য স্বামীকে টাকা দেয় এই টাকার বদল হইতেছে তালাক স্ত্রীই উপভোগ করে এবং তালাক কোনটিই মাল নহে। এই সব বন্দন বা চুক্তির দ্বারা মালের মালিক হইলে উহাতে তেজারতের নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ উহা দ্বারা তেজারতের নিয়ত করিলেও যাকাত ফরজ হইবে না। অনুরূপ ঐসব বস্তু ওয়ারেসী সূত্রে পাইলেও উহাতে তেজারতের নিয়ত শুদ্ধ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তেজারতের মাল রাখিয়া মারা গেল। এই মালের যাহারা ওয়ারিস তাহারাও যদি উক্ত মাল দ্বারা তেজারতের নিয়ত করে তবে উহার যাকাত ফরজ হইবে। অনুরূপ চরা পশু ওয়ারেসী সূত্রে পাওয়া গেলে যাকাত দিতে হইবে, ভবিষ্যতে ঐগুলিকে মাঠে চরিতে দেওয়া হউক বা না হউক। (আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ঘরে রাখার জন্য কোন বস্তু ক্রয় করিল কিন্তু নিয়ত করিল যে মুনাফা পাইলে বিক্রি দিয়া দিব ইহার যাকাত ফরজ নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- জমি হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তেজারতের নিয়ত করিলেও যাকাত ফরজ হয় না। জমি ওশরীই হউক বা খেরাজী জমি, নিজস্ব হউক বা উদ্ধারে বা কেরায়ার। তবে যদি খেরাজী জমি কেরায়া বা ধারের উপর গ্রহণ করে এবং যে বীজ তেজারতের জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিল যদি উহাই বুনা হয় তবে উৎপন্ন ফসলের ভিতর তেজারতের নিয়ত শুদ্ধ হইবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- একজনে মাল দিল এবং অপর জন মুনাফার অংশের উপর উহা দ্বারা কারবার করিল, ইহাকে (مضاربه) মুজাবারা বলে। যিনি কারবার করেন তাহাকে (مضارب) মুজারিব বলে ইনি উক্ত মাল দ্বারা যাহাই ক্রয় করিবেন যদিও তেজারতের নিয়ত না থাকে যদিও নিজের খরচের জন্য করে তবুও উহার যাকাত দিতে হইবে। এমন কি উক্ত মাল দ্বারা যদি গোলাম খরিদ করে তৎপর উহার পরিধানের জন্য কাপড় এবং খোরাকী ইত্যাদি খরিদ করে এই সবই তেজারতের জন্য এই সমস্তেরই যাকাত দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার,রদ্দুল মোহতার)

দশম শর্ত বৎসর শেষ হওয়া

চন্দ্র বৎসরের হিসাব ধরিতে হইবে। অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১২ মাস হওয়া চাই।

মাসয়ালাঃ- বৎসরের প্রথম এবং শেষে পূর্ণ নেছাব ছিল কিন্তু মধ্য বৎসরে মাল নেছাবের চেয়ে কমিয়া গেল। এই কম হওয়ায় কোন কিছু হইবে না অর্থাৎ যাকাত দিতেই হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তেজারতের মাল অথবা সোনা রূপা বৎসরের মধ্য ভাগে যদি নিজ নিজ জাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় মাল দ্বারা বদল করা হয় তাতেও বৎসর শেষ হইতে কোন বাধা আসিবে না। কিন্তু চরা জানোয়ার বদল হইলে বৎসর নষ্ট হইয়া পুনঃ যেদিন বদলাইয়াছে সেই দিন হইতে আরম্ভ হইবে। বদলানোর পূর্বে যে কয়দিন অতিবাহিত হইয়াছে উহা ধরা যাইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- নেছাবের মালিক বৎসরের মধ্যভাগে একই জাতীয় আরও মাল পাইল। যেমন নেছাব পরিমাণ গরু ছিল বৎসরের মধ্যভাগে আরও কয়েকটি গরু পাইল। এই অবস্থায় এই নূতন মালের ভিন্ন বৎসরে হইবে না বরং প্রথম মালের বৎসর খতম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন মালেরও পূর্ণ বৎসর ধরিতে হইবে, যদিও প্রথম মালের বৎসর হওয়ার এক মিনিট পূর্বে উক্ত নূতন মাল পাইয়া থাকে। এই নূতন মাল উক্ত পুরাতন মালের দ্বারা হাছিল হউক বা মিরাছী সূত্রে বা হেবা সূত্রে অথবা অন্য কোন জায়েয সূত্রে পাইয়া থাকুক। তবে ভিন্ন জাতীয় হইলে যেমন প্রথম তার নিকট নেছাব পরিমাণ উট ছিল এবং বৎসরের ভিতরই কতগুলি বকরী পাইল। এখানে বকরীগুলির জন্য নূতন বৎসরের হিসাব হইবে উটের সঙ্গে হিসাব হইবে না। (জওহারা)

মাসয়ালাঃ- দুইটি নেছাবের মালিক বৎসরের মধ্যভাগে তাহার আরও কিছু মাল হাছিল হইল। তাহার উক্ত দুই নেছাবের বৎসর ভিন্ন ভিন্ন যেমন এক নেছাবের বৎসর আরম্ভ হইয়াছে মোহররম হইতে এবং অপরটি যেন রজব হইতে। এ অবস্থায় বৎসরের মধ্য ভাগে যে মাল হাছিল হইল, তাহা ঐ মালের সহিত মিশাইতে হইবে যাহার প্রথম ফরজ হইবে অর্থাৎ যেই নেছাবের বৎসর প্রথম শেষ হইবে যেই নেছাবের সঙ্গে উক্ত মাল মিলাইয়া সম্পূর্ণ মালের যাকাত আদায় করিতে হইবে। যথা- তাহার নিকট এক হাজার টাকা আছে এবং যাকাত দেওয়া জানোয়ারের মূল্য নেছাব পরিমাণ আছে। এই দুই নেছাব মিশ্রিত করা যাইবে না। এখন যে টাকা বৎসরের মধ্যভাগে সংগ্রহ হইল উপরোক্ত দুই রকমের নেছাবের যেইটির বৎসর প্রথম শেষ হইবে সেইটিরই সঙ্গে মিলাইতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- চরা জানোয়ার ছিল বৎসর শেষ হওয়ার পর উহার যাকাত আদায় করিল। তৎপর উক্ত জানোয়ার গুলি টাকার পরিবর্তে বিক্রি করিল, এবং তার নিকট আগেরও নেছাব পরিমাণ টাকা ছিল যাহার অর্ধেক বৎসর শেষ হইয়াছে। ঐ অবস্থায় উক্ত জানোয়ার বিক্রির টাকা এই নেছাবের টাকার সহিত মিশ্রিত হইবে না। বরং এই

জানোয়ার বিক্রির টাকার জন্য এখন হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। এখন সে দুই নেছাবের মালিক। একটির এখন অর্ধেক বৎসর শেষ হইয়াছে অপরটির বৎসর সবেমাত্র আরম্ভ। এই নূতন টাকা মিলান হইবে না যদি নেছাব পরিমাণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যদি নেছাবের চেয়ে কম হয়। তবে পূর্বের টাকার সঙ্গে মিলাইয়া পূর্বের টাকার বৎসর শেষ হইলে সমস্ত টাকারই যাকাত দিতে হইবে। (জওহারা)

মাসয়ালাঃ- বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে চরা জানোয়ার যদি টাকার পরিবর্তে বিক্রি করে তাহা হইলে এই টাকা ঐ টাকার সহিত মিশ্রিত করিবে যাহা পূর্ব হইতে তাহার নিকট নেছাব পরিমাণ জমা ছিল- অর্থাৎ পূর্বের নেছাব এক বৎসর শেষ হওয়ার সহিত ইহারও বৎসর শেষ ধরিবে এবং যাকাত আদায় করিবে। এই টাকার জন্য নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে না। ঐরূপ বৎসরের মধ্যে যদি উক্ত চরা জানোয়ার অন্য জানোয়ারের সহিত মিলাইবে যাহা পূর্ব হইতে তাহার নিকট ছিল। চরা জানোয়ারের যাকাত আদায়ের পর ঐগুলি চরা অবস্থায় রাখিল না তৎপর বিক্রি করিয়া ফেলিল, তাহা হইলে এই মূল্য পূর্ব মালের সহিত মিলাইয়া ফেলিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- উট, গরু, এবং বকরী একটি অপরটির পরিবর্তে বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করিল তখন ইহার জন্য নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। অনুরূপ যদি অন্য কোন বস্তুর পরিবর্তে তেজারতের নিয়তে বিক্রি করে তাহা হইলে এখন হইতে এক বৎসর শেষ হইতে যাকাত ফরজ হইবে এবং যদি একই শ্রেণীর জানোয়ার যেমন উট উটের পরিবর্তে এবং গরু গরুর পরিবর্তে বিক্রি করে তাহা হইলে ইহার জন্যও এখন হইতে এক বৎসর শেষ হওয়ার পর যাকাত ফরজ হইবে। কিন্তু বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর বিক্রি করিয়া থাকিলে তাহার উপর যাকাত ফরজ হইয়াছিল, উহা তাহার জিম্মায় বাকি রহিয়াছে। (জওহারা)

মাসয়ালাঃ- বৎসরের মধ্য ভাগে চরা জানোয়ার বিক্রি করিল। কিন্তু কোন দোষের কারণে উক্ত বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই খরিদ্দার জানোয়ারটি ফেরত দিল, এই অবস্থায় এই ফেরত যদি কাজীর হুকুমে দিয়া থাকে তবে নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে না। অন্যথায় যখন ফেরত দিল তখন হইতে বৎসর আরম্ভ হইবে। যদি উক্ত চরা জানোয়ারটি হেবা করার পর বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ফেরত লইল। তাহা হইলে নূতন বৎসর আরম্ভ করিতে হইবে। (জওহারা)

মাসয়ালাঃ- খাজনা দেওয়ার পর জমিটা বিক্রি করিয়া ফেলিল এই অবস্থায় উহার মূল্য আসল নেছাবের সঙ্গে মিলাইয়া যাকাত দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে টাকার যাকাত দেওয়া হইয়াছে উহা দ্বারা চরা জানোয়ার খরিদ করিল এবং তাহার নিকট পূর্ব হইতেই আরও চরা জানোয়ার ছিল। এখন এই খরিদা জানোয়ার তাহার পূর্বের জানোয়ারের সহিত মিশ্রিত করিবে না বরং এইটি হিসাবের বাহিরে রাখিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কেহ হাজার টাকা হেবা সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আরও হাজার টাকা সে উপার্জন করিল। ইহার পর হেবা দাতা কাজীর হুকুমে নিজ হেবার টাকা ফেরত লইয়া গেল। এ অবস্থায় উক্ত নূতন উপার্জনীয় টাকাগুলির বৎসর শেষ না হইতে যাকাত ফরজ হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কাহারও নিকট তেজারতের বকরী আছে। যাহার মূল্য নেছাব পরিমাণ। বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই উহার চামড়া খসাইয়া পাকা করিয়া রাখিল। এখন যদি এই চামড়ার মূল্য দ্বারা নেছাব পুরা হয়, তবে যাকাত দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যাকাত দেওয়ার সময় অথবা যাকাতের জন্য মাল ভিন্ন করার সময় যাকাতের নিয়ত করা শর্ত। নিয়তের অর্থ এই যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাত বিনা চিন্তায় বলিতে পারে যে, ইহা যাকাত। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বৎসর ধরিয়া দান খয়রাত করিতেছে। এখন নিয়ত করিল যে, যাহা দিয়াছে সবই যাকাত, ইহাতে যাকাত আদায় হয় নাই। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তিকে উকিল বানাইল। উহাকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করে নাই। কিন্তু যখন উকিল ফকীর মিসকীনকে দিতেছিল তখন মুয়াক্কিল যাকাতের নিয়ত করিল। ইহাতে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- দেওয়ার সময় নিয়ত করে নাই, পরে করিল। এই অবস্থায় তার দেওয়া মাল যদি ফকীরের নিকট উহারই স্বত্ব হিসাবে মওজুদ থাকিয়া থাকে অর্থাৎ তখনও ফকীর অন্য কেহকে উহার মালিক করে নাই, তাহা হইলে এই নিয়ত ঠিক হইবে। যাকাত আদায় হইবে, অন্যথায় না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাত দেওয়ার জন্য উকিল বানাইয়া যাকাতের নিয়তে উকিলের নিকট মালও দিয়া দিল। কিন্তু উকিল উক্ত মাল ফকীরকে দেওয়ার সময় নিয়ত করে নাই। ইহাতে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। এবং জিম্মিকে দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করিয়াছে, এই অবস্থায় এই নিয়তই যথেষ্ট। যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- উকিলকে দেওয়ার সময় বলিল যে, ইহা নফল ছদকা অথবা কাফ্‌ফারা। কিন্তু উকিল কর্তৃক ফকীরকে দেওয়ার পূর্বেই মুয়াক্কিল যাকাতের নিয়ত করিল। ইহা যাকাতই হইবে। যদিও উকিল ফকীরকে দেওয়ার সময় নফল ছদকা অথবা কাফ্‌ফারার নিয়ত করিয়া থাকে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তি কতিপয় যাকাত দাতার উকিল। সে সকলের যাকাত মিশ্রিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইবে। তবে মালিকগণ তাহাকে এজাযত দিয়া থাকিলে মিলাইতে পারে। বিনা এজাযতে মিশ্রিত করা জায়েয নাই।

মাসয়ালাঃ- কতিপয় ওয়াকফের মোতাওয়াল্লীর জন্য জায়েয নাই আমদানী সমূহ

মিশ্রিত করা। অনুরূপ দালালদেরও জায়েয নাই বিভিন্ন মালিকের মাল বিক্রয় অর্থ এবং বিক্রিত মাল সমূহ মিশ্রিত করা। ঐরূপ কতিপয় ফকিরের জন্য চাহিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছে তাহার এজাযত ছাড়া মিশ্রিত করা জায়েয নহে। এইরূপ আটা চুর্ণকারীর জন্য জায়েয নাই লোকের গমগুলি মিশ্রিত করিয়া ফেলা। মিশ্রিত করিয়া ফেলিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। তবে যে দেশে মিশ্রিত করার প্রথা জারি আছে সেই দেশে মিশ্রিত করা জায়েয। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- মুয়াক্কিলগণ প্রকাশ্যে মিশ্রিত করার এজাযত দেয় নাই তবে প্রথা এইরূপ জারি হইয়াছে যে, উকিলগণ মিশ্রিত করিয়াই থাকেন। ইহাও এজাযত ধরা হইবে। যদি মুয়াক্কিলের এই প্রথা জানা থাকে। কিন্তু দালালের মিশ্রণের এজাযত নাই। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- উকিল ইচ্ছা করিলে যাকাতের মাল নিজ ছেলে এবং স্ত্রীকে দিতে পারে যদি তাহারা ফকীর হয়। এবং ছেলে যদি নাবালেগ হয় তবে তাহাকে দেওয়া ঐ সময় জায়েয হইবে যখন স্বয়ং উকিলই ফকীর হইবে। কিন্তু নিজের আওলাদ অথবা স্ত্রীকে দেওয়া জায়েয হইবে যদি মুয়াক্কিল উহাদের ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য বলিয়া না থাকে। অন্যথায় উহাদিগকে দিতে পারিবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- উকিল নিজে গ্রহণ করিতে পারে না। তবে যাকাত দাতা বলিয়া দেয় যে, যথা ইচ্ছা দিতে পার। তবে সে নিজেও লইতে পারে। (রদ্দোল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাত দাতার হুকুম ব্যতিরেকেই উকিল মুয়াক্কিলের পক্ষ হইতে যাকাত দিয়া দিলে আদায় হইবে না। যদিও পরে সে জায়েয করিয়া দেয়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাত দাতা উকিলকে যাকাতের টাকা দিয়া দিল উকিল উক্ত টাকা জমা রাখিয়া নিজের যাকাত হিসাবে দিয়া দিল। ইহা জায়েয যদি নিয়ত থাকে যে, ইহার পরিবর্তে মুয়াক্কিল টাকা নিজে গ্রহণ করিবে। কিন্তু উকিল যদি প্রথমে মুয়াক্কিলের প্রদত্ত যাকাতের টাকা নিজে খরচ করে তৎপর নিজের টাকা যাকাতের জন্য দেয় এই অবস্থায় যাকাত আদায় হইবে না। বরং ইহা নফল ছদকা হইবে। মুয়াক্কিলকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাতের উকিল ইচ্ছা করিলে মালিকের বিনা অনুমতিতে অন্য কেহকে উকিল বানাইতে পারে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- কেহ বলিল, যদি আমি এই ঘরে যাই তাহা হইলে আল্লাহর জন্য এই একশত টাকা দান করিব। তৎপর সে সেই ঘরে গেল এবং যাওয়ার সময় নিয়ত করিল যে, ইহা যাকাত বাবদ দিব। এই অবস্থায় উহা যাকাত বাবদ দিতে পারিবে না।

(আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যাকাতের মাল হাতের উপর রাখিয়া দিল এই অবস্থায় ফরিকগণ উহা লুট করিয়া লইয়া গেল। যাকাত আদায় হইয়া যাইবে এবং হাত হইতে পড়িয়া গেলে পর ফকীর উঠাইয়া লইয়াছে। এই লোক যদি ফকীরকে চিনিয়া থাকে এবং রাজী হইয়া থাকে অথবা মাল নষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাকাত আদায় হইয়া গিয়াছে।

(আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- আমানতদারের নিকট আমানত নষ্ট হইয়া গিয়াছে সে ঝগড়া হইতে বাঁচার জন্য মালিককে কিছু টাকা দিল এবং দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত করিল এবং মালিক ফকীরও বটে, ইহাতে যাকাত আদায় হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যাকাতের নিয়তে মাল আলাদা করিলেই জিম্মা খালাছ হয় না। যতক্ষণ ফকীরগণকে দিয়া না দিবে। এমনকি ফকীরকে দেওয়ার পূর্বে যদি উক্ত মাল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যাকাত মাফ হয় না; এবং ফকীরকে দেওয়ার পূর্বে মারা গেলে উহাতে ওয়ারেসী দাবী চলিবে। (দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব নেছাব দান করিয়া দিল। যদিও যাকাতের নিয়ত করে নাই বরং নফল দানের নিয়ত করিয়াছে অথবা কোন নিয়তই করে নাই এ অবস্থায় যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। সমস্ত নেছাব যদি মান্নত অথবা অন্য কোন ওয়াজিব কাজের জন্য ফকীরকে দিয়া দেয় তবে দেওয়া যদিও শুদ্ধ হইয়াছে কিন্তু যাকাতের ফরজ তার উপর মাফ হয় নাই। মালের কোন অংশ দান করিলে এই অংশের যাকাতও দিতে হইবে। সমস্ত মাল যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে সব মালেরই যাকাত মাফ হইয়া যাইবে। কতক নষ্ট হইলে বা যাহা নষ্ট হইয়াছে কেবল সেই মালের যাকাত দেওয়া লাগিবে না। বাকী মালের যাকাত দিতে হইবে। যদিও ইহা নেছাব পরিমাণ না থাকে। হালাকের অর্থ এই যে, তাহার নিজস্ব কোন কাজ ছাড়া নষ্ট হইয়াছে যথা চুরি হইয়া গিয়াছে অথবা কাউকে কর্জ বা ধার দিয়াছে, সে উহা অস্বীকার করিয়াছে এবং সাক্ষীও নাই। অথবা সে মৃত্যুর পর ত্যাজ্য কিছুই রাখিয়া যায় নাই। যদি নিজের কাজ দ্বারা হালাক করিয়া থাকে যথা- খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, অথবা ফেলিয়া দিয়াছে অথবা কোন ধনী ব্যক্তিকে হেবা করিয়া দিয়াছে এই অবস্থায় যাকাত যথারীতি আদায় করিতে হইবে এক পয়সাও মাফ হইবে না। যদিও সে একেবারে অক্ষম হইয়াও পড়ে। (আলমগীরী ও দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ফকীরের উপর করজ ছিল এই সবই মাফ করিয়া দিল। তাহাতে টাকার যাকাত মাফ হইয়া যাইবে এবং অংশ মাফ করিলে সেই পরিমাণ অংশের যাকাত মাফ হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় যদি নিয়ত করে যে, এই অংশ পূর্ণ যাকাতেরই হইয়া যাউক ইহাতে যাকাত আদায় হইবে না। ধনী ব্যক্তির নিকট করজের টাকা পাওনা, উহা হইতে সবই মাফ করিয়া দিলে, তাহাতে যাকাত মাফ হইবে না; বরং তার জিম্মায়ই যাকাত থাকিয়া যাইবে। ফকীরের নিকট পাওনা ছিল তাহা মাফ করিয়া দিল এবং নিয়ত

করিল যে, অমুক ব্যক্তির নিকট আমার যে পাওনা আছে ইহা উহারই যাকাত। ইহাতে যাকাত আদায় হইবে না। (আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- কেহর কাছে টাকা পাইবে। ফকীরকে বলিল যে, উহার কাছ হইতে উসুল করিয়া লও এবং যাকাতের নিয়ত করিল। ইহাতে কবজের পর যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। ফকীরের নিকট পাওনা, যে উক্ত টাকা নিজের মালের যাকাতের বাবদ দিতে চায় অর্থাৎ সে যে উহা মাফ করিয়া দিবে, ইহা দ্বারা নিজের মালের যাকাত আদায় হইয়া যাইবে এইরূপভাবে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য নিজ হইতে তাহাকে যাকাতের টাকা দিয়া তাহার নিকট নিজের পাওনা আদায় করিয়া লইবে। যদি দিতে না চায়, তবে তার হাত ধরিয়া জোরপূর্বক আদায় করিতে পারে, এইভাবেও যদি না হয়, তবে কাজীর নিকট মোকদ্দমা করিবে যে উহার নিকট মাল আছে অথচ আমার প্রাপ্য দিতেছে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন অথবা মসজিদের মেঝেতে খরচ করিতে পারে না। কেননা ইহা দ্বারা ফকীরকে মালিক করিয়া দেওয়া হয় না। যদি এইসব জায়গায় খরচ করিতে চায়, তবে ইহার নিয়ম এই যে, কোন ফকীরকে উহার মালিক বানাইয়া দিবে এবং সে উক্ত কাজে খরচ করিবে। উভয়েরই ছওয়াব হইবে; বরং হাদীস শরীফে আছে- শত হাত হইয়া ছদকা পৌছিলেও সবারই ছওয়াব যিনি দান কারেন তাহারই মত হইবে এবং ইহার ছওয়াবে কোন কমি হইবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাত প্রকাশ্যে জানাইয়া দেওয়া উত্তম। নফল ছদকা গোপনীয়ভাবে দেওয়াই আফজল। যাকাতের প্রচার এই জন্য যে, গোপনীয়ভাবে দিলে লোকের তোহমত এবং বদগুমানীর সুযোগ হয়। তাহাছাড়া ইহা দ্বারা অন্য লোকেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তাহাকে দেখিয়া অন্য লোকেরাও দিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু রিয়া যেন না আসে। কেননা রিয়া দ্বারা ছওয়াব নষ্ট হইবে এবং গুনাহ্ ও আযাবের উপযোগী হইয়া যাইবে।

মাসয়ালাঃ- ফকীরকে যাকাত দেওয়ার সময় বলিয়া দেওয়া জরুরী নহে; বরং যাকাতের নিয়তই যথেষ্ট। এমনকি দেওয়ার সময় হেবা অথবা করজ বলিয়াও দেয় এবং নিয়ত থাকে যাকাতের তাতেও আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী) অনুরূপ মান্নত অথবা হাদিয়া বা পান খাওয়ার জন্য এবং ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য অথবা ঈদের নামেও যদি দেয় এবং যাকাতের নিয়ত থাকে, তবে আদায় হইয়া যাইবে। কোন কোন অভাবগ্রস্ত ফকীর লোক যাকাতের টাকা লইতে চায় না। তাহাকে দেওয়ার সময় যাকাতের কথা বলিবে না।

মাসয়ালাঃ- যাকাত আদায় করে নাই, বর্তমানে রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় ওয়ারিসকে না দেখাইয়া যাকাত দিবে। পূর্বে দেয় নাই এখন দিতে চায় কিন্তু কোন মাল

নাই যাহার দ্বারা যাকাত আদায় করিতে পারে এবং সে করজ লইয়া আদায় করিতে চায় এই অবস্থায় যদি করজ আদায় হইয়া যাওয়ার পুরা সম্ভাবনা থাকে, তবে করজ লইয়া আদায় করা উত্তম। অন্যথা করজ লইবে না। কেননা বান্দার হক আল্লাহর হক হইতে অতি কঠিন। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- নেছাবের মালিক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যাকাত আদায় করিতে পারে। তবে বৎসর শেষ অবস্থায় যদি নেছাবের মালিক না থাকে অথবা বৎসরের মধ্যেই নেছাবের মাল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায় তবে যাহা দিয়াছে তাহা নফল হইবে এবং যে ব্যক্তি নেছাবের মালিক নহে সে যাকাত দিতে পারে না। অর্থাৎ আগামীতে যদি সে নেছাবের মালিক হয় তবে যাহা কিছু পূর্বে দিয়াছে উহা তার যাকাতের মধ্যে গণ্য হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- এক নেছাবের মালিক বৎসর শেষ না হইতেই যদি কতিপয় নেছাবের যাকাত দিতে চায়, তবে দিতে পারে। অর্থাৎ সে বৎসরের প্রথমে এক নেছাবের মালিক ছিল কিন্তু দুই অথবা তিন নেছাবের যাকাত আদায় করিল এবং বৎসর শেষ না হইতেই সে যত নেছাবের যাকাত দিয়াছে তত নেছাবের মালিক হইয়াছে। এই অবস্থায় সব নেছাবের যাকাত আদায় হইয়া গিয়াছে। বৎসর শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি এক নেছাবেরই মালিক থাকিয়া যায় কিন্তু বৎসর চলিয়া যাওয়ার পরবর্তী বৎসরে আরও নেছাবের মালিক হয়, তবে পূর্ব বৎসরের অতিরিক্ত যাকাত এই বৎসরের নেছাবের যাকাত হিসাবে গণ্য হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- নেছাবের মালিক কয়েক বৎসরের যাকাতও অগ্রিম দিতে পারে। (আলমগীরী) অতএব যাকাতের নিয়তে কিছু কিছু করিয়া দিতে থাকা উচিত। বৎসরের শেষে হিসাব করিয়া দেখিবে যদি সব দেওয়া হইয়া থাকে ভাল, অন্যথা কিছু বাকি থাকিলে তাড়াতাড়ি পরিশোধ করিবে। দেরী করা দুরস্ত হইবে না এবং যদি দেখা যায় যে, বেশী দেওয়া হইয়াছে তাহা হইলে এই অতিরিক্ত যাহা দিয়াছে তাহা আগামী বৎসরের যাকাত হইতে কর্তন করিবে।

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যক্তি এক হাজার টাকার মালিক। কিন্তু যাকাত দিল দুই হাজারের। নিয়ত করিল যে, বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে যদি আরও এক হাজারের মালিক হয়, তবে এই যাকাত উহারই হইবে। অন্যথা আগামী বৎসরের যাকাত হিসাবে গণ্য হইবে। ইহা জায়েয আছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- পাঁচ শত টাকা মনে করিয়া উহারই যাকাত দিল। পরে দেখা গেল যে, টাকা চারশত মাত্র। এ ক্ষেত্রে যাহা অতিরিক্ত দিয়াছে তাহা আগামী বৎসরের যাকাত হিসাবে গণ্য করিতে পারে। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- কেহর নিকট সোনা-রূপা উভয়ই আছে এবং বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে একটির যাকাত দিল। এখানে এই যাকাত উভয়টিরই গণ্য হইবে। অর্থাৎ বৎসরের

মধ্যে যদি একটি নষ্ট হইয়া থাকে যদিও সেটির যাকাত নিয়ত করিয়া দিয়াছিল। এ অবস্থায় যেটি রহিয়া গিয়াছে উক্ত যাকাত উহারই ধরিতে হইবে। কিন্তু তাহার নিকট যদি গরু, বকরী এবং উট প্রত্যেক রকমেরই নেছাব পরিমাণ থাকে এবং কোন এক রকমের যাকাত অগ্রিম দেয় সে ক্ষেত্রে যেটির যাকাত দিয়াছে যদি বৎসরের মধ্যে উহা নেছাব পরিমাণ না থাকে তবে যে যাকাত দেওয়া হইয়াছে তাহা বাকীগুলির যাকাত হিসাবে গণ্য হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বৎসরের মধ্যভাগে যে ফকীরকে যাকাত দেওয়া হইয়াছে বৎসর শেষে সে মালদার হইয়া গেল, অথবা মারা গেল অথবা মোরতাদ হইয়া গেল ইহাতে যাকাতের ক্ষতি হইবে না। যাকাত আদায় হইয়া গিয়াছে। যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব সে যদি মারা যায় তাহার উপর যাকাত থাকে না। অর্থাৎ তাহার মাল হইতে যাকাত দেওয়া জরুরী নহে। তবে অসিয়ত করিয়া থাকিলে মালের ৩ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অসিয়ত জারী হইবে। তবে সাবালেগ জ্ঞান সম্পন্ন ওয়ারিসগণ যদি এজাযত দেয় তবে সব মাল হইতে যাকাত আদায় করিবে। (আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাত দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে যাকাত আদায় করিবে। (রদ্দুল মোহতার)

চরা পশুর যাকাত

মাসয়ালাঃ- ছায়েমা ঐ সব জানোয়ারকে বলা হয়, যাহা বৎসরের অধিকাংশ সময় সরকারী চারণ জমিতে চরিয়া অতিবাহিত করে এবং উহা শুধু দুগ্ধ এবং বাচ্চা সংগ্রহ করার অথবা মোটা তাজা করার জন্য পালন করা হয়। যদি বাড়ীতে ঘাস আনিয়া খাওয়ান হয় অথবা বোঝা বহন এবং হাল ইত্যাদি কোন কাজের জন্য ব্যবহার করে বা সওয়ারীর জন্য পালন করে তবে যদিও মাঠে চরিয়া থাকে উহা ছায়েমা নহে। উহার যাকাত ফরজ নহে। ঐরূপ গোশত খাওয়ার জন্য হইয়া থাকিলেও ছায়েমা নহে। যদিও বনে চরান হইয়া থাকে। ব্যবসার জানোয়ার বনে জঙ্গলে চরিতে দিলেও ইহা ছায়েমা হইবে না; বরং উহার যাকাত মূল্য ধরিয়া আদায় করিতে হইবে।

(দুররুল মোখতার, রদ্দুর মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ছয় মাস বনে মাঠে চরাইয়া এবং বাকী ছয় মাস ঘাস আনিয়া খাওয়াইলে ইহা চরা জানোয়ার হইবে না। নিয়ত ছিল ঘাস সংগ্রহ করিয়া খাওয়াইবে অথবা উহার দ্বারা কোন কাজ লইবে, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না বরং বনে জঙ্গলে চরিতে চরিতে বৎসর শেষ হইয়া গেল। এই অবস্থায় উহার যাকাত দিতে হইবে। যদি ব্যবসার জন্য রাখিয়া থাকে এবং ছয় মাস অথবা উহার চেয়ে বেশী সময় মাঠে চরানো অবস্থায় রাখিয়াছে তাহাতে উহা চরা হইবে না। যতক্ষণ সে উহা চরা হওয়ার নিয়ত না করিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ব্যবসার জন্য ক্রয় করিয়াছিল। তৎপর উহা 'ছায়েমা' করিয়া দিল। এখন এই সময় হইতে যাকাতের জন্য বৎসর হিসাব করিতে হইবে, ক্রয়ের সময় হইতে নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে 'ছায়েমা' পশু ঐ সব বস্তুর পরিবর্তে বিক্রি করিয়া ফেলিল, যে বস্তুর যাকাত ফরজ হয়, এবং যদি পূর্ব হইতে এই বস্তু নেছাব পরিমাণ তাহার নিকট না থাকে উক্ত বিক্রির সময় হইতে ইহার বৎসর হিসাব করিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ওয়াকফের জানোয়ার এবং জেহাদের ঘোড়ার যাকাত নাই। অনুরূপ অন্ধ অথবা হস্ত পদ কাটা জানোয়ারেরও যাকাত নাই। অবশ্য অন্ধ জানোয়ার যদি মাঠে চরিতে থাকে তবে ফরজ হইবে। অনুরূপ নেছাবে যদি অসম্পূর্ণ থাকে এবং অন্ধটি মিশ্রিত করিলে পূর্ণ হয় এই অবস্থায় যাকাত ফরজ হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তিন রকম জানোয়ারের যাকাত ফরজ-যখন চরা হইবে। (১) উট (২) গরু (৩) বকরী। অতএব ইহার নেছাব বিস্তারিত বর্ণনা করার পর অন্যান্য মাসয়ালা সমূহ বর্ণনা করা হইবে।

উটের যাকাত

মাসয়ালাঃ- ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে- পাঁচটি উটের কমে যাকাত ফরজ হয় না। উটের যাকাতের বিস্তারিত বর্ণনা ছহীহ বুখারীর ঐ হাদীসে আছে যাহা হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে।

১। পাঁচ উটের কমে যাকাত নাই, যথা- পাঁচ অথবা পাঁচের চাইতে বেশী হয়। কিন্তু পঁচিশের চাইতে কম, তবে প্রত্যেক পাঁচটির পরিবর্তে একটি বকরী যাকাত দিতে হইবে। অর্থাৎ পাঁচটি হইলে একটি বকরী, দশটি হইলে দুইটি বকরী, এইভাবে হিসাব করিবে।

২। যাকাতের বকরী এক বৎসরের চেয়ে কম হইতে পারিবে না। পাঠা, খাসী, বকরী যাহা ইচ্ছা দিতে পারে। (রদ্দুল মোহতার)

৩। দুই নেছাবের মধ্যে যাহা তাহা মাফ, উহার যাকাত নাই, যথা- উট সাতটি অথবা আটটি আছে, এ অবস্থায়ও উক্ত একটি বকরীই দিতে হইবে।

(দুররুল মোখতার)

বাংলাদেশে উটের মাসয়ালার প্রয়োজন না থাকায় উট সম্বন্ধে বিস্তারিত আর কিছু লেখা হইল না।

মহিষ ও গরুর যাকাত

আবূ দাউদ, তিরমিজী, নাছায়ী এবং দারামী প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, যখন হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায (রাঃ) কে ইয়ামেনের হাকীম নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, তখন তাঁহাকে ফরমাইলেন যে- প্রত্যেক ত্রিশটি গরুর যাকাত হিসাবে একটি "তাবীয়া" গ্রহণ করিবে এবং প্রত্যেক চল্লিশটির একটি মোছেন্ন অথবা মোছেন্না আদায় করিবে। এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মাসয়ালাঃ- ছায়েমা মহিষ গরুর ত্রিশটির কমে যাকাত ফরজ হয় না। যখন ত্রিশটি গরু পূর্ণ হইবে তখন ইহার যাকাত এক তাবি অথবা তাবিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসর বয়সের গরুর বাচ্চা হউক অথবা মাদী একটি দিতে হইবে। চল্লিশটি হইতে একটি মোছেন্ন বা মোছেন্না অর্থাৎ দুই বৎসরের গরু নয় মাদী যাহাই হয় দিতে হইবে। এইভাবে ৫৯ পর্যন্ত। ৬০টি পূর্ণ হইলে দুইটি এক বৎসরের বাচ্চা দিতে হইবে। তৎপর প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি এক এক বৎসরের বাচ্চা এবং প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি দুই বৎসরের বাচ্চা দিতে হইবে। যথা ৭০ টিতে একটি এক বৎসরের এবং একটি দুই বৎসরের মোট দুইটি বাচ্চা দিতে হইবে। এবং ৮০টি হইলে দুইটি দুই বৎসরের দিতে হইবে। এইভাবে হিসাব করিবে। যেখানে ত্রিশ এবং চল্লিশ উভয়টিই হইতে পারে, যেমন ১২০টি গরু আছে। এখানে যদি ত্রিশের হিসাবে দেয় তবে ৪টি এক বৎসরের বাচ্চা দেওয়া লাগে এবং চল্লিশ হিসাবে গণনা করা হয়, তবে তিনটি দুই বৎসরের বাচ্চা দিতে হয়। এখানে দাতা যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন।

মাসয়ালাঃ- মহিষ গরুরই হুকুম রাখে শরীয়তে এই দুই পদকে একই হুকুমে ধরা হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি গরু মহিষ দুই পদ কাহার থাকে, তবে যাকাত উভয় পদই মিশ্রিত করা হইবে। যথা কাহার ২০টি গরু এবং ১০টি মহিষ আছে ইহার উপর যাকাত ফরজ হইয়া গিয়াছে। যাকাত বেশী পদ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ গরু বেশী হইলে গরুর বাচ্চা গ্রহণ করিবে। মহিষ বেশী হইলে, মহিষের বাচ্চা গ্রহণ করিবে। যদি উভয় পদ সমান হয় তাহা হইলে যাকাত হিসাবে উহা লইবে যাহা মধ্যম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নহে এবং একেবারে নিকৃষ্টও নহে।

মাসয়ালাঃ- গরু মহিষের যাকাত নর মাদী যেটা ইচ্ছা লইতে পারে, উৎকৃষ্ট এই যে গাভীর সংখ্যা বেশী হইলে মাদী বাচ্চা এবং বলদের সংখ্যা বেশী হইলে নর বাচ্চা গ্রহণ করা। (আলমগীরী)

ছহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন তাহাকে বাহরাইনে পাঠাইলেন তখন যাকাতের ফরজগুলি যাহা হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহাকে লিখিয়া দিলেন,

উহাতে বকরীর নেছাবের বর্ণনাও আছে; এবং ইহাও উহাতে আছে যে, যাকাতে একেবারে বৃদ্ধা বকরী অথবা দোষণীয় অথবা পাঠা যেন দেওয়া না হয়। অবশ্য যাকাত আদায়কারী ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারে; এবং যাকাত হইতে বাচ্চার জন্য ভিন্ন ভিন্নগুলিকে একত্র করিবে না এবং একত্রিতগুলিকেও ভিন্ন করিবে না।

মায়সালাঃ- চল্লিশটি বকরীর কমে যাকাত ফরজ হয় না। চল্লিশটি হইলে একটি বকরী দিতে হইবে। ১২০টি বকরী পর্যন্ত মাত্র একটি বকরীই দিতে হইবে; এবং ১২১টি হইলে দুইটি বকরী দিতে হইবে এইভাবে ২০১ হইলে তিনটি দিবে; এবং ইহার পর ৪০০ শতে ৪টি ইহার পর প্রত্যেক এক শতকে একটি বকরী দিতে হইবে। দুই নেছাবের মধ্যে যতটা থাকিবে সেইগুলি মাফ। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ইহার যাকাত বকরী বা বকরা অর্থাৎ নর মাদী যাহাই ইচ্ছা দিতে পারে। কিন্তু পূর্ণ এক বৎসরের বয়সের কম হইতে পারিবে না । যদি এক বৎসরের বয়সের কম হয়, তবে মূল্য হিসাবে দিতে পারে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ভেড়া, দুম্বা, বকরীর হুকুমের ভিতরই গণ্য। এক শ্রেণী দ্বারা নেছাব পূর্ণ না হইলে অপর শ্রেণী মিশ্রিত করিয়া নেছাব পূর্ণ করিবে এবং ভেড়া দুম্বা দ্বারা যাকাতও আদায় করিতে পারে। তবে এক বৎসরের কম না হওয়া চাই।

(দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- পশুসমূহের বংশ মাতার হিসাবে হয় যেমন নর হরিণ এবং ছাগীর মিলনে বাচ্চা হইয়াছে। এই বাচ্চা বকরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং নেছাবে যদি একটি অভাব থাকে তবে ইহা দ্বারা পূরণ করিবে। এবং পাঠা ও মাদী হরিণের মিলন দ্বারা বাচ্চা হইলে হরিণই ধরিবে। ইহা যাকাতের মালের মধ্যে গণ্য হইবে না। কেননা হরিণের যাকাত নাই। অনুরূপ জঙ্গলী গাভী এবং পোষা ষাড়ের মিলনে বাচ্চা হইলে উহা গরুর শামিল ধরা যাইবে না। অবশ্য জঙ্গলী বলদ এবং পোষা গাভীর দ্বারা বাচ্চা হইলে গরুর শামিল হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে সব পশুর যাকাত ফরজ উহা অন্ততঃ এক বৎসরের হওয়া চাই, যদি সবগুলি এক বৎসরের চেয়ে কম বয়সের হয় তাহা হইলে উহার যাকাত ফরজ নহে। তবে উহার ভিতর একটিও যদি পূর্ণ এক বৎসরের হয় তাহা হইলে সবই উহার অধীন হিসাবে গণ্য হইবে এবং যাকাত ফরজ হইয়া যাইবে। যথা চল্লিশটি এক বৎসরের কম বয়সের বকরীর বাচ্চা খরিদ করিল এ অবস্থায় ক্রয়ের সময় হইতে এক বৎসরে যাকাত ফরজ হইবে না। কেননা সেই সময় নেছাবের উপযোগী ছিল না; বরং উহার ভিতর যে কোন একটির যখন পূর্ণ বৎসর হইবে তখন হইতে বৎসর আরম্ভ হইবে। ঐরূপ যদি তাহার নিকট নেছাব পরিমাণ বকরী থাকে এবং ছয় মাস শেষ হওয়ার পর উহার চল্লিশটি বাচ্চা হইল তৎপর বকরীগুলি শেষ হইয়া গেল। শুধু বাচ্চাগুলি রহিয়া যায়। এ অবস্থায় বৎসর পূর্ণ হওয়ার সময় এইগুলি নেছাবের উপযোগী নহে। অতএব

যাকাত ফরজ নহে। (জওহারা)

মাসয়ালাঃ- তার নিকট একদল উট, গরু এবং বকরী সবই আছে কিন্তু এক শ্রেণীও নেছাব পরিমাণ নহে বা কোন জাত নেছাব পরিমাণ এবং কোন জাত নেছাব পরিমাণ নহে। এই অবস্থায় নেছাব পূর্ণ করার জন্য মিশ্রিত করিবে না; এবং যাকাত ফরজ হইবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাত হিসাবে মধ্যম পদের পশু গ্রহণ করিবে, বাছিয়া উৎকৃষ্ট নহে। তবে তাহার নিকট যদি সবই উৎকৃষ্ট থাকে তবে উহাই লইবে এবং গাভীন ও ঐসব পশু যাহা খাওয়ার জন্য মোটা তাজা করিয়াছে তাহা আদায় করিবে না এবং যে সব মাদী পশু স্বীয় বাচ্চাগুলিকে দুগ্ধ খাওয়ায় তাহাও আদায় করিবে না; এবং পাঠাও আদায় করিবে না। (দুররুল মোখতার, আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে বয়সের পশু দেওয়া ফরজ হইয়াছে তাহা তাহার নিকট নাই বরং তার চেয়ে উৎকৃষ্ট আছে তাহা হইলে তাহাই দিবে এবং অতিরিক্ত মূল্য ফেরত লইবে। কিন্তু যাকাত আদায়কারীর উপর উহা লওয়া ফরজ নহে। যদি সে সেইটা না লয় এবং ঐ পশু চায় যাহা তাহার উপর ফরজ হইয়াছে তবে সে উহার মূল্য চাইতে পারে। যে বয়সের পশু দেওয়া ফরজ তাহা নাই, আছে তার চেয়ে কম বয়সের। এ অবস্থায় উহাই দিয়া দিবে এবং যাহা কম পড়িয়াছে তার মূল্য দিয়া দিবে। অথবা যাহা ফরজ হইয়াছিল তারই মূল্য দিয়া দিবে। উভয় প্রকারই করিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- ঘোড়া গাধা এবং খচ্চর চরা হইলেও উহার যাকাত নাই। অবশ্য ব্যবসার জন্য হইয়া থাকিলে উহার মূল্য ধরিয়া উহার ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করিবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- দুই নেছাবের মাঝের পশুগুলি যাহা মাফ উহার যাকাত নাই। অর্থাৎ বৎসর শেষ হওয়ার পর উক্ত মাফ পশুগুলি নষ্ট হইয়া যায় তাহাতে যাকাত কোন কমি হইবে না এবং যাকাত ফরজ হওয়ার পর যদি নেছাব নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে উহার যাকাতও মাফ হইয়া যাইবে। নষ্ট প্রথমতঃ দুই নেছাবের মধ্যবর্তী মাফ পশুগুলির প্রতি আরোপিত হইবে। উহা হইতে বাঁচিলে উহার সংমিশ্রিত নেছাবের প্রতি আরোপিত হইবে তৎপর বাঁচিলে ইত্যাদি, যেমন ৮০টি বকরীর চল্লিশটি মারা গেল, এখনও এক বকরী ফরজ রহিয়াছে, কেননা চল্লিশের পর বাকী চল্লিশ মাফ। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- দুইটি বকরী যাকাত দেওয়া ফরজ। সে মোটাতাজা একটি বকরী দিয়া দিল যাহার মূল্য উভয় বকরীর সমান ইহাতে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (জওহারা)

মাসয়ালাঃ- মালেকে নেছাব বৎসর শেষ হওয়ার পর করজ দিয়া দিল অথবা ধার দিল, তেজারতের মালের পরিবর্তে বিক্রি দিল এবং যাহাকে দিয়াছে সে অস্বীকার করিল, তাহার নিকট কোন প্রমাণও নাই অথবা সে মারা গেল এবং ওয়ারিসের জন্য কিছু রাখিয়া যায় নাই। ইহাতে সে হালাক করে নাই অতএব যাকাত মাফ হইয়া গিয়াছে; এবং

বৎসর শেষ হওয়ার পর যদি তেজারতের মাল বিহীন কোন বস্তুর পরিবর্তে বিক্রি দেয় অর্থাৎ উহার পরিবর্তে যাহা লইয়াছে উহা দ্বারা তেজারত উদ্দেশ্য নহে, যথা- খেদমতের জন্য গোলাম অথবা পরিধান করার জন্য কাপড় ক্রয় করিল অথবা চরা জানোয়ার চরা জানোয়ারের পরিবর্তে বিক্রি দিল এবং যাহার নিকট বিক্রি দিয়াছে সে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে ওদিকে কোন সাক্ষীও নাই অথবা সে মরিয়া গিয়াছে এবং ওয়ারিস রাখিয়া যায় নাই। ইহা হালাক নহে বরং হালাক করা হইয়াছে অতএব যাকাত ফরজ। বৎসর শেষ হওয়ার পর তেজারতের মাল স্ত্রীর মোহর হিসাবে দিয়া দিল অথবা স্ত্রী নিজ নেছাবের পরিবর্তে স্বামী হইতে "খোলা" গ্রহণ করিল এ অবস্থায় যাকাত দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- তাহার নিকট টাকা জমা ছিল যাহার এক বৎসর অতীত হইয়াছে এখন যাকাত দেয় নাই। সে উহা দ্বারা ব্যবসার মাল খরিদ করিলে পর উহা হালাক হইয়া গেল। ইহার যাকাত মাফ হইয়া গিয়াছে। তবে যদি বেশী মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে এবং যত বেশী মূল্যে লোকে খরিদ করুক না কেন তাহা হইলেও আসল মূল্যের পর অতিরিক্ত মূল্য যাহা দিয়াছে তাহার যাকাত মাফ হইবে না। কেননা সে উহা হালাক করিয়াছে। হালাক হয় নাই এবং তেজারতের জন্য যদি ক্রয় করিয়া না থাকে, যেমন খেদমতের জন্য গোলাম ক্রয় করিল এবং এই গোলাম মারা গেল এই অবস্থায় উক্ত টাকার যাকাত মাফ হইবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- মুসলমান বাদশা যদিও সে জালেম অথবা বিদ্রোহী হউক, চরা জানোয়ারের যাকাত আদায় করতঃ ঠিক জায়গায় খরচ করিলে যাকাত আদায় হইবে। অন্যথা পুনঃ আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- যাকাত আদায়কারীর সাক্ষাতেই চরা জানোয়ার বিক্রি দিয়া ফেলিল। এখন সে যাকাত পরিমাণ মূল্যও লইতে পারে, তাহা হইলে বিক্রি শুদ্ধ হইয়া যাইবে অথবা যে জানোয়ার যাকাতের জন্য দেওয়া ফরজ তাহাই আদায় করিতে পারে। এই অবস্থায় যেটি আদায় করিবে সেইটির বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না এবং যাকাত আদায়কারী যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে বরং বেচাকেনার স্থান হইতে খরিদ্দার এবং বিক্রেতা যখন বেচাকেনার কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া যায় তখন সে উপস্থিত হয়, এই অবস্থায় সে জানোয়ার লইতে পারিবে না বরং যে জানোয়ার ফরজ হইয়াছে উহার মূল্য আদায় করিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ৮০টি বকরী আছে এই অবস্থায় যাকাতের জন্য একটি আদায় করিবে। এইগুলিকে ৪০/৪০ দুই ভাগ করিয়া দুইটি বকরী আদায় করা যাইবে না। অনুরূপ দুই ব্যক্তির ৪০টি করিয়া বকরী আছে, এখানে এই দুইজন স্বীয় বকরী গুলি একত্র করিয়া দিতে পারিবে না; বরং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুইটি আদায় করিবে। অনুরূপ যদি একজনের নিকট থাকে ৩৯টি এবং অপরজনের নিকট থাকে ৪০টি এখানে যাহার ৩৯টি

আছে তাহার নিকট হইতে কিছুই লওয়া যাইবে না। মোটের উপর একত্রিতগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন গুলিকে একত্রিত করা চলিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- পশু জানোয়ারের ভিতর শরীক হওয়া দ্বারা যাকাতের মাসয়ালার কোন পরিবর্তন আসে না, যে ধরনেরই হউক না কেন। প্রত্যেকের অংশ যদি নেছাব পরিমাণ হয় তবে প্রত্যেকের উপরই যাকাত ফরজ হইবে এবং অপরজনের নহে, তখন যাহার নেছাব পরিমাণ আছে তাহারই যাকাত দিতে হইবে অপরজনের নহে। কাহারও যদি পূর্ণ নেছাব না থাকে, তবে অবশ্য একত্র করা দ্বারা নেছাব পূর্ণ হয়। এই অবস্থায় কাহারও উপর যাকাত ফরজ নহে। (আলমগীরী ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ- ৮০টি বকরীর ২জন মালিক। একজন প্রত্যেকটি বকরীর অর্ধেকের মালিক। এই হিসাবে ইনি মোটের উপর ৪০টি বকরীর মালিক। অংশীদারগণ প্রত্যেকে এক বকরীর অর্ধেকের মালিক মাত্র। এই অবস্থায় কাহারও যাকাত ফরজ নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- কতিপয় শরীকের একত্রিত বকরীগুলির যাকাত একত্রিত ভাবে দেওয়া হইল। এখানে প্রত্যেকের অংশ হিসাবে তাহার যাকাত আদায় হইবে। তাহার অংশ হইতে যাহা অতিরিক্ত দেওয়া হইবে অন্য শরীক হইতে তাহা সে ফেরত লইবে, যথা- একজনের ৪১টি বকরী আছে, অপর শরীকের ৮২টি, মোট ১২৩টি বকরী হইল এবং যাকাত হিসাবে দুইটি বকরী আদায় করা হইল। অর্থাৎ প্রত্যেকের পক্ষ হইতে একটি দেওয়া হইল। এখানে কিন্তু একজন ৩ এর ১ অংশ এবং অপরজন ৩ এর ২ অংশের মালিক। অতএব উক্ত যাকাতের বকরী দুইটির প্রত্যেকটি বকরীর ভিতর একজনের ৩ এর ১ অংশ এবং অপরজনের ৩ এর ২ অংশ আদায় হইতেছে। প্রত্যেক বকরীর ভিতর যাহার ৩এর ২ অংশ তাহার দেওয়া হইল ৩ এর ২ অংশ, যাহার মোট হইল ৩ এর ১ অংশ এবং পূর্ণ এক বকরী। ৩ এর ১ অংশীদারের গেল প্রত্যেক বকরীর ভিতর ৩ এর ১ অংশ যাহার মোট হইল ৩ এর ২ অংশ এবং ইহার উপর ফরজ এক বকরী। অতএব ৩ এর ২ অংশের মালিক ৩ এর ১ অংশীদার হইতে ৩ এর ১ অংশ লওয়ার অধিকারী। যদি মোট বকরী ৮০টি হয়, একজন ৩ এর ২ অংশের মালিক। অপরজন ৩ এর ১ অংশের মালিক এবং যাকাতের হিসাবে এক বকরী লওয়া হইল, এখানে যিনি ৩ এর ১ অংশের মালিক তিনি নিজ অংশীদার হইতে ৩ এর ১ অংশের মূল্য আদায় করিবে। কেননা তাহার যাকাত ফরজ নহে।

সোনা রূপা এবং তেজারতী মালের যাকাত

আবূ দাউদ এবং তিরমিজী শরীফে আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন- ঘোড়া এবং দাস দাসীর যাকাত আমি মাফ করিয়াছি তবে রূপার যাকাত প্রত্যেক চল্লিশ

দেরহামে আদায় কর। তবে ১৯০ দেরহামে কিছুই নাই (যাকাত নাই) যখন ২০০ শত দেরহাম হইবে তখন ৫ দেরহাম দিবে।

আবূ দাউদে দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেক ৪০ দেরহামে এক এক দেরহাম যাকাত তবে ২০০ শত দেরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরজ নহে। যখন ২০০ শত দেরহাম হইবে ৫ দেরহাম দিবে এবং উহার চাইতে বেশী হইলে উক্ত হিসাবে দিবে।

তিরমিজী শরীফে আছে- দুইটি মেয়েলোক হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দরবারে হাজির হইলেন, তাহাদের হাতে সোনার বলয় ছিল, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন তোমরা ইহার যাকাত দাও কি? তদুত্তরে তাহারা বলিল, না। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন তোমরা কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে অগ্নির বলয় পরাইয়া দিবেন? তাহারা বলিল, না। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন তবে উহার যাকাত আদায় কর। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হযরত উম্মুল মোমেনীন উম্মে ছালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন- আমি সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করিতাম আমি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, ইহা কি কানজ। যার বিষয় কুরআন পাকে শাস্তির বাণী রহিয়াছে? ইহার উত্তরে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন যে, উহা যদি যাকাতের সোনার নেছাব পরিমাণ পৌছে এবং যাকাত আদায় করিয়া দেয় তবে "কানজ" হইবে না।

আবূ দাউদ (রহঃ) হযরত ছামুরাবিন জুনদাব হইতে বর্ণনা করেন যে, আমাকে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন যে, যাহা আমি বেচার-তেজারতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখি তার যাকাত যেন আদায় করি।

মাসয়ালাঃ- সোনার নেছাব ২০ "মেছকাল" অর্থাৎ ৭.৫০ তোলা এবং চান্দীর নেছাব ২০০শত দেরহাম অর্থাৎ ৫২.৫০ তোলা অর্থাৎ ঐ তোলা যাহা বর্তমান প্রচলিত টাকার ১১.২৫ মাশা হয়। সোনা চান্দীর যাকাত ওজনের হিসাব ধরিতে হইবে মূল্যের নহে। যথা- সাত তোলা সোনা অথবা উহার চাইতে কম সোনার অলঙ্কার অথবা পাত্র উহার শিল্পায়ন এবং নিপুণতার কারণে মূল্য ৫২.৫০তোলা চান্দীর মূল্যের বেশী হইয়া যায়। অথবা সোনার নেছাবের চেয়ে কম স্বর্ণের মূল্য ৫২.৫০ তোলা চান্দীর মূল্য হইতে বাঁচিয়া যায়। যেমন আজ কাল ৭.৫০ তোলা স্বর্ণের মূল্য চান্দীর কয়েক নেছাবের সমান হইয়া যায় এবং মোটের উপর ওজনের হিসাবে নেছাব পরিমাণ না হইলে যাকাত ফরজ হইবে না, মূল্য যাহাই হউক।

অনুরূপ স্বর্ণের যাকাতে স্বর্ণের কোন জিনিষ এবং চান্দীর যাকাতে চান্দীর কোন জিনিষ যদি দেওয়া হয় তবে উহার মূল্য ধর্তব্য নহে, ওজন ধরিতে হইবে। যদিও উহার

নিপুণতার কারণে মূল্য বাড়িয়া যাইয়া থাকে।

মাসয়ালাঃ- উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাকাত আদায় করিতে মূল্য ধর্তব্য নহে। উহা যখন স্বর্ণ চান্দীর যাকাত স্বর্ণ এবং চান্দী দ্বারা আদায় করা হইবে তখন। কিন্তু যদি স্বর্ণের যাকাত চান্দী দ্বারা এবং চান্দীর যাকাত স্বর্ণ দ্বারা আদায় করা হয় তখন মূল্য ধরিতে হইবে। যেমন স্বর্ণের যাকাতে চান্দীর কোন বস্তু দিবে যাহার মূল্য এক আশরাফী এইক্ষেত্রে এক আশরাফী দেওয়াই হইল। যদিও ওজন হিসাবে ঐ চান্দী ১৫ টাকা পরিমাণও না হয়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- স্বর্ণ চান্দী যখন নেছাব পরিমাণ হইবে তখন উহার যাকাত দিতে হইবে। শুধু স্বর্ণ চান্দী হউক অথবা উহার মুদ্রা হউক যেমন টাকা আশরাফী অথবা উহার কোন বস্তু তৈয়ার হউক, ব্যবহারে জায়েয হউক যেমন স্ত্রী লোকের জন্য অলঙ্কার এবং পুরুষের জন্য এক নাগীনার ৪.৫০ মাশা ওজনের কম চান্দীর আংটি অথবা স্বর্ণ রূপার বিনা শিকলের বোতাম এই সব ব্যবহার জায়েয। অথবা যেইগুলির ব্যবহার জায়েয নাই যথা স্বর্ণ রূপার পাত্র, ঘড়ি, সুর্মাদানী ছলাই বা শলাকা এই সবগুলির ব্যবহার স্ত্রী পুরুষ সকলেরই জন্য হারাম। অথবা পুরুষের জন্য সোনা চান্দীর আংটি, অথবা অলংকার অথবা স্বর্ণের আঙ্গুটি অথবা ৪.২৫ মাশার বেশী চান্দীর আঙ্গুটি অথবা কতিপয় আঙ্গুটি অথবা কতিপয় নাগীনার আঙ্গুটি মোটের উপর যাহা কিছু হউক সবগুলিরই যাকাত ফরজ। যেমন ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ আছে তাহা হইলে ২ মাশা স্বর্ণ যাকাত দেওয়া ফরজ অথবা ৫২ তোলা ৬ মাশা চান্দী আছে তাহা হইলে ১ তোলা ৩ মাশা ৬ রতি চান্দী যাকাত দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- স্বর্ণ রৌপ্য ছাড়া ব্যবসার কোন বস্তু যাহার মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের নেছাব পরিমাণ হইবে উহার যাকাত ফরজ হইবে। অর্থাৎ মূল্যের ৪০ ভাগের ১ ভাগ দিতে হইবে। ব্যবসার মালের মূল্যে নেছাব পরিমাণ নাই তবে তাহার নিকট উহা ছাড়া স্বর্ণ রৌপ্যও আছে তাহা হইলে উহার মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের সঙ্গে মিলাইয়া একত্রিত করিবে, যদি সবগুলি নেছাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ফরজ হইবে; এবং ব্যবসার মালের মূল্য দেশী প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে হিসাব করিবে। যথা পাক-ভারতের টাকার দেশী প্রচলন রহিয়াছে, ইহার দ্বারা মূল্য ধরিবে। যদি কোন দেশে স্বর্ণ রৌপ্য উভয় প্রকারের মুদ্রা সমান প্রচলন থাকে, তবে যেটি ইচ্ছা সেইটির দ্বারা মূল্য হিসাব করিতে পারে। তবে যখন টাকা দ্বারা নেছাব পূর্ণ হয় না এই অবস্থায় যেটি দ্বারা নেছাব পূর্ণ হইবে সেইটি দ্বারা হিসাব করিবে এবং উভয় মুদ্রা দ্বারা যদি নেছাব পূর্ণ হয়, তবে একটি দ্বারা নেছাব পূর্ণ হইয়াও নেছাবের চাইতে ৫ এর ১ অংশ বৃদ্ধি হয় অপরটি দ্বারা বৃদ্ধি হয় না তখন যাহা দ্বারা নেছাব হইয়াও ৫ এর ১ অংশ বৃদ্ধি হয় তাহা দ্বারাই মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে।

(দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- নেছাব হইতে মাল আরও বেশী আছে। তবে এই অতিরিক্ত যদি

নেছাবের ৫ এর ১ অংশ পরিমাণ হয় তবে এই ৫ এর ১ অংশেরও যাকাত ফরজ। যেমন ২৪০ দেরহাম অর্থাৎ ৬৩ তোলা চান্দি যদি হয় তবে যাকাতে ৬ দেরহাম দেওয়া ফরজ, অর্থাৎ ১ তোলা ৬ মাশা ৭ সমস্ত ৫ ভাগের ১ অংশ রতি দিবে অর্থাৎ ৫২ তোলা ৬ মাশার পর প্রত্যেক ১০ তোলা ৬ মাশার যাকাত ৩ মাশা ৫ ভাগের ১ ভাগ না হয় তাহলে এই অতিরিক্তের যাকাত মাফ। যেমন স্বর্ণের ৯ তোলায় এক তোলা ১ রতিও যদি কম হয় তাহা হইলে যাকাত উক্ত ৭ তোলা ৬ মাশারই দিতে হইবে অনুরূপ চান্দী ৬৩ তোলা হইতে ১ রতিও যদি কম হয়, তবে যাকাত উক্ত ৫২ তোলা ৬ মাশার ১ তোলা ৩ মাশা ৬ রতিই দিতে হইবে। ঐরূপ ৫ এর ১ অংশের যাহা অতিরিক্ত হইবে তাহারও যদি নেছাবের ৫ এর ১অংশ হয় তবে উহারও ৪০ এর ১ অংশ যাকাত ফরজ অন্যথা মাফ। তেজারতের মালেরও ঐরূপ হুকুম। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- সোনা চান্দীর ভিতর যদি কৃত্রিম থাকিয়া থাকে তবে অধিকাংশ সোনা চান্দী হইলে সোনা চান্দীই ধরিতে হইবে এবং সবগুলির উপর যাকাত ফরজ। অনুরূপ কৃত্রিম যদি সোনা চান্দীর সমান সমান হয় তখন যাকাত ফরজ কিন্তু যদি কৃত্রিম অধিকাংশ হয় তখন উহা সোনা চান্দী নহে। ইহা বিভিন্নরূপ হইতে পারে, ইহার মধ্যে সোনা চান্দী যদি এতটা হয় যাহা ভিন্ন করিলে নেছাব পরিমাণ হয়। অথবা উহা নেছাব পরিমাণ হয় না তবে ইহার নিকট আরও মাল আছে যাহা মিলিয়া নেছাব পূর্ণ হয় অথবা উহার মূল্য হিসাবে প্রচলিত এবং উহার মূল্য নেছাব পরিমাণ হইয়া যায়, তবে এইসব অবস্থাতেই যাকাত দিতে হইবে এবং এইসব কোন ছুরত যদি না হয়, তবে উহার দ্বারা যদি ব্যবসার নিয়ত থাকে, তবে তেজারতের শর্ত সাপেক্ষ উহার তেজারতের মালে পরিগণিত হইবে। এবং উহার মূল্য যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে শুধু উক্ত মাল অথবা অন্যান্য আরও মালের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় তাহা হইলে যাকাত ফরজ অন্যথা নহে।

(দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- সোনা চান্দী একত্র মিশাইয়া ফেলিয়াছে এই অবস্থায় যদি স্বর্ণ অধিকাংশ হইয়া থাকে, তবে স্বর্ণই ধরিতে হইবে; এবং উভয় প্রকার যদি সমান হয় এবং স্বর্ণ নেছাব পরিমাণ হয় শুধু উহা দ্বারাই অথবা রৌপ্যসহ তখনও সোনাই ধরিতে হইবে এবং রৌপ্য অধিকাংশ হইলে রৌপ্যই ধরিতে হইবে। নেছাব পরিমাণ হইলে চান্দীরই যাকাত দিতে হইবে, তবে যদি যতটুকু সোনা আছে উহার মূল্য চান্দীর মূল্য হইতে বেশী হয় তখনও উহা সোনাই ধরিতে হইবে।

(দুররুল মোহতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- কাহারও নিকট সোনা আছে এবং চান্দীও আছে এবং উভয়টাই পূর্ণ নেছাব পরিমাণ আছে। এই অবস্থায় সোনাকে চান্দী এবং চান্দীকে সোনা ধরিয়া যাকাত দেওয়া প্রয়োজন নাই বরং প্রত্যেকটির যাকাত ভিন্ন ভিন্ন ফরজ। তবে যাকাত দাতা যদি একই বস্তু দ্বারা উভয় নেছাবের যাকাত দিতে চায়, তবে দিতে পারে। এই অবস্থায় যে

যাকাতে ফকীরগণের বেশী উপকার হইবে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা তাহার উপর ওয়াজিব। যথা- পাক-ভারতে আশরাফীর চাইতে টাকার প্রচলন বেশী। অতএব সোনার মূল্য চান্দী দ্বারা করিয়া চান্দীই যাকাত হিসাবে দিবে; এবং স্বর্ণ রৌপ্যের কোন একটি যদি নেছাব পরিমাণ না থাকে তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অথবা রৌপ্যের কোন একটিও যদি নেছাব পরিমাণ না থাকে তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ রৌপ্য অথবা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ স্বর্ণ হিসাবে মিলাইবে। এই মিলানের পরও যদি নেছাব না হয়, তাহা হইলে দেওয়া লাগিবে না; এবং যদি সোনার মূল্য চান্দীর সঙ্গে মিশায়, তবে নেছাব হয় এবং চান্দীর মূল্যের স্বর্ণ স্বর্ণের সঙ্গে মিশাইলে নেছাব না হয় অথবা ইহার বিপরীত, এই অবস্থায় যাহাতে নেছাব পূর্ণ হয় সেইটা করাই ওয়াজিব এবং উভয় অবস্থায় যদি নেছাব পূর্ণ হইয়া যায়, তবে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। তবে যদি এক অবস্থায় নেছাবের ৫ এর ১ অংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে যে অবস্থায় ৫ এর ১ অংশ বৃদ্ধি পায় তাহাই করা ওয়াজিব। যথা- ২৬.২৫ তোলা চান্দী আছে এবং ৩.৭৫ তোলা স্বর্ণ আছে। এই অবস্থায় ৩.৭৫ তোলা স্বর্ণের চান্দী যদি ২৬.৭৫ তোলা হয় এবং ২৬.২৫ তোলা চান্দীর স্বর্ণ ৩.৭৫ তোলা হয় তবে সোনাকে চান্দী অথবা চান্দীকে সোনা যাহা ইচ্ছা ধরিতে পারে। এবং ৩.৭৫ তোলা স্বর্ণের পরিবর্তে ৩৭ তোলা চান্দী পাওয়া যায় এবং ২৬.২৫ তোলা চান্দী দ্বারা ৩.৭৫ তোলা স্বর্ণ না পাওয়া যায়, এ অবস্থায় স্বর্ণকে চান্দী ধরিয়া হিসাব করা ওয়াজিব। কেননা এই অবস্থায় নেছাব হইয়া যায় বরং ৫এর ১ অংশ আরও বৃদ্ধি পায় এবং অন্য ছুরতে নেছাবও পূর্ণ হয় না। অনুরূপ প্রত্যেক পদ যদি নেছাব হইতে কিছু বেশী হয়, এই অবস্থায় যাহা বেশী তাহা যদি নেছাবের ৫এর ১ অংশ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ইহারও যাকাত দিতে হইবে। প্রত্যেক পদে যাহা বেশী তাহা যদি ৫ এর ১ অংশ হইতে কম হইয়া থাকে তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পদ মিশাইবে। যদি মিলানোর পর কোন নেছাবের ৫ এর ১অংশ না হয় তবে এই অতিরিক্ত যাহা তার যাকাত নাই; এবং উভয়টিতে নেছাব অথবা নেছাবের ৩ এর ২ অংশ যদি হয় তখন তাহার ইখতিয়ার। কিন্তু একটিতে যদি নেছাব হয় এবং অপরটিতে ৫ এর ১ অংশ তাহা হইলে যাহা করিলে নেছাব হয় তাহাই করিবে। এবং যদি একটিতে নেছাব অথবা ৫ এর ১ অংশ হয় এবং অপরটি না হয় তাহা হইলে উহাই করা ওয়াজিব যাহাতে নেছাব অথবা নেছাবের ৫ এর ১ অংশ হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- চালু পয়সা যদি ৫২.৫০ তোলা অথবা ৭.৫০ তোলা স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ হয়, তবে উহার যাকাত ফরজ। যদি তেজারতের জন্য না হয় এবং যদি উহা অচল হইয়া পড়ে তাহা হইলে যতক্ষণ তেজারতের জন্য না হইবে ততক্ষণ যাকাত ফরজ হইবে না। বর্তমান বিশ্ব বাজারে প্রচলিত নোটের যাকাতও ফরজ যতদিন উহা চালু থাকে। ইহাও ব্যবহারিক মূল্য হিসাবে গণ্য এবং পয়সারই হুকুমের শামিল।

মাসয়ালাঃ- যে মাল অপরকে করজ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে, উহার যাকাত কখন

ফরজ হইবে এবং কখন আদায় করিতে হইবে ইহার ভিতর তিন ছুরত আছে-

(১) دين قوى (২) دين متوسطة (৩) دين ضعيف যদি প্রথম নম্বরের ঋণ (دين قوى) হয়, যথা- করজ এবং তেজারতের মালের মূল্য যেমন কোন মাল তেজারতের নিয়তে খরিদ করিল এবং উহা কাহারো নিকট বাকী বিক্রয় করিল অথবা তেজারতের কোন মালের কেরায়া যেমন কোন ঘর অথবা জমিন ব্যবসার নিয়তে খরিদ করিল এবং উহা কাহাকেও বসবাস অথবা ফসল করার জন্য কেরায়ায় দিল, এই কেরায়া যদি তার উপর ঋণ হয়, তবে ইহা (دين قوى) প্রথম নম্বরের ঋণ হইবে এবং এই প্রথম নম্বরের ঋণের যাকাত ঋণ অবস্থায়ই বৎসর বৎসর ফরজ হইতে থাকিবে; তবে আদায় করা তখনই ফরজ হইবে যখন নেছাব ৫ এর ১ অংশ উসুল হইবে এবং যত আদায় হইবে ততই যাকাত আদায় করিতে হইবে। অর্থাৎ চল্লিশ দেরহাম উসুল হইলে এক দেরহাম যাকাত আদায় করিতে হইবে; ৮০ দেরহাম আদায় হইলে দুই দেরহাম দিতে হইবে। এইভাবে হিসাব করিয়া আদায় করিবে।

দ্বিতীয় রকমের ঋণ- (دين متسوط) কোন তেজারত বিহীন মালের বদল, যথা- খোরাকীর শস্য অথবা সওয়ারীর ঘোড়া বা খেদমতের গোলাম এবং অন্য কোন বস্তু যাহা তাহার আছলী হাজতের বস্তু বিক্রি দিল এবং মূল্য ক্রয়কারীর নিকট বাকী। এই অবস্থায় যাকাত দেওয়া ফরজ হইবে। যখন ২০০ দেরহাম হস্তগত হইবে, ঐরূপ যদি মৃত ব্যক্তি কর্তৃক পদত্ত করজ কেহ ত্যাজ্য সূত্রে পাইয়াছে, যদিও উহা তেজারতের মালের পরিবর্তে হইয়া থাকে। কিন্তু ওয়ারিস যথা- ২০০ শত দেরহাম উসুল করিতে পারিবে এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর এক বৎসর অতিবাহিত হইলে যাকাত ফরজ হইবে।

তৃতীয় রকম- (دين ضعيف) বা দুর্বল ঋণ। যাহা মাল ছাড়া অন্য কোন বস্তুর পরিবর্তে হইবে, যথা- স্ত্রীর মহর, খোলার বদল অথবা ঘর বা দোকান যাহা তেজারতের নিয়তে ক্রয় করে নাই উহার কেরায়া কেরায়াদারের নিকট বাকী রহিয়াছে, ইহার যাকাত ফরজ হইবে যখন অন্ততঃ নেছাব পরিমাণ হস্তগত হওয়ার পরদিন বৎসর শেষ হইয়া যায়। অথবা তাহার নিকট উক্ত পদের কোন নেছাব আছে এবং উহার বৎসর পূর্ণ হইলেই যাকাত দেওয়া ফরজ হইবে।

১ম ও ২য় রকমের ঋণের অর্থ যদি কতিপয় বৎসর পর উসুল হয়, তবে ১ম বৎসরের যাকাত যাহা তার উপর ঋণ রূপে ছিল পরবর্তী বৎসর হইতে তাহা বাদ যাইবে যথা- যায়েদ আমর হইতে ৩০০ দেরহাম (دين قوى) ১ম নম্বরের ঋন পাওনা আছে। পাঁচ বৎসর পর যদি ৪০ দেরহাম কম উসুল হয় তবে কিছুই দিতে হইবে না। যদি ৪০ দেরহাম উসুল হয় তবে এক দেরহাম দেওয়া ফরজ। এখন ৩৯ দেরহাম রহিল

ইহা নেছাবের (২০০ দেরহামের) ৫ এর ১ অংশ নহে উহার চাইতে কম অতএব বাকী বৎসর সমূহের যাকাত এখন দেওয়া ফরজ নহে। এবং তিন শত দেরহাম যদি ২য় শ্রেণীর (دين متوسط) ঋণ হইয়া থাকে তাহা হইলে যতদিন ২০০ শত দেরহাম উসুল না হয় তবে কিছুই দেওয়া লাগিবে না। এবং পাঁচ বৎসর যদি ২০০ শত দেরহাম উসুল হয় তবে ২১ দেরহাম দিতে হইবে। ১ম বৎসরের ৫ দেরহাম, এখন দ্বিতীয় বৎসরে ১৯৫ দেরহাম বাকী রহিল। ইহার থেকে ৩৫ দেরহাম যেহেতু উহা নেছাবের ৫এর ১ অংশের চাইতে কম সেই জন্য উহার যাকাত মাফ। এখন ১৬০ রহিল, ইহার ৪ দেরহাম ফরজ। অতএব তৃতীয় বৎসরে ১৯১ রহিল, ইহাতেও ৪ দেরহাম ফরজ। ৪র্থ বৎসরে রহিল ১৮৭ দেরহাম এবং ৫ম বৎসরে ১৮৩ দেরহাম রহিল ইহাতেও ৪+৪ দেরহাম ফরজ। অতএব মোট ২১ দেরহাম আদায় করা ফরজ রহিল।

(দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ঋণের পূর্ব বৎসর নেছাব চালু ছিল। এ অবস্থায় কাহারও থেকে ঋণ পাওয়া হইয়াছে ইহার বৎসর পূর্ব চলিত নেছাবের সঙ্গে ধরিবে। ঋণের অধিকারী হওয়ার সময় থেকে নহে এবং ঋণের পূর্বে যদি অনুরূপ বস্তুর নেছাব চালু না থাকিয়া থাকে, তবে ঋণের অধিকারী হওয়ার সময় হইতে বৎসর গণ্য হইবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- কাহার উপর ১ম বা দ্বিতীয় নম্বরের ঋণ পাওনা ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় উক্ত ঋণের যাকাতের জন্য অসিয়ত করা জরুরী নহে। কেননা উহার উপর যাকাত আদায় করা ফরজই নহে। এবং ওয়ারিসের উপর যাকাত ঐ সময় বর্তিবে যখন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় থেকে এক বৎসর শেষ হইবে এবং (دين قوى) ১ম নম্বরের ঋণে ৪০ দেরহাম এবং (دين متوسط) ২য় নম্বরের ঋণে দুই শত দেরহাম উসুল হইবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- বৎসর শেষ হওয়ার পর মালিক ঋণের টাকা মাফ করিয়া দিল অথবা বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে যাকাতের মাল হেবা করিয়া দিল, এ অবস্থায় যাকাত মাফ হইয়া যাইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- স্ত্রী মহরের টাকা উসুল করিয়া লইল। বৎসর শেষ হইয়া যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে দেখা সাক্ষাতের পূর্বে তালাক দিয়া দিল, এই অবস্থায় অর্দ্ধেক মহর ফেরত দিতে হইবে এবং যাকাত পুরা মহরের ফরজ এবং স্বামীর উপর ফেরত পাওয়ার পর থেকে বৎসর হিসাব করা হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ব্যবসার মালে বৎসর শেষে যাহা মূল্য হইবে তাহাই ধরিতে হইবে। কিন্তু শর্ত এই যে, বৎসরের প্রথমে উহার মূল্য ২০০ শত দেরহামের কম না হওয়া চাই। এবং বিভিন্ন ধরনের মাল হইয়া থাকিলে সবগুলির মূল্য ৫২.৫০ তোলা চান্দী অথবা ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ পরিমাণ হওয়া চাই। (আলমগীরী) অর্থাৎ যখন তাহার নিকট

শুধু এই মালই থাকে এবং উহা ছাড়া যদি তাহার নিকট আরও সোনা চান্দী থাকে তাহা হইলে উক্ত মালের মূল্য ইহার সঙ্গে মিলাইয়া হিসাব করিবে।

মাসয়ালাঃ- শস্য অথবা তেজারতের মাল বৎসর শেষ হওয়া কালে ২০০ শত দেরহামের আছে। তৎপর বাজার বাড়িয়া কমিয়া গেল, এখন যদি উহার দ্বারা যাকাত দিতে চায় তাহা হইলে উক্ত দিন যত ছিল উহার ৪০ এর ১ অংশ যাকাত দিবে। এবং যদি উহার মূল্যের অন্য কোন বস্তু দিতে চায় তবে ঐ বস্তু ধরিতে হইবে যাহা বৎসর শেষ হওয়ার দিন ছিল; এবং ঐ বস্তু বৎসর শেষ হওয়ার দিন ভিজা ছিল এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখনও উক্ত সময় যেরূপ ছিল তারই মূল্য ধরিতে হইবে এবং উহা যদি উক্ত দিন শুষ্ক ছিল এখন ভিজিয়া গিয়াছে তাহা হইলে অদ্যকার মূল্য ধরিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে স্থানে মাল আছে সেই স্থানের মূল্য ধরিবে এবং মাল অনাবাদী স্থানে থাকিলে উহার নিকটে যে আবাদী স্থান আছে সেখানের মূল্য ধরিতে হইবে। (আলমগীরী) ইহা এমন অনাবাদী স্থানের যেখানে বেচা কেনা না হয় এবং যদি উক্ত অনাবাদী স্থানে খরিদ্দার যায় যথা- কাঠ এবং ঐ সমস্ত বস্তু যাহা উক্ত স্থানে পয়দা হয় তাহা হইলে যতক্ষণ মাল সেখানে পড়িয়া থাকিবে, সেখানেই মূল্য ধার্য করিবে।

মাসয়ালাঃ- কেরায়া দেওয়ার জন্য ডেগ সমূহ আছে উহার যাকাত নাই। অনুরূপ কেরায়ার ঘরেরও যাকাত নাই। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ঘোড়ার ব্যবসা করে উহার জন্য ঝুল লেগাম এবং রশী ইত্যাদি এই জন্য ক্রয় করিয়াছে যে, উহা দ্বারা ঘোড়াগুলির হেফাজত করিবে এই সবগুলির যাকাত দিতে হইবে না এবং এই জন্য যদি খরিদ করিয়া থাকে যে, ঐগুলি ঘোড়ার সহিত বিক্রি দিবে তা'হইলে এইগুলিরও যাকাত দিতে হইবে। রুটি তৈয়ার করিল, রুটি পাকানের জন্য জ্বালানী কাষ্ঠ ক্রয় করিল অথবা রুটির ভিতর দেওয়ার জন্য নিমক খরিদ করিল এই কাষ্ঠ এবং নিমকের যাকাত দেওয়া লাগিবে না; এবং রুটির উপর ছিটানের জন্য তৈল খরিদ করিয়া থাকিলে তৈলেরও যাকাত ফরজ। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কেউ নিজের ঘর তিন বৎসরের জন্য বাৎসরিক ৩০০ শত দেরহামের উপর কেরায়া দিল ইহা ছাড়া তাহার নিকট আর কিছুই নাই; এবং যাহা কেরায়া বাবদ মাস মাস আসিতেছে সে সবই জমা রাখিতেছে এইভাবে আট মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে নেছাবের মালিক হইয়া গেল। কেননা ৮ মাসে ২০০শত দেরহাম কেরায়া বাবদ হইল অতএব অদ্য হইতে যাকাতের বৎসর আরম্ভ হইবে; এবং বৎসর পূর্ণ হইলে ২০ মাস হইবে যাহার কেরায়া বাবদ হইবে ৫০০ শত দেরহাম। অতএব ৫০০ শত দেরহামের যাকাত দিতে হইবে। ইহার পর যদি আরও এক বৎসর শেষ হয়, তবে মোট দেরহাম হইবে ৫০০ + ৩০০= ৮০০ শত দেরহাম এই ৮০০ শত দেরহামের যাকাত দিবে। কিন্তু ১ম বৎসরের যাকাতের ১২.৫০ দেরহাম কম করা হইবে। (আলমগীরী) বরং ৮০০ শত দেরহামের ৪১ দেরহাম কমের যাকাত ফরজ হইবে। কেননা ৪০

দেরহামে যাকাত নাই বরং উহা মাফ।

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তির নিকট মাত্র ১০০০ হাজার দেরহাম আছে, অন্য কোন মাল নাই। সে বাৎসরিক একশত দেরহামের ১০ বৎসরের জন্য ঘর কেরায়া লইয়া মালিককে অগ্রিম ১০ বৎসরের কেরায়া হিসাবে এক হাজার টাকা দিয়া দিল এই অবস্থায় ১ম বৎসর ৯০০ শত দেরহামের যাকাত দিবে। দ্বিতীয় বৎসর ৮০০ শত হইতে প্রথম বৎসরের ২২.৫০ দেরহাম বাদ দিয়া ৭৭৭.৫০ দেরহামের যাকাত দিবে। এইভাবে প্রত্যেক বৎসরের কেরায়া বাবৎ ১০০শত দেরহাম এবং পূর্বের যাকাতের টাকা বাদ দিয়া যাহা আছে উহার যাকাত দিতে হইবে; এবং ঘরের মালিকের নিকটও যদি উক্ত হাজার টাকা ছাড়া অন্য কিছু না থাকিয়া থাকে, তবে দুই বৎসর পর্যন্ত কিছুই দিতে হইবে না। দুই বৎসর শেষ হওয়ার পর এখন ১০০ শতের মালিক হইল, তিন বৎসর শেষ হইলে তিন শতের যাকাত দিতে হইবে। এইভাবে প্রত্যেক বৎসর একশতের যাকাত বৃদ্ধি পাইবে। তবে পূর্বের বৎসরের যাকাতের টাকা বাদ দিয়া বাকীগুলির যাকাত দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- টাকার পরিবর্তে খানা, শস্য, কাপড় ইত্যাদি ফকীরকে দিয়া মালিক বানাইয়া দিল ইহাতে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। ইহাতে বাজার দর হিসাবে উহার মূল্য ধার্য হইবে, অতিরিক্ত খরচ যথা বাজার হইতে আনয়নের জন্য যাহা মজুরী লাগিয়াছে অথবা গ্রাম হইতে আনয়নের খরচা ইত্যাদি উহা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না, অথবা পাক করান হইয়াছে ইহার মজুরী এবং জ্বালানী কাঠের মূল্য উহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে না; বরং উক্ত পাকান বস্তুর মূল্য যাহা বাজার ধার্য আছে উহাই ধরিতে হইবে। (দুররুল মোখতার ও আলমগীরী)

(عاشر) আশের

মুসলমান বাদশা যাহাকে বিভিন্ন রাস্তা ঘাটে ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে যাকাত আদায় করার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাকে আরবী ভাষায় (عاشر) আশের বলা হয়। "আশের" মুসলমান আজাদ হইতে হইবে হাশেমী হইতে পারিবে না; এবং চোর ডাকাত হইতে মাল হেফাজত করার ক্ষমতা থাকা চাই। (বাহার)

মাসয়ালাঃ- কোন পথিক যদি বলে যে, আমার এই মালের এবং যাহা বাড়ীতে আছে কোন মালেরই বৎসর শেষ হয় নাই। অথবা বলে যে ইহা আমার মাল নহে বরং আমার নিকট আমানত, শরীকি মুনাফার উপর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায় শর্ত এই, উহাতে মুনাফা অতটা না হওয়া চাই যাহাতে তাহার অংশ নেছাব পরিমাণ হইয়া যায়। অথবা নিজকে মজদুর, মোকাতাব ও মাজুন বলিয়া প্রকাশ করে। অথবা বলে যে, এই মালের যাকাত নাই যদিও কারণ বর্ণনা না করে। অথবা বলে যে, আমার ঋণ আছে

যাহা এই মালের সমান। অথবা ঋণ যাহা আছে তাহা বাহির করিলে নেছাব থাকিবে না। অথবা বলে যে, অন্য "আশেরকে" ইহার যাকাত আদায় করিয়া দিয়াছি; এবং সে যাহাকে দিয়াছে বলে সে সত্যিই "আশের" এই আশেরও জানে যে, যাহার নাম বলিয়াছে সে সত্যই "আশের" অথবা বলে যে, নিজ শহরে ফকীরগণকে উহার যাকাত পরিশোধ করিয়া দিয়াছি; এবং নিজের বর্ণনার উপর হলফও করে, তবে তাহার কথা মানিয়া লইবে। উহার নিকট রশিদ চাওয়ার দরকার করে না। কেননা রশিদ কখন কখন জালও হইয়া থাকে এবং কখন ভুলে রশিদ লওয়া হয় না এবং কখনও হারানও যায়। অথবা রশিদ দেখান হওয়ার পর যদি যে আশেরের নাম বলিয়াছে উহাতে তাহার নাম পাওয়া না যায় তখনও হলফ লইয়া তার কথা মানিয়া লইবে। কয়েক বৎসর পর যদি প্রমাণ হয় সে মিথ্যা বলিয়াছে তাহা হইলে এখন তাহার নিকট যাকাত আদায় করা হইবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার ও আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ২০০শত দেরহামের কমের মাল লইয়া ব্যবসায়ী হাজির হইলে তাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করা হইবে না। সে মুসলমান জিম্মী অথবা হরবী যাহাই হউক না কেন। তাহার ঘরে আরও মাল থাকার কথা জানা থাকুক বা নাই থাকুক। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মুসলমান হইতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জিম্মী হইতে বিশ ভাগের এক ভাগ এবং হরবী হইতে বিশ ভাগের এক অংশ আদায় করিবে। (তানবীর)

মাসয়ালাঃ- সদ্য নষ্ট হয় এমন বস্তু নিয়া ব্যবসায়ী "আশেরের" নিকট হাজির হইল, যথা- ফল, তরকারী, খরবুজা, তরমুজ, দুধ ইত্যাদি। যদিও উহার মূল্য নেছাব পরিমাণ হয়, তবু উহা হইতে ১০ এর ১ অংশ ওশর লওয়া যাইবে না। তবে সেখানে যদি ফকীর পাওয়া যায়, তাহা হইলে যাকাত উসুল করতঃ ফকীরগণকে ভাগ দিবে।

(দুররুল মোখতার ও আলমগীরী)

মাসয়ালা- মাল বেশী মনে করিয়া "আশের" যাকাত আদায় করিল, তৎপর জানা গেল যে, যতটা যাকাত আদায় করা হইয়াছে ততটা মাল ছিল না। এই অবস্থায় যতটা অতিরিক্ত লইয়াছে তাহা আগামী বৎসরের হিসাবে গণ্য করিবে। এবং ইচ্ছাকৃতভাবে লইয়া থাকিলে ইহা যাকাত হিসাবে গণ্য হইবে না, কেননা ইহা জুলুম। (খানিয়া)

খনি ও গুপ্তধন

ছহীহ বুখরী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, খনির ৫ এর ১ অংশ।

মাসয়ালাঃ- খনি হইতে লৌহ, শীসা, তামা, পিতল, সোনা, চান্দী পাওয়া গেলে উহা হইতে ৫ এর ১ অংশ আদায় করা হইবে, বাকী যে পাইয়াছে তাহার। যিনি পাইয়াছেন তিনি আজাদ, কৃতদাস, মুসলমান, জিম্মি স্ত্রী পুরুষ বালেগ বা নাবালেগ যাহাই

হউক। যে জমিনে পাওয়া গিয়াছে তাহা খেরাজী জমি বা ওশরী জমি যাহাই হউক।
(আলমগীরী)

ইহা যখন জমির কেহ মালিক না হয়, যথা- অনাবাদী স্থান অথবা পাহাড়। জমির যদি কোন মালিক থাকে, তবে সবগুলিই মালিক পাইবে, উহা হইতে ৫এর ১ অংশ আদায় করা যাইবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ফিরোযা ইয়াকুত, জমররদ এবং অন্যান্য মণিমুক্তা সুরমা, ফিটকারী, চুনা, মতি এবং নিমক ইত্যাদি গলিত বস্তুর ৫এর ১অংশ দিতে হইবে না।
(রদ্দুল -মোহতার, দুররুল-মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ফিরোযা, ইয়াকুত, জমরদ ইত্যাদি মণিমুক্তা ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ব হইতে প্রথিত ছিল এবং এখন বাহির হইল ইহার ২ এর ১ অংশ লইবে কেননা ইহা গনিমতের মাল। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- মূর্তি এবং উহা যাহা কিছু নদী হইতে বাহির হয়, যদিও সোনা যাহা পানির নীচে ছিল। যদি উহার ভিতর ইসলামী চিহ্ন না থাকে, তবে উহা যে পাইয়াছে সেই পাইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যেই গুপ্তধনের ভিতর ইসলামী চিহ্ন পাওয়া যাইবে উহা টাকা হউক অথবা হাতিয়ার, ঘরে আসবাবপত্র ইত্যাদি ইহা পতিত মাল হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ মসজিদ, বাজার সমূহে শোহরত করিতে হইবে। অতদিন পর্যন্ত যখন আর উহার অন্বেষণকারী পাওয়া যাইবে না বলিয়া পূর্ণ ধারণা জন্মে। তৎপর উহা মিসকীনকে দিয়া দিবে এবং নিজে ফকীর হইলে নিজেও খরচ করিতে পারে। উহার ভিতর যদি কুফরী চিহ্ন থাকে, যেমন ভুতের ছবি অথবা কাফের বাদশার নাম তাহা হইলে উহা হইতে ৫ এর ১ অংশ লওয়া হইবে, বাকী যে পাইয়াছে তাহাকে দিবে। নিজের জমিনে পাইয়া থাকুক অথবা অন্যের জমিনে কিংবা মোবাহ জমিনে।
(দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- হরবী কাফের গুপ্তধন পাইয়া থাকিলে তাহাকে কিছুই দেওয়া হইবে না।

মাসয়ালাঃ- গুপ্ত মালের ভিতর ইসলামী এবং কুফরী কোন চিহ্ন না থাকিলে কুফরী যামানার ধরিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ৫ এর ১ অংশ মিসকীনগণের হক, ইসলামী বাদশা তাহাদিগকে দান করিবে। যে পাইয়াছে সে যদি নিজেই গরীব মিসকীনকে দান করিয়া দেয় তাহাও জায়েয হইবে। বাদশার সংবাদ হইলে উহাই ঠিক রাখিবে। মাতা-পিতা অথবা সন্তান-সন্ততি যদি মিসকীন হয় উহাদিগকে ৫ এর ১ অংশ দিতে পারে ইহাও জায়েয।
(দুররুল-মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

ফসল ও ফলের যাকাত

আল্লাহ তায়ালা জাল্লাশানুহু ফরমাইয়াছেন- واتوا حقه يوم حصاده

অর্থাৎ- ফসল কাটার দিন উহার হক আদায় কর। ছহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- যে সব জমিন আসমান অথবা ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত করা হইয়াছে অথবা ওশরী হউক অর্থাৎ নহরের পানি যাহা সিক্ত করা হইয়াছে উহার ১০ এর ১ অংশ যাকাত দিতে হইবে। যেই জমি প্রাণী দ্বারা পানি টানিয়া সিক্ত করা হয় উহাতে ২০ এর ১ অংশ যাকাত দিতে হইবে। হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- যে সব বস্তু জমিনে উৎপন্ন হয় উহার ১০ এর ১ অংশ অথবা ২০ এর ১ অংশ যাকাত দিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- জমি তিন রকমের। (১) ওশরী (২) খেরাজী এবং (৩) যাহা ওশরীও নহে এবং খেরাজীও নহে। প্রথম এবং তৃতীয় রকমের জমির হুকুম একই, অর্থাৎ- ১০ এর ১ অংশ দিতে হইবে। পাক-ভারতের মুসলমানগণের জমিনগুলি খেরাজী ধরা যাইবে না, যতক্ষণ কোন নির্দিষ্ট জমি খেরাজী হওয়ার শরীয়তানুযায়ী প্রমাণ না হইবে।

ওশরী হওয়ার কারণ সমূহ

১। যে সব দেশ মুসলমানগণ জয় করার পর যোদ্ধাগণের ভিতর উহার জমি বন্টন করিয়া দিয়াছে।

২। যে দেশের লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই।

৩। ওশরী জমির সংলগ্ন পতিত জমি যাহাতে কৃষি করা হইতেছে।

৪। যে সব পতিত জমিতে কৃষি আরম্ভ করিয়াছে যাহা দূরত্ব হিসাবে ওশরী ও খেরাজী জমির সমান সমান।

৫। যে জমি ওশরী পানি দ্বারা সিক্ত করা হইয়াছে।

৬। যে জমি খেরাজী ওশরী উভয় পানি দ্বারা সিক্ত করা হইয়াছে।

৭। যে সব জমি মুসলমান নিজের বাসস্থানকে বাগান অথবা ক্ষেত বানাইয়া ওশরী পানি দ্বারা সিক্ত করিয়াছে।

৮। ওশরী এবং খেরাজী উভয় পানি দ্বারা সিক্ত করিয়াছে।

৯। যে ওশরী জমি কাফের জিম্মি ক্রয় করার পর কোন মুসলামান হক্কে "শোফয়া" দ্বারা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে।

১০। যে জমি ক্রয়মুক্ত হইয়াছে।

১১। যে জমি 'খেয়ারে শর্ত' অথবা 'খেয়ারে রুইয়াত' দ্বারা ফেরত হইয়াছে। অথবা খেয়ারে আয়েবের কারণে কাজীর হুকুমের ফেরত হইয়াছে।

খেরাজী হওয়ার কারণ সমূহ

১। যে জমি যুদ্ধ দ্বারা দখল করার পর সেখানকার লোকের উপর দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের নিকট ফেরত দেওয়া হইয়াছে। ২। যে জমি অন্য কাফেরগণকে দেওয়া হইয়াছে। ৩। যেই দেশ সন্ধির দ্বারা দখল হইয়াছে। ৪। কোন জিম্মি মুসলমান হইতে ওশরী জমি ক্রয় করিলে। ৫। খেরাজী জমি মুসলমান ক্রয় করিলে। ৬। জিম্মি মুসলমান বাদশার আদেশে অনুর্বর জমি আবাদ করিয়াছে।

৭। যে অনুর্বর জমি জিম্মিকে দেওয়া হইয়াছে। ৮। যে জমি মুসলমানই আবাদ করিয়াছে কিন্তু উহা খেরাজী জমি সংলগ্ন ৯। খেরাজী পানি দ্বারা জমি সিক্ত হইয়াছে। ১০। খেরাজী জমি যদি ওশরী পানি দ্বারাও সিক্ত করা হয়, তবে খেরাজীই থাকিয়া যাইবে।

খেরাজী ওশরী কোনটাই নহে, যেমন মুসলমানগণ দখল করিয়া নিজেদের চিরদিনের জন্য ভোগ দখলে রাখিল অথবা উক্ত জমির মালিক মারা গিয়াছে এবং জমি বায়তুল মালের স্বত্ব হইয়া গিয়াছে।

মাসয়ালা- খেরাজ খাজনা দুই প্রকার ১। খেরাজে মোকাছামা (خـــــراج مــقــاســمــه) উৎপন্ন ফসলের কোন একটা অংশ ২ এর ১ অর্দ্ধেক, অথবা একতৃতীয়াংশ অথবা চতুর্থাংশ ইত্যাদি নির্দিষ্ট হওয়া যেমন হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বরের ইহুদিগণের সম্পদে ধার্য করিয়াছিলেন।

২। খেরাজে মোয়াজ্জাফ (خراج مـؤظـف) যাহার নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ ধার্য করা হয়, যেমন বাৎসরিক বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট টাকা ধার্য করিয়া দেওয়া। যেরূপ হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) ধার্য করিয়াছিলেন।

মাসয়ালাঃ- যে দেশ ইসলামী রাষ্ট্র নহে সেইখানকার লোকগণ নিজেরাই ফকীর মিসকীনকে ওশর দান করিয়া দিবে।

মাসয়ালাঃ- "ওশর" ফরজ হওয়ার জন্য জ্ঞানী এবং বালেগ হওয়া শর্ত নহে বরং পাগল এবং নাবালেগের জমি হইতেও ওশর আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- স্বেচ্ছায় না দিলে মুসলমান বাদশাহ বা রাষ্ট্রনায়ক জবরদস্তীভাবে উহা আদায় করিবে, এই অবস্থায়ও ওশর আদায় হইবে- তবে ছওয়াব হইতে মাহরূম হইবে। খুশীতে আদায় করিলে ছওয়াবও পাইবে। (আলমগীরী ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ- ওশরের জন্য বৎসর শেষ হওয়া শর্ত নহে; বরং বৎসরে একই ক্ষেতে যদি কয়েক বার ফসল উৎপন্ন হয়, তবে প্রত্যেক বারই যাহা কিছু হয় উহার ১০ এর ১ অংশ দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ওশরের জন্য নেছাব শর্ত নহে, জমিতে যাহা কিছু হইবে উহার ওশর দিতে হইবে, কৃষক জমির মালিক হউক বা নাই হউক।

মাসয়ালাঃ- যে ক্ষেত বৃষ্টি অথবা নহর নালার দ্বারা সিক্ত হয় উহার ১০ এর ১ ভাগ দিতে হইবে। যে জমিতে বালতি ইত্যাদি দ্বারা পানি দেওয়া হয় উহাতে ২০ এর ১ অংশ দেওয়া ফরজ এবং পানি ক্রয় করিয়া যদি জমিতে দেওয়া হয়, সে অবস্থাতেও ২০ এর ১ অংশ দিতে হইবে। সে ঐ জমি যদি কতক দিন বৃষ্টির পানি এবং কতক দিন বালতির দ্বারা পানি দেয় সে অবস্থায় যদি অধিকাংশ দিন বৃষ্টির পানি পায় তবে ১০ এর ১ অংশ ফরজ অন্যথা ২০ এর ১ অংশ দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ওশরী জমিতে অথবা পাহাড় জঙ্গলে মধু হইয়াছে উহারও ১০ এর ১ অংশ দিতে হইবে। অনুরূপ পাহাড় এবং জঙ্গলের ফলেরও ১০ এর ১ অংশ ফরজ, যখন ইসলামী বাদশাহ, হরবী ডাকাত এবং বিদ্রোহীগণ হইতে উহার হেফাজত করিবে। অন্যথা কিছুই দিতে হইবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- আসমান, কূপ, ঝর্ণা এবং নদীর পানি ওশরী এবং যে নহর আজমি লোকেরা খনন করিয়াছে উহার পানি খেরাজী। কাফেরগণ কূপ খনন করার পর মুসলমানগণের দখলে আসিলে অথবা খেরাজী জমিনে খনন করিলে উহাও খেরাজী হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ক্ষেত-খামার রোপণ করা হইয়াছে, কিন্তু ফসল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যথা- ক্ষেত ডুবিয়া গিয়াছে বা জ্বলিয়া গিয়াছে, এই স্থলে "ওশরী" "খেরাজী" উভয়টিই মাফ হইয়া যাইবে যদি সবই নষ্ট হইয়া থাকে। যদি কিছু বাকী থাকে তাহা হইলে উক্ত বাকী যাহা আছে কেবল উহারই ওশর আদায় করিতে হইবে; এবং যদি ফসল পশু জানোয়ারে খাইয়া নষ্ট করে তাহা হইলে মাফ হইবে না; এবং মাফ হওয়ার জন্য ইহাও শর্ত যে, উক্ত বৎসর উক্ত ফসলের পর অন্য কোন ফসল তৈয়ার হইতে পারিবে না; এবং ইহাও শর্ত যে, ফসল ভাঙ্গা এবং কাটার পূর্বে নষ্ট হওয়া, অন্যথা মাফ হইবে না।

(রদ্দোল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- খেরাজী জমি কেউ গছব করিয়া নিয়া গছবের কথা অস্বীকার করে এবং মালিকের নিকট সাক্ষীও নাই, এই জমিনে ফসল করিলে গাছেব অর্থাৎ আত্মসাৎকারী জবরদখলকারীরই খাজনা দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- (بيع وفا) অর্থাৎ যে বিক্রির ভিতর শর্ত রহিল যে, বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিবে তখন ক্রেতাও বিক্রয় ফেরত দিবে। খেরাজী জমি এইভাবে কাহারো নিকট বিক্রি দিলে জমি যদি বিক্রেতার দখলে থাকে, তবে খাজনা তারই দিতে হইবে; এবং ক্রেতার দখলে যদি হয়, সে উহাতে ফসলও বপন করিয়া থাকে, তবে খাজনা ক্রেতারই দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ফসল তৈয়ার হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রি দিল এই অবস্থায় "ওশর" ক্রেতাকে দিতে হইবে। যদিও ক্রেতা শর্ত লাগাইয়াছে যে, ফসল পাকান পর্যন্ত কাটা হইবে না বরং ক্ষেতেই থাকিবে: এবং বিক্রির সময় যদি ফসল তৈয়ার হইয়া থাকে তাহা

হইলে ওশর বিক্রেতার উপর এবং জমি ফসল উভয়টি অথবা শুধু জমি বিক্রি দিল এবং এই অবস্থায় পুরা হইতে এতদিন বাকী যাহাতে ফসল হইতে পারে। তাহা হইলে খাজনা খরিদ্দারের উপর অন্যথা বিক্রেতার উপর। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ওশরী জমি ভাগের উপর লাগাইল এই অবস্থায় ওশর উভয়কেই দিতে হইবে; এবং খেরাজী জমি যদি ভাগের উপর দেয় তবে খাজনা মালিককেই দিতে হইবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- নগদ অর্থের পরিবর্তে যে জমি লাগান হয়, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে উহার ওশর জমির মালিকের উপর কিন্তু হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) এবং মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে কৃষকের উপর। আল্লামা শা'বী বলেন যে, যামানার হিসাবে বর্তমানে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতের উপর আমল চলিতেছে।

মাসয়ালাঃ- গভর্নমেন্টকে যে রাজস্ব দেওয়া হইতেছে ইহা দ্বারা শরীয়তী খেরাজ আদায় হয় না বরং উহা জমির মালিকের জিম্মায়। উহা আদায় করা জরুরী; এবং খাজনা ব্যয় করার স্থান শুধু ইসলামী সৈন্য নহে বরং সর্বসাধারণ মুসলমানের যাবতীয় শুভ কাজে ব্যয় করিতে পারে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে মসজিদ মেরামত, মসজিদের খরচ, ইমাম মুয়ায্যিনের অজীফা এবং দ্বীনি বিদ্বা যাহারা শিক্ষা দিবেন সেই সব ওস্তাদগণের বেতন। দ্বীনি বিদ্বা শিক্ষার্থীগণের সাহায্য এবং আহলে সুন্নাত আলেম যাহারা দ্বীনের তায়ীদ করেন তাহাদের খেদমতে। যাহারা ওয়াজ নসীহত করেন এবং দ্বীনি বিদ্বা শিক্ষা দিতেছেন অথবা ফতোয়ার কাজে লিপ্ত আছেন। পোল ও মুসাফিরখানা তৈয়ারের কাজেও খরচ করিতে পারে।

যাকাতের মাল খরচ করার স্থান

আল্লাহ তায়ালা জাল্লা শানুহু এরশাদ করিতেছেন-

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله

وابن السبيل فريضة من الله- والله عليم حكيم-

"ছদকা সমূহ ফকীর এবং মিসকীনগণের জন্য এবং ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা এই কাজে নিযুক্ত এবং ঐ সব লোক যাহাদের অন্তর জয় উদ্দেশ্য এবং গোলাম আযাদ করিতে এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহর রাস্তায় ও মুসাফিরের জন্য। ইহা আল্লাহর তরফ হইতে নির্ধারিত এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।"

হাদীসঃ ১। আবূ দাউদ শরীফে জিয়াদ বিন হারেস ছাওরী (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে- আল্লাহ তায়ালা ছদকাহ (যাকাত) কে নবী বা অন্য কাহার হুকুমের উপর অর্পণ করেন নাই বরং তিনি স্বয়ং উহার হুকুম বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

২। ইমাম আহমদ (রহঃ) আবূ দাউদ (রহঃ) এবং হাকেম (রহঃ) হযরত আবূ দাউদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে- ধনীদের জন্য যাকাত হালাল নহে বরং পাঁচ ব্যক্তির জন্য হালাল। ১। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। ২। যে ব্যক্তি যাকাত উসুল ইত্যাদির কাজে নিযুক্ত। ৩। যে ঋণগ্রস্ত। ৪। যে নিজের মাল দ্বারা কোন যাকাতের বস্তু ক্রয় করিয়া লইল। ৫। কোন মিসকীনকে ছদকাহ যাকাত দেওয়ার পর উক্ত মিসকীন যদি কোন পড়শী মালদারকে উহা হাদিয়া দেয় ইমাম আহমদ (রহঃ)-এবং বায়হাকী (রহঃ)- এর অন্য রেওয়ায়েতে আছে মুসাফিরের জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।

৩। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত শেরে আল্লাহ আলী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে তিনি এরশাদ করিয়াছেন-ফরজ ছদকার ভিতর আওলাদ এবং পিতার হক নাই।

৪। ইমাম আহমদ (রহঃ), মুসলিম (রহঃ), মতলব বিন রবিয়া (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে- হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আওলাদের জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয নাই। কেননা ইহা লোকের অর্থের ময়লা।

৫। ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে- আমার উপর এবং আমার পরিবারবর্গের উপর আল্লাহতায়ালা যাকাত গ্রহণ হারাম করিয়া দিয়াছেন।

৬। তিরমিজী, নাসায়ী এবং হাকেম হযরত আবূ রা'ফে (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- আমার জন্য যাকাত হালাল নহে বরং যে গোলাম যাহাদের দ্বারা মুক্ত হইয়াছে সে তাহাদের।

মাসয়ালাঃ- যাকাতের "মাছরাফ" (খরচের স্থান) সাতটি। ১। দরিদ্র ২। মিসকীন ৩। আমেল ৪। রেকাব ৫। গারীম ৬। ফি-সাবীলিল্লাহ ৭। ইবনে ছাবীল।

মাসয়ালাঃ- ফকীর বা দরিদ্র ঐ ব্যক্তিকে বলে যাহার নিকট কিছু মাল আছে, তবে নেছাব পরিমাণ নহে। অথবা নেছাব পরিমাণ আছে কিন্তু উহা তার জন্য হাজতে আছলীভুক্ত। যথা-থাকার ঘর, পরিধানের বস্ত্র, খেদমতের জন্য কৃতদাসদাসী। বিদ্যার চর্চা যাহারা করেন তাহাদের দ্বীনি কিতাব সমূহ, যাহা তাহার দরকারের চেয়ে বেশী নয়। যাহার বর্ণনা পূর্বে হইয়াছে। ঐরূপ যদি সে ঋণগ্রস্ত এবং ঋণ শোধ করিলে নেছাব বাকী

না থাকে, তবে সেও ফকীর, যদিও তার নিকট কতিপয় নেছাব থাকে।

(রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ফকীর যদি আলেম হয়, তবে মুর্খকে দেওয়ার চেয়ে তাহাকেই দেওয়া উত্তম। (আলমগীরী) কিন্তু আলেমকে দিলে তাহার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আদবের সহিত দিবে যেমন ছোট বড়কে হাদিয়া দেয় এবং দ্বীনি এলেমের ঘৃণা অন্তরে আসিলে উহা ভীষণ ধ্বংসের কারণ হইবে।

মাসয়ালাঃ- যাহার নিকট কিছু নাই তাহাকে মিসকীন বলে। এমন কি খাইতে এবং শরীর ঢাকিতেও লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতে যদি বাধ্য হয় তাহার জন্য ভিক্ষা জায়েয। কিন্তু ফকীরের জন্য ভিক্ষা জায়েয নহে। কেননা যাহার নিকট খাওয়া এবং শরীর আবৃত করার মত বস্ত্র আছে তাহার জন্য বিশেষ কারণ ছাড়া ছওয়াল করা হারাম।

(আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- আমেল যাহাকে মুসলমান বাদশাহ যাকাত ওশর উসুল করার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাকে কাজের হিসাব এতটা দিতে হইবে যাহাতে তাহার এবং তাহার সহকর্মীদের মধ্যমভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়। যাহা উসুল করিয়াছে তাহার অর্ধেক হইতে বেশী দেওয়া জায়েয হইবে না। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ- আমেল ধনী হইলে নিজের কাজের উজরত (মজুরী) লইতে পারে। হাশেমী হইলে তাহাকে যাকাতের মাল দেওয়া এবং তাহার লওয়া উভয়টাই না-জায়েয। তবে যদি অন্য কোন ফান্ড হইতে হাদিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা লইতে আপত্তি নাই।

(আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যাকাতের মাল আমেলের নিকট হইতে নিখোঁজ হইলে সে কিছুই পাইবে না। কিন্তু দাতাগণের যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

(দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজে লইয়া বায়তুল মালে দিয়া আসিয়াছে, আমেল ইহার মজুরী বাবদ কিছুই পাইবে না। (আলমগীরী)

রিকাব

মাসয়ালাঃ- রিকাব এর দ্বারা মোকাতাব গোলাম ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ যে গোলাম নিজে মালিক হইতে কতক নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করার অঙ্গীকার-পত্র লিপিবদ্ধ করাইয়াছে যে, ইহা পরিশোধ করিলে সে আজাদ হইয়া যাইবে। এহেন দাসকে যাকাতের মাল দেওয়া যায় যে, উহা দ্বারা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতঃ আজাদী লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

গারীম

গারীম অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত। অর্থাৎ তার উপর এত ঋণ আছে যে, উহা পরিশোধ করিলে নেছাব বাকী থাকিবে না। যদিও সে অন্যান্যের নিকট পাওনা আছে। কিন্তু উহা আদায় করার ক্ষমতা নাই। তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হাশেমী হইলে যাকাত পাইতে পারিবে না। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

ইহার কতিপয় ছুরতঃ ১। কোন ব্যক্তি মোহতাজ ধর্ম যুদ্ধে যাইতে চাহে, কিন্তু সওয়ারী এবং পথের সম্বল তাহার নাই তাহাকে যাকাতের মাল দেওয়া যাইতে পারে ইহা আল্লাহর রাস্তা যদিও সে কামাই করার ক্ষমতা রাখে। কেহ হজ্জে যাইতে চায় কিন্তু তাহার নিকট মাল নাই। উহাকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হজ্জের জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নাই। ২। তালেবে-এলম যে দ্বীনি বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে অথবা শিক্ষা করিতে চায়, তাহাকেও যাকাত দেওয়া যাইতে পারে বরং তালেবে এলম সওয়াল করিয়াও যাকাতের মাল লইতে পারে। যখন সে দ্বীনি বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য নিজকে ওয়াকফ করিয়া থাকে। যদিও সে কামাই করিতে সক্ষম। অনুরূপ প্রত্যেক নেক কাজে যাকাত খরচ করা আল্লাহর রাস্তায় দেওয়া হইবে, যখন মালিক করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা মালিক করিয়া না দিলে যাকাত আদায় হইবে না। (দারামী অগায়রাহ)

মাসয়ালাঃ- অনেক লোক যাকাতের মাল ইসলামী মাদ্রাসা সমূহে পাঠাইয়া দেয়, ইহাদের কর্তব্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া যে, ইহা যাকাতের মাল। তাহা হইলে মোতাওয়াল্লী উক্ত মাল ভিন্ন রাখিয়া দিবে। অন্য মালের সঙ্গে মিলাইবে না এবং গরীব ছাত্রদের জন্য খরচ করিবে। উহা দ্বারা কোন কাজের উজরৎ (মজুরী) যেন না দেয়, দিলে যাকাত আদায় হইবে না।

ইবনে সাবীল

মুসাফির যাহার নিকট মাল নাই সে যাকাত গ্রহণ করিতে পারে দরকার পরিমাণ। যদিও বাড়ীতে তাহার মাল থাকে। দরকারের অতিরিক্ত লওয়ার এজাযত নাই। অনুরূপ কোন মালেকে-নেছাব যাহার মাল অন্য কেহ ঋণ রূপে নির্দিষ্ট তারিখের জন্য নিয়াছে এবং এখনও নির্দ্দিষ্ট তারিখ পূরণ হয় নাই তাহার মধ্যেই তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অথবা যাহার নিকট পাওনা সে এখানে নাই অথবা আছে কিন্তু তা পরিশোধ করিতে অপারগ। অথবা সে ঋণের পাওনা অস্বীকার করিতেছে। যদি পাওনাদারের প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে দরকার পরিমাণ যাকাত লইতে পারে। কিন্তু উৎকৃষ্ট হইতেছে যদি করজ পায় তবে করজ লইয়া কাজ সমাধা করা। (আলমগীরী ও দুররুল

মোখতার) ঋণ যদি তাৎক্ষণিক হয় অথবা নির্ধারিত সময় পুরা হইয়া থাকে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ধনী ও হাজির এবং স্বীকারও করে এ অবস্থায় যাকাত লইতে পারে না- কেননা সে ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তি হইতে লইয়া নিজ দরকার সমাধা করিতে পারে। অতএব সে অভাবগ্রস্ত নহে।

স্মরণ রাখা দরকার যে ঋণ শরীয়তানুযায়ী সর্বদা তাৎক্ষণিকই হইয়া থাকে। যখন ইচ্ছা উহার তাগাদা করিতে পারে যদিও হাজার চুক্তিপত্র রেজিষ্টারী দ্বারা উহার জন্য নির্দিষ্ট সময় ধার্য করা হয় যে, উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাগাদা করিতে পারিবে না, করিলে বাতিল এবং অগ্রাহ্য হইবে। এই সব শর্ত বাতিল এবং ঋণদাতার সর্বক্ষণ তাগাদা করার ক্ষমতা আছে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- মুসাফির অথবা ঐ মালেকে নেছাব যাহার নিজস্ব মাল অপরের নিকট ঋণ হিসাবে রহিয়াছে ঠেকা বশতঃ যাকাতের মাল গ্রহণ করিয়াছে। তৎপর নিজ মালও পাইয়াছে যেমন মুসাফির বাড়ী পৌঁছিয়াছে অথবা নেছাবের মালিক ঋণের মাল উসুল করিয়াছে। এই অবস্থায় যাকাতের অর্থের যাহা বাকী আছে তাহা অবশ্য নিজ খরচে ব্যবহার করিতে পারিবে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যাকাত দাতার ইচ্ছা এই সাত প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের লোকের দেয়, অথবা ইহাদের কাহাকে দেয়, এক প্রকারের কতিপয় লোককে দেয়, অথবা একজনকে। যাকাতের মাল নেছাব পরিমাণ না হইলে একজনকেই দেওয়া উত্তম। এক ব্যক্তিকে নেছাব পরিমাণ দেওয়া মাকরূহ। কিন্তু দিয়া থাকিলে আদায় হইয়া যাইবে। এক ব্যক্তিকে নেছাব পরিমাণ দেওয়া মাকরূহ যখন ফকীর ঋণগ্রস্ত না হইবে। ঋণগ্রস্ত হইলে অতটা দেওয়া যাহা হইতে ঋণ বাহির করার পর কিছুই থাকে না, অথবা নেছাবের চেয়ে কম থাকে তাহা হইলে মাকরূহ নহে। ঐরূপ ফকীর যদি পুত্র-পরিজনওয়ালা হয় যাহাদের ভিতর বন্টন করিলে প্রত্যেকেই নেছাবের চেয়ে কম পায়, তবে এই অবস্থায় নেছাব বা নেছাবের চেয়ে বেশী দেওয়াতে কোন দোষ নাই। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যাকাত আদায় হওয়ার জন্য দরকার যাহাকে দিবে তাহাকে মালিক বানাইয়া দেওয়া মোবাহ করিয়া দিলে যথেষ্ট হইবে না। অতএব যাকাতের মাল মসজিদে খরচ করা অথবা উহা দ্বারা মুর্দার কাফন দেওয়া, অথবা মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করা অথবা গোলাম আজাদ করা, পোল, মুসাফির খানা তৈয়ার করা, রাস্তা বানাইয়া দেওয়া, নহর অথবা কূপ খনন করিয়া দেওয়া। এই সব কাজে ব্যয় করা অথবা কিতাব ইত্যাদি খরিদ করিয়া ওয়াকফ করিয়া দিলে তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না।

(জাওহারা, তানবীর, আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ফকীরের ঋণের টাকা তাহার বলার পর যাকাতের টাকা দ্বারা শোধ করিয়া দিলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। তাহার বিনা হুকুমে পরিশোধ করিলে যাকাত আদায় হইবে না। ফকীর এজাযত দিল কিন্তু আদায় করার পূর্বে সে মারা গেল এখন

উক্ত ঋণ যদি যাকাতের মাল দ্বারা আদায় করে তবে যাকাত আদায় হইবে না। (দোররুল মোখতার) এইসব জায়গায় যাকাতের মাল খরচ করার হিলা করিতে পারে।

মাসয়ালাঃ- নিজের আছল অর্থাৎ মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ইত্যাদী এবং নিজের আওলাদ বেটা-বেটি, পোতা-পুতী, নাতী-নাতনী ইত্যাদিগণকে যাকাত দেওয়া যাইবে না। অনুরূপ রোযার ফিতরা, মান্নত এবং কাফ্ফারাও ঐ সবকে দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য নফল ছদকাহ উহাদিগকে দিতে পারে বরং তাহাদিগকেই দেওয়া উত্তম। (রদ্দুল-মোহতার ও আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- জেনার সন্তান যাহা তাহার ঔরসে পয়দা হইয়াছে অথবা ঐ সন্তান তাহার স্ত্রীর হইতে বিবাহ থাকাকালীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কিন্তু সে বলিয়াছে যে, উহা আমার হইতে নহে। এই সব ছেলেকেও যাকাতের মাল দেওয়া জায়েয হইবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- পুত্রবধু, জামাতা, বিমাতা, বিপিতা অথবা স্ত্রীর সন্তান অথবা স্বামীর সন্তানগণকে দিতে পারে এবং আত্মীয়গণের মধ্যে যাহার জীবিকা তাহার উপর ওয়াজিব তাহাকে যাকাত দিতে পারে যখন উহা জীবিকার শামিল না করে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- পিতা-মাতা অভাবগ্রস্ত ইহাদিগকে হিলা করিয়া যাকাত দিতে চাহে ইহার হিলা এই যে, যাকাত কোন ফকীরকে দিবে, ফকীর উহাদিগকে দিবে; কিন্তু এই হিলা মাকরূহ। (রদ্দোল মোহতার) অনুরূপ হিলা করে নিজের আওলাদকে দেওয়াও মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ- নিজের পিতা, দাদা ইত্যাদি এবং পুত্র বা নাতী ইত্যাদি এবং স্বামী স্ত্রীর দাস-দাসীকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারে না। যদিও তিন তালাক দেয় তবে তালাকের ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত। (দুররুল মোখতার, রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যে ব্যক্তি নেছাবের মালিক-যখন উক্ত বস্তু হাজতে আছলীর বাহিরে যেমন ঘর, ঘরের বাজে আসবাবপত্র, পরিধানের কাপড় কৃতদাস, সওয়ারীর জানোয়ার, হাতিয়ার, বিদ্বানের জন্য কিতাব সমূহ যাহা তাহার কাজের এইসব হাজতে আছলীর বস্তু। যদিও উহার বৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকে এবং উহা ছহীহ হওয়ার বস্তুও নহে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই; এবং এখানে নেছাবের অর্থ হইল যে, উহার মূল্য ২০০ শত দেরহাম হয় যদিও উহা পরিমাণে যাকাতের পরিমাণ হইতে কম হয়। যথা- ৬ তোলা স্বর্ণ, ইহার মূল্য যদিও ২০০ শত দেরহামের চেয়ে অনেক বেশী তবুও উহা যাহার আছে তাহার উপর যাকাত ফরজ হইলেও যাকাত গ্রহণ জায়েয নাই। অথবা তাহার নিকট ৩০টি বকরী আছে এবং ২০টি গরু আছে যাহার মূল্য ২০০ শত দেরহামের চেয়ে অনেক বেশী, ইহাকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে না। যদিও তাদের উপর যাকাত

ফরজ নহে। তাহার নিকট জরুরাত ছাড়া আরও আসবাব রহিয়াছে যাহা ব্যবসার জন্যও নহে। কিন্তু মূল্য কম পক্ষে ২০০ শত দেরহাম এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- সুস্থ স্বাস্থ্যবান ফকীরকে যাকাত দেওয়া জায়েয। যদিও সে কামাই করিতে সক্ষম। কিন্তু তাহার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নহে। (আলমগীরী ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ- ধনী লোকের নাবালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। কিন্তু ধনী লোকের বালেগ সন্তান যদি ফকীর হয়, তবে তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ধনী লোকের স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া জায়েয। যদি সেই স্ত্রী নেছাবের মালিক না হয়। অনুরূপ ধনীর পিতাকেও দিতে পারে যদি সে ফকীর হয়। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে স্ত্রী লোকের মোহরের অর্থ স্বামী হইতে পাওনা যদিও উহা নেছাব পরিমাণ হয়, যদিও স্বামী ধনী হইয়া থাকে। মোহর আদায় করার ক্ষমতা রাখে তবুও উক্ত স্ত্রীলোকটিকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে। (জাওহারাতুন নাইয়্যেরা)

মাসয়ালাঃ- পিতৃহীন শিশুর মাতা যদি নেছাবের মালিকও হয় তবুও সেই শিশুকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- কেহ ঘর অথবা দোকানের মালিক। এইগুলি সে কেরায়া দিয়া থাকে উহার মূল্য তিন হাজার টাকা কিন্তু কেরায়া অতটা নহে যাহা দ্বারা তাহার এবং তাহার পারিবারিক খরচের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। এহেন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে। অনুরূপ তাহার জমি আছে যাহাতে সে ফসল করে কিন্তু উৎপন্ন ফসল অতটা হয় না। যাহা বাৎসরিক খোরাকের জন্য প্রয়োজন। ইহাকেও যাকাত দিতে পারে। যদিও ক্ষেতের মূল্য ২০০ শত দেরহাম বা উহার চেয়েও বেশী হইয়া থাকে।

(রদ্দুল মোহতার, আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যাহার নিকট খোরাকীর জন্য ফসল আছে যাহার মূল্য ২০০ শত দেরহাম অথবা উহার চেয়ে বেশী এবং উক্ত ফসল বৎসরের জন্য যথেষ্ট। এই অবস্থায় তাহাকে যাকাত দেওয়া যায়। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- শীতের বস্ত্র যাহা গরমের সময় দরকার করে না এইগুলি "হাজতে আছলীর" শামিল, ঐ সব কাপড়গুলি যদিও অতি মূল্যবান হইয়া থাকে উহার মালিকও যাকাত গ্রহণ করিতে পারে। যাহার থাকার ঘরটি প্রয়োজনের চেয়ে বড় সে যাকাত গ্রহণ করিতে পারে। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- মাতা-পিতার পক্ষ হইতে মেয়েকে যাহা যৌতুক দেওয়া হয় উহা তাহারই, স্বামীর কোন অধিকার উহাতে নাই। উহার ভিতর দুই রকমের বস্তু হয়-

১। এক প্রকার যাহা তাহার দরকারী বস্তু যথা, ঘরের আসবাবপত্র, পরিধানের কাপড়, ব্যবহারের পাত্র সমূহ এই ধরনের বস্তু যত মূল্যেরই হউক উহার কারণে স্ত্রী ধনী নহে।

২। দ্বিতীয় রকমের বস্তু যাহা দরকারের চেয়ে অতিরিক্ত, সাজ-শোভার জন্য দেওয়া হয়, যথা- অলঙ্কার, দরকার ছাড়া আসবাবপত্র এবং আসা-যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত মূল্যবান বস্ত্র, ঘোড়া, এই সমস্ত বস্তুর মূল্য যদি নেছাবের পরিমাণ হয়, তবে মেয়েলোকটি ধনী, সে যাকাত গ্রহণ করিতে পারিবে না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- মণি-মুক্তা ইত্যাদি যাহার নিকট থাকে এবং ব্যবসার জন্য যদি না হয় তবে উহার যাকাত নাই। কিন্তু নেছাব পরিমাণ মূল্য হইলে সে যাকাত লইতে পারে না। (দুররুল মোখতার ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ- বনী হাশেমকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। এমনকি কোন হাশেমী অন্য হাশেমীকেও দিলে জায়েয হইবে না। বনী হাশেমের অর্থে হযরত আলী (রাঃ), জাফর (রাঃ), আকীল (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হারেছ বিন আব্দুল মোতালেবের আওলাদ বুঝিবে। উহাদের ছাড়া যাহারা হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহায্য করে নাই। যেরূপ আবূ লাহাব যদিও এই কাফের মরদুদও হযরত আব্দুল মোতালেবের পুত্র ছিল। কিন্তু উহার আওলাদ বনী হাশেমের মধ্যে গণ্য হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- মাতা হাশেমী বরং সৈয়্যদা যদি হয় এবং পিতা হাশেমী না হয়, তবে সেও হাশেমী নহে। কেননা শরীয়তের নছব পিতার হইতে ধরা হয়। অতএব এহেন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যায় যদি অন্য কোন না-জায়েয কারণ না থাকে।

মাসয়ালাঃ- নফলী দান খয়রাত এবং গরীব মিসকীনদের জন্য ওয়াকফের আয় বনী হাশেমকে দেওয়া জায়েয। ওয়াকফ কারক উহাদের জন্য নির্দিষ্ট করুক বা নাই করুক। (দুররুল-মোখতার)

মাসয়ালাঃ- জিম্মি কাফেরকে যাকাত এমনকি কোন ওয়াজিবী ছদকাহ যথা- মান্নত, কাফফারা, ফিতরা ইহার কিছুই দেওয়া জায়েয নাই। হরবী কাফেরকে কোন রকমের ছদকাই দেওয়া জায়েয নাই। ওয়াজেবী নফল কোনটাই নহে। যদিও সে দারুল ইসলামে মুসলমান বাদশাহর হইতে আমান লইয়া আসিয়া থাকে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- হিন্দুস্থান যদিও দারুল ইসলাম, কিন্তু সেখানের কাফেরগণ জিম্মি নহে উহাদিগকে নফলী ছদকাহ যথা-হাদিয়া, তোহফা ইত্যাদি দেওয়াও জায়েয নহে।

যাহাদিগকে যাকাত দেওয়া না-জায়েয তাহাদিগকে অন্য কোন ওয়াজেবী ছদকা যথা- মান্নত, কাফ্‌ফারা এবং ফিতরা দেওয়া জায়েয নহে। কিন্তু গুপ্তমাল এবং খনি পাইলে উহার ৫ এর ১ অংশ নিজের মাতা-পিতা এবং আওলাদকেও দেওয়া জায়েয। বরং কোন কোন ছুরতে নিজেও খরচ করিতে পারে।

মাসয়ালাঃ- যাহাদিগকে যাকাত দেওয়া বলা হইয়াছে উহাদের ফকীর হওয়া শর্ত।

তবে আলেমের জন্য ফকীর হওয়া শর্ত নহে। এবং ইবনেচ্ছাবীল যদিও ধনী উক্ত সময় তাহাকে ফকীর ধরিতে হইবে। বাকী অন্য যাহারা তাহারা যদি ফকির না হয় তবে তাহাদের যাকাত দিলে উহা আদায় হইবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যে ব্যক্তি অন্তিম রোগে পতিত, সে তাহার ভ্রাতাকে যাকাত দিল এবং সেই ভাইই যদি ওয়ারিস হয় তাহা হইলে যাকাত আল্লাহর নিকট আদায় হইয়া যাইবে। তবে অন্যান্য ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করিলে তাহার নিকট উক্ত যাকাত ফেরত লইতে পারে, কেননা ইহা অসিয়তের হুকুমে এবং অন্যান্য ওয়ারিসের এজাযত ছাড়া কোন ওয়ারিসের অসিয়ত শুদ্ধ হইবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির খেদমত করে, বরং তাহার কাজ করে, তাহাকে যাকাত দিল অথবা যে তাহাকে সুসংবাদ শুনাইয়াছে, তাহাকে দিল, অথবা যে তাহার নিকট হাদিয়া পাইয়াছে তাহাকে দিয়াছে এই সবই জায়েয। যদি সে বলে যে, উহা তাহার কাজের প্রতিদান হিসাবে দিয়াছে। ঈদ, কোরবানীর ঈদে খাদেম নর-নারীকে ঈদ-উপহার বলিয়া দিল, তাহাতেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তাহাররী করিল অর্থাৎ চিন্তা করিল এবং মনে এই কথা স্থির সিদ্ধান্ত লইল যে, উহাকে যাকাত দেওয়া যাইতে পারে; এবং যাকাত দিয়া দিল, তৎপর প্রকাশ পাইল সে, যাকাত পাওয়ার উপযোগী। অথবা কোন প্রকাশ পাইল না, এই অবস্থায় যাকাত আদায় হইয়া গিয়াছে। পরে যদি জানা যায় যে, ধনী ছিল, অথবা তাহার মাতা-পিতার কিছু ছিল, অথবা তাহার আওলাদ ছিল অথবা স্বামী ছিল, অথবা স্ত্রী ছিল, অথবা হাশেমী বা হাশেমীর চাকর ছিল অথবা জিম্মি ছিল তখনও আদায় হইয়া যাইবে। যদি জানা যায় যে, সে তার কৃতদাস ছিল অথবা হরবী কাফের ছিল তাহা হইলে আদায় হয় নাই। অনুরূপ কেহ সওয়াল করিয়াছে দাতা তাহা গরীব ধারণা করিয়া দিয়াছে অথবা ফকীরগণের দলের সঙ্গে তাহাদের বেশে ছিল, তাহাকে যাকাত দিয়াছে, ইহাতে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (রদ্দুল মোহতার, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- তাহাররী অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা না করিয়া যাকাত দিয়াছে, পরে তাহাকে দেওয়া যায় কিনা সেই খেয়ালও করে নাই এবং পরে জানা গেল যে, উহাকে দেওয়া যাইত না এই অবস্থায় যাকাত আদায় হয় নাই। দেওয়ার সময় যদি সন্দেহ থাকে এবং তাহাররী না করে অথবা তাহাররী করে কিন্তু কোন দিকেই দেল গাওয়াহী না দেয় অথবা তাহাররী করে কিন্তু তার বিশেষ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যাকাত গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও যদি তাহাকে যাকাত দিয়া দেয় তাহা হইলে যাকাত আদায় হইবে না। তবে দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, সে সত্যই যাকাত গ্রহণ করার উপযোগী ছিল তাহা হইলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (আলমগীরী ইত্যাদি)

যাকাত কাহাকে দেওয়া উত্তম

যাকাত ছদকাহ সমূহ দেওয়া সম্বন্ধে এই যে, প্রথমতঃ নিজের ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে দিবে, তৎপর তাহাদের আওলাদ তৎপর চাচা এবং ফুফীগণকে তৎপর তাহাদের আওলাদকে তৎপর মামা এবং খালাকে তৎপর তাহাদের আওলাদকে তৎপর আত্মীয়-স্বজনকে তৎপর পড়শীগণকে তৎপর নিজের হামপেশা লোকদিগকে তৎপর নিজের শহর এবং গ্রামবাসীকে দেওয়াই উত্তম। (জাওহারাহ, আলমগীরী)

হাদীস শরীফে আছে যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, হে উম্মতে মুহাম্মদী কসম ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে হকের সাথে পাঠাইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির ছদকাহ কবুল করেন না যাহার আত্মীয়তার দানের মুখাপেক্ষী অথচ সে (উহাদিগকে না দিয়া) অন্যান্যকে দিয়া দেয়। ঐ আল্লাহর কসম যাহার কুদরতী হাতে আমার জান। আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে কেয়ামতের দিনে নজর করিবেন না। (রদ্দুল মোহতার)

মাসয়ালাঃ- অন্য শহরে যাকাত পাঠাইয়া দেওয়া মাকরূহ। তবে সেখানে যদি তার আত্মীয় থাকে তবে তাদের জন্য পাঠাইতে পারে। অথবা সেই দেশের বেশী দরকার অথবা বেশী পরহেজগার অথবা সেখানে পাঠাইলে যদি মুসলিম জাতির বেশী উপকারী অথবা তালেবে এলেমের জন্য পাঠাইলে, অথবা দরবেশগণের জন্য পাঠাইলে অথবা যাকাতদাতা দারুল হরবে তাই তিনি দারুল ইসলামে যাকাত পাঠাইলে অথবা বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে পাঠাইয়া দিল। এই সব অবস্থায় অন্য শহরে পাঠাইয়া দেওয়া মাকরূহ নহে। (আলমগীরী , দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- শহর বলিতে যে শহরের মাল সেই শহরই ধরিতে হইবে। যদি মালেকে নেছাব এক শহরে এবং তাহার মাল অন্য শহরে তবে যে শহরে মাল সেই শহরের ফকীরগণকেই যাকাত দিতে হইবে। এবং ছদকায়ে ফেতরে এই শহর ধরিতে হইবে যেখানে সে থাকে। যদি নিজে এক শহরে থাকে এবং ছোট ছোট বাচ্চা এবং মাল অন্য শহরে তাহা হইলে সে যেখানে এই শহরের ফকীরগণকে যাকাত দিবে।

(জাওহারা ও আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বদ মাযহাবের লোকদিগকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। (দুররুল মোখতার) যখন বদ মাযহাবের লোকের এই হুকুম তখন বর্তমান যামানায় কাদিয়ানী ও নজদী ওহাবী সম্প্রদায় এবং তাহাদের অনুসারীগণ যাহারা আল্লাহর হুকুম আহকামকে অবজ্ঞা এবং শানে রাসূলকে হেয় করে যাহাদিগকে মক্কা শরীফ, মদীনা তৈয়্যেবার ও পাক ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে বাতিলপন্থী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, যদিও তাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া দাবী করে উহাদিগকে যাকাত দেওয়া উচিত নহে, দিলে যাকাত আদায় হইবে না।

মাসয়ালাঃ- যাহার নিকট অদ্যকার খোরাক আছে, অথবা সুস্থ কামাই করিতে সক্ষম, খাওয়ার জন্য এমন ব্যক্তির সওয়াল করা হালাল নহে। যদি বিনা সওয়ালে কেহ কিছু দেয় তবে লওয়া জায়েয। এবং যদি খাওয়ার বস্তু আছে কিন্তু কাপড় নাই তবে কাপড়ের জন্য সওয়াল করিতে পারে। ঐরূপ যদি ধর্ম যুদ্ধ অথবা ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষায় মগ্ন এ অবস্থায় যদিও সে সুস্থ স্বাস্থ্যবান কামাই করিতে সক্ষম, সে সওয়াল করিতে পারে। যাহার সওয়াল করা না জায়েয উহার সওয়ালে দান করাও জায়েয নহে, যে দিবে সেও গুনাহগার হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- এই পরিমাণ দান করা মুস্তাহাব যাহাতে ঐ দিন দান গ্রহণকারীর আর সওয়াল করার দরকার না হয়। ইহা উক্ত ফকীরের অবস্থা হিসাবে বিভিন্ন। তাহার খাওয়া পরিবারের লোকের আধিক্য এবং অন্যান্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিবে।

(দুররুল মোখতার ও রদ্দুল মোহতার)

ভিক্ষা কার জন্য জায়েয

আজকাল এক ব্যাপক মুছিবত এই দাঁড়াইয়াছে যে, কতক স্বাস্থ্যবান লোক যাহারা ইচ্ছা করিলে কামাই করিয়া নিজে এবং অপরকেও খাওয়াইতে পারে তাহারা নিজেকে বেকার বানাইয়া রাখিয়াছে। কে আবার পরিশ্রম করে। বিনা পরিশ্রমে ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় তাহাতেই চলে। কেন তকলীফ বরদাস্ত করিবে? এবং অনেকে এমনও আছে যাহারা মজদুরী করা দূরের কথা ছোট ছোট ব্যবসা করিতেও লজ্জা বোধ করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে যাহা বেইয্যতী এবং অপমানের কাজ। অনেকে ভিক্ষা করা নিজেদের পেশায় পরিণত করিয়া লইয়াছে। বাড়ীতে হয়ত জমিজমা টাকা পয়সা আছে। সুদের কারবার করে কৃষি করে কিন্তু ভিক্ষা ছাড়ে না। তাহাকে বলা হইলে সে বলে যে, ইহা আমার পেশা। অথচ এহেন ব্যক্তিদের সওয়াল করা সম্পূর্ণ হারাম। যাহার উহা জানা আছে তাহার জন্য ঐরূপ দান করাও জায়েয নহে।

১। ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে সচ্ছল ব্যক্তি সওয়াল করিতে থাকিবে সে এমনকি কেয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় উঠিবে যে তাহার চেহারার উপর গোশতের সামান্য টুকরাও থাকিবে না। অর্থাৎ খুব অপমানজনক অবস্থায় উঠিবে।

২। আবূ দাউদ, তিরমিজী, নাছায়ী ও ইবনে হাব্বান (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত ছামুরা বিন জুন্দব (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, ভিক্ষা এক রকমের আঁচড়, লোক ভিক্ষা দ্বারা নিজ মুখমন্ডলকে আঁচড়াইতেছে যাহার ইচ্ছা উহা চালু রাখে যাহার ইচ্ছা উহা বর্জন করে। তবে যদি কোন প্রতাপশালী বাদশাহ হইতে নিজের হক আদায়ের সওয়াল করে অথবা এমন কাজের জন্য সওয়াল করে যাহা না করিয়া উপায় নাই তবে উহা জায়েয।

৩। ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর জবানী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোক হইতে সওয়াল করে অথচ সে উপবাসী নহে কিম্বা তাহার এত সন্তানাদী নাই যার ভরণ পোষণের ক্ষমতা তাহার নাই, এই ব্যক্তি কিয়ামতে গোশত বিহীন চেহারা নিয়া উঠিবে। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করিয়াছেন- যে ব্যক্তি অভাব ব্যতিরেকে ভিক্ষার ঝোলার মুখ খুলে, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য উপবাসের দরওয়াজা খুলিয়া দিবেন। এমনভাবে যে, সে কল্পনাও করিতে পারিবে না।

৪। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অভাব ব্যতিরেকে সওয়াল করে সে যেন আগুনের আযাব ভক্ষণ করিতেছে।

(তিরমিজী, ইবনে খোযায়মা ও বায়হাকী)

৫। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- যে ব্যক্তি অভাব ব্যতিরিকে সওয়াল করে এবং তাহার নিকট এই পরিমাণ সম্পদ আছে যাহা তাহাকে পরমুখাপেক্ষী রাখে না সে আগুনে জ্বালাইতে চায়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল কি পরিমাণ সম্পদ থাকিলে সওয়াল জায়েয নাই? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সকাল বিকালের খানা। (আবূ দাউদ, ইবনে হাব্বান ও ইবনে খোযায়মা)

৬। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- ছদকাহ দ্বারা মাল কমেনা এবং হক মাফ করিয়া দিলে কিয়ামতে আল্লাহ তায়ালা ইয্যত বাড়াইবেন। বরং বান্দা সওয়ালের দরওয়াজা খুলিলে আল্লাহতায়ালা মোহতাজীর দরওয়াজা খুলিয়া দিবেন।

(ইমাম আহমদ, আলী বাজ্জার।)

৭। হযরত কোবায়ছা (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, এক সময় আমার উপর জামানতের অর্থ চাপিল। আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হইয়া সওয়াল করিলাম। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, অপেক্ষা কর আমার নিকট ছদকার মাল আসিবে তখন তোমার জন্য আদেশ করিব। তৎপর ফরমাইলেন, হে কোবায়ছা সওয়াল তিন অবস্থা ছাড়া হালাল নহে। কেহ জামিন হইয়াছে অথবা পরস্পরের বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহে সন্ধি স্থাপন করিয়াছে এবং উহার উপর কোন মালের জামিন হইয়াছে এহেন ব্যক্তির সওয়াল হালাল ঐ পর্যন্ত যতদিন উক্ত পরিমাণ পাওয়া যায় তৎপর সওয়াল বন্ধ করিবে। অথবা কোন ব্যক্তির উপর বিপদ চাপিয়া তাহার মাল ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। এই ব্যক্তির জন্যও সওয়াল হালাল, যতদিন জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হইয়া না যায়। অথবা কোন (ধনী) ব্যক্তির উপবাস ও দারিদ্র জড়িত হইয়াছে এবং তার সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি বুদ্ধিমান সাক্ষী দিল যে, সে উপবাস ও অভাবগ্রস্ত হইয়াছে এই ব্যক্তির জন্যও সওয়াল হালাল, যতক্ষণ জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা না হয়। এই তিন অবস্থা ছাড়া হে কোবায়ছা সওয়াল করা হারাম সওয়াল কারী হারাম খাইতেছে। (মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাছায়ী শরীফ)

৮। একজন আনছারী হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হইয়া সওয়াল করিল, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন- তোমার ঘরে কি কোন কিছু নাই? সে বলিল যে- আছে, একটি চটের বিছানা যাহার এক ধার বিছাই এবং আপর ধার দ্বারা আমি শরীর আবৃত করি। এবং একটি কাঠের পেয়ালা আছে যাহা দ্বারা পানি পান করি। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন উভয় বস্তু দুইটি আমার নিকট হাজির কর। সে হাজির করিল, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হাতে লইয়া ফরমাইলেন কে এই বস্তু দুইটি ক্রয় করিবে? এক ব্যক্তি বলিল যে, এক দেরহামের পরিবর্তে আমি ক্রয় করিব। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এক দেরহামের বেশী কে দিবে? দুই তিনবার ফরমাইলেন পরে কেহ বলিলেন যে, আমি দুই দেরহাম দিব। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তিকে উহা দিয়া দেরহাম দুইটি গ্রহণ করিলেন এবং আনছারীকে দেরহাম দুইটি দিয়া ফরমাইলেন যে, এক দেরহাম দ্বারা কিছু খোরাকী ক্রয় করিয়া ঘরে নিয়া আস এবং এক দেরহাম দ্বারা কুড়াল খরিদ করিয়া আমার নিকট নিয়া আস। সে কুড়াল খরিদ করিয়া নিয়া আসিল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোবারক হাত দ্বারা উহাতে কাঠ লাগাইয়া দিয়া বলিলেন যাও কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় কর। অর্থাৎ ১০ দিন পর্যন্ত আমার এখানে আসিও না। সে চলিয়া গেল এবং কাঠ কাটিয়া বিক্রি দিতে ছিল ইহার পর যখন হাজির হইল তখন তাহার নিকট দশ দেরহাম জমা ছিল। কতক দ্বারা কাপড় এবং কতক দ্বারা খোরাকী ক্রয় করিল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- ইহা উত্তম, কিয়ামতের দিন তোমার মুখের ভিতর জখম অবস্থায় হাজির হওয়ার চেয়ে। সওয়াল শুধু তিন ব্যক্তির জন্যই হালাল। এমন অভাবগ্রস্তের জন্যে যাহাতে সে জমিনে লুটিয়া পড়িয়া বাধ্য হইয়াছে। অথবা ক্ষতিপুরণ বা জামানত চাপিয়াছে। যাহা তাহাকে অপদস্থ করিতেছে অথবা খুনের "দাবিতে" যাহাতে বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। (আবূ দাউদ)

৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন- "যাহার উপবাস করিতে হয় সে উহা লোকের কাছে বর্ণনা করে তাদের উপবাস বন্ধ করা হইবে না এবং যদি সে আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিয়া থাকে তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই অমুখাপেক্ষী বা আত্মনির্ভরশীল করিয়া দিবেন অথবা তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসিবে অথবা তাড়াতাড়ি মালদার করিয়া দিবেন। (আবূ দাউদ, তিরমিজী)

১০। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- যে উপবাসী অথবা অভাবগ্রস্ত তাহার অভাবের কথা লোকের নিকট গোপন করিয়া রাখে এবং আল্লাহর নিকট আরজ করে, আল্লাহর উপর হক হইতেছে এক বৎসরের হালাল রুজী তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া। (তিবরানী)

কোন কোন ভিক্ষুক বলিয়া থাকে যে, আল্লাহর জন্য দাও "আল্লাহর ওয়াস্তে দাও" অথচ ইহার জন্য ভীষণ নিষেধ আসিয়াছে। এক হাদীসে এহেন ব্যক্তিকে মালউন বলা হইয়াছে; এবং এক হাদীসে সর্বনিকৃষ্ট মাখলুক বলা হইয়াছে। ভিক্ষা সওয়ালের পর দেওয়াই মুস্তাহাব। তবে ভিক্ষুক যদি উদ্ধত লোক হয় তাহা হইলে দিবে না। ইহাও দেখা দরকার যেন মসজিদে সওয়াল না করে। বিশেষতঃ জুমার দিন লোকের ঘাড়ের উপর দিয়া যাইয়া সওয়াল করা সম্পূর্ণ হারাম। বরং কোন কোন আলেমের মতে মসজিদের ভিতর কোন ভিক্ষুক সওয়াল করিলে যদি তাঁহাকে কেহ একটি পয়সাও দেয় তবে সে যেন উহার কাফ্ফারার জন্য সত্তর পয়সা দান করে। হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে আরাফাতের দিন আরাফার ময়দানে সওয়াল করিতে দেখিয়া তাহাকে দোররা লাগাইলেন এবং বলিলেন যে, এমন দিনে এমন ময়দানে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সওয়াল করিতেছ? এখানে বর্ণিত মাত্র কয়েকটি হাদীস দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ভিক্ষা করা কত অপমানজনক কাজ। সাবধান বিনা দরকারে যেন সওয়াল না করা হয়। বিশেষ জরুরাতের সময়ও এমন সব কাজ হইতে বিরত থাকিবে যাহা করিতে নিষেধ আছে; এবং সওয়ালের যদি একান্ত দরকারই হয় তবে মোবালাগা বা বাড়াবাড়ি যেন না হয়। যেন না লইয়া যাইবেই না। শরীয়তে ইহাও নিষেধ করা বর্ণিত হইয়াছে।

নফল ছদকাহ

আল্লাহর রাস্তায় দান করা নেহায়েত ভাল কাজ। মালের দ্বারা যদি অভাবগ্রস্তের উপকারই না হইল তাহা হইলে উহা দ্বারা কি কাজ হইল, নিজের কাজে উহাই লাগিয়াছে যাহা খাইয়াছে, পরিধান করিয়াছে অথবা আখেরাতের জন্য খরচ করিয়াছে। উহা নহে যাহা জমা করিয়া অন্যের জন্য ছাড়িয়া গিয়াছে। নফল ছদকার ফজীলতে বর্ণিত কতিপয় হাদীস শুনুন এবং উহার আমল করুন। আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দাতা।

হাদীসঃ ১। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন- "বান্দা বলে আমার মাল আমার মাল- তাহার শুধু তিন রকমের মাল দ্বারাই উপকার হয়, যাহা খাইয়া শেষ করিয়াছে। অথবা পরিধান করতঃ পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছে। অথবা দান করতঃ পরকালের জন্য জমা করিয়াছে; এবং উহা ভিন্ন যাহা সব চলিয়া যাইবে, অন্যের জন্য ছাড়িয়া যাইবে। (মুসলিম শরীফ)

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন- তোমাদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি যাহার নিকট নিজস্ব মাল হইতে ওয়ারিসের মাল অধিক মহব্বতের? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভিতর কেহই এমন নাই যাহার নিজস্ব মাল মহব্বতের নহে। তখন হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন- নিজের মাল উহাই যাহা নিজের পরে রাখিয়া গিয়াছে উহা ওয়ারিসের মাল। (বুখারী, নাসায়ী শরীফ)

৩। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে- প্রত্যেক দিন সকালে দুইজন ফেরেশতা নাযিল হন উহাদের একজন বলিতে থাকেন, হে আল্লাহ খরচকারীকে উহার বদলা দান করুন এবং দ্বিতীয় জন বলিতে থাকেন হে আল্লাহ যিনি খরচ করে না তাহার মাল নষ্ট করুন।

(মুসলিম শরীফ)

৪। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, জুলুম কিয়ামতে অন্ধকারে পতিত হইবে এবং কৃপণতা হইতে বাঁচ, কেননা কৃপণতাই উহাদিগকে রক্তপাতের এবং হারামকে হালালে পরিণত করার জন্য বাধ্য করিয়াছে।

(মুসলিম শরীফ)

৫। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছে যে, এক ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দানের বেশী ছওয়াব? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঐ দান যাহা সুস্থ অবস্থায় করা হয় এবং ধনী হওয়ার আকাংখা থাকে। এই সময়ের দানেরই ছওয়াব খুব বেশী। ইহা নহে, যে দান না করিয়া অর্থ সঞ্চিত রাখে এবং যখন প্রাণ গলদেশে আসিয়া পড়ে তখন বলে ইহা হইতে এত ইহাকে এত উহাকে দিয়া দিবে, অথচ সেই অবস্থায় তাহার যাবতীয় অর্থ ওমুকের হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ওয়ারিসের হইয়া গিয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

৬। হযরত আবূ জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাজির হইলাম এবং হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। আমাকে দেখিয়া ফরমাইলেন- কাবার ঘরের কসম তাহারা ক্ষতির ভিতরই রহিয়াছে। আমি আরজ করিলাম আমার পিতা-মাতা হুযুরের উপর কোরবান, তাহারা কাহারা? ফরমাইলেন, বেশী অর্থশালীগণ। তবে যাহারা এইরূপ ঐরূপ আগে পিছে ডাইনে বামে অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গায় খরচ করে এবং তেমন লোক বহুত কম। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

৭। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন- ছখী আল্লাহর নিকটে, বেহেশতের নিকটে, লোকের নিকটে, জাহান্নাম হইতে দূরে; এবং বখীল আল্লাহ হইতে দূরে। জাহান্নামের নিকটে এবং জাহেল ছখী আল্লাহর নিকট বখীল আবেদের চেয়ে বেশী প্রিয়। (তিরমিজী)

৮। হযরত আবূ ছায়ীদ (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি ফরমাইয়াছেন- কোন লোকের নিজ জীবনে সুস্থাবস্থায় এক দেরহাম ছদকাহ অন্তিম সময়ের শত দেরহাম ছদকাহ করার চেয়ে বেশী উৎকৃষ্ট। (আবূ দাউদ শরীফ)

৯। হযরত আবুদ্দরদা (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে

রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি এরশাদ করিয়াছেন- যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ছদকাহ দেয় অথবা গোলাম আজাদ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি তৃপ্তি লাভের পর হাদিয়া দেয়।

(আহমদ, নাসায়ী, দারামী, তিরমিজী)

১০। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি এরশাদ করিয়াছেন- এক ব্যক্তি জনশূন্যময় স্থানে ছিল, সে মেঘের ভিতর একটা শব্দ শুনিল যে, অমুক ব্যক্তির বাগান পানি দ্বারা তরুতাজা করিয়া দাও। ইহার সাথে সাথে উক্ত মেঘ এক কিনারায় জমা হইয়া সেই মেঘ পাথুরী জমিনে পানি বর্ষণ করিল। উক্ত পানি একটি প্রণালী দিয়া ধাবিত হইল। ঐ ব্যক্তি পানির পিছনে পিছনে চলিল। কতদূর যাইয়া এক ব্যক্তিকে দেখিল যে, সে স্বীয় বাগানে পানি সেচ করিতেছে। ঐ ব্যক্তি বলিল হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি? সে ঐ নাম বলিল। যেই নাম উক্ত ব্যক্তি মেঘের ভিতর হইতে শুনিয়াছিল। সে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন? সে বলিল, আমি ঐ মেঘের ভিতর যাহার এই পানি, এক শব্দ শুনিলাম যে, সে আপনার নাম লইয়া বলে অমুক ব্যক্তির বাগান সিক্ত কর। আপনার কোন আমলের ফল ইহা? সে জওয়াব দিল, এই বাগানে যাহাকিছু উৎপন্ন হয় উহার এক তৃতীয়াংশ দান করি। এক তৃতীয়াংশ নিজে এবং নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করি। বাকী এক তৃতীয়াংশ বপন করার জন্য রাখি।

(মুসলিম শরীফ)

১১। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি ফরমাইয়াছেন যে, বনী ইসরাইলের ভিতর তিনজন লোক ছিল, একজন কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জনের মাথায় টাক, তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ তায়ালা ইহাদের পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। তাহাদের নিকট একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাইলেন। ফেরেশ্‌তা প্রথমতঃ কুষ্ঠরোগীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন বস্তু প্রিয়? সে বলিল, উৎকৃষ্ট রং, উৎকৃষ্ট চামড়া এবং যাহা লোকেরা ঘৃণা করে তাহা দূর হওয়া। ফেরেশ্‌তা হাত বুলাইয়া দিলেন। ঐ সব চলিয়া গেল; এবং চামড়া ও চেহারা উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হইয়া গেল। ফেরেশ্‌তা বলিল, তোমার কোন মাল বেশী মহব্বতের? সে উটের অথবা গরুর কথা বলিল। তাহাকে দশ মাসের গাভীন উট দিল এবং বলিল আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহাতে বরকত দান করুন। তৎপর টাকওয়ালার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বেশী প্রিয় বস্তু কি? সে বলিল সুন্দর চুল এবং যে সব কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে তাহা যেন দূর হয়। ফেরেশতা তাহার মাথার উপর হাত ফিরাইল। তারপর তাহার ঘৃণিত বস্তু দূর হইল এবং সুন্দর চুল পাইল। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি মাল সব চাইতে পছন্দীয়? সে গরুর কথা বলিল। তৎপর তাহাকে একটা গাভীন গরু দেওয়া হইল এবং ফেরেশ্‌তা বরকতের দোয়া করিয়া অন্ধের নিকট চলিয়া গেলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কোন বস্তু বেশী প্রিয়? সে

বলিল আমার চক্ষু। উহা ফিরিয়া পাইলে আমি সকলকে দেখিতে পাইব। ফেরেশ্‌তা হাত ফিরাইলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার চক্ষু ফিরাইয়া দিলেন। তৎপর ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করেন কোন মাল তোমার বেশী প্রিয়? সে বলিল বকরী, উহাকে একটি গাভীন বকরী দেওয়া হইল। তৎপর উট, গরু এবং বকরী প্রত্যেকটিই বাচ্চা দিল। প্রত্যেকের প্রত্যেকটি দ্বারা মাঠ পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর উক্ত ফেরেশ্‌তা কুষ্ঠ রোগীর নিকট তাহার ছুরতে অর্থাৎ কুষ্ঠ ওয়ালা সাজিয়া হাজির হইল এবং বলিল আমি মিসকীন সফরে আমার ছামান শেষ হইয়া গিয়াছে, দেশে পৌঁছার কোন পথই দেখিতেছি না। তবে আল্লাহর সাহায্যে তৎপর আপনার সাহায্যে আমি ঐ আল্লাহর ওয়াস্তে যিনি আপনাকে সুন্দর রং, উৎকৃষ্ট চামড়া ও মাল দিয়াছেন একটা উট চাহিতেছি, যাহা দ্বারা আমি ছফরে নিজের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব। সে জওয়াব দিল, ইহাতে অনেকের হক রহিয়াছে। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, যেন আমি তোমাকে চিনিতেছি, তুমি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলে না? লোকে তোমাকে ঘৃণা করিত। ফকীর ছিলে না? তৎপর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাল দিয়াছেন। সে বলিল, আমিত বংশানুক্রমে এই মালের ওয়ারিস। ফেরেশতা বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যুক হইয়া থাক তবে তুমি যে অবস্থায় ছিলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তাহাই করিয়া যেন দেন। তৎপর আসিলেন টাকওয়ালার নিকট। টাকওয়ালার ছুরতে হাজির হইয়া ইহার নিকটও অনুরূপ বলিল এবং সে উক্ত কুষ্ঠওয়ালার ন্যায় জওয়াব দিল, ফেরেশ্‌তা বলিলেন- যদি তুমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাক তবে আল্লাহ তায়ালা তুমি যেমন ছিলে তেমনই যেন করিয়া দেন। তৎপর অন্ধের নিকট অন্ধের ছুরতে হাজির হইলেন এবং বলিলেন আমি মিসকীন এবং মুসাফির। আমার রাস্তায় সম্বল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে আদৌ পৌঁছার বন্দোবস্ত নাই, তবে আল্লাহর সাহায্যে তারপর তোমার সাহায্যে আমি ঐ আল্লাহর উছীলায় যিনি তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন একটা বকরীর ছওয়াল করিতেছি। যাহার উছীলায় আমি আকাংখিত স্থানে পৌঁছিতে পারিব। সে বলিল, আমি অন্ধ ছিলাম আল্লাহ তায়ালা আমাকে চক্ষু দিয়াছেন। তোমার যাহা ইচ্ছা লইয়া যাও এবং যাহা ইচ্ছা রাখিয়া যাও। আল্লাহর কসম আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি যাহাই নিবে আমি তোমাকে বিপদগ্রস্ত করিব না। ফেরেশ্‌তা বলিলেন- তুমি তোমার মাল নিজ হাতেই রাখিয়া দাও। কথা এই যে, তোমাদের তিন জনের রেজামন্দীর জন্য পরীক্ষাই ছিল। তোমার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রহিয়াছে। বাকী দুই জনের উপর নারাজী।

(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

১২। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালিমা (রাঃ) এর দরবারে গোস্তের টুকরা হাদীয়া আসিল। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোস্ত পছন্দ করিতেন। তিনি দাসীকে বলিলেন, ইহা ঘরে রাখিয়া দাও, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবেন। দাসী উহা তাকের উপর রাখিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে একজন ভিক্ষুক দরজায় আসিয়া বলিল, কিছু ছদকা করুন আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে বরকত দিবেন।

লোকেরা বলিল, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। ভিক্ষক চলিয়া গেলে পর হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন তোমার এখানে কিছু খাওয়ার আছে? হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ফরমাইলেন, হ্যাঁ আছে। দাসীকে বলিলেন, যাও গোশত নিয়া আস। সে যাইয়া তাকের উপর পাথরের একটা টুকরা পাইল? হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ভিক্ষুককে যেহেতু দেও নাই সে জন্য উহা পাথর হইয়া গিয়াছে। (বায়হাকী)

১৩। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন- ছাখাওত (দান) নামে বেহেশতে একটি বৃক্ষ রহিয়াছে। যে ছখী সে উক্ত বৃক্ষের ডাল ধরিয়াছে। উক্ত ডাল তাহাকে ছাড়িবে না যতক্ষণ তাহাকে বেহেস্তে দাখিল করিবে না এবং কৃপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। বখীল যে সে উক্ত বৃক্ষের ডাল ধরিয়াছে এই ডাল তাহাকে জাহান্নামে দাখিল না করিয়া ছাড়িবে না।

(বায়হাকী)

১৪। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তির মধ্যে সুবিচার করা ছদকাহ, কেহকে জানওয়ারের উপর আরোহণ করিতে সাহায্য করা অথবা তাহার আসবাব উঠাইয়া দেওয়া ছদকাহ এবং ভাল কথা ছদকাহ। যেই কদম নামাযের জন্য চলিবে, উহাও ছদকাহ। রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও ছদকাহ।

(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

১৫। হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন,- যে মুসলমান বৃক্ষ রোপণ করে অথবা ফসল বপন করে উহা হইতে কোন লোক অথবা পাখী অথবা চতুস্পদ জানওয়ার কিছু খাইয়া থাকিলে এই সবই উহার জন্য ছদকাহ হইবে। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

১৬। হযরত আবুযর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- নিজের ভাইয়ের সাথে মুচকিয়া হাসা ছদকাহ, নেক কাজের হুকুম করা ছদকাহ, খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখাও ছদকাহ, পথ ভোলাকে পথ বাতাইয়া দেওয়াও ছদকাহ, দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের সাহায্য করাও ছদকাহ। রাস্তা হইতে পাথর, কাটা, হাড্ডী দূর করাও ছদকাহ। নিজের ডোলচী হইতে নিজের ভাইদের (দ্বীনী ভাই) ডোলচীতে পানি ঢালিয়া দেওয়াও ছদকাহ। (তিরমিজী শরীফ)

১৭। হযরত আনাস (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি ফরমাইয়াছেন- যখন আল্লাহ তায়ালা যমীন পয়দা করিলেন তখন যমীন আন্দোলিত বা নড়িতে লাগিল তখন পাহাড় সৃষ্টি করিয়া ইহার উপর কায়েম করায় উহা স্থির হইয়া রহিল। পাহাড়ের ভীষণতা দেখিয়া ফেরেশ্তাদের আশ্চর্যের সীমা রহিলনা। তাহারা আরজ করিলেন- হে পরওয়ারদেগার! আপনার সৃষ্ট মাখলুকাতের মধ্যে পাহাড়ের

চেয়ে কোন শক্ত বস্তু আছে কি? আল্লাহ তায়ালা ফরমাইলেন, - হ্যাঁ আছে, লৌহ। ফেরেশ্‌তাগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! লৌহ হইতে বেশী শক্তিশালী কিছু আছে? এরশাদ করেন, হ্যাঁ আছে, 'আগুন' ফেরেশ্‌তাগণ আরজ করিলেন আগুন হইতে কোন বস্তু শক্তিশালী আছে কি? ফরমাইলেন, হ্যাঁ পানি। ফেরেশ্‌তাগণ আরজ করিলেন হে আল্লাহ! পানি হইতে শক্তিশালী কোন বস্তু আছে কি? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হ্যাঁ আছে বায়ু। ফেরেশ্‌তাগণ আরজ করিলেন, বায়ু হইতে শক্তিশালী কোন বস্তু আছে? ফারমাইলেন, হ্যাঁ আদম সন্তান। যিনি দক্ষিণ হাত দ্বারা ছদকাহ দেন এবং বাম হাত গোপন রাখেন। (তিরমিজী শরীফ)

১৮। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) এবং হেকাম বিন হোজাম (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন- উৎকৃষ্ট ছদকাহ উহাই যাহা সম্পদশালীর পিঠ হইতে হয়, অর্থাৎ ছদকার পরও সম্পদ বাকী থাকে এবং যাহারা তোমার পরিবারভুক্ত তাহাদের হইতে দান আরম্ভ করিবে। অর্থাৎ প্রথমতঃ ইহাদিগকে দিবে, অন্যকে পরে। (বুখারী শরীফ)

১৯। হযরত আবূ মাসউদ (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- মুসলমান যাহা কিছু নিজের আওলাদের জন্য খরচ করে, যদি সওয়াবের নিয়তে খরচ করে তবে ইহাও ছদকাহ। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

২০। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী বিবি জিন্নত হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আরজ করিয়াছেন- স্বামী এবং এতীম বাচ্চা যাহা নিজ লালন পালনে রহিয়াছে তাহাদিগকে ছদকাহ দেয়া যথেষ্ট হইবে কি? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- ইহাদিগকে দিলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যাইবে। এক আত্মীয়তার সওয়াব এবং দ্বিতীয় ছদকার সওয়াব। (বুখারী, মুসলিম)

২১। হযরত সোলায়মান বিন আমের (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বলেন, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- মিসকীনকে ছদকাহ দিলে শুধু ছদকাহই হইবে। কিন্তু আত্মীয়কে দিলে ছদকাহও হইবে ছেলায়ে রহমতও হইবে। (আহমদ, তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

২২। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন,- হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, এক লোকমা রুটি এবং এক মুষ্টি খুরমা এবং উহার মত কোন বস্তু যাহা দ্বারা মিসকীনের উপকার হয়, উহার কারণে আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তিকে বেহেস্তে দাখিল করিবেন। একজন বাড়ীওয়ালা যিনি হুকুম দিয়াছেন, দ্বিতীয়জন স্ত্রী যিনি উহা তৈয়ার করিয়াছেন। তৃতীয়জন খাদেম যে মিসকীনকে দিয়া আসিয়াছে। তৎপর হুযুর ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের খাদেম, চাকর- নওকরগণকেও বর্জন করেন নাই। (হাকেম, তিবরানী)

২৩। হযরত ওকবা বিন আমের (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন- হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে নিজ নিজ ছদকার ছায়াতলে থাকিবেন, সমস্ত লোকের হিসাব শেষ হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আহমদ (রহঃ), ইবনে খোযায়মা, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং তাবরানীর রেওয়ায়েত আছে যে, ছদকাহ কবরের গরমী দূর করিয়া দেয়।

২৪। হযরত হাসান বছরী (রহঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন- "হে আদম সন্তান! নিজের অর্থ ভাণ্ডার হইতে আমার নিকট কিছু জমা দেও, উহা আগুনে জ্বলিবে না, পানিতে ডুবিতে না, কেহ চুরি করিয়া নিতে পারিবে না। তোমাকে আমি পুরা দিয়া দিব ঐ সময় যখন তুমি উহার বেশী মোহতাজ হইবে। (তাবরানী, বায়হাকী)

২৫। হযরত আমর বিন আজ (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, মুসলমানের ছদকাহ হায়াত বৃদ্ধি করে এবং খারাপ মৃত্যুকে দূর করে এবং আল্লাহতায়ালা উহার কারণে তাকাব্বরী এবং ফখর দূর করিয়া দেন।

(তিবরানী)

২৬। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) আরজ করিলেন- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ছদকাহ সর্বোৎকৃষ্ট? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন- অল্প পুজীওয়ালা লোকের পরিশ্রম করা ছদকাহ। (আবূ দাউদ, হাকেম)

২৭। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- এক দেরহাম লাখ দেরহাম হইতে বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কিভাবে ফরমাইলেন? এক ব্যক্তির নিকট বহু মাল রহিয়াছে, সে উহা হইতে লাখ দেরহাম ছদকাহ করিল এবং এক ব্যক্তির শুধু দুই দেরহাম আছে, সে উহা হইতে এক দেরহাম ছদকাহ করিয়া দিল।"

(নাসায়ী, ইবনে খোযায়মা, ইবনে হাব্বান)

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্রয়- বিক্রয়ের মাসয়ালা

ঐ বিশ্ব স্রষ্টা যাহার মহান শক্তির অনুভূতি মানব শক্তির বহির্ভুত, আকাশ পাতাল সর্বক্ষেত্রেই যাহার কুদরত পরিস্ফুট, প্রাণী সমূহ, বৃক্ষরাজী, জড় পদার্থসমূহ এবং সমস্ত সৃষ্টি তাহারই চিহ্ন বহন করিতেছে। তিনিই তাহার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানব জাতির মাথায় সম্মান ও বুযুর্গীর মুকুট রাখিয়াছেন এবং ইহাদিগকে مدنى الطبع অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বানাইয়াছেন। কেননা মানবীয় প্রয়োজনীয় বস্তু এতই বেশী এবং উহা আয়ত্ত করা এতই কষ্টসাধ্য যে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্বীয় যাবতীয় প্রয়োজনগুলির সমাধান নিজেই করিতে চাহে, তবে সাধারণতঃ সে অক্ষম হইয়াই পড়িবে এবং জীবনের সুখ শান্তি তিরোহিত হইবে। অতএব সেই মহা বিজ্ঞানময় প্রভু মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেক সম্প্রদায় এক এক কাজ সমাধা করিয়া চলিয়াছেন। এইভাবে সকলের সমষ্টিগত চেষ্টায় সমাজের যাবতীয় কাজের সমাধা হইয়া যায়। যেমন কেউ কৃষি কাজ করিতেছে, কেউ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, অন্য কেহ হস্তশিল্পে লিপ্ত। কৃষকের যেমন কাপড়ের প্রয়োজন ঐরূপ বস্ত্র বয়নকারীর ফসলের দরকার। কেউ কাহারও থেকে মুক্ত নহে; বরং প্রত্যেকেরই অপরের দরকার। অতএব একের মাল অন্যের নিকট যাওয়া আসার দরকার। তাহা হইলে সবারই দরকার পূর্ণ হইবে এবং কোন কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না। এখান থেকেই معامله বা লেনদেন, ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা আরম্ভ হইয়াছে। বেচা কেনার কাজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইসলাম যেহেতু পূর্ণ ধর্ম এবং মানবীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই উহার হুকুম জারি- যেখানে ইবাদতের নিয়ম বর্ণিত সেখানে লেনদেনের বিস্তারিত বর্ণনাও পরিপূর্ণ তাহা হইলে মুসলমান কোন কাজেই অন্য জাতির মুখাপেক্ষী থাকিবে না। যেমন ইবাদতের মধ্যে জায়েয ও নাজায়েয ক্রিয়া পদ্ধতি তেমনি অর্থ উপার্জনেরও কতিপয় অবস্থা জায়েয এবং কতিপয় নাজায়েয। জায়েয নাজায়েয চিনার উপরই হালাল রিজিক নির্ভরশীল। জায়েয নিয়মে কাজ করা এবং নাজায়েয হইতে দূরে থাকা ইসলামের বিধান। পবিত্র কুরআনে নাজায়েয তরীকায় অর্থ উপার্জনের কঠিন নিষেধ বর্ণিত আছে। যথা- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

অর্থ- একে অপরের মাল নাহকভাবে ভক্ষণ করিও না এবং বিচারকগণের নিকট উহার মোয়ামালা এই জন্য নিয়া যাইও না যে লোকের মালের কিছু অংশ জানিয়া শুনিয়া গুনাহের সহিত ভক্ষণ করিবে। অন্য আয়াতে এরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ-

হে ঈমানদারগণ! একে অপরের মাল নাহকভাবে খাইওনা। তবে পরস্পর সম্মতিক্রমে তেজারত হইলে কোন আপত্তি নাই।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا- اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ- وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ যে বস্তু হালাল করিয়াছেন সেই পবিত্র বস্তুগুলিকে হারাম বলিও না এবং সীমা লংঘন করিও না। সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না; এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যে রুজী দিয়াছেন উহা থেকে পবিত্র হালালগুলি ভক্ষণ কর। এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ।

অর্থ উপার্জনের পন্থা সমূহের মধ্যে যাহা সর্ব প্রয়োজনীয় এবং সাধারণতঃ যাহা প্রত্যহ সমাধা করিতে হয় উহা হইতেছে বেচা কেনা। এখানে সেই বিষয় আলোচিত হইবে। তবে মাসয়ালা লেখার পূর্বে উপার্জন এবং ব্যবসায়ের ফজীলত সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস পেশ করা গেল।

১। ছহীহ বুখারী শরীফে হযরত মেকদাম বিন মাদীকারের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- ঐ খাদ্য হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্য নাই যাহা কেউ নিজের হাতের দ্বারা কামাই করিয়াছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) স্বীয় হস্তোপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছেন।

২। ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন এবং আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণকে ঐ হুকুম দিয়াছেন যাহা রাসূলগণকে দিয়াছেন। তিনি রাসূলগণকে ফরমাইয়াছেন-

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا-

হে রাসূলগণ! পাক বস্তু হইতে খাও এবং উৎকৃষ্ট কাজ কর এবং মুমিনগণকে ফরমাইয়াছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ-

হে ঈমানদারগণ! যাহাকিছু আমি তোমাদিগকে দিয়াছি উহার পাক বস্তুগুলি হইতে খাদ্য গ্রহণ কর।

তৎপর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর ইখতিয়ার করেন যাহার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত এবং শরীর ধূল যুক্ত। (অর্থাৎ সে মুসাফির যার দোয়া কবুলের উপযোগী) সে আসমানের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলে হে রব, হে রব। (দোয়া করিতে থাকে) কিন্তু অবস্থা এই যে, তাহার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, লেবাছ হারাম এবং খোরাক হারাম। এই অবস্থায় ইহার দোয়া কিভাবে কবুল হইতে পারে? (অর্থাৎ যদি কবুলের আকাঙ্খা থাকে তাহা হইলে হালাল কামাই গ্রহণ কর, উহা ছাড়া দোয়া কবুলের আশা করা যায়না।)

৩। ছহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- লোকের উপর এমন একটি যামানা আসিবে যখন কোন বস্তু কোথা হইতে আসিল হালাল হইতে না হারাম হইতে উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবে না।

৪। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যাহা তোমারা ভক্ষণ কর উহার ভিতর সব চাইতে পবিত্র উহাই যাহা তোমাদের কামাই দ্বারা উৎপন্ন হয়। এবং তোমাদের সন্তানগণও তোমাদের কামাই হইতে। (অর্থাৎ দরকার বসতঃ সন্তানের কামাই হইতে খাওয়া যায়।(তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন - তিনি এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল সংগ্রহ করে যদি উহা ছদকাহ করে তবে উহা কবুল হয় না। এবং খরচ করিলে তাহার জন্য উহাতে বরকত হয় না এবং উহা রাখিয়া মৃত্যু হইলে উহা দোযখে যাওয়ার সম্বল হয়। (অর্থাৎ মালের তিন অবস্থা এবং হারাম মালের তিন অবস্থা এবং হারাম মালের তিন অবস্থাই খারাপ)

আল্লাহ তায়ালা পাপ দ্বারা পাপ নষ্ট করেন না। অবশ্য নেকীর দ্বারা পাপ মিটাইয়া ফেলেন। নিশ্চয়ই খবীছ খবীছকে মিটায় না। - আহমদ।

৬। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন হালাল কামাইর অন্বেষণ করা অন্যান্য ফরজের ন্যায় একটি ফরজ। বায়হাকী

৭। আবূ বকর বিন আবি মরিয়ম বলিয়াছেন যে, হযরত মেকদাম বিন মা'দীকরব (রাঃ) এর দাসী দুগ্ধ বিক্রি করিত; এবং উহার মূল্য হযরত মেকদাম (রাঃ) গ্রহণ করিতেন,

তাঁহাকে কেহ বলিল- সুবহানাল্লাহ! আপনি দুগ্ধ বিক্রি করেন এবং উহার মূল্য গ্রহণ করিতেছেন। তিনি জওয়াব দিলেন, হাঁ! আমি এই কাজ করিতেছি এবং ইহাতে দোষই বা কি আছে? আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনিয়াছি যে, লোকের উপর এমন একটা যামানা আসিবে তখন টাকা ছাড়া অন্য কোন বস্তু উপকার করিবে না। - ইমাম আহমদ (রহঃ)

৮। তিরমিজী, দারামী, দারকুতনী, হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ীগণ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণের সঙ্গী হইবেন।

৯। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- ব্যবসায়ীগণকে কেয়ামতের দিন বদকার হিসাবে উঠান হইবে। কিন্তু যে ব্যবসায়ী মুত্তাকী হইবে এবং লোকের প্রতি এহসান করিবে এবং সত্য বলিবে। (সে বদকার হইবে না) তিরমিজী ইবনে মাজা, দারামী হযরত রোকায়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন।

১০। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন ব্যবসায়ী বদকার হয়। লোকেরা আরজ করিল হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা কি বেচা-কেনা হালাল করেন নাই? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন হাঁ। বেচা-কেনা হালাল কিন্তু এই সব লোক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে এবং কসম খায়। এই হিসাবে ইহারা মিথ্যুক হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) ইবনে খোযায়মা (রহঃ) হাকেম তাবরানী, বায়হাকী (রহঃ)।

১১। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- সমস্ত উপার্জন হইতে পবিত্র উপার্জন হইতেছে ঐ সব ব্যবসায়ীদের উপার্জন যাহারা মিথ্যা বলে না। তাদের নিকট আমানত রাখা হইলে খেয়ানত করে না। ওয়াদা খেলাফ করে না এবং যখন কোন বস্তু ক্রয় করে তখন উহার দোষ প্রচার করে না এবং যখন নিজ বস্তু বিক্রি করে তখন উহার প্রসংশায় বাড়াবাড়ি করে না। তাহার কাছে কেউ পাওনা থাকিলে পরিশোধ করিতে অবহেলা করে না এবং সে কাহার নিকট পাইলে তাহার উপর কর্কশতা ও নির্মমতা অবলম্বন করে না। -বায়হাকী

১২। হযরত আবূ যার গেফারী (রাঃ) হইতে- বর্ণিত হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন কালাম করিবেন না, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিবেন না। তাহাদিগকে পাক করিবেন না এবং তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। হযরত আবূ যার (রাঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা কোন লোক? হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন- যাহারা কাপড় লটকায় এবং এহসান করিয়া বলিয়া বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের মাল চালায়।

অত্যাবশ্যকীয় ফায়দাহ

ব্যবসা অত্যধিক উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান কাজ; কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা কাজ সমাধা করে বরং মিথ্যা কসম খাইয়া থাকে এইজন্য অধিকাংশ হাদীসের ভিতর যেখানেই তেজারতের উল্লেখ আছে সেখানেই মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কসম খাওয়ার নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অতি সত্য কথা যে, ব্যবসায়ী যদি স্বীয় ব্যবসায় বরকত দেখিতে চায় তবে যেন উক্ত অন্যায় সমূহ বর্জন করে। ব্যবসায়ীদের ঐ সব অন্যায় কাজের কারণে বাজারকে সর্ব নিকৃষ্ট স্থান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকদিন প্রাতে স্বীয় ঝাণ্ডা নিয়া বাজারে গমন করে। এবং অকারণে বাজারে যাওয়াও অন্যায় বলা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনের বাণী-

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

ঐদিক ইঙ্গিত করিতেছে যে, তেজারত এবং বেচা-কেনা আল্লাহর ইয়াদ হইতে গাফেল করার বস্তু এবং উহার সহিত মনোযোগ রাখা আল্লাহ হইতে অমনোযোগিতা সৃষ্টি করে। এই জন্যই কুরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে-

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا -

এই জন্যই ব্যবসার সঙ্গে অতটা মনোযোগ দিতে নাই যাহাতে আল্লাহর স্মরণ হইতে অমনোযোগী হইয়া পড়ে। ছহীহ বুখারী শরীফে আছে হযরত কাতাদা (রাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, ছাহাবীগণ বেচাকেনা বা ব্যবসা করিতেন। কিন্তু যখন আল্লাহর কোন হক সামনে আসিত তখন উক্ত ব্যবসা বেচাকেনা-তাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখিতে পারিত না, তাহা আদায় করিয়া দিতেন।

বাজারে যাওয়ার সময় নিম্ন দোয়া পড়িবে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ

لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

ইমাম আহমদ তিরমিজী, হাকেম এবং ইবনে মাজা, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- বাজারে দাখিল হওয়ার সময় এই দোয়া পড়িলে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য এক লাখ নেকী লিখিবেন এবং এক লক্ষ গুনাহ মিটাইয়া দিবেন এবং এক লক্ষ দরজা বুলন্দ করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য একটি ঘর বেহেশ্‌তে বানাইয়া দিবেন। বেচা-কেনার ভিতর নম্রতা আবশ্যক। হাদীস শরীফে উহার প্রসংশা আসিয়াছে। বেচা-কেনা এবং তলব তাগেদার ভিতর সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য হাদীসে আছে। এমনকি মালদারকে কিছু সময় দেওয়া এবং অভাবগ্রস্তকে সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দেওয়া অতি সওয়াবের কাজ।

মাসয়ালা সমূহ

বিক্রি কাহাকে বলে?

শরীয়তের পরিভাষায় বিক্রির অর্থ হইতেছে একটি নির্দিষ্ট চুক্তিতে দুই ব্যক্তির পরস্পরের মালামালের পরিবর্তে মাল বদল করা। বিক্রি কোন্ কোন্ বাক্য দ্বারা হয় এবং কোন্ কোন্ কর্ম দ্বারা। যদি বাক্য দ্বারা হয় তবে উহার "রোকন" হইতেছে ইজাব ও কবুল অর্থাৎ একজনে বলিবে আমি বিক্রি করিলাম এবং দ্বিতীয়জনে বলিবে আমি ক্রয় করিলাম। এবং বেচাকেনা কর্ম দ্বারা হইলে মালামাল লওয়া এবং দিয়া দেওয়াই উহার "রোকন"। এই কাজ ইজাব ও কবুলের স্থলবর্তী হইবে। যেমন তরকারী ইত্যাদির আটি বাঁধিয়া অনেকে রাখিয়া দেয় এবং বলিয়া দেয় যে প্রত্যেক আটি এক আনা, এক আনা। খরিদ্দার আসিয়া এক আনা রাখিয়া দেয় এবং আটি উঠাইয়া লইয়া যায়, উভয়ের কেউ কোন বাক্য ব্যবহার করে না। কিন্তু উভয়ের কাজকে ইজাব ও কবুলের পরিবর্তে গণ্য করা হয়। এই ধরনের বেচাকেনাকে بيع تعاطى বলা হয়। বেচাকেনার দুই ব্যক্তির একজনকে বিক্রেতা এবং অপরজনকে ক্রেতা বলা হয়।

বেচাকেনার জন্য ৮টি শর্ত

১। প্রথম শর্ত হইতেছে বিক্রেতা এবং খরিদ্দার জ্ঞানবান হওয়া চাই। অর্থাৎ পাগল অথবা একেবারে অজ্ঞান শিশুর বেচাকেনা অশুদ্ধ

২। একাধিক ব্যক্তি হওয়া চাই। অর্থাৎ একই ব্যক্তি বিক্রেতা ও খরিদ্দার হইতে পারে না। তবে পিতা অথবা অছী যদি নাবালেগ শিশুর মাল বিক্রি করে এবং নিজেই উহা ক্রয় করে অথবা নিজ মাল উহার নিকট বিক্রি করে। অথবা এক এতীমের মাল অন্য এতীমের জন্য বিক্রি করে। এইসব অবস্থায় যদিও একই ব্যক্তি বিক্রেতা ও খরিদ্দার তবুও ইহা শুদ্ধ এবং জায়েয। তবে এইরূপ খরিদ বিক্রি জায়েয হইবার জন্য এতীমের স্পষ্ট উপকার থাকা শর্ত। ঐরূপ একই ব্যক্তি যদি বিক্রেতা ও খরিদ্দার উভয় পক্ষের قاصد বা বার্তাবাহক হয়, তবে এই অবস্থায়ও বেচাকেনা একই ব্যক্তির জন্য জায়েয।

(আলমগীরী, ইত্যাদি)

৩। ইজাব ও কবুলের ভিতর সাদৃশ্য থাকা দরকার। (অর্থাৎ যে বস্তুর ইজাব উহারই কবুল) অথবা যে বস্তুর সহিত ইজাব করা হইয়াছে উহারই সহিত কবুল হইতে হইবে। যদি অন্য কোন বস্তু কবুল করে অথবা যাহার ইজাব ছিল উহার কোন অংশ কবুল করে অথবা কবুলে মূল্য অন্য আর একটার উল্লেখ করে। অথবা ইজাবের কতেক মূল্যের সহিত কবুল করে, এইসব অবস্থায় বেচাকেনা শুদ্ধ নহে। তবে খরিদ্দার যদি ইজাব করে

এবং বিক্রেতা উহার চাইতে কম মূল্যে কবুল করে, তবে বেচা শুদ্ধ হইবে।

৪। ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হওয়া চাই।

৫। প্রত্যেকে অপরের বাক্য শ্রবণ করা। খরিদ্দার বলিল আমি ক্রয় করিলাম কিন্তু বিক্রেতা শুনিল না। ইহাতে বেচা হইবে না। তবে উক্ত স্থানের লোকেরা খরিদ্দারের কথা শ্রবণ করিয়াছে বলে। কিন্তু বিক্রেতা বলে আমি শুনি নাই তাহা কাজির রায় মতে বিক্রেতার কথা অগ্রাহ্য হইবে।

৬। বিক্রিত বস্তু বর্তমান থাকা, মূল্যবান হওয়া, স্বত্ত্বাবান হওয়া এবং সমর্পণ যোগ্য হওয়া। যে বস্তু বর্তমানে মওজুদ নাই বরং উহা মওজুদ না হওয়ার আশংকা থাকে উহার বেচাকেনা জায়েয নাই। যথা- গর্ভ, অথবা স্তনে যে দুধ আছে উহার বিক্রি জায়েয নহে। কেননা হইতে পারে প্রসূতির পেট ফুলা। সেই জন্য গর্ভের মত দেখায় এবং উহাতে বাচ্চা নাই ও স্তনে দুধ নাই। ফল প্রকাশ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা যায় না। অনুরূপ রক্ত এবং মৃত পশু বেচা যায় না, কেননা ইহা মাল নহে। মুসলমানের জন্য শরাব এবং শূকর বিক্রি জায়েয নহে। কেননা উহা মূল্যবান মাল নহে।

৭। নিদিষ্ট কালের জন্য বিক্রি না হওয়া চাই। যদি নির্দিষ্ট কালের জন্য হয় যথা- এতদিনের জন্য বিক্রি দিলাম। তবে এই বেচাকেনা শুদ্ধ নহে।

৮। বিক্রিত বস্তু এবং মূল্য উভয়ই এমনিভাবে জ্ঞাত হওয়া দরকার যাহাতে কোনরূপ ঝগড়ার সৃষ্টি না হইতে পারে। যদি অজ্ঞাত হয় যাহাতে ঝগড়ার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা হইলে বিক্রি শুদ্ধ নহে। যথা- এই পাল হইতে একটি বকরী বিক্রি দিলাম অথবা এই বস্তুটা সঠিক মূল্যে বিক্রি দিলাম অথবা ঐ মূল্যে দিলাম যাহা অমুক ব্যক্তি বর্ণনা করে। ইহা জায়েয নহে।

মাসয়ালা- ইজাব ও কবুলের পর (বিক্রেতার উপর) বিক্রিত বস্তু খরিদ্দারের হাতে সোপর্দ করা ওয়াজিব এবং খরিদ্দারের উপর ওয়াজিব বিক্রেতাকে মূল্য দিয়া দেওয়া। ইহা ঐ সময় যখন বিক্রি সম্পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু মওকুফ বেচা হইলে, যাহা অন্যের ইজাবের উপর নির্ভরশীল। ইহাতে সত্ত্ব আসিবে যখন এজাযত হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মাল বিক্রি করা উদ্দেশ্য নহে শুধু হাসি ঠাট্টা করিয়া বেচাকেনার শব্দগুলি বলার সময় স্পষ্টভাবে হাসিঠাট্টার শব্দ ব্যবহার করিলে অথবা উভয়ই যদি পূর্ব হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া নেয় যে, লোকের সামনে হাসিঠাট্টার ভাবে বেচাকেনা স্বীকার করিব। এই দুই অবস্থায় হাসিঠাট্টার হুকুম দেওয়া যাইবে এবং বেচাকেনা শুদ্ধ হইবে না। যদি 'আকদের' সময় হাসিঠাট্টার শব্দ না থাকে এবং পূর্বেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়া না থাকে তবে হাবভাব দ্বারা উহা হাসিঠাট্টা হিসাবে গণ্য হইবে না বরং এই বেচাকেনা শুদ্ধ ধরা হইবে। হাসিঠাট্টার বেচাকেনায় কবজ হইলেও সত্ত্ব আসে না। (রদ্দুল মুহতার)

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যক্তিকে বিক্রির উপর বাধ্য করা গেল অর্থাৎ বিক্রি না করিলে কতল অথবা অঙ্গহানির ধমক দেওয়া হইল। সে ভয় পাইয়া বিক্রি দিল, তবে এই বিক্রি

ঠিক হইবে না বরং বাধ্যকতা চলিয়া যাওয়ার পর যদি উহার এজাযত দেয় তখন উক্ত বিক্রি জায়েয বা শুদ্ধ হইবে। (রদ্দে মুহতার)

মাসয়ালাঃ- এমন দুইটি শব্দ যাহা দ্বারা মালিক হওয়া এবং মালিক করার কাজ করে এইরূপ শব্দগুলিকে 'ইজাব কবুল' বলে। ইহার প্রথম বাক্যটিকে 'ইজাব' এবং উহার মোকাবেলায় পরবর্তী বাক্যটিকে 'কবুল' বলে। যেমন বিক্রেতা বলিল- আমি এই বস্তু এত মূল্যে বিক্রি দিলাম। খরিদ্দার বলিল আমি ক্রয় করিলাম। এখানে বিক্রেতার বাক্য 'ইজাব' এবং খরিদ্দারের বাক্য 'কবুল'। খরিদ্দার যদি প্রথমে বলিত যে, আমি এই বস্তু এত টাকায় ক্রয় করিলাম। তাহা হইলে ইহা ইজাব হইত এবং বিক্রেতার শব্দ কবুল হইত। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ইজাব কবুলের শব্দগুলি আরবী, ফারছী, উর্দু, বাংলা প্রত্যেক ভাষায়ই হইতে পারে। উভয়ের শব্দগুলি অতীত কালের হওয়া চাই। যথা- ক্রয় করিলাম বিক্রি দিয়াছি। অথবা উভয়টা বর্তমান কালের হইতে হইবে। যথা- ক্রয় করিতেছি, বিক্রি দিতেছি। অথবা একটি অতীত এবং অপরটি বর্তমান কালের হইতে হইবে। যথা- একজন বলিল বিক্রি দিতেছি অপরজনে বলিল ক্রয় করিয়াছি। ভবিষ্যৎকালের শব্দ দ্বারা বেচাকেনা হয় না। উভয়ের বাক্য ভবিষ্যৎকালের হউক অথবা একজনের। যথা-ক্রয় করিব, বিক্রি দিব। কেননা ভবিষ্যৎকালের শব্দগুলি ইচ্ছার প্রকাশ পায়। বর্তমানে উহা দ্বারা কোন আকদের সমাধা হয় না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- একজনে امـــر বা আদেশের শব্দ ব্যবহার করিল এবং অপর জনে অতীত কালের, যথা- সে বলিল এই বস্তুটি এত টাকায় গ্রহণ কর, অপর জনে বলিল আমি গ্রহণ করিলাম। ইহাতে বেচাকেনা শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন বিক্রেতা দিতে এবং খরিদ্দার গ্রহণ করিতে বাধ্য। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা বলিল, "আমি এই বস্তু বিক্রি দিয়াছি" খরিদ্দার বলিল হাঁ। ইহা দ্বারা বেচাকেনা শুদ্ধ হইবে না। তবে খরিদ্দার যদি 'ইজাব' করিত এবং উহার জওয়াবে বিক্রেতা হাঁ বলিত, তবে বিক্রি হইয়া যাইত।

মাসয়ালাঃ- একজন বলিল, আমি আমার ঘোড়া তোমার ঘোড়ার সঙ্গে বদল করিলাম। অপরজনে বলিল আমিও করিলাম। ইহা দ্বারা বেচা শুদ্ধ হইয়াছে। বিক্রেতা বলিল এই বস্তু তোমার জন্য হাজারের পরিবর্তে, খরিদ্দার বলিল আমি কবুল করিয়াছি বেচা শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তি বলিল, এই বস্তু তোমার জন্য এক হাজারের পরিবর্তে যদি তোমার পছন্দ হয়। অপরজন বলিল আমার পছন্দ হইয়াছে ইহা দ্বারা বিক্রি হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ যদি বলে যে, যদি তোমার মনোপুত হয়, অথবা যদি তুমি ইচ্ছা কর, অথবা যদি তোমার উহার আকাংখা থাকে। সে উত্তরে বলিল, আমার মনোপুত হইয়াছে,

আমি ইচ্ছা করিয়াছি, আমার উহার আকাংখা আছে। এইসব অবস্থায় বেচাকেনা শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তি বলিল এই 'সামান' বা আসবাবপত্র লইয়া যাও এবং উহার সম্বন্ধে অদ্য চিন্তা কর। যদি তোমার পছন্দ হয় তবে উহা এক হাজারের পরিবর্তে, অপরজন উহা লইয়া গেল, ইহা দ্বারা বিক্রি জায়েয হইয়া গিয়াছে। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তি এক হাজার টাকায় একটি গোলাম বিক্রি দিয়া বলিল যে, অদ্য মূল্য না দিলে তোমার আমার মধ্যে বেচাকেনা থাকিবে না। খরিদ্দার উহা মঞ্জুর করিল। কিন্তু সেইদিন মূল্য আনিল না। দ্বিতীয় দিন খরিদ্দার বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাত করিল এবং বলিল আপনি এই গোলাম আমার নিকট এক হাজার টাকায় বিক্রি করিয়াছেন। সে বলিল, হাঁ! খরিদ্দার বলিল, আমি উহাকে গ্রহণ করিলাম। এই অবস্থায় এখনই বেচাকেনা শুদ্ধ হইল। গতকল্য যে বেচাকেনা হইয়াছিল, উহা মূল্য না দেওয়ার কারণে বাতিল হইয়া গিয়াছিল। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তি দূর হইতে চিৎকার করিয়া বলিল, আমি এই বস্তু এত টাকায় তোমার নিকট বিক্রি দিলাম। সে বলিল আমি ক্রয় করিলাম। দূরত্ব যদি এতটা হইয়া থাকে যাহাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় না বেচাকেনা শুদ্ধ হইবে অন্যথায় নহে।

(আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা বলিল যে, ইহা আমি আপনার নিকট বিক্রি দিলাম। খরিদ্দার উহা খাইতে আরম্ভ করিল, অথবা বিক্রিত বস্তু পশু ছিল খরিদ্দার উহার উপর আরোহণ করিল। অথবা কাপড় ছিল উহা সে পরিধান করিল- ইহা দ্বারা বেচাকেনা হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এইসব ব্যবহার স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হইয়াছে। অনুরূপ এক ব্যক্তি অপরকে বলিল এই বস্তুটা খাইয়া ফেল এবং ইহার পরিবর্তে তোমার উপর এক টাকা ধার্য হইবে। সে উহা খাইয়া ফেলিল। ইহা দ্বারা বেচাকেনা শুদ্ধ হইয়াছে এবং খাওয়াও হালাল হইয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- দুই ব্যক্তির মধ্যে একখানা কাপড় সম্বন্ধে দর হইতে লাগিল। বিক্রেতা বলিল, পনর টাকায় বেচিতেছি। খরিদ্দার বলিল দশ টাকায় লইতেছি ইহার চাইতে বেশী দিব না; বরং খরিদ্দার উক্ত কাপড়খানা লইয়া চলিয়া গেল। এখন দেখিতে হইবে দর করার সময় কাপড় খানা কাহার হাতে ছিল। যদি খরিদ্দারের হাতে থাকিয়া থাকে তবে পনর টাকায়ই বেচা হইয়াছে এবং বিক্রেতার হাতে যদি ছিল খরিদ্দার তাহার থেকে লইল কিন্তু সে নিষেধ করিল না। তাহা হইলে দশ টাকায়ই বেচা হইয়াছে; এবং কাপড়খানা যদি খরিদ্দারের নিকট থাকে এবং সে বলে যে, দশ টাকার বেশী দিব না। কিন্তু বিক্রেতা বলিল যে, পনর টাকার কমে বেচিব না। ইহা শুনিয়া খরিদ্দার কাপড়খানা ফেরত দিল। ইহার পর পুনঃ বিক্রেতাকে বলিল, কাপড় লও, মূল্য দাও বিক্রেতা দিয়াদিল। কিন্তু মূল্য সম্বন্ধে কিছুই আর বলিল না। খরিদ্দার লইয়া চলিয়া গেল। এই

অবস্থায় দশ টাকায়ই বেচা হইয়াছে। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- কোন একটা বস্তু সম্পর্কে বিক্রেতা মূল্য বদলাইয়া দুইটা 'ইজাব' করিল। যথা- প্রথম পনর টাকা বলিয়াছে, দ্বিতীয় 'ইজাবে' বলিয়াছে যে, ইহার মূল্য এক গিনি। এই উভয় ইজাবের পর খরিদ্দার কবুল করিয়াছে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় মূল্যের সহিত বেচাকেনা সাব্যস্ত হইবে। খরিদ্দার যদি প্রত্যেক ইজাবের পরই কবুল করিয়া থাকে তবুও দ্বিতীয়টাই শুদ্ধ হইবে। প্রথমটি বাতিল হইয়া যাইবে; এবং ইভয় ইজাবের মধ্যে মূল্য একই ধরনের হয় তবে পরিমাণের দিক দিয়া কম ও বেশী। যথা- প্রথম পনর টাকা বলিয়াছে তৎপর দশ টাকা বলিয়াছে বা প্রথম দশ টাকা পরে পনর টাকা বলিয়াছে এই অবস্থায় দ্বিতীয় বেচাই ধর্তব্য হইবে; এবং পরিমাণের হিসাবে যদি বেশী কম না হয় তবে প্রথম বেচাই শুদ্ধ দ্বিতীয়টি বেহুদা। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে মজলিসে ইজাব হইয়াছে, যদি কবুলকারী সেই মজলিস হইতে গায়েব থাকিয়া থাকে ভবে ইজাব বাতিল হইয়া যাইবে। তবে কবুলকারীর নিকট যদি ইজাবের শব্দগুলি লিখিয়া পাঠায় এবং যেই মজলিসে লেখা পৌছিয়াছে সেই মজলিসে কবুল করিয়া থাকে তবে বেচাকেনা শুদ্ধ হইয়াছে। উক্ত মজলিসে কবুল না করিয়া থাকিলে তৎপর কবুল করিতে পারিবে না। অনুরূপ ইজাবের শব্দগুলি যদি কোন দূত মারফত বলিয়া পাঠান হয়, তবে উক্ত দূত যেই মজলিসে খবর পৌছায় সেই মজলিসেই কবুল করিতে পারে। তবে গায়েব ব্যক্তির পক্ষ হইতে উক্ত মজলিসের কেহ যদি কবুল করে তবে ইজাব বাতিল হইবে না বরং উক্ত গায়েব ব্যক্তির ইজাজতের উপর মওকুফ থাকিবে। একজনকে খবর পৌছানোর জন্য আদেশ করিয়াছে। কিন্তু সে না পৌছাইয়া অন্য কেউ পৌছাইয়াছে এবং গায়েব ব্যক্তি কবুল করিয়াছে। তাহা হইলে বেচা শুদ্ধ হইয়াছে। যেরূপ ইজাব লেখা দ্বারা হইতে পারে তেমনি কবুলও লেখা দ্বারা হইতে পারে। যেমন একজন অন্যের নিকট ইজাব লিখিয়া পাঠাইল অপরজনও কবুল লিখিয়া পাঠাইলে ইহাতে বেচা হইয়া যাইবে। তবে যেই মজলিসে ইজাবের লেখা পৌছিয়াছে কবুলের লেখাও সেই মজলিসে হইতে হইবে। নতুবা ইজাব বাতিল হইয়া যাইবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার, আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- একজনে ইজাব করিলে অপরজনের জন্য ইচ্ছা উক্ত মজলিসে কবুল করুক বা রদ করুক। ইহাকে আরবী ভাষায় (خيار قبول) বলে। খিয়ারে কবুলের ভিতর উত্তরাধিকারী নাই। যেমন- সে মরিয়া গেলে তাহার ওয়ারিসের উহা কবুল করার অধিকার থাকে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- 'খিয়ারে কবুল' শেষ মজলিস পর্যন্ত থাকে। মজলিস বদল হইয়া গেলে আর খিয়ারে কবুল থাকে না। ইজাবকারী ব্যক্তি জীবিত হওয়া চাই। অর্থাৎ যদি ইজাবের পর কবুলের পূর্বে উক্ত ব্যক্তি মরিয়া যায়, তবে কবুলের হক থাকে না। কেননা

ইজাবকারীর মৃত্যুর কারণে ইজাবই বাতিল হইয়া গিয়াছে তাহলে আর কে কবুল করিবে? (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে কোন একজন ব্যক্তি উক্ত মজলিস হইতে উঠিয়া গেলে অথবা বিক্রি ছাড়া অন্য কোন কাজে লিপ্ত হইলে 'ইজাব' বাতিল হইয়া যাইবে। কবুল করার পূর্ব পর্যন্ত যিনি 'ইজাব' করিয়াছেন স্বীয় ইজাব হইতে ফিরিয়া যাওয়া বৈধ হইবে। কিন্তু কবুল করা হইলে আর ইজাব ফেরত করিতে পারিবে না। কেননা কবুল দ্বারা অন্যের হক প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, উহা নষ্ট করা যায় না। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- 'ইজাব' ফেরত লওয়ার জন্য শর্ত হইতেছে অপর জনের উহা শ্রবণ করা। যেমন বিক্রেতা বলিল, আমি ইহা বিক্রি দিয়াছি; তৎপর আমার এই ইজাব ফেরত লইয়াছি। কিন্তু খরিদ্দার ইহা শুনিলনা এবং সে কবুল করিয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থায় বেচাকেনা শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (আলমগীরী)

মাসায়ালাঃ- ইজাব লেখিয়া পাঠাইল অথবা কোন দূত মারফত বলিয়া পাঠাইল, এই অবস্থায় অপর জনের নিকট পত্র না পৌছায় অথবা কবুল না করা পর্যন্ত প্রেরিত ব্যক্তিকে ফেরত লওয়ার অধিকার আছে।

মাসয়ালাঃ- ইজাব কবুল হইয়া যাওয়ার পর বেচাকেনা হইয়া যায়। এখন কেহ অপর জনের মত ছাড়া রদ করিতে পারে না। তবে বিক্রিত বস্তুর ভিতর (عيب) বা ত্রুটি বাহির হইয়া পড়িলে অথবা খরিদ্দার বিক্রিত বস্তু দেখিয়া না থাকিলে 'খিয়ারে আয়েব' এবং খিয়ারে রুইয়াত থাকিয়া যায় বা দেখার অধিকার বলবৎ থাকিবে। পরে ইহার বর্ণনা আসিতেছে। (হেদায়া)

বায়ে তায়াতী

মাসয়ালাঃ- মৌখিক ইজাব কবুল ছাড়া মাল লওয়া দেওয়ার দ্বারা যে বেচাকেনা হয় উহাকে (بيع تعاطى) বা হাত ব-হাত বেচাকেনা বলে। ইহা সাধারণ বস্তু যেমন সাক, তরকারীর বেচাকেনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বরং প্রত্যেক মূল্যবান ও সাধারণ বস্তুর ভিতরই হইয়া থাকে। ইজাব ও কবুল দ্বারা যেমন বেচাকেনা পাকা হইয়া যায়। তদ্রূপ পরস্পরে মাল লওয়া দেওয়ার দ্বারাও বেচাকেনার কাজ সমাধা হইয়া যায়। একে অপরের মত ছাড়া রদ করিতে পারে না। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- মালের মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর খরিদ্দার বিক্রেতার সম্মতিক্রমে মাল নিয়া গেল এবং মূল্য দিল না অথবা খরিদ্দার বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করিয়া দিল কিন্তু মাল রাখিয়া চলিয়া গেল। এই অবস্থায়ও বেচাকেনা হইয়া যাইবে। যেখানে মূল্য জানা না থাকে সেখানেই মূল্য ধার্য করা প্রয়োজন। যদি কোন বস্তুর মূল্য সর্বসাধারণের জানা থাকে যথা- বাজারে রুটি বিক্রি হয়, সকল লোকেই উহার মূল্য জানে অথবা

গোশত ইত্যাদি অনেক বস্তুই আছে যার মূল্য লোকের জানা থাকে; এই সব বস্তুর মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। (রদ্দে মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা দোকানদারকে আটা চাউলের জন্য টাকা দিয়া বলিল, টাকায় কত সের? সে বলিল দশ সের। ইহার পর ক্রেতা চুপ হইয়া গেল অর্থাৎ উক্ত দর মঞ্জুর করিল। তারপর দোকানদার থেকে আটা বা চাউল তলব করিল। বিক্রেতা বলিল আগামীকল্য দিব, খরিদ্দার চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন উহা নেওয়ার জন্য আসিল কিন্তু আজ বাজার বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বের দর অনুযায়ীই দিতে হইবে, অতিরিক্ত মূল্য লইতে পারিবে না। (রদ্দে মোখতার)

মাসয়ালাঃ- এক মুঠা এক টাকায় খরিদ করিয়া পুনঃ বিক্রেতাকে বলিল এই মূল্যের আর একটা মুঠা এখানে আনিয়া রাখ, সে আনিয়া দিল। এই অবস্থায় ২য় মুঠারও বিক্রি হইয়া গিয়াছে। খরিদ্দার উহা লইতে অস্বীকার করিতে পারিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ফলের ঝুড়ি যাহার ভিতর ছোট বড় ফল আছে। মালিককে জিজ্ঞাসা করা হইল, টাকায় কয়টি? সে বলিল ১০টি। এখন খরিদ্দার ১০টি উহা হইতে ভিন্ন করিয়া লইল অথবা বিক্রেতা খরিদ্দারের জন্য ১০টি বাহির করিয়া দিল এবং খরিদ্দারও লইল। এই অবস্থায় বিক্রিত মাল শুদ্ধ হইয়াছে। (ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালাঃ- দোকানদারগণ থেকে খরচের জন্য বাজে বস্তু লওয়া হয় এবং খরচ করার পর মূল্যের হিসাব হয় এই রূপ করা জায়েয। (রদ্দে মুখতার)

বিক্রিত বস্তু এবং মূল্য

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তু যদি (منقولات) অস্থাবর সম্পত্তি হয়। যথা- ধান, চাউল ইত্যাদি। তাহা হইলে এইসব বস্তু বিক্রি করিতে হইলে বিক্রেতার হস্তগত হওয়া দরকার। হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করিলে বেচা অশুদ্ধ হইবে। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তু এবং মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া দরকার এবং মূল্যের প্রকৃতিও জানা দরকার। তবে মূল্যের দিকে ইশারা করা যদি হয়। যেমন এই টাকার পরিবর্তে ক্রয় করিলাম। এই অবস্থায় পরিমাণ এবং প্রকৃতি বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। তবে উক্ত মালটা যদি এমন হয় যাহাতে কম ও বেশী হইলে সুদ হয়। (এইসব জিনিসের মালের মোকাবেলায় বিক্রি হয়) যথা- গমের এই স্তুপের পরিবর্তে এই স্তুপ বিক্রি দিলাম। এখানে বিক্রিত বস্তু এবং মূল্য উভয়টির প্রতি যদিও ইশারা করা হইয়াছে তবুও পরিমাণ জানা দরকার। কেননা উভয় স্তুপের পরিমাণ যদি সমান সমান না হয় তবে সুদ হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বেচাকেনার ভিতর কখন কখন মূল্য নগদ পরিশোধ করা হয় কখন উহার পরিশোধের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয়। কেননা নির্দিষ্ট তারিখ না হইলে

ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে। বেচাকেনার ইজাব কবুলের সময় নগদ মূল্য পরিশোধ করাই সাধারণ নিয়ম। অতএব ইজাব ও কবুলের সময় মূল্য নগদ দেওয়া হইবে। এই কথা বলার কোন প্রয়োজন থাকে না; বরং ইজাব কবুলের সময় যদি মূল্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তখনও তৎক্ষণাত মূল্য পরিশোধ করাই ওয়াজিব। কিন্তু ধার্য মূল্যের জন্য ইজাব ও কবুলের সময়ই উহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা বলে যে, নির্দিষ্ট কোন দিন ধার্য ছিল না। কিন্তু খরিদ্দার বলে যে, নির্দিষ্ট দিন ছিল। এমতাবস্থায় খরিদ্দারের সাক্ষীই গ্রহণযোগ্য; এবং বিক্রেতার কওল মো'তাবার নয় নির্দিষ্ট দিনের পরিমাণ সম্বন্ধে যদি মতভেদ হয়, যেমন- একজন বলে 'কম' অপরজন বলে বেশী। তাহা হইলে যে কম বলে তাহারই কথা ধর্তব্য হইবে; এবং সাক্ষী এখানেও খরিদ্দারেরই গ্রহণযোগ্য। যদি একজন বলে যে, নির্দিষ্ট দিন অতিবাহিত হইয়াছে এবং অপরজন বলে যে, বাকী আছে। এই অবস্থায় খরিদ্দারের কথাই গ্রহণযোগ্য। এবং উভয় যদি সাক্ষী হাজীর করে তবে খরিদ্দারের সাক্ষীই গ্রহণযোগ্য। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মরিয়া গেলে নির্দিষ্ট দিন বাতিল হইয়া যায়। তবে ঋণ দাতা মরিলে 'মিয়াদ' বাতিল হয়না। কেননা মিয়াদের ফায়দাহ এই যে, ব্যবসা ইত্যাদি করিয়া ঐ সময় ঋণের পরিমাণ সংগ্রহ করা এবং ঋণ পরিশোধ করা। নির্দ্ধারিত সময় রাখার কোন অর্থ হয় না; বরং তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি এবং যখন সে নিজেই না থাকে তবে মিয়াদ হওয়া ফজুল; বরং যাহা তরকা থাকিবে উহা ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে। এই জন্য বাকী বিক্রির মধ্যেও বিক্রেতার মৃত্যুর কারণে সময় বাতিল হইবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- বেচাকেনার ইজাব কবুলের সময় মূল্য পরিশোধ করার কোন 'মিয়াদ' উল্লেখ ছিল না। ইজাব কবুলের পর বিক্রেতা খরিদ্দারকে মূল্য পরিশোধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ ঠিক করিয়া দিল। যেমন- পনর দিন অথবা এমন মিয়াদ নির্দিষ্ট করিল যাহার ভিতর সামান্য অজ্ঞতা থাকে। যথা- যখন ফসল কাটা হইবে তখন মূল্য পরিশোধ করিবে। এইসব অবস্থায় মূল্য বাকী ধার্য হইয়া গেল। এখন যতদিন পর্যন্ত মিয়াদ পূর্ণ না হইবে বিক্রেতার জন্য মূল্য তলব দেওয়ার অধিকার আসিবে না। তবে যদি এমন মিয়াদ নির্দিষ্ট হয় যাহাতে অনেক বেশী জেহালত থাকে। যথা- বন্যা হইবে তখন মূল্য আদায় করিবে। এই অবস্থায় এই মিয়াদ বাতিল। মূল্য নগদ পরিশোধ করিতে হইবে। (দুররুল মোখতার, হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তুর মূল্য বাবৎ খরিদ্দারের কাছে এক হাজার টাকা পাওনা আছে, বিক্রেতা বলিয়া দিল যে, প্রত্যেক মাসে একশত টাকা করিয়া পরিশোধ করিবে। ইহা (دين مؤجل) বা অবকাশযুক্ত দেনা হিসাবে গণ্য হইবে। কেহ হাজার টাকা দেনা

এবং ঋণদাতা আদায় করার জন্য কিস্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিল এবং ইহার জন্য এই শর্তও করিয়া দিল যে, যদি এক কিস্তি খেলাফ হয়, তবে বাকী সমস্ত দেনা তখনই পরিশোধ করা হইবে। কিস্তি দেওয়া হইবে না এই ধরনের শর্ত করা শুদ্ধ। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু খরিদ্দারকে দেওয়ার পর হইতে মিয়াদ আরম্ভ হইবে। যেমন এক বৎসরের মিয়াদ ছিল কিন্তু বৎসর শেষ হইয়া গেল। এখনও বিক্রিত বস্তু খরিদ্দারকে দেওয়া হইল না। এই অবস্থায় দেওয়ার পর থেকে এক বৎসরের মিয়াদ সে পাইবে। (দুররুল মোখতার)

বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত মুদ্রার হুকুম

মাসয়ালাঃ- যে দেশে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার প্রচলন আছে। সেখানে বিক্রয়ের সময় শুধু টাকা উল্লেখ হইয়াছে, কোন নির্দিষ্ট ধরনের উল্লেখ করা হয় নাই। এক্ষেত্রে সেই দেশে যেই মুদ্রার প্রচলন সর্বাপেক্ষা বেশী তাহাই পরিশোধ করিতে হইবে। যদিও মুদ্রাগুলি আর্থিক মানের হিসাবে বেশী বা কম হয় বা সমানই হয়; এবং প্রচলন যদি সব গুলির সমান হয় এবং আর্থিক মানের দিক দিয়াও সমান সমান। তবে বেচা শুদ্ধ হইবে এবং খরিদ্দার যেইটা ইচ্ছা পরিশোধ করিতে পারে। যেমন- এক টাকায় কোন বস্তু ক্রয় করিয়াছে এখন খরিদ্দার এক টাকা অথবা ২ খানা আধুলী অথবা চারখানা চার আনী অথবা দশ পয়সা দশ খানা যাহা ইচ্ছা দিতে পারে। তবে আর্থিক মানের দিক দিয়া যদি বেশী বা কম হয়। যথা- হায়দারাবাদী টাকা এবং শাহী চেহারাযুক্ত টাকা, যাহা মানের দিক দিয়া পার্থক্য থাকে। যদি কোন দেশে উভয় সমান চালু থাকে তাহলে উক্ত বেচা শুদ্ধ হইবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বিভিন্ন আর্থিক মানের টাকা কোন দেশে সমান ভাবে চালু আছে। বেচাকেনার সময় কোনটি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল না। কিন্তু এখনও একই মজলিসে রহিয়াছে। এই অবস্থায় একজনে যদি টাকা নির্দিষ্ট করে এবং অপরজন মঞ্জুর করিয়া লয় এ অবস্থায় বেচাকেনা শুদ্ধ হইয়া যাইবে। (ফতহুল কাদীর)

তুলাদণ্ড এবং পাল্লা দ্বারা ওজন করা অথবা অনুমানের বেচাকেনা

গম, যব এবং অন্যান্য শস্যগুলি বিক্রি পাল্লায় ওজন করিয়াও হইতে পারে এবং পাল্লা দ্বারা মাপিয়াও বেচা যায়। যেমন- এক টাকায় এত সের এবং অনুমানে আন্দাজ করিয়াও ক্রয় করা যায়। যেমন- এই ধরনের স্তুপটি এত টাকা যদিও উক্ত স্তুপে কি পরিমাণ ধান আছে তাহা জানা নাই। তবে অনুমানে কেনাবেচা ঐ স্থানে জায়েয যেখানে শস্যের মূল্য অন্য জিনিস দ্বারা পরিশোধ করা হয়। যেমন-টাকা দ্বারা অথবা গম, যবের পরিবর্তে বা অন্য কোন শস্যের পরিবর্তে বেচা হয়। যদি উভয় বস্তু একই জিনিসের হয় যেমন-গমের পরিবর্তে গম ক্রয় করিল। এই অবস্থায় অনুমানে বেচা জায়েয হইবে না। কেননা এই অবস্থায় কম বেশী হইলে সুদ হইবে। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- একই ধরনের জিনিসের দুইটা বস্তু একটি অপরটির পরিবর্তে বেচাকেনা হইল। ঐ মজলিসেই যদি জ্ঞাত হইয়া যায় যে, উভয় বস্তুই সমান সমান তবে বেচা শুদ্ধ হইয়াছে। অনুরূপ যদি উভয়টির মধ্যে কম ও বেশীর সম্ভাবনা না থাকে, আর পরিমাণ জানা না-ই থাকে এমতাবস্থায়ও বেচা শুদ্ধ হইবে। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- একই জিনিসের বস্তু একটি অপরটির পরিবর্তে আনুমানিক বেচা হইল। ইহাদের মধ্যে কিছু কম ও বেশী আছে। তবে উহার পরিমাণ মাত্র অর্দ্ধ ছাঃ বা পৌণে দুই সের এই অবস্থায় বেচা শুদ্ধ হইবে। কেননা অর্দ্ধ ছার কমে সুদ হয় না।

(দোররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- একটা পাত্র যাহার পরিমাণ জানা নাই যে, উহাতে কি পরিমাণ শস্য ধরে অথবা একটা পাথর বা লৌহ যাহার ওজন জানা নাই, উহা দ্বারা বেচা জায়েয। যেমন এই পাত্রের চার পাত্র গম এক টাকা অথবা এই পাথরের বা লোহার এক বার পরিমাণ এক টাকায়। তবে ইহাতেও শর্ত এই যে, ওজন করিতে যেন বেশী দিন অতিবাহিত না হয়। কেননা তাহা হইলে পাত্র নষ্ট হইতে পারে অথবা পাথর ও লৌহ হারাইয়া যাইতে পারে। এবং পাত্রটিও সংকোচ ও প্রশস্ত না হয় তেমন হওয়া দরকার। কাঠের লোহার এবং পাথরের হওয়া চাই। যদিও সংকোচ অথবা প্রশস্ত হয় এমন পাত্র হয়, তবে উহা দ্বারা বেচা জায়েয নাই। যেমন- থলে। তবে পানির মশক যদিও উহার সংকোচ হয় তবুও দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উহা দ্বারা বেচা-কেনা জায়েয।

(হেদায়া, ফতহুল কাদীর, দুররুল মুখতার)

মাসয়ালাঃ- শস্যের এক স্তুপ এইভাবে বিক্রি দিল যে, উহার প্রত্যেক সের এক টাকা। এই অবস্থায় শুধু এক সেরেরই বিক্রি শুদ্ধ হইবে এবং খরিদ্দারের ইখতিয়ার থাকিবে তাহার নেওয়া না নেওয়ার ভিতর। তবে ঐ মজলিসেই যদি সবগুলি ওজন দিয়া ফেলে অথবা বিক্রেতা বলিয়া দেয় যে, ইহাতে এত সের। তাহলে সমস্ত স্তুপেরই বেচা শুদ্ধ হইবে; এবং ইজাব ও কবুলের পূর্বে অথবা ইজাব কবুলেরই ভিতর সেরের পরিমাণ বর্ণনা করিয়া থাকিলে খরিদ্দারের ইখতিয়ার থাকিবে না; এবং পরে বর্ণনা করিয়া থাকিলে ইমাম আজমের মতে খরিদ্দারের ইখতিয়ার থাকিবে । ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে মজলিসের পরেও যদি পরিমাণ মালুম হইয়া যায় তাহলে বেচা শুদ্ধ হইবে। এই কওল সহজ বিধায় ইহার উপর ফতোয়া হইয়াছে।

(হেদায়া, ফতহুল কাদীর, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বকরীর পাল খরিদ করিল এইভাবে যে, প্রত্যেক বকরী পাঁচ টাকা অথবা কাপড়ের থান ক্রয় করিল এই হিসাবে যে, প্রত্যেক গজ এক টাকা। কিন্তু জানা নাই বকরীর পালে কয়টা বকরী এবং কাপড়ের থানে কত গজ কাপড় আছে, পরে জানা হইল। এই অবস্থায় হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে বেচাকেনা জায়েয হইয়াছে এবং ইহারই উপর ফতোয়া হইয়াছে।

(দুররুল মোখতার)

বর্ণিত পরিমাণ হইতে কম অথবা বেশী পাওয়া গেলে

মাসয়ালাঃ- শস্যের স্তুপ ক্রয় করিল, যেমন- ধরা হইল যে, এখানে একশত মণ এবং ইহার মূল্য একশত টাকা। পরে উহার ওজন দেওয়া হইল। এখন যদি পুরাপুরি একশত মণ হয় তবেত ঠিকই হইয়াছে; এবং একশত মণ হইতে বেশী হইলে অতিরিক্তগুলি বিক্রেতারই রহিয়া গেল এবং একশত মণ হইতে কম হইলে খরিদ্দারের ইচ্ছা যতটা কম হইয়াছে উহার মূল্য কমাইয়া অবশিষ্ট মূল্য তাহা লওয়া অথবা কিছুই না লওয়া। এই হুকুম প্রত্যেক ঐ সব বস্তুর যাহা পাল্লায় অথবা পাত্র দ্বারা মাপিয়া বিক্রি দেওয়া হয়। তবে উহা যদি এমন ধরনের বস্তু হয় যাহা খণ্ড করিলে ক্ষতি হয় এবং বর্ণিত ওজন হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে সমূলেই খরিদ্দারই পাইবে এবং অতিরিক্তের পরিবর্তে খরিদ্দারের কিছু দিতে হইবে না। কেননা ওজন এই সব বস্তুর ভিতর (وصف) গুণই হইয়া থাকে এবং গুণের পরিবর্তে মূল্যের অংশ আসে না। যথা- একটা মতি বা ইয়াকুত ক্রয় করিল যে, উহা এক মাশা, পরে দেখা গেল যে, উহা এক মাশা হইতে কিছু বেশী। এই অবস্থায় পূর্ব নির্দ্ধারিত মূল্যেই খরিদ্দার উহা গ্রহণ করিবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- থান কিনিল যে, ইহা দশ গজ এবং উহার মূল্য দশ টাকা। যদি উক্ত থান উহা হইতে কম হয় যাহা বিক্রেতা বলিয়াছে। তাহা হইলে খরিদ্দারের ইখতিয়ার হয় যে, পুরা দামে উহাই লইবে অথবা একেবারেই লইবে না। যে পরিমাণ কম সেই পরিমাণ মূল্য কমাইতে পারিবে না; এবং যদি উহা হইতে বেশী পাওয়া যায় তাহা হইলে এই অতিরিক্ত বিনা মূল্যেই খরিদ্দার পাইবে, বিক্রেতার কোন অধিকার নাই যে অতিরিক্তটুকুও ফেরত লইতে পারিবে; এবং উহার মূল্যও লইতে পারিবে না এবং বিক্রি বাতিল করিতেও পারিবে না। এইরূপ যদি জমি ক্রয় করিয়া থাকে যে, উহা একশত গজ। উহার মূল্যও একশত টাকা এবং কম বেশী পাওয়া গেল। এই অবস্থায় বেচা শুদ্ধ হইয়াছে এবং একশত টাকাই দিতে হইবে, তবে কম হইলে খরিদ্দারের ইখতিয়ার লওয়া না লওয়ার ভিতর। (হেদায়া ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ- ইহা বলিয়া থান কিনিল যে, দশ গজের থান দশ টাকায় এবং ইহাও বলিল যে, প্রত্যেক গজ এক টাকা। এখন যদি কম হয়, তবে যত কম মূল্য সেই হিসাবে কম হইবে এবং খরিদ্দারের না লওয়ারও ইখতিয়ার আছে। যদি বেশী হয় যেমন- একাদশ অথবা দ্বাদশ গজ হয়, তবে এই অতিরিক্তের টাকাও দিতে হইবে অথবা বেচা বাতিল করিয়াও দিতে পারে। (হেদায়া)

এই হুকুম ঐ থানের যাহা পুরা এক রকমের হয় না। যথা- চিকন, গোল বদন, বেনারসী শাড়ী, বা থান কাপড় যাহা বুটাদ্বার। যদি একই রকমেরই হয় তাহা হইলে ইহাও হইতে পারে যে, বিক্রেতা উক্ত অতিরিক্ত অংশটুকু ফাড়িয়া দশ গজ খরিদ্দারকে দিয়া দিবে।

মাসয়ালাঃ- কোন বাসস্থান অথবা স্নানাগারের একশত গজ হইতে দশ গজ ক্রয় করিয়াছে, ইহা অশুদ্ধ। যদি বলিত যে, শত অংশের দশ অংশ ক্রয় করিয়াছে, তাহা হইলে বেচা শুদ্ধ হইত। প্রথম ছুরতে যদি ঐ মজলিসেই উক্ত দশ গজ জমি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। যেমন- বলিল যে, এই দশ গজ তাহা হইলে বেচা শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

(হেদায়া, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- কাপড়ের এক পুটলী এই শর্তে ক্রয় করিল যে, ইহাতে দশ থান কাপড় রহিয়াছে। পরে দেখা গেল যে, উহাতে নয় থান অথবা এগার থান, এমতাবস্থায় বেচাকেনা অশুদ্ধ হইবে। কেননা কম হওয়ার অবস্থায় মূল্য অজানা এবং বেশীর অবস্থায় বিক্রিত বস্তু অজ্ঞাত; এবং প্রত্যেক থানের মূল্য যদি বর্ণনা করিয়া থাকে, তবে কম অবস্থায় বেচা জায়েয হইবে। নূতন থানের মূল্য দিয়া লইয়া যাইবে। অবশ্য এই অবস্থায় খরিদ্দার ইচ্ছা করিলে বিক্রি ভংগ করিতে পারিবে। যদি এগার থান হয়, তবে বেচা নাজায়েয। কেননা বিক্রিত বস্তু অজ্ঞাত। উহা হইতে কোন থানটি কম হইবে তাহাও অজ্ঞাত। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- বহু থানের এক পুটলী কাপড় খরিদ করিল উহা হইতে এক অনির্দিষ্ট থান বাদ দিল অথবা বকরীর একটা পাল ক্রয় করিল এবং উহা হইতে একটা অনির্দিষ্ট বকরী বাদ দিল, এই বেচা অশুদ্ধ। তবে নির্দিষ্ট থান বা নির্দিষ্ট বকরী যদি বাদ দিত তাহা হইলে বেচা জায়েয হইত। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- কেহ একটা জমি ক্রয় করিল যে, উহাতে একটা ফলদার বৃক্ষ আছে। কিন্তু উহার ভিতর এমন একটা বৃক্ষ পাওয়া গেল যাহা ফল দেয় না। এই বেচা শুদ্ধ হয় নাই। জমি কিনিল যে উহাতে একটা বৃক্ষ আছে। কিন্তু উহা হইতে কম পাওয়া গেল, এ অবস্থায় বেচা শুদ্ধ, তবে খরিদ্দার ইচ্ছা করিলে পুরা টাকায় উহাই গ্রহণ করিবে অন্যথায় গ্রহণ করিবে না। এইরূপ যদি বাসস্থান খরিদ করে এই হিসাবে যে, উহাতে এতটা কামরা অথবা কোঠা আছে কিন্তু কম পাওয়া গেল। এখানে বেচা শুদ্ধ কিন্তু খরিদ্দারের ইখতিয়ার থাকিবে। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

কি কি বস্তু বিক্রির ভিতর শামিল হইবে এবং কি কি বস্তু শামিল হইবে না

মাসয়ালাঃ- কোন বাসস্থান ক্রয় করিল, উহাতে যতগুলি কামরা বা কোঠা আছে সবই বিক্রির ভিতর শামিল হইবে। এইরূপ যে সব বস্তু বিক্রিত বস্তুর সহিত এমনিভাবে জড়িত যে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ এই জন্য নয় যে, উহা ভিন্ন করা যাইবে। ইহাও বিক্রির ভিতর শামিল হইবে। যথা- বাসস্থানের সিড়ি, অথবা কাঠের সিড়ি যাহা ঘরের সহিত মিশ্রিত, দরজা, চৌকাঠ, দ্বারের শিকল এবং ঐসব তালা যাহা কপাটের সঙ্গে জড়িত এবং উহার চাবি, দোকানের সামনে যে তখতা লাগান থাকে এই সবই বেচার মধ্যে শামিল। কিন্তু যে সব তালা কপাটের সঙ্গে জড়িত না থাকে বরং আলাদা থাকে, এই সব

বেচায় শামিল নহে; বরং এইসবগুলো বিক্রেতা লইয়া যাইবে।

(দুররুল মোখতার, ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত জমির ভিতর যত রকমের বৃক্ষ ছোট বড় ফলদার ফলশূন্য সবই বেচার শামিল হইবে। কিন্তু শুকনা গাছ যাহা এখনও জমি হইতে উঠান হয় নাই ইহা বিক্রির ভিতর শামিল হইবে না। কেননা ইহা যেন শুকনা কাঠ জমিনের উপর রাখা হইয়াছে। অতএব আম ইত্যাদির চারা যাহা জমিনে হয় বর্ষার সময় ঐগুলি উঠাইয়া অন্যত্র লাগান হয় এই সবও বিক্রয়ের শামিল হইবে। (ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালাঃ- স্নানাগার বিক্রি হইল, সেখানে পানি গরম করার ডেগ যাহা জমির সঙ্গে জড়িত অথবা এত বড় ও ভারী যে, যাহা এদিক ওদিক সরান যায় না, তাহা বিক্রির শামিল হইবে। এবং ছোট ডেগ যাহা জমির সঙ্গে জড়িত নহে তাহা বিক্রির ভিতর শামিল হইবে না। ধোপার ডেগ যাহাতে পানি গরম করা হয় এবং রঞ্জকের মটকী ইত্যাদি যাহাতে রং তৈয়ার করে, এই সব যদি জমির সঙ্গে জড়িত হয় বিক্রিতে শামিল হইবে, নতুবা শামিল হইবে না। অনুরূপ ধোপার পাটা। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- গাধার মালিক হইতে গাধা ক্রয় করিলে, উহার গদিও শামিল হইবে। তবে ব্যবসায়ী হইতে ক্রয় করিয়া থাকিলে উহা শামিল হইবে না। উহার গলায় যদি হার ইত্যাদি পরাইয়া থাকে, তবে উহা সর্বক্ষেত্রেই বিক্রির শামিল হইবে।

(দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- গরু অথবা মহিষ ক্রয় করিলে, উহার ছোট ছোট বাচ্চা যাহা দুধ পান করে বিক্রির মধ্যে শামিল হইবে যদিও উল্লেখ না থাকে এবং গর্দভীর সঙ্গে উহার দুধপায়ী বাচ্চা বিক্রির শামিল হইবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- ঘোড়া অথবা উট বিক্রি হইল। উহার লেগাম এবং উটের নাসারন্ধ্রে যে দড়ি পরান হয় উল্লেখ না থাকিলেও বিক্রির শামিল হইবে। বিক্রেতা উহা দিতে বাধ্য। তবে উহার গদি শামিল হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- মাছ ক্রয় করার পর উহার পেটে মতি পাওয়া গেল। যদি এই মতি ঝিনুকের ভিতর থাকিয়া থাকে, তবে উহা খরিদ্দারের; এবং ঝিনুক ছাড়া খালি মতি হইলে, যদি বিক্রয়কারী উক্ত মাছ শিকার করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে ফেরত দিবে এবং বিক্রেতার নিকট উহা পাওয়া বস্তুর ন্যায় আমানত থাকিবে। সে প্রচার করিবে, মালিকের সন্ধান না পাইলে খয়রাত দিয়া দিবে; এবং মোরগের পেটে মতি পাইলে বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। (খানিয়া, আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বেচার ভিতর যে সব বস্তু শামিল হয় উহার জন্য মূল্যের কোন অংশ নাই। অর্থাৎ উহা নষ্ট হইলেও আসল মালের মূল্য কমিবে না। খরিদ্দারের পুরা মূল্যে উহা গ্রহণ করিতে হইবে।

ফসলওয়ালা জমি ক্রয় করা

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত জমিতে ফসল আছে, এই ফসল বিক্রেতা পাইবে। তবে যদি খরিদ্দার উহার শর্ত করিয়া থাকে তবে সেই ফসল পাইবে। ঐরূপ বৃক্ষ বেচিয়াছে যাহাতে ফল আছে, এই ফল বিক্রেতারই। তবে যদি খরিদ্দার উহা নিজের জন্য শর্ত করিয়া থাকে সেই পাইবে। (হেদায়া, ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালাঃ- ফসলওয়ালা জমি অথবা ফলওয়ালা গাছ ক্রয় করিল। এখন বিক্রেতার অধিকার নাই যে, সে যতদিন ইচ্ছা ফসল অথবা ফল রাখিয়া দিবে; বরং তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে ফসল কাটিয়া লও অথবা ফল নিয়া যাও। জমি অথবা গাছ খরিদ্দারকে সোপর্দ কর। কেননা উহা খরিদ্দারের স্বত্ব এবং অপরের স্বত্ব জড়িত রাখার তাহার অধিকার নাই। তবে খরিদ্দার যদি মূল্য পরিশোধ করিয়া না থাকে তাহা হইলে বিক্রিত বস্তু খরিদ্দারের সোপর্দ করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব নহে।

(হেদায়া, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ফসলওয়ালা জমি বিক্রি করিল এবং বিক্রেতা চায় যে ফসল পাকা পর্যন্ত ফসল ক্ষেতেই থাকুক। পাকিলে কাটা হইবে এবং অত দিনের উজরত দিবে। যদি খরিদ্দার রাজী হয়, তবে অনরূপ করিতেও পারে। তাহার রাজী ছাড়া ঐরূপ করিতে পারিবে না। (দুররুল মোখতার)

খরিদা গাছ কিরূপে কাটিবে ও উহা হইতে ডালা বাহির হইলে তাহা কাহার

মাসয়ালাঃ- গাছ কাটিয়া নেওয়ার জন্য খরিদ করিল। এই অবস্থায় খরিদ্দার সাধারণতঃ যতটা মূল খুদিয়া বৃক্ষ কাটে ইহাও সেইরূপ খুদিয়া কাটিবে। তবে বিক্রেতা যদি শর্ত করে যে জমি খুদিতে পারিবে না। জমির উপর দিয়া কাটিয়া নিবে। তাহা হইলে গাছটি খুদিতে পারিবে না। অথবা বিক্রেতা শর্ত করে নাই, তবে জমি খুদিলে বিক্রেতার ক্ষতি হইবে। যথা উক্ত গাছ দেওয়াল অথবা কূপের সংলগ্ন জমি খুদিলে ঐ সব নষ্ট হইতে পারে। এই অবস্থায় জমির উপর দিয়াই কাটিবে। তৎপর উক্ত গাছের মূলে যদি অন্য গাছ সৃষ্টি হয় তবে এই গাছ বিক্রেতার হইবে। তবে বিক্রিত গাছের কিছু অংশ যদি জমির উপরে রাখিয়া থাকে এবং উহা হইতে ডালা বাহির হয় তবে এই ডালাগুলি খরিদ্দারের।

বিক্রিত গাছের সঙ্গে জমিও শামিল হইবে কি না

মাসয়ালাঃ- কাটিয়া নেওয়ার জন্য গাছ কিনিয়া থাকিলে উহার নীচের জমি বিক্রির শামিল হইবে না; এবং গাছটি সেখানে বাকী রাখার জন্য কিনিয়া থাকিলে উহার নীচের জমিও বিক্রির শামিল হইবে। বেচার সময় যদি কাটিয়া নেওয়া বা বাকী রাখা কোন কিছুই প্রকাশ না করিয়া থাকে এই অবস্থায় নীচের জমি বিক্রির শামিল হইবে। (রদ্দে মোহতার) গাছ বিক্রির সময়

গাছটা যতটুকু মোটা এবং উক্ত সময় উহার জন্য যতটা জমি প্রয়োজন তাহাই বিক্রির শামিল হইবে। এমনকি পরে আরও মোটা হইলে বিক্রেতা উক্ত গাছটির বাকল উন্মোচন করিয়া বিক্রয়ের সময় যতটা মোটা ছিল তাহাই রাখিয়া দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কাটিয়া নেওয়ার জন্য গাছ কিনিয়া থাকিলে খরিদ্দারকে গাছ কাটিয়া নেওয়ার হুকুম দেওয়া যায় যে, রাখিয়া দেওয়ার এজাযত নাই এবং বাকী রাখার জন্য কিনিয়া থাকিলে কাটার হুকুম দেওয়া যাইবে না এবং কাটিয়া ফেলিলে সেইস্থানে অন্য গাছ লাগাইতে পারে বিক্রেতার একথা বলার অধিকার নাই। কেননা গাছটি আঁটে সেই পরিমাণ জমি খরিদ্দারের হইয়া গিয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- মূলসহ গাছ ক্রয় করিয়াছে এবং উহার মূল হইতে আরও গাছ জন্মিল। এই অবস্থায় দেখিতে হইবে যে, বিক্রিত গাছটি কাটিয়া ফেলিলে উক্ত নূতন গাছটি যদি মরিয়া যায়, তবে উহা খরিদ্দারের, অন্যথায় উহা বিক্রেতারই। (আলমগীরী)

বিক্রিত জমির ফসল কখন কাটিবে

মাসয়ালাঃ- ফসল তৈয়ার হওয়ার পূর্বে জমি বিক্রি দিল এই শর্তে যে, ফসল যতক্ষণ তৈয়ার না হইবে ক্ষেতেই থাকিবে। অথবা ক্ষেতের জমি বিক্রি দিল এবং উহাতে ফসল মওজুদ আছে এবং শর্ত করিল যে, যতদিন পর্যন্ত তৈয়ার না হয় ক্ষেতেই থাকিবে। এই দুই অবস্থায় না জায়েয। (রদ্দে মোহতার)

জমির গাছ গাছরা বিক্রির শামিল হইবে কি না

মাসয়ালাঃ- জমি বিক্রি দিল। এখন ঐসব বস্তু যাহা জমিনে বাকী রাখার জন্যই যথা- গাছ, বাসস্থানসমূহ। এই সবই বেচার শামিল হইয়া যাইবে। যদিও বিক্রির ভিতর ঐ সবের উল্লেখ না থাকে; এবং ইহাও যদি বলা না হইয়া থাকে যে, সমস্ত হক এবং মুনাফাসহ ক্রয় করিতেছি। তবে ঐ সব জমিনে যদি শুষ্ক গাছ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এইরূপ বেচার ভিতর উহা শামিল থাকিবে না। যেই সব বস্তু বাকী থাকার জন্য নহে যেমন- বাঁশ, ঘাস। এইগুলি বিক্রির ভিতর শামিল হইবে না। তবে বেচার সময় উহারও উল্লেখ থাকিলে উহাও শামিল হইবে। (আলমগীরী)

ছোট গাছ কিনিয়াছে পরে উহা বড় হইয়াছে

মাসয়ালাঃ- ছোট গাছ ক্রয় করিয়াছিল এবং বিক্রেতার এজাযতে উহা রাখিয়া দিল, পরে বড় হইয়াছে। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ গাছের মালিক হইবে খরিদ্দার। বিক্রেতা এজাযত দিয়া থাকিলেও যখন ইচ্ছা উহা কাটিয়া নেওয়ার জন্য হুকুম দিতে পারে। ইহার পর খরিদ্দারের জন্য উক্ত গাছ বিক্রেতার জমিনে রাখা জায়েয হইবে না এবং বিক্রেতার এজাযত ছাড়া যদি খরিদ্দার গাছটি সেখানে রাখিয়া দেয় তৎপর উহাতে ফল আসিয়াছে। এই অবস্থায় ফলগুলি ছদকাহ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। (খানিয়া)

জমি একজনের, গাছ অপরের

মাসয়ালাঃ- একজনের জমিনে অপর জনের গাছ। জমিনের মালিক গাছের মালিকের এজাযত লইয়া জমিন এবং গাছ উভয়ই বিক্রি দিল। এখন যদি কোন আসমানী বিপদে গাছ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে খরিদ্দার ইচ্ছা করিলে জমি নাও গ্রহণ করিতে পারে এবং বেচা ফছখ (বাতিল) করিতে পারে। এবং যদি জমি গ্রহণ করে তাহা হইলে জমি ও গাছের যত মূল্য হইয়াছিল সবই দিতে হইবে; এবং এই পুরা মূল্য এই অবস্থায় জমির মালিকই পাইবে গাছের মালিক কিছুই পাইবে না। (আলমগীরী)

ফল এবং বাগানের বসন্তকাল ক্রয়

মাসয়ালাঃ- বাগানের বসন্তকাল ফল আসার পূর্বে বিক্রি দিল ইহা জায়েয নহে। ঐরূপ যদি কিছু ফল আসিয়াছে এবং কিছু এখনও আসে নাই। তখনও উহা না জায়েয যখন বর্তমান অবর্তমান উভয়টি বিক্রি হয়। তবে ঐ সমস্ত ফল আসিয়া থাকিলে তখন উহা বেচা জায়েয। কিন্তু খরিদ্দারকে হুকুম দেওয়া হইবে যে, এখনই ফল কাটিয়া গাছ খালি করিয়া দিবে। যদি শর্ত করা হয় যে, যতক্ষণ ফল তৈয়ার না হইবে ফল গাছেই থাকিয়া যাইবে। তৈয়ার হওয়ার পর কাটা হইবে। তবে এই শর্ত ও বেচা সবই অশুদ্ধ হইবে। ফল আসার পর বিক্রি হইল। কিন্তু খরিদ্দারের দখলে না যাওয়ার পূর্বেই আরও ফল জন্মিল। এই অবস্থায় বিক্রিত এবং অবিক্রিত ফল একত্র হইয়া গেল। যাহার পার্থক্যও বাকী রহিল না। অতএব এই বেচা বাতিল হইয়া গিয়াছে। এবং খরিদ্দারের দখলের পর যদি আরও ফল জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে বেচা ঠিকই থাকিবে। তবে যেহেতু নূতন ফলগুলি বিক্রেতার এবং ভিন্নও নহে, অতএব বিক্রেতা ও খরিদ্দার উভয়ই উহাতে শরীক; তবে কতক ফল খরিদ্দারের এবং কতকগুলি বিক্রেতার এইখানে খরিদ্দার হলফ দ্বারা যতটা বলিবে তাহারই কথা গ্রহণযোগ্য হইবে।

(ফতহুল কাদীর, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ফল ক্রয় করিল কিন্তু এখনই ফল ছিড়িয়া নিবে অথবা পাকা পর্যন্ত গাছে থাকিবে, কোন শর্তই করে নাই; এবং ইজাব কবুলের পর বিক্রেতা ফলগুলি গাছে থাকার এজাযত দিল ইহা জায়েয। এখন ফলের ভিতর যাহা কিছু অতিরিক্ত আসিবে উহা খরিদ্দারের জন্য হালাল। যদি গাছে ফল রাখিয়া দেওয়া প্রথা না থাকে, তবে যে দেশে ঐরূপ প্রথা আছে সেখানে অনুরূপ বিক্রি অশুদ্ধ; এবং বিক্রির ভিতর শর্তও করে নাই এবং বিক্রেতা গাছে রাখার এজাযতও দেয় নাই। তবে খরিদ্দার ফলও ছিড়ে নাই এই অবস্থায় ফল যদি খরিদ করার পর বড় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যাহাকিছু অতিরিক্ত হইয়াছে উহা ছদকাহ করিবে। অর্থাৎ বিক্রির দিন ফলের মূল্য যাহা ছিল, অদ্য উহা হইতে যাহা বাড়িয়াছে উহা ছদকাহ করিবে। যেমন- বিক্রির দিন ফলের মূল্য ছিল দশ টাকা অদ্য উহার মূল্য হইয়াছে এগার টাকা। এখন অতিরিক্ত এক টাকা ছদকা করিবে;

এবং বিক্রির দিন যদি ফল পুষ্ট হইয়া থাকে এতদিনে উহার পরিমাণ মোটেই বাড়ে নাই। তবে তখন কাঁচা ছিল অদ্য পাকিয়াছে মাত্র। এই অবস্থায় ছদকার প্রয়োজন নাই। অবশ্য বিনা এজাযতে অতদিন ফল না কাটায় সে গুনাহগার হইয়াছে।

(দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

নূতন ফল জন্মিলে অথবা ফলের পরিমাণ বাড়িলে উহা জায়েযের হিলা

মাসয়ালাঃ- ফল ক্রয় করিল ধারণা এই যে, আরও ফল জন্মিবে। অথবা ক্রয়ের পর বিক্রেতার এজাযত ছাড়াই গাছে ফল রাখিয়া দিল কিন্তু পরে ফলের পুষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যাহা ক্রেতার জন্য নাজায়েয। ইহা জায়েয হওয়ার হিলা এই যে, খরিদ্দার মূল্য আদায় করিয়া বিক্রেতা হইতে বাগান অথবা গাছগুলি ভাগাভাগি হিসাবে গ্রহণ করিবে। যদিও বিক্রেতার ভাগ অতি সামান্যই হউক যেমন- যাহা উৎপন্ন হইবে উহার হাজারে ৯৯৯ ভাগ খরিদ্দারের এবং এক ভাগ বিক্রেতার। এখন যত নূতন ফল জন্মিবে অথবা যাহা কিছু অতিরিক্ত হইল বিক্রেতাকে হাজার ভাগের এক ভাগ দিয়া বাকী সব খরিদ্দার গ্রহণ করিবে। তবে এই হীলা তখনই শুদ্ধ হইবে যখন বাগান অথবা গাছগুলি কোন এতিমের বা ওয়াক্‌ফকৃত না হয়; এবং যদি বেগুন, মরিচ, খিরা, কাকড়ি ইত্যাদি ক্রয় করে এবং উহার গাছ এবং লতাগুলিতে দৈনন্দিন ফল হইতে থাকে এই অবস্থায় গাছ এবং লতাগুলি ক্রয় করিয়া লইবে। এখন যত ফল জন্মিবে সবই তার জন্য হালাল হইবে। ফসল পাকার পূর্বে যদি ক্রয় করে তবে যত দিনে উহা তৈয়ার হইবে উহার দিন ধার্য করে জমিনটা ইজারা হিসাবে গ্রহণ করিবে। (দুররুল মোখতার)

বিক্রির ভিতর ব্যতিক্রম বা বাদ হইতে পারে কি না

মাসয়ালাঃ- শস্যের একটি স্তুপ হইতে দশ সের বা কম বেশী ক্রয় করিতে পারে। অনুরূপ দশ সের বাদে পুরা স্তুপও ক্রয় করিতে পারে। বকরীর পাল হইতে একটি বকরী ক্রয় করিতে পারে। ঐরূপ একটি নির্দিষ্ট বকরী বাদে বাকী সব পাল খরিদ করিতেও পারে। অনির্দিষ্ট বকরী খরিদ করা বা বাদ দেওয়া কোনটাই যায় না। গাছের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল ক্রয় করা যায় এবং এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদও দেওয়া যায়। তবে অতটা বাদ দেওয়া যাবে না যাহাতে বিক্রিত বস্তু শেষ হইয়া যায়। বাগানের একটা নির্দিষ্ট গাছ বাদ দিয়া ক্রয় করা জায়েয। বকরী বিক্রি দিল এবং উহার পেটের বাচ্চা বাদ দিল ইহা নাজায়েয। কেননা পেটের বাচ্চা ছাড়া খরিদ সম্ভব নহে। কোন জানোয়ারের নির্দিষ্ট কোন অংশ, যথা- মাথা, পা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ভিতর উহা বাদ দেওয়া যায় না; এবং প্রসিদ্ধ অংশ যথা- অর্ধেক, অথবা এক-চতুর্থাংশ ক্রয়ও করা যায় এবং বাদও দেওয়া যায়। এই অবস্থায় উক্ত পশুটির ভিতর উভয় অংশীদার হইবে।

(দুররুল মোখতার, আলমগীরী)

মাসয়ালা- বাসস্থান ভাঙ্গিয়া আনার জন্য ক্রয় করিল। ইহার কাঠসমূহ অথবা ইটগুলি বাদ দেওয়া যায়। (আলমগীরী)

বিক্রিত বস্তুর ওজন ও গণনাকারীর মজুরী কে দিবে

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তুর ওজন, মাপ অথবা গণনার মজুরী দিতে হইলে বিক্রেতার জিম্মায় হইবে। মাপা ওজন করা এবং গণনা করা তাহারই কাজ। কেননা ইহা দ্বারাই বিক্রিত বস্তু সমর্পণ করা যায়; এবং মূল্যের ওজন, গণনা অথবা পরীক্ষা করার মজুরী দিতে হইলে খরিদ্দারের দিতে হইবে। কেননা পুরা দাম ও চালু দাম দেওয়া উহারই কাজ। তবে বিক্রেতা পরীক্ষা ছাড়া যদি মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে এবং বলে যে, টাকা ভাল না এবং ফেরত দিতে চায়। এই অবস্থায় টাকা পরীক্ষা করার মজুরী বিক্রেতার ব্যক্তিকেই দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- নির্দিষ্ট মূল্যে গাছের সম্পূর্ণ ফল অনুমানে ক্রয় করিল। অনুরূপ ক্ষেতের রসুন, পিঁয়াজ অনুমানে ক্রয় করিল, অথবা নৌকার সমস্ত শস্য ইত্যাদি অনুমানে ক্রয় করিল। এই অবস্থায় ফল কাটা পিঁয়াজ, রসুন উঠান অথবা নৌকা হইতে বিক্রিত বস্তু বাহির করার মজুরী খরিদ্দারের দিতে হইবে। যদি বিক্রেতা খরিদ্দারকে বলিয়া থাকে যে, তুমি ফল কাটিয়া নেও এবং এই সমস্ত বস্তু বাহির করিয়া লও। (রদ্দে মোহতার)

দালালী কাহার দিতে হইবে

মাসয়ালাঃ- মালিকের হুকুমে দালাল মাল বিক্রি দিয়া থাকিলে দালালী বিক্রেতাকেই দিতে হইবে। তবে দালাল নিজে বিক্রি না দিয়া যদি উভয়ের বেচাকেনার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে মাত্র। বিক্রয় মালিকেই দিয়াছে। এই অবস্থায় সেই দেশের প্রথা অনুযায়ী দালালের মজুরী দিতে হইবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় যদি দেশে প্রথা থাকে যে মজুরী বিক্রেতার দেওয়া, তবে সেই দিবে এবং খরিদ্দারের জিম্মায় হইলে খরিদ্দার দিবে এবং দুই জনের জিম্মায় থাকিলে দুইজনই দিবে।

(রদ্দে মোহতার, দুররুল মোখতার)

বিক্রিত বস্তু এবং মূল্যের কবজা বা দখল

মাসয়ালাঃ- টাকা, আশরাফী 'পয়সার দ্বারা' বিক্রি হইল এবং বিক্রিত বস্তু সেখানে হাজির আছে এবং মূল্য এখনই দিতে হইবে। খরিদ্দারের কোন খেয়ারে শর্ত (خیار شرط) রহিল না। এই অবস্থায় প্রথমেই খরিদ্দারকেই মূল্য দিতে হইবে। উহার পর বিক্রিত বস্তু দখল করিতে পারে অর্থাৎ বিক্রেতার জন্য হক থাকিলে মূল্য উসুল করার জন্য বিক্রিত বস্তু অশুদ্ধ রাখিয়া দেওয়া এবং উহাতে দখল না দেওয়া; বরং

যতক্ষণ সম্পূর্ণ মূল্য উসুল না হইবে বিক্রিত বস্তু যদি সেখানে হাজির না থাকে তবে যতক্ষণ উহা হাজির না করিবে মূল্যের তাগাদা করিতে পারিবে না; এবং বেচাকেনার ভিতর যদি উভয় বস্তুই আসবাবপত্র হয়, যেমন- কিতাব কাপড়ের পরিবর্তে ক্রয় করিল অথবা উভয় দিকেই যদি মূল্য হয় যেমন টাকার দ্বারা সোনা চান্দি ক্রয় করিল। এ অবস্থায় উভয় বস্তুই সেই মজলিসেই এক সঙ্গে আদায় করিতে হইবে।

(দুররুল মোখতার, হেদায়া)

দখলের পূর্বে বিক্রিত বস্তু নষ্ট হইয়া গেল

মাসয়ালাঃ- খরিদ্দারের দখলের পূর্বে বিক্রেতার কর্ম দ্বারা বিক্রিত বস্তু হালাক হইয়া গেল অথবা বিক্রিত বস্তু নিজেই নিজেকে হালাক করিয়া দিয়াছে। অথবা আসমানী বিপদ দ্বারা হালাক হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বেচা বাতিল হইয়া গিয়াছে। বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা ফেরত দিতে হইবে; এবং খরিদ্দারের কর্ম দ্বারা হালাক হইয়া থাকিলে তাহার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব। এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি হালাক করিয়া থাকে, এই অবস্থায় খরিদ্দার ইচ্ছা করিলে বেচা বাতিল করিতে পারে। এই অবস্থায় যে হালাক করিয়াছে সেই বিক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিবে। অথবা খরিদ্দার বিক্রি ঠিক রাখিয়া বিক্রেতাকে মূল্য দিতেও পারে এবং যে হালাক করিয়াছে তাহার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে। এই ক্ষতিপূরণ মূল্য জাতীয় না হইলে মূল্য হইতেও বেশী লওয়া জায়েয। মূল্য জাতীয় হইলে অতিরিক্ত হালাল হইবে না। যেমন মূল্য দশ টাকা ক্ষতিপূরণ হইল পনর টাকা, এই অবস্থায় অতিরিক্ত পাঁচ টাকা নাজায়েয হইয়াছে; এবং ক্ষতিপূরণে আশরাফী লইয়া থাকিলে জায়েয। যদিও উহা পনর টাকা অথবা আরও বেশী মূল্যের হউক। (ফতহুল কাদীর)

দুই বস্তু একই ইজাব কবুলে বিক্রি দিল

মাসয়ালাঃ- দুইটি বস্তু একই ইজাব কবুলে বিক্রি দিল। যদি প্রত্যেকটির মূল্য ভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়া থাকে, যথা- দুইটি ঘোড়া এক সঙ্গে মিলাইয়া বিক্রি দিয়া একটার মূল্য পাঁচশত টাকা অপরটির মূল্য চারশত টাকা। এই অবস্থায়ও বিক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত দখল না দিতে পারে। খরিদ্দার উহার একটির মূল্য আদায় করিয়া সেই একটিকেও দখল করার দাবী করিতে পারিবে না। খরিদ্দার যদি বিক্রেতার নিকট কোন বস্তু রেহেনও রাখে অথবা জামিন উপস্থিত করে তখনও বিক্রিত বস্তু আবদ্ধ রাখার হক বিক্রেতার থাকিবে; এবং বিক্রেতা যদি মূল্যের কিছু অংশ মাফ করিয়া দেয় তখনও বাকী সব মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রিত বস্তু আবদ্ধ রাখিতে পারে। (রদ্দে মোহতার)

মূল্য আদায় করার জন্য অবকাশ দিল

মাসয়ালাঃ- বিক্রির পর বিক্রেতা মূল্য আদায় করার জন্য কিছু অবকাশ দিল। এখন আর বিক্রিত বস্তু আবদ্ধ রাখার অধিকার থাকিবে না। অথবা মূল্য আদায় না করিয়া খরিদ্দারের দখলে মাল দিয়া দিল, এখন বিক্রিত মাল ফেরত লইতে পারিবে না। তবে বিক্রেতার এজাযত ছাড়া যদি খরিদ্দার মাল দখল করে তখন ফেরত লইতে পারে। খরিদ্দার বিক্রেতার এজাযত ছাড়াই কবজা করিল। বিক্রেতা দেখিতেছিল কিন্তু সে নিষেধ করে নাই। এই অবস্থায় এজাযত হইয়া গিয়াছে এখন আর ফেরত লইতে পারিবে না। (রদ্দে মোহতার)

দখলের পূর্বে খরিদ্দারের হস্তক্ষেপ

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তু দখলের পূর্বে কাহাকেও উহা 'হেবা' করিল এবং যাহাকে হেবা করিল সে উহা দখল করিল। এই অবস্থায় ইহার দখল খরিদ্দারেরই বুঝা যাইবে। তবে দখলের পূর্বে যদি বিক্রিত বস্তু বিক্রি দেয় ইহা নাজায়েয। (রদ্দে মোহতার)

আমানত রেহেন এবং ধার দিলে কবজা হইবে কি না

মাসয়ালাঃ- খরিদ্দারের মালটা কাহারও নিকট আমানত রাখিল অথবা কাহাকেও ধার দিল অথবা বিক্রেতাকে বলিল যে, অমুকের নিকট মালটা দিয়া দিবে, সে উহা নষ্ট করিল। এই সব অবস্থায় খরিদ্দারের কবজা হইয়া গেল। তবে বিক্রেতার নিকট যদি আমানত রাখে অথবা তাহাকে ধার দেয় অথবা কেরায়া দেয় অথবা বিক্রেতাকে কিছু মূল্য দিয়া বলিল যে, বাকী মূল্যের পরিবর্তে উহা তোমার নিকট রেহেন রহিল। এই সব অবস্থায় কবজা হইবে না। (রদ্দে মোহতার)

শস্য থলিতে ভরিলে কবজা হইবে কি না

মাসয়ালাঃ- শস্য ক্রয় করিয়া খরিদ্দার নিজ থলি বিক্রেতার নিকট দিয়া বলিল যে, ওজন করিয়া ইহার ভিতর ভরিয়া দেও। এইরূপ করিলে খরিদ্দারের কবজা হইয়া যাইবে। বিক্রেতা খরিদ্দারের সাক্ষাতে থলিয়া পূর্ণ করুক বা অসাক্ষাতে, উভয় অবস্থাতেই কবজা হইয়া যাইবে। তবে খরিদ্দার যদি নিজ থলিয়া না দিয়া বিক্রেতাকে বলে যে, তুমি আমাকে তোমার থলিয়া ধার দাও এবং ওজন করিয়া উহা পূর্ণ কর। এই অবস্থায় খরিদ্দারের সাক্ষাতেই যদি থলিয়া ভরিয়া থাকে তবে খরিদ্দারের কবজা হইয়াছে অন্যথা নহে। ঐরূপ তৈল ক্রয় করিল এবং নিজ বোতল অথবা পাত্র দিয়া বলিল ইহাতে মাপিয়া দিন সে ওজন করিয়া বোতলে বা পাত্রে ঢালিয়া দিল। ইহা দ্বারা খরিদ্দারের কবজা হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ প্রত্যেক বস্তু যাহা মাপ বা ওজন করিয়া আদান প্রদান করা হয়। খরিদ্দারের হুকুমে তাহার পাত্রে রাখিয়া দিলে কবজা হইয়া যাইবে। (হেদায়া)

দখলের বাধা অপসারণ দ্বারা দখল হইবে কি না

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু এবং খরিদ্দারের মধ্যে এমন করিয়া দিল যাহাতে সে উহা দখল করিতে পারে এবং দখলের কোন বাধাই রাখিল না এবং বিক্রিত বস্তুও খরিদ্দারের মাঝে কোন বাধাই নাই। এই অবস্থায় বিক্রিত বস্তুর কবজা হইয়া গেল। এইরূপ খরিদ্দার মূল্যও বিক্রেতার মধ্যে কাটিয়া দিল। ইহাতে বিক্রেতাকে মূল্য সমর্পণ করা হইয়াছে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা মালটা মুক্ত করিয়া দিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ দখল করা যাইতেছে না। যেমন বিক্রিত বস্তু অন্যের হকের সঙ্গে জড়িত যথা- ঘর বিক্রি দিয়াছে কিন্তু উহাতে বিক্রেতার আসবাবপত্র রহিয়া গিয়াছে যদিও কমই হউক। অথবা জমি বিক্রি দিয়াছে এবং উহাতে বিক্রেতার ফসল রহিয়াছে। এই সব অবস্থায় খরিদ্দারের কবজা নাই। তবে বিক্রেতা ঘর এবং আসবাবপত্র সবই দখল করার জন্য যদি বলিয়া দেয় এবং সে কবজা করে তবে কবজা হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় আসবাবপত্র খরিদ্দারের নিকট 'আমানত' হিসাবে থাকিবে। এবং বিক্রিত বস্তুই যদি অন্যের মাল আবদ্ধ রাখিয়া থাকে যেমন শস্য ক্রয় করিয়াছে যাহা বিক্রেতার থলিয়ায় পূর্ণ অথবা ফল ক্রয় করিয়াছে যাহা গাছের সঙ্গে জড়িত। এই অবস্থায় تخلية শূন্য করিয়া দিলে কবজা হইয়া যাইবে। (রদ্দে মোহতার, আলমগীরী)

অন্যের নিকট কেরায়া ঘর ক্রয় করিল

মাসয়ালাঃ- এমন ঘর ক্রয় করিল যাহা অন্যের নিকট কেরায়ায় আবদ্ধ এবং খরিদ্দারও রাজী হইল যে, কেরায়ার মুদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় বাতিল করিবে না এবং কেরায়ার মুদ্দত শেষ হইলে কবজা করিবে। এই অবস্থায় খরিদ্দার এখনই দখলের দাবী করিতে পারিবে না। যতক্ষণ না কেরায়ার মুদ্দত শেষ হয় এবং বিক্রেতাও খরিদ্দার হইতে মূল্য তাগাদা করিতে পারিবে না যতক্ষণ উহা দখলের উপযোগী না করিয়া দেয়। (রদ্দে মোহতার)

চাবি দিয়া দিলে কবজা হইবে কি না

মাসয়ালাঃ- ঘর ক্রয় করিলে পর বিক্রেতা চাবি দিয়া বলিল যে, উহা মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যে, ঘরটি যদি সেখানেই হইয়া থাকে সে সহজেই উহাতে তালা লাগান যায়, তবে কবজা হইয়া গিয়াছে। তবে বিক্রিত ঘর যদি দূরে হয়, তবে কবজা হয় নাই। যদিও বিক্রেতা বলিয়া গিয়াছে যে, আমি তোমাকে সোপর্দ করিয়াছি এবং খরিদ্দার বলিয়াছে যে, আমি হস্তগত করিয়াছি।

(রদ্দে মোহতার, আলমগীরী)

বিক্রেতা বিক্রিত বস্তুর দিকে ইশারা করিয়া বলিল হস্তগত কর

মাসয়ালাঃ- গরু ক্রয় করিল যাহা চরিতেছে। বিক্রেতা বলিল যাও কবজা করিয়া লও। যদি গরু সামনে হয় যাহাতে উহার দিকে ইশারা করা যায়, তবে কবজা হইয়া গিয়াছে অন্যথা হয় নাই। কাপড় ক্রয় করিল এবং বিক্রেতা বলিল কবজা করিয়া লও। এই অবস্থায় কাপড় যদি এত নিকটে হয় যে, উহা হাত বাড়াইয়া লওয়া যায়, তবে কবজা হইয়া যাইবে। কিন্তু কবজা করার জন্য যদি উঠার প্রয়োজন হয়, তবে কবজা হয় নাই। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা সওয়ার অবস্থায় ঘোড়া বিক্রয় করিল। পরে ক্রেতা বলিল আমাকে সওয়ার করিয়া লও, বিক্রেতা ক্রেতাকে সওয়ার করিয়া লইল। এই অবস্থায় যদি ঘোড়ার পৃষ্ঠে জীন বা গদি থাকিয়া না থাকে, তবে ক্রেতার কবজা হইয়া গিয়াছে এবং জীন থাকিয়া থাকিলে ক্রেতা জীনের উপর সওয়ার হইয়া থাকে তখনও কবজা হইয়া যাইবে এবং জীনের উপর সওয়ার হইয়া না থাকিলে কবজা হয় নাই এবং বিক্রির পূর্বেই যদি উভয়ই উহার উপর সওয়ার থাকিয়া থাকে এবং এই অবস্থায় বেচা কেনা করার ইজাব কবুল হইল। এই অবস্থায় ক্রেতার সওয়ার থাকা কবজা নহে। যেমন কোন ঘরে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই রহিয়াছে এবং মালিককে উহা বিক্রি দিল। এখন ক্রেতার সেই ঘরে থাকা কবজা নহে। (ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালাঃ- এত বড় মটকা বিক্রি দিল যাহা ঘরের দরওয়াজা না খুলিয়া বাহির করা যায় না। ইহার কবজার জন্য বিক্রেতার কর্তব্য ঘর হইতে বাহির করিয়া হস্তগত করাইয়া দেওয়া। তবে বিক্রেতা যদি ইহাতে তাহার ক্ষতি মনে করে, তবে বিক্রয় বাতিল করিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তৈল ক্রয় করিয়া বিক্রেতাকে পাত্র দিয়া দিল যে, তৈল ওজন করিয়া উহাতে ভরিবে। এক সের ঢালার পরই পাত্র ভাঙ্গিয়া গেল এবং তৈল পড়িয়া গেল। ইহার খবর ক্রেতা বিক্রেতা কাহারও হইল না। বিক্রেতা উহাতে পুনঃ আরও তৈল ঢালিল। এখন ইহার হুকুম এই যে, ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পূর্বে যতটা ঢালিয়াছিল এবং বহিয়া গিয়াছে তাহা ক্রেতারই ক্ষতি হইয়াছে এবং ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর যতটা ঢালিয়াছে এবং বহিয়া গিয়াছে তাহা বিক্রেতারই নষ্ট হইয়াছে। তবে ভাঙ্গার পূর্বে যতটা ঢালিয়াছিল যদি উহা সব পড়িয়া না যাইয়া থাকে, তবে এমতাবস্থায় উহার সাথে বিক্রেতা আরও এক সের ঢালিয়াছে। এই অবস্থায় প্রথমবার যাহা বাকী ছিল উহা বিক্রেতারই স্বত্ব হইবে। তবে উহার ক্ষতি পূরণ ক্রেতাকে দিতে হইবে। ক্রেতা যদি ভাঙ্গা পাত্র বিক্রেতাকে দিয়া থাকে যাহার খবর কাহারও ছিল না, এই অবস্থায় এত তৈল বহিয়া গিয়াছে সমস্তেরই ক্ষতি ক্রেতারই হইয়াছে এবং ক্রেতা যদি পাত্রটি বিক্রেতার নিকট না দিয়া নিজেই রাখিল বিক্রেতা তৈল ওজন করতঃ উহাতে ভরিতেছিল এই অবস্থায় সমস্ত ক্ষতি ক্রেতারই দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তৈল খরিদ করিয়া বিক্রেতাকে পাত্র দিয়া বলিল যে, ওজন করিয়া ইহা পুরাও, কিন্তু পাত্রটি ভাঙ্গা ছিল যাহা বিক্রেতার জানা ছিল কিন্তু ক্রেতার খবর ছিল না। এ অবস্থায় ক্ষতি বিক্রেতার জিম্মায় থাকিবে ক্রেতার নহে; এবং ক্রেতার জানা ছিল কিন্তু বিক্রেতার জানা ছিল না অথবা উভয়েরই জানা ছিল এই অবস্থায় সমস্ত ক্ষতি ক্রেতারই হইয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তৈল ক্রয় করিয়া বিক্রেতাকে বোতল দিয়া বলিল যে, আমার লোকের মারফত আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। এই অবস্থায় যদি রাস্তায় বোতল ভাঙ্গিয়া যায় এবং তৈল নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্রেতার ক্ষতি হইল এবং যদি বলিয়া থাকে যে, আপনার লোক মারফত পাঠাইবেন তাহা হইলে বিক্রেতারই ক্ষতি হইয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কোন বস্তু ক্রয় করিয়া বিক্রেতার নিকট রাখিয়া দিল এবং বলিল যে, আগামীকল্য নিয়া যাইব, যদি ক্ষতি হয় আমারই হইবে এবং মনে করুন উহা পশুই ছিল উহা রাত্রে মরিয়া গেল। এই অবস্থায় বিক্রেতারই ক্ষতি হইয়াছে। ক্রেতার উক্ত বাক্য বলার কোন অর্থ হয় না। কেননা যতক্ষণ ক্রেতার কবজা না হইবে ক্ষতির সঙ্গে ক্রেতার কোন সম্বন্ধ হইবে না। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- কোন বস্তু বিক্রি দিল কিন্তু উহার মূল্য এখনও হস্তগত হয় নাই। উক্ত বস্তু কোন সালিসের নিকট রাখিয়া দিল যে, ক্রেতা মূল্য আদায় করিয়া নিয়া যাইবে। সেই বস্তু তথায় নষ্ট হইয়া গেল, এই অবস্থায় ক্ষতি বিক্রেতারই হইয়াছে এবং সালিস যদি কিছু মূল্য উসুল করিয়া ঐ বস্তু ক্রেতাকে দিয়া থাকে যাহার খবর বিক্রেতার নাই তাহা হইলে বিক্রেতা উক্ত বস্তু ক্রেতার থেকে ফেরত লইতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- কাপড় ক্রয় করিল যাহার দাম এখনও আদায় করে নাই যে, কবজা করিবে। সে বিক্রেতাকে বলিল যে, উহা সালিসের নিকট রাখিয়া দিন আমি মূল্য দিয়া নিয়া যাইব। সে সালিসের নিকট রাখিয়া দিল উক্ত কাপড় সালিসের নিকট নষ্ট হইয়া গেল। এই অবস্থায় বিক্রেতারই ক্ষতি হইয়াছে ক্রেতার নহে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তু বিক্রেতারই হাতে ছিল এই অবস্থায় ক্রেতা উহা হালাক অথবা আয়েবদার করিয়া ফেলিল অথবা বিক্রেতা ক্রেতার হুকুমে উহাতে আয়েব সৃষ্টি করিয়া দিল, ইহা দ্বারা ক্রেতার কবজা হইয়া গিয়াছে। গম ক্রয় করিয়া বিক্রেতাকে বলিল যে, উহা পিষিয়া দাও। ইহা দ্বারা ক্রেতার কবজা হইয়া গিয়াছে এবং আটা ক্রেতারই হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কবজার পূর্বে ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল যে, বিক্রিত বস্তু অমুক ব্যক্তিকে হেবা কর। সে হেবা করিয়া দিল এবং যাহাকে হেবা করিয়াছে তাহার কবজা বা হস্তগত করাইয়া দিল। এই হেবা শুদ্ধ হইয়াছে এবং ক্রেতার কবজা হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ বিক্রেতাকে যদি বলে যে, উহা কেরায়া দিয়া দেও, সে কেরায়া দিয়া দিল ইহাও জায়েয। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা মূল্য আদায়ের পূর্বে বিক্রেতার এজাযত ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবজা করিয়া লইল। এই অবস্থায় বিক্রেতার ইখতিয়ার আছে উক্ত কবজা বাতিল করিয়া বিক্রিত বস্তু ফেরত লওয়ার এবং ক্রেতা কবজা করিয়া যদি এমন কোন কাজ করিয়া থাকে যাহা ভঙ্গ করা যায় তাহা হইলে বিক্রেতা সেই কাজও নষ্ট করিতে পারে। যথা- ক্রেতা বিক্রিত বস্তু হেবা করিয়া দিয়াছে অথবা বিক্রি দিয়াছে অথবা রেহান রাখিয়াছে অথবা ইজারা দিয়াছে অথবা ছদকাহ করিয়া দিয়াছে। তবে যদি উক্ত কর্ম নষ্ট না করা যায়, যেমন- বিক্রিত বস্তু দাস ছিল ক্রেতা উহাকে আজাদ করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় ঠেকাবশতঃ ইহা বাতিল করা যাইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতার কবজা বিক্রিত বস্তুর উপর ইজাব কবুলের পূর্বেই হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে উক্ত কবজা কোন ধরনের। যদি কবজাটি এমন ধরনের হয় যাহাতে উক্ত বস্তু নষ্ট হওয়া অবস্থায় উহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগে এই অবস্থার বিক্রির পর নূতন কবজার দরকার নাই। যেমন- উক্ত বস্তু ক্রেতা গছব করিয়া রাখিয়াছে অথবা ফাসেদ বায় দ্বারা ক্রয় করিয়া কবজা করিয়াছে, ইহার পর শুদ্ধ ইজাব কবুল দ্বারা ক্রয় করিল। এই অবস্থায় পূর্বের কবজাই যথেষ্ট ইহার পর বাড়ী না পৌঁছিতেই উক্ত বস্তু হালাক হইয়া গেল, এখন ক্রেতারই হালাক হইল। এবং উক্ত কবজা যদি এমন ধরনের হয় যাহাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগে না, যথা- ক্রেতার নিকট উক্ত বস্তু আমানত স্বরূপ ছিল। এই অবস্থায় নূতন কবজা প্রয়োজন হইবে না। (আলমগীরী)

খিয়ারে শর্তের বয়ান

হাদীস- ছহীহ বুখারী, মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন- বিক্রেতা এবং ক্রেতা হইতে প্রত্যেকেরই ইখতিয়ার আছে যতক্ষণ তাহারা জুদা না হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ ইজাব কবুলের ভিতর লিপ্ত কথা পূর্ণ হয় নাই।

হাদীস- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, হযরত হেযাম বিন হোজাম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার ইখতিয়ার আছে যতক্ষণ জুদা না হয়। যদি উভয় সত্য বলে মালের আয়েব প্রকাশ করে তাহাদের বেচা কেনার বরকত হইবে এবং মালের আয়েব গোপন করিয়া মিথ্যা বলিলে বেচার বরকত মিটাইয়া দেওয়া হইবে।

খিয়ারে শর্ত কাহাকে বলে এবং উহার প্রয়োজনীয়তা

ক্রেতা বিক্রেতার অধিকার আছে যে, তাহারা নিশ্চিতরূপে বেচা কেনা না করিয়া ইজাব কবুলের সময় শর্ত করে যে, যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তবে বেচা কেনা বাকী থাকিবে না ইহাকে খিয়ারে শর্ত বলে। উভয়েরই ইহার প্রয়োজন হয়, কেননা বিক্রেতা

কোন কোন সময় নিজের অজানা থাকার কারণে কম মূল্যে মাল বিক্রি দিয়া বসে অথবা ক্রেতাও অনেক সময় জিনিসের মূল্য না জানার কারণে বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া বসে। অথবা মালটা সে চিনে না, প্রয়োজন আছে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করার এবং এখনই যদি ক্রয় না করে, তবে মালটাও পাওয়া যাইবে না, অথবা বিক্রেতার ভয় আছে যে, গ্রাহক হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। এই সব অবস্থায় পবিত্র শরীয়ত উভয়কে সুযোগ দিয়াছে যে, তাহারা চিন্তা করিবে, যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে বেচা-কেনা অনুমোদন করিবে না।

মাসয়ালা- খিয়ারে শর্ত ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই নিজের জন্য করুক অথবা শুধু একজনে করুক, অথবা অন্য কাহার জন্য উহার শর্ত করুক সবই দুরস্ত (জায়েয)। ইহাও হইতে পারে যে, ইজাব কবুলের সময় খিয়ারে শর্তের উল্লেখ নাই। কিন্তু ইজাব কবুলের পর একজন অপরকে অথবা প্রত্যেকে অপরকে অথবা অন্য কাহাকেও খিয়ার দিয়া দেওয়া। ইজাব কবুলের পূর্বে খিয়ারে শর্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ যদি প্রথমে খিয়ারের কথা উল্লেখ হইয়াছে কিন্তু ইজাব কবুলের সময় উল্লেখ হয় নাই অথবা ইজাব কবুলের পরও উহার শর্ত করে নাই যেমন বেচার পূর্বে বলিয়া দিল যে, তোমার সহিত যে বিক্রির কাজ করিব উহাতে আমি তোমাকে খিয়ার দিয়া দিলাম, কিন্তু ইজাব কবুলের সময় নিছক বেচা-কেনা হইল, এই অবস্থায় খিয়ার হাছিল হইবে না।

(দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- নিম্নলিখিত কাজের ভিতর খিয়ারে শর্ত হইতে পারে। যথা- (১) ক্রয়-বিক্রয়, (২) ইজারা, (৩) বন্টন, (৪) মাল দ্বারা সন্ধি (৫) লিখন, (৬) খোলার ভিতর স্ত্রীলোকের জন্য, (৭) মালের পরিবর্তে যখন গোলাম আজাদ করা হয় তখন গোলামের জন্য, (৮) বন্ধকদাতার জন্য, গৃহীতার জন্য নহে, (৯) জামিন হওয়ার ভিতর উভয়ের জন্য, (১০) 'ইব্‌রার' ভিতর যেমন- বলিল আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি এবং তিন দিন পর্যন্ত আমার ইখতিয়ারে আছে, (১১) শোফয়ার মাল পরিত্যাগ করার ভিতর, (১২) হাওয়ালা বা বরাতের ভিতর, (১৩) মুযারাবার ভিতর, (১৪) মোয়ামালাতের ভিতর।

নিম্নলিখিত কাজগুলির ভিতর খিয়ারে শর্ত হইতে পারে না। যথা- (১) বিবাহ, (২) তালাক, (৩) কসম, (৪) মান্নত (৫) আকদের একরার, (৬) বায়য়ে ছরফ, (৭) বায়য়ে সলম, (৮) ওকালাত। (রাহরুর রায়েক)

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তুর সবটার ভিতর অথবা কোন অংশের ভিতর, যেমন- অর্ধেক অথবা এক-চতুর্থাংশের ভিতর শিয়ারে শর্ত হইতে পারে। বিক্রিত বস্তু যদি একাধিক হয় উহার কোনটায় খিয়ার এবং কোনটায় খিয়ার না হয় তাহাও জায়েয। তবে এই অবস্থায় যেইটার ভিতর খিয়ার সেইটা নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে; এবং মূল্যও ঠিক করিয়া দিতে হইবে, যেমন দুইটা বকরী আট টাকায় ক্রয় করিল এবং এই বকরীর

ভিতর খিয়ার আছে এবং উহার দাম তিন টাকা। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা বিক্রেতার মতভেদ হইল, একজনে বলে খিয়ারে শর্ত ছিল, অপরজনে বলে ছিল না। এই অবস্থায় যিনি খিয়ারে শর্ত ছিল বলে দাবী করিতেছে তাহার সাক্ষী হাজির করিতে হইবে। যদি সে সাক্ষী হাজির না করে তাহা হইলে যিনি খিয়ারে শর্তের অস্বীকার করেন তাহার বাক্যই গ্রহণযোগ্য। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারের মুদ্দত অতিরিক্ত তিন দিন হইতে পারে। উহার চাইতে বেশী নয়, কমও হইতে পারে। কেহ এমন বস্তু ক্রয় করিল যাহা তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রেতার তিন দিনের খিয়ার ছিল তখন উহাকে বলা হইবে, হয় বেচা বাতিল কর অথবা কবুল বা জায়েয কর। খারাপ হয় এমন বস্তু কেহ খিয়ার ছাড়াই ক্রয় করিল কিন্তু সে কবজা না করিয়া এবং মূল্য আদায় না করিয়াই কোথাও নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। এই অবস্থায় উক্ত বস্তু বিক্রেতা অন্যের নিকট বিক্রি দিতে পারে এবং এই দ্বিতীয় খরিদ্দারের জানা সত্ত্বেও ঐরূপ মাল ক্রয় করিতে পারে।

(খানিয়াহ, দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারের কোন মুদ্দত উল্লেখ করিল না, শুধু বলিল যে, আমার খিয়ার আছে। অথবা মুদ্দত অজ্ঞাত যেমন বলিল আমার কতেক দিনের খিয়ার আছে। অথবা হামেশার জন্য খিয়ার রাখিল। এই সব অবস্থায় খিয়ার ফাছেদ, ইহা ঐ সময় যখন ইজাব কবুলের ভিতর খিয়ারের উল্লেখ থাকে এবং তিন দিনের ভিতর যাহার খিয়ার তিনি বিক্রি জায়েয না করে। তবে তিন দিনের ভিতর যদি জায়েয করিয়া দেয় তবে বিক্রি শুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং আকদ বা ইজাব কবুলের সময় যদি খিয়ার থাকিয়া না থাকে ইজাব কবুলের পর একে অপরকে বলিল তোমার ইখতিয়ার আছে, তাহা হইলে তাহার খিয়ার উক্ত মজলিসের ভিতরই থাকিবে, মজলিস শেষ হইল এবং সে কিছু বলিল না তা হইলে খিয়ার বাতিল হইয়া গিয়াছে। এখন কিছুই করিতে পারিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তিন দিনের বেশী মুদ্দত নির্দ্ধারিত করিল কিন্তু তিন দিন শেষ না হইতেই যাহার খিয়ার সে বিক্রয়কে জায়েয করিল। এখন এই বিক্রয় শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিন দিন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে অথচ বিক্রি জায়েয করিল না, তবে এই বেচা অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল যদি তিন দিন পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ না করি তাহা হইলে আমার এবং তোমার মধ্যে বেচা কেনা নাই। ইহাও খিয়ারে শর্তের হুকুমে অর্থাৎ এই মুদ্দত পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ করিলে বেচা কেনা শুদ্ধ হইয়া যাইবে অন্যথা বাতিল হইবে। এবং তিনদিন হইতে বেশী দিনের কথা উল্লেখ করে যদি অনুরূপ বলে এবং তিন দিনের ভিতর মূল্য পরিশোধ করিয়া দেয় তবুও বেচা শুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তিন দিন পূর্ণ হইয়া গেলে বেচা বাতিল হইয়া যাইবে।

মাসয়ালা- বেচা হল এবং মূল্যও ক্রেতা আদায় করিয়া দিল এবং সিদ্ধান্ত হইল

যে, তিন দিনের ভিতর যদি বিক্রেতা মূল্য ফেরত দেয় তাহা হইলে বেচা থাকিবে না। ইহাও খিয়ারে শর্তের হুকুমেই। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- তিন দিনের মুদ্দত ছিল পরে উহা হইতে একদিন অথবা দুই দিন কম করিয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় কম করার পর যাহা বাকী থাকিবে উহাই খিয়ারের মুদ্দত। যেমন- তিন দিন হইতে এক দিন কম করিয়া দিল এখন দুই দিনেরই মুদ্দত রহিল, এই দুই দিন খতম হইলেই খিয়ার খতম হইয়া গেল। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা খিয়ারে শর্ত নিজের জন্য রাখিল, এই অবস্থায় বিক্রিত বস্তু তার সত্ব হইতে খারিজ হয় নাই, এই অবস্থায় যদি ক্রেতা উহা কবজা করিয়া লয়, বিক্রেতার এজাযতেই কবজা করুক বা বিনা এজাযতে করুক এবং ক্রেতার নিকট উক্ত বস্তু হালাক হইয়া গেল। এখন বিক্রিত বস্তুর নির্দ্ধারিত মূল্য ক্রেতার পরিশোধ করা ওয়াজিব; এবং বিক্রিত বস্তু যদি মিছলী বা নজীর বিশিষ্ট হইয়া থাকে তবে ক্রেতার উপর ওয়াজিব উহার নজীর আদায় করা এবং বিক্রেতা যদি বিক্রয় বাতিল করিয়া থাকে তখনও হুকুম উহাই। অর্থাৎ মূল্য অথবা উহার নজীর আদায় করিতে হইবে; এবং বিক্রেতা যদি নিজের খিয়ার খতম করিয়া দেয় এবং বেচা শুদ্ধ করিয়া দেয় অথবা মুদ্দতের পর উক্ত বস্তু হালাক হইয়া গেল। এই অবস্থায়ও ক্রেতার উপর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব; এবং বিক্রিত বস্তু যদি বিক্রেতার নিকটই নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে বেচা কেনা নষ্ট হইয়া গেল কাহার উপর কিছুই পাওনা দেনা রহিল না; এবং বিক্রিত বস্তুর ভিতর যদি কোন আয়েব পয়দা হইয়া যায় তখনও বিক্রেতার খিয়ার থাকিয়াই যাইবে কিন্তু খরিদ্দারের ইখতিয়ার ইচ্ছা সে পুরা দামে উহা গ্রহণ করিবে অথবা একেবারেই না লওয়া; এবং বিক্রেতা যদি নিজেই উহার ভিতর কোন আয়েব সৃষ্টি করিয়া দেয় তবে আয়েব পরিমাণ মূল্য কমিয়া যাইবে। যে অবস্থায় ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব তাহার অর্থ যে দিন সে কবজা করিবে সেই দিনের মূল্য। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার ইত্যাদি)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতার যদি খিয়ার থাকে তখন মূল্য ক্রেতার সত্ব হইতে বাহির হইয়া যায় সত্য কিন্তু বিক্রেতার সত্বে পরিণত হয় না। (আলমগীর)

মাসয়ালা- ক্রেতা নিজের জন্য খিয়ার রাখিল। এখন বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার সত্ব হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় বিক্রেতা যদি বিক্রিত বস্তুর ভিতর কোন কার্য করে তাহা শুদ্ধ হইবে না। যেমন- বিক্রিত বস্তু গোলাম ছিল সে উহাকে আজাদ করিয়া দিল। এই অবস্থায় উহা আজাদ হইবে না। এবং এই অবস্থায় যদি বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে মূল্য দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তু ক্রেতার কবজায় এবং উহার ভিতর আয়েব সৃষ্টি হইল আয়েবটি ক্রেতার দ্বারা হউক বা অন্য কাহার দ্বারা হউক অথবা আসমানী বিপদ দ্বারাই হউক যদি খিয়ার ক্রেতার হয় তবে ক্রেতার মূল্য দিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- আয়েবের এই হুকুম যখন আয়েবটা দূর হওয়া সম্ভব নয় যেমন হাত

কাটিয়া ফেলিয়াছে, তবে আয়েবটি যদি দূর হইতে পারে যেমন বিক্রিত বস্তুর ভিতর রোগের সৃষ্টি হইল, তাহা হইলে ইহার হুকুম এই যে, উক্ত আয়েবটি যদি মুদ্দতের ভিতর দূর হইয়া থাকে তাহা হইলে ক্রেতার খিয়ার রহিয়া গেল মুদ্দতের ভিতর বিক্রিত বস্তু ফেরত দিতে পারে; এবং মুদ্দতের ভিতর যদি আয়েব দূর না হইয়া থাকে তাহা হইলে মুদ্দত পুরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতার উপর বেচা লাজেম হইয়া গিয়াছে কেননা আয়েবের কারণে ক্রেতা উহা ফিরাইয়া দিতে পারে না; এবং মুদ্দতের পর যদিও আয়েব চলিয়া যায় তবুও ক্রেতা বিক্রয় নষ্ট করিতে পারিবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতার খিয়ার থাকাকালীন অবস্থায় মূল্য ক্রেতার সত্ব হইতে খারেজ হয় না এবং বিক্রিত বস্তু যদিও বিক্রেতার সত্ব হইতে বাহির হইয়া যায় কিন্তু ক্রেতার সত্বও হয় না। ইহা সত্ত্বেও ক্রেতা যদি বিক্রিত বস্তুর ভিতর কোন কার্য করে যেমন গোলাম ছিল উহাকে সে আজাদ করিয়া দিল। তার এই কাজ শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

(হেদায়া)

মাসয়ালা- ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই খিয়ার। এই অবস্থায় বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার সত্ব হইতে খারিজ হইবে না যেমন মূল্যটাও ক্রেতার সত্ব হইতে খারিজ হইবে না। তৎপর বিক্রেতা যদি বিক্রিত বস্তুর ভিতর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে বিক্রয় নষ্ট হইয়া যাইবে; এবং ক্রেতা যদি মূল্যের ভিতর হস্তক্ষেপ করে এবং মূল্য টাকা জাতীয় বস্তু নহে। এই অবস্থায় খরিদ্দারের পক্ষ হইতে বিক্রয় বাতিল হইবে।

(দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- উভয়ের খিয়ার থাকাকালীন মুদ্দতের ভিতর যে কেহ বিক্রয় নষ্ট করে, নষ্ট হইয়া যাইবে এবং যিনি বিক্রয় জায়েয করিয়া দিবে তাহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে, অর্থাৎ তাহার পক্ষে বিক্রয় নির্ধারিত হইল অপরজনের খিয়ার রহিয়া গেল এবং মুদ্দত যদি পূর্ণ হইয়া যায় এবং কেহ ফছখ বা বিক্রয় ভঙ্গও করিল না এবং জায়েযও করিল না। এই অবস্থায় উভয়ের পক্ষ হইতে বিক্রয় নির্ধারিত হইয়া গেল।

(দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যাহার জন্য খিয়ার চাই সে ক্রেতা হউক বা বিক্রেতা অথবা অন্য কেহ যখন সে বিক্রয় জায়েয করিয়া দিল বেচা কেনা পূর্ণ হইয়া গেল। অপর জনের উহা জ্ঞাত হউক বা নাই হউক। তবে যদি উভয়ের খিয়ার থাকে তখন তাহার একা জায়েয করিয়া দিলে বিক্রয় পূর্ণ হইবে না। কেননা অপর জনের ফছখ বা ভঙ্গ করার হক আছে। সে ভঙ্গ করিয়া দিলে উহার জায়েয করাতে কোন লাভ হইবে না।

মাসয়ালা- বিক্রেতার খিয়ার ছিল এবং মুদ্দতের মধ্যেই বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিল তৎপর জায়েযও করিয়া দিল ক্রেতা ইহা কবুল করিয়া লইল। ইহা দ্বারা বেচা শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি নূতন বিক্রয় হইল কেননা ভঙ্গ দ্বারা প্রথমকার বিক্রয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবং খিয়ার যদি খরিদ্দারের হয় সে প্রথমতঃ জায়েয করিয়া পরে ভাঙ্গিয়া দিল

এবং বিক্রেতা অনুমোদন করিল তাহা হইলে ফছখ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একালা হইতেছে। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যাহার খিয়ার তিনি কওল দ্বারা ফছখ করিতে পারে এবং আমল দ্বারা ও কওল বা বাক্য দ্বারা ফছখ বা ভঙ্গ করিলে মুদ্দতের ভিতরই অন্যের জ্ঞাত হইতে হইবে। অপর জনের যদি জানা না হয় অথবা মুদ্দত চলিয়া যাওয়ার পর জানা হয় তাহা হইলে ফছখ শুদ্ধ হইবে না বরং বেচা অবধারিত হইয়া যাইবে। আর যাহার খিয়ার আছে সে যদি কোন আমল বা কর্ম দ্বারা বিক্রয় ফছখ করে তবে অপরের জানা না হইলেও ফছখ হইয়া যাইবে। যেমন বিক্রিত বস্তুর ভিতর এমন ধরনের হস্তক্ষেপ করিয়াছে যাহা মালিক করে যেমন বিক্রিত বস্তু গোলাম ছিল সে উহাকে আজাদ করিয়া দিল, অথবা বিক্রয় করিয়া ফেলিল, অথবা উহা দাসী ছিল তাহার সঙ্গে সঙ্গম করিয়াছে অথবা উহাকে চুম্বন করিয়াছে অথবা বিক্রিত বস্তুটা হেবা, রেহেন রাখিয়া কবজা দিয়াছে, অথবা ইজারা দিয়াছে অথবা খরিদ্দারকে মূল্য মাফ করিয়া দিয়াছে অথবা ঘর কাহাকেও থাকার জন্য দিয়াছে, যদিও বিনা ভাড়ায় অথবা উহার ভিতর নূতন তামীর করিল অথবা প্লাস্টার করিল অথবা মেরামত করাইল, অথবা ভাঙ্গিয়া দিল। এই সব অবস্থায় বিক্রয় ফছখ বা ভঙ্গ হইয়া গেল। যদিও মুদ্দতের ভিতর অপর জন জ্ঞাত হইল না।

(আলমগীরী, রদ্দে মোহতার)

এজাযতের শব্দ সমূহ

মাসয়ালাঃ- যাহার জন্য খিয়ার সে বলিল আমি বিক্রয় জায়েয করিয়া দিলাম অথবা রাজী হইলাম অথবা নিজের খিয়ার আমি অকেজো করিয়া দিলাম অথবা এই ধরনের অন্য কোন শব্দ বলিয়াছে, ইহা দ্বারা খিয়ার চলিয়া যায় এবং বেচা নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এবং যদি বলে যে, আমার লওয়ারই ইচ্ছা অথবা এই বস্তু আমার পছন্দ মত অথবা আমার ইহার আকাঙ্খা আছে এই সব শব্দ দ্বারা খিয়ার বাতিল হইবে না।

(আলমগীরী, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- মুদ্দতের ভিতরেই যাহার খিয়ার ছিল সে মারা গেল। ইহাতে খিয়ার বাতিল হইয়া গিয়াছে। খিয়ারের ভিতর মীরাছ জারী হয় না অতএব তাহার ওয়ারিসের কেহ উক্ত খিয়ারের হকদার হইবে না। ঐরূপ যদি সে বেহুঁশ হইয়া পড়ে অথবা মজনুন (পাগল) হইয়া গিয়াছে অথবা শুইয়া রহিয়াছে ইতিমধ্যে মুদ্দত শেষ হইয়া গেল। ইহার দ্বারা খিয়ার বাতিল হইয়া গিয়াছে। খরিদ্দারকে মালিক হিসাবে কবজা দিয়াছে ইহা দ্বারা বিক্রেতার খিয়ার বাতিল হইয়া গিয়াছে তবে মালিক হিসাবে নয় বরং নিজের ইখতিয়ার রাখিয়া কবজা দিয়াছে তাহাতে খিয়ার বাতিল হয় নাই। (আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- একাধিক বিক্রিত বস্তুর ভিতর খিয়ার কোনটার ভিতর আকদ জায়েয রাখা এবং কোনটার ভিতর জায়েয না রাখা সে ইহা করিতে পারিবে না বরং জায়েয

রাখিলে সবটারই রাখিতে হইবে, বাতিল করিলেও সবটারই করিতে হইবে।

(আলমগীরী)

মাসয়ালা- ক্রেতার খিয়ার এখন যতক্ষণ মুদ্দত পুরা না হইবে বিক্রেতা মূল্য তলব করিতে পারিবে না এবং বিক্রেতাকেও বিক্রিত বস্তু সমর্পণের জন্য বাধ্য করা যাইবে না। তবে খরিদ্দার যদি মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকে, তবে বিক্রিত বস্তু বিক্রেতাকে দিয়া দিতে হইবে। ঐরূপ বিক্রেতা যদি সমর্পণ করিয়া থাকে, তবে খরিদ্দারকে মূল্য দিতে হইবে। তবে বিক্রয় ফছখ করিয়া দেওয়ার হক থাকিবে; এবং খিয়ার যদি বিক্রেতার হইয়া থাকে এবং খরিদ্দার মূল্য আদায় করিয়া থাকে এবং বিক্রিত বস্তু কবজা করিতে চায় তাহা হইলে বিক্রেতা কবজা হইতে বাধা দিতে পারে। তবে বাধা দিলে মূল্য ফেরত দিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- খিয়ারের শর্তের সহিত একটা ঘর ক্রয় করিল, উহার আশপাশ অন্য আর একটি ঘর বিক্রি হইল, ক্রেতা শোফয়া করিল। এই অবস্থায় খিয়ার বাতিল হইয়া গেল এবং বিক্রি লাযেম হইয়া গেল। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- দুইটা বস্তু এক সঙ্গে বিক্রি দিল। যেমন- দুইটা গোলাম অথবা দুইখানা কাপড় অথবা দুইটা প্রাণী ক্রেতা অথবা বিক্রেতা উহার একটার ভিতর খিয়ারে শর্ত করিল। ইহার চার ছুরত যে, একটির ভিতর খিয়ার উহার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট এবং প্রত্যেকটির মূল্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলিয়া দিয়াছে অথবা দেয় নাই। যদি খিয়ারের স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রত্যেকটির মূল্য প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা হইলে বেচা শুদ্ধ হইয়াছে; এবং বাটখারা অথবা পইকা, খুচি চুনিয়া, পুরা এবং কাটা ইত্যাদি দ্বারা ওজন ও পরিমাণ করিয়া যে সব বস্তু ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা ক্রয় করিল এবং উহার অর্দ্ধেকের ভিতর খিয়ারে শর্ত রাখিল, অথবা একটি গোলাম ক্রয় করিল এবং অর্দ্ধেকের ভিতর খিয়ার রাখিল তাহা হইলে বিক্রয় শুদ্ধ হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বলুক বা নাই বলুক। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- দুই ব্যক্তি একটা বস্তু ক্রয় করিল এবং ইহাদের প্রত্যেকেই খিয়ারে শর্ত করিল তৎপর একজন প্রকাশ্যে অথবা লক্ষণ দ্বারা সম্মতি জাহের করিল ইহাতে অপর জনের খিয়ার নষ্ট হইয়া যাইবে। ঐরূপ যদি দুই ব্যক্তি আকদ দ্বারা কোন বস্তু বিক্রি দিল এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্য খিয়ার রাখিল, তৎপর একজন বিক্রেতা উক্ত বিক্রয় জায়েয করিয়া দিলে অপর জনের খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে, রদ করার হক তাহার থাকিবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- এক আকদ দ্বারা দুইটা বস্তু বিক্রি দিল এবং নিজের জন্য খিয়ার রাখিল তৎপর একটির বিক্রি ফছখ করিল ইহাতে উহা ফছখ হয় নাই বরং খিয়ার বাকী আছে। ঐরূপ একটা বস্তু বিক্রি দিয়া উহার অর্দ্ধেকের বিক্রি ফছখ করিল, ইহা দ্বারা বেচা নষ্ট হয় নাই, এবং খিয়ার বাকী আছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যক্তি খিয়ারের শর্তের সহিত কোন ঘর বিক্রয় দিল, ক্রেতা বিক্রেতাকে কিছু টাকা অথবা কোন বস্তু দিল, খিয়ার ছাবেত বা অকেজো করিয়া দেওয়ার জন্য এবং বিক্রি ঠিক করিয়া দেওয়ার জন্য বিক্রেতা তাই করিয়া দিল ইহা জায়েয এবং ক্রেতা যাহা দিয়াছে মূল্যের শামিল হইবে। অনুরূপ যদি ক্রেতার জন্য খিয়ার থাকে এবং বিক্রেতা বলিল যদি আপনি খিয়ার অকেজো করিয়া দেন তাহা হইলে আমি মূল্য হইতে এতটা কম করিয়া দিব অথবা বিক্রিত বস্তুর সঙ্গে এই বস্তুটা আরও বৃদ্ধি করিয়া দিব, ইহাও জায়েয। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতার জন্য খিয়ার, সে পরীক্ষার জন্য বিক্রিত বস্তুর ভিতর এমন ধরণের হস্তক্ষেপ বা কার্য করিয়াছে যাহা সত্ববিহীন বস্তুর ভিতরও করা যায়। এই রকমের কাজ দ্বারা খিয়ার বাতিল হইবে না। তবে সেই কাজটি সত্ব বিহীন বস্তুর ভিতর কোন অবস্থাতেই জায়েয না হয়, এমন কাজ দ্বারা খিয়ার বাতিল হইবে। যেমন ঘোড়ার উপর একবার সওয়ার হইল, অথবা কাপড় এইজন্য পরিধান করিল যে, শরীরে ঠিক হয় কিনা, অথবা দাসী দ্বারা কাজ করাইয়া দেখিল যে, সে কাজ জানে কিনা ইহা দ্বারা খিয়ার বাতিল হয় নাই। তবে দুইবার সওয়ার হইলে, দুইবার কাপড়টা পরিধান করিলে দাসী দ্বারা দুইবার কাজ করাইলে খিয়ার নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে ঘোড়ার উপর একবার সওয়ার হইয়া এক রকমের গতি এবং দ্বিতীয় বার অন্য রকমের গতি লক্ষ্য করিল এবং দাসী দ্বারাও দ্বিতীয়বার অন্য ধরনের কাজ লইল ইহা দ্বারা তাহার খিয়ার নষ্ট হয় নাই।

(আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া পানি পান করাইতে নিয়া গেল অথবা চড়াইতে নিয়া গেল অথবা বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়া গেল। এই সব কাজ সওয়ার না হইয়া যদি অক্ষম হয় তাহা হইলে বিক্রয়ের এজাযত হইবে না। খিয়ার বাকী থাকিবে। অন্যথায় এই সওয়ার এজাযতে গণ্য হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- জমিন ক্রয় করিয়া ক্রেতা উহাতে কৃষি করিল। ইহা দ্বারা তাহার খিয়ার বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং বিক্রেতা যদি কৃষি করিয়া থাকে তাহা হইলে বিক্রয় বাতিল হইয়া গিয়াছে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে শর্তের সহিত এমন ঘর ক্রয় করিল যে ঘরে সে পূর্বের থেকেই থাকিত। ইহার পরও সেই ঘরে অবস্থান করিলে খিয়ার বাতিল হইবে না।

(আলমগীরী)

মাসয়ালা- ক্রেতার নিকট বিক্রিত বস্তু বাড়িয়া গেল। ইহা প্রথমতঃ দুই রকম, জড়িত বা স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটি বিক্রিত বস্তু হইতে উৎপাদিত বা অনুৎপাদিত। যদি অতিরিক্ত যাহা বাড়িয়াছে তাহা আসল বস্তুর সঙ্গে জড়িত ও ইহা হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। যেমন- বিক্রিত বস্তু প্রাণী ছিল উহা মোটা হইয়া গিয়াছে অথবা রুগ্ন ছিল, রোগ দূর হইয়া গিয়াছে। আর এক রকমের বৃদ্ধি যাহা জড়িত সত্য কিন্তু আসল হইতে

উৎপাদিত নহে। যেমন কাপড় রং দেওয়া হইয়াছে, অথবা সেলাই করা হইয়াছে। আর এক রকমের বৃদ্ধি যাহা জড়িত নহে, তবে আসল হইতে উৎপত্তি। যথা– প্রাণীর বাচ্চা পয়দা হইয়াছে, দুগ্ধ দোহাইয়াছে, পশম কাটিয়াছে। এইসব অবস্থায় বিক্রিত বস্তু ফেরত দিতে পারিবে না। তবে যদি যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা আসলের সঙ্গে জড়িত নহে এবং উহা হইতে উৎপত্তিও নহে। যেমন বিক্রিত বস্তু গোলাম ছিল সে কিছু উপার্জন করিয়াছে, ইহা দ্বারা খিয়ার বাতিল হইবে না। এই অবস্থায় যদি বিক্রয় ঠিক রাখে তবে অতিরিক্ত যাহা তাহাও সেই পাইবে এবং বিক্রয় নষ্ট করিয়া দিলে, আসল এবং অতিরিক্ত সবই ফেরত দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বকরী ক্রয় করিল এই শর্তের সহিত যে, উহা গাভীন অথবা এতটা দুগ্ধ দেয় এই বেচা ফাসেদ নাজায়েয। তবে যদি শর্ত থাকে যে, বেশী দুগ্ধ দেয় তাহা হলে বায় ফাসেদ নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- একখানা ঘর এই শর্তের সহিত ক্রয় করিল যে, উহা পাকা ইট দ্বারা তৈয়ারী কিন্তু পাওয়া গেল কাঁচা ইটের, অথবা বাগান কিনিল এই শর্তের সহিত যে, উহার সব গাছগুলি ফলদার, কিন্তু দেখা গেল যে, একটি গাছও ফলদার নহে, অথবা কাপড় ক্রয় করিল এই শর্তে যে, উহা কুসুম রং দ্বারা রঞ্জিত কিন্তু পাওয়া গেল জাফরানের রঙ্গে রঞ্জিত। এই সব অবস্থায় বায় ফাছেদ নাজায়েয। অথবা খচ্চর ক্রয় করিল শর্ত ছিল যে, উহা মাদী কিন্তু পাওয়া গেল নর, এখানে বেচা জায়েয হইয়াছে তবে খরিদ্দারের ইখতিয়ার থাকিবে লওয়া না লওয়ার ভিতর। তবে নর বলিয়া ক্রয় করিল কিন্তু পাওয়া গেল মাদী, অথবা গাধা অথবা উট বলিয়া ক্রয় করিয়াছে কিন্তু পাওয়া গেল গাধী অথবা উটনী এই সব ছুরতে বায়ে জায়েয এবং ক্রেতার ফছখ করার খিয়ারও নাই কেননা জিনিস ভিন্ন নহে এবং শর্ত যাহা ছিল বিক্রিত বস্তু তাহার চাইতে উত্তম।

(দুররুল মোখতার, ফতহুল কাদীর)

খিয়ারে তায়ীন এবং উহার শর্ত সমূহ

মাসয়ালাঃ- কতেক বস্তু হইতে একটা অনির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় করিল। যেমন- বলিল ইহা হইতে ক্রয় করিলাম, এই অবস্থায় ক্রেতা উহা হইতে যে কোন একটা নির্দিষ্ট করিয়া লইবে। ইহাকে খিয়ারে তায়ীন বলে। ইহার জন্য কতিপয় শর্ত রহিয়াছে প্রথম শর্ত এই যে, উহা হইতে একটা ক্রয় করিবে, সবটা নহে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, দুই বা তিনটি বস্তুর মধ্যে একটা ক্রয় করিতে হইবে। চারটা হইতে একটা ক্রয় করিল তবে শুদ্ধ হইবে না। তৃতীয়তঃ স্পষ্ট বর্ণনা থাকা চাই যে, ইহার যে কোন একটি চান নিয়া যান। চতুর্থ এই যে, উহার মুদ্দতও তিন দিন পর্যন্ত হওয়া চাই। পঞ্চম এই যে, মূল্যবান বস্তু হওয়া চাই, নজীর বিশিষ্ট নহে।

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে তায়ীন বিক্রেতার জন্যও হইতে পারে, ইহার ছুরত এই যে,

ক্রেতা দুই অথবা তিন বস্তুর কোন একটা ক্রয় করিল এবং বিক্রেতাকে বলিয়া দিল যে, ইহার যে কোনটা আপনি দিয়া দিতে চান দিয়া দিন। এই অবস্থায় বিক্রেতা যে কোন একটা দিয়া দিবে সেটাই ক্রেতার গ্রহণ করিতে হইবে। তবে আয়েবদারটা যদি বিক্রেতা দিতে চায় এবং ক্রেতাও রাজী থাকে তবে কোন আপত্তি নাই অন্যথা বিক্রেতা ক্রেতাকে বাধ্য করিতে পারিবে না। এবং ক্রেতা আয়েবদারটা লইতে যদি প্রস্তুত না থাকে তখন অপরটা নেওয়ার জন্যও ক্রেতাকে বাধ্য করিতে পারিবে না। এবং ঐ বস্তুর একটা যদি বিক্রেতার নিকট হালাক হইয়া যায় তাহা হইলে যেটা বাকী আছে সেইটা ক্রেতার জন্য লাযেম করিতে পারে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে তায়ীনের সহিত বিক্রয় হইল। কিন্তু ক্রেতা উভয় বস্তু কবজা করিল, এই অবস্থায় উহার একটি ক্রেতার এবং অপরটি বিক্রেতার যাহা ক্রেতার নিকট আমানত হিসাবে গণ্য হইবে। এই হিসাবে উক্ত বস্তু দুইটি যদি ক্রেতার নিকট হালাক হইয়া যায় তবে একটার দাম যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা বিক্রেতাকে দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে তায়ীনের সহিত একটা বস্তু ক্রয় করার পর ক্রেতা মরিয়া গেল। এখন উক্ত খিয়ার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। ওয়ারিস যে কোন একটা গ্রহণ করিতে পারে, উভয়টা রদ করিয়া বেচা নষ্ট করিতে পারে না। এবং উভয়টা কবজা হইয়া থাকিলে অপরটা তাহার নিকট আমানত হিসাবে থাকিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- বিক্রেতার নিকট উভয় বস্তু হালাক হইয়া গেল, এই অবস্থায় বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। এবং একটা বাকী থাকিলে ইহাই বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা উভয়টা কবজা করিয়াছে। পরে একটা হালাক হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় যেইটা হালাক হইয়াছে সেইটাই বিক্রয় হইয়াছে ধরিতে হইবে। বাকীটা ক্রেতার নিকট আমানত। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে তায়ীনের সহিত বিক্রয় হইল এবং এখনও উভয় জন্তুই বিক্রেতার কবজায় রহিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় একটা আয়েবদার হইয়া গেল। এখন ক্রেতার ইচ্ছা যে কোন একটা লউক কিন্তু পুরা দামে লইতে হইবে অথবা ইচ্ছা করিলে কোন একটা নাও লইতে পারে। উভয়টার ভিতর যদি আয়েব সৃষ্টি হয় তখনও হুকুম ইহাই। কিন্তু ক্রেতা যদি কবজা করিয়া থাকে এবং তাহারই নিকটে একটা আয়েবদার হইয়া যায় তখন ইহাই বিক্রয়ের বস্তু বলে সাব্যস্ত হইবে বাকীটা বিক্রেতারই ক্রেতার নিকট আমানত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এবং উভয়টা যদি আয়েবদার হইয়া যায় তখন দেখিতে হইবে পর পর আয়েবদার হইয়া থাকিলে যেইটা প্রথম আয়েবদার হইয়াছে সেইটাই বিক্রয়ের জন্য নির্দ্ধারিত হইবে এবং একই সময় উভয়টা আয়েবদার হইয়া থাকিলে বিক্রয়ের জন্য যে কোন একটা ধরিয়া লইবে। কিন্তু উভয়টা ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- দুইখানা কাপড় ছিল, নির্দিষ্ট করার পূর্বেই ক্রেতা একখানাকে রং দিল, ইহাই বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- খরিদ্দার কোন বস্তুর দাম নির্দিষ্ট করিয়া ইজাব কবুলের পূর্বে কবজা করিল, এখন এই বস্তু তাহার জামিনে রহিল যদি হালাক হইয়া যায় তবে ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে এবং এই ক্ষতি পূরণ সেই বস্তুর বাজার দর দিতে হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত মূল্যের সমান হউক বা বেশী বা কম তাহাই দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- গ্রাহক বিক্রেতার সঙ্গে ফায়ছালা করিল যে, মাল নষ্ট হইলে আমি ক্ষতিপূরণ দিব না। এই অবস্থায়ও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং উক্ত শর্ত কোন কাজে আসিবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা কোন বস্তু ক্রয়ের জন্য উকীল নিযুক্ত করিল। উকীল মূল্য ঠিক করিয়া ইজাব কবুল না করিয়াই মুয়াক্কিলকে দেখানোর জন্য নিয়া আসিল। মুয়াক্কিল দেখিয়া পছন্দ করিল না এবং ফেরত দিল পর উহা উকীলের নিকট হালাক হইয়া গেল। এই অবস্থায় উকীলের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে উহা মুয়াক্কিল থেকে আদায় করিতে পারিবে না। তবে মুয়াক্কিল যদি বলিয়া দিয়া থাকে যে, দাম ঠিক করিয়া পছন্দ করার জন্য আমার নিকট নিয়া আসিবে তখন উকীল থেকে আদায় করিতে পারিবে না।

মাসয়ালাঃ- খরিদ্দার দোকানদার হইতে মাল চাহিল সে তিনটি মাল দিল এবং প্রত্যেকটির দামও বলিয়া দিল। এই মাল দশ টাকা, এইটা বিশ টাকা এবং এইটা ত্রিশ টাকা লইয়া যাও ইহার যেইটা তোমার পছন্দ সেইটাই তোমার নিকট বিক্রি দিলাম। ইহার পর উক্ত তিন খানাই ক্রেতার নিকট হালাক হইয়া গেল। এখন দেখিতে হইবে সবগুলি একই সঙ্গেই হালাক হইয়াছে অথবা আগে পরে হইয়াছে, তবে কোনটা আগে কোনটা পরে তাহা জানা নাই। এই অবস্থায় প্রত্যেকটির তিনের এক অংশ মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এবং কোনটি প্রথম নষ্ট হইয়াছে তাহা যদি জানা থাকে তবে উহারই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বাকী দুইটি আমানত ছিল উহার ক্ষতিপূরণ নাই এবং যদি নষ্ট হইয়া থাকে এবং কোনটি প্রথম নষ্ট হইয়াছে উহা জানা না থাকে তবে এই দুইটি মালের প্রত্যেকটির অর্ধেক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে বাকী মালটি আমানত উহা ফেরত দিবে; এবং একটি নষ্ট হইয়া থাকিলে সেইটির ক্ষতিপূরণ দিয়া বাকী দুইটি ফেরত দিবে। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- মূল্য ঠিক করিয়া মাল লইয়া গেলে ক্ষতিপূরণ তখনই দিতে হইবে যখন উহা ক্রয়ের জন্য নিয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া যায় অন্যথা নহে। যেমন- দোকানদার গ্রাহককে বলিল যে, ইহা লইয়া যাও তোমার জন্য দশ টাকা, খরিদ্দার বলিল লও ইহা দেখিব অথবা ফালানা ব্যক্তিকে দেখাইব, ইহা বলিয়া লইয়া গেল তৎপর উহা হালাক হইয়া গেল। এই অবস্থায় উহার ক্ষতিপূরণ নাই ইহা আমানত। তবে যদি এই কথা

বলিয়া যায় যে, লও পছন্দ হইলে লইব এবং নষ্ট হইয়া যায় এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- দোকানদার হইতে মাল চাহিয়া লইয়া গেল যে, যদি পছন্দ হয় ক্রয় করিব এবং উহার নিকট হালাক হইয়া গেল এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ নাই। তবে যদি এইরূপ বলিয়া নেয় যে, পছন্দ হইলে দশ টাকায় ক্রয় করিব এবং উহা হালাক হইয়া গেল। এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম ছুরতে যেহেতু মূল্যের উল্লেখ নাই অতএব এই কবজা খরিদ্দার হিসাবে হয় নাই এবং দ্বিতীয় ছুরতে মূল্যের কথা উল্লেখ থাকায় খরিদ্দার হিসাবেই কবজা হইয়াছে।

(ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালা- দাম ঠিক করিয়া ইজাব কবুল ছাড়া যে বস্তু লইয়া গেল উহা হালাক হয় নাই এবং সে নিজেই উহা হালাক করিয়াছে। যেমন- খাওয়ার বস্তু ছিল সে খাইয়া ফেলিয়াছে, কাপড় ছিল সে উহা কাটাইয়া ছিলাইয়া লইয়াছে এই অবস্থায় উহার মূল্য দিতে হইবে।

মাসয়ালা- দেখিতে অথবা দেখাইতে আনিয়াছে এবং ইহা বলে নাই যে, পছন্দ হইলে লইব এবং খরচ করিয়া ফেলিয়াছে এখন উহার বাজার মূল্য দিতে হইবে।

(দুররুল মোখতার)

খিয়ারে রুইয়াতের বর্ণনা

মাসয়ালাঃ- যদি কোন মাল দেখাশুনা না করিয়া ক্রয় করা হয় এবং দেখার পর সেই বস্তু নাপছন্দ হয়, এইরূপ অবস্থায় পবিত্র শরীয়ত ক্রেতাকে ইখতিয়ার দিয়াছে যে, দেখার পর যদি মালটা লইতে না চায় তাহা হইলে বিক্রয় ফছখ বা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে, ইহাকে 'খিয়ারে রুইয়াত ' বলে।

হাদীস শরীফে আছে- যে ব্যক্তি এমন বস্তু ক্রয় করিল যাহা দেখে নাই, তাহা হইলে দেখার পর সে ইখতিয়ার গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে। তাহাছাড়া হযরত ওসমান (রাঃ) স্বীয় জমিন যাহা বসরায় ছিল হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) এর নিকট বিক্রয় দিলেন। কেহ হযরত তালহাকে বলিল যে, এই কেনায় আপনার ক্ষতি আছে, তিনি বলিলেন, এই ক্রয়ের মধ্যে আমার দেখার খিয়ার আছে। কেননা আমি না দেখিয়াই ক্রয় করিয়াছি। হযরত ওসমান (রাঃ) কে কেহ কেহ বলিল আপনার এই বিক্রয়ের ভিতর লোকসান হইয়াছে। তিনিও ফরমাইলেন যে, আমার খিয়ার আছে। কেননা আমি না দেখিয়াই বিক্রয় দিয়াছি। এই মোয়ামেলার ভিতর উভয় জন হযরত জোবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) কে সালিস নিযুক্ত করেন। তিনি হযরত তালহা (রাঃ) এর অনুকূলেই ফায়ছালা দিলেন। ছাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাতেই এই ঘটনা হইয়াছিল। কেহই উহা এনকার করেন নাই। অতএব উহা 'এজমার' ন্যায় ধরিতে হইবে।

(হেদায়া, তাবেয়ী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা এমন বস্তু বিক্রি দিল যাহা সে দেখে নাই যেমন ওয়ারেসী সূত্রে ধান কিছু সে পাইয়াছে এবং না দেখিয়াই বিক্রি দিল। এই বিক্রি শুদ্ধ হইয়াছে। দেখার পর উহা ফছখ করার তাহার ইখতিয়ার নাই। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যে মজলিসে বিক্রয় হইয়াছে, সেখানেই বিক্রিত বস্তু মওজুদ কিন্তু ক্রেতা দেখে নাই। যেমন পিপার ভিতর ঘি অথবা তৈল অথবা বস্তার ভিতর শস্য ছিল অথবা গাঠুরীর ভিতর কাপড় ছিল এবং খুলিয়া দেখার সময় হইল না অথবা সেখানে বিক্রিত বস্তু মওজুদ নাই সেই জন্য দেখে নাই। এই সব অবস্থাতেই দেখার পর খরিদ্দারের খিয়ার থাকিবে বিক্রয় বহাল রাখা বা ভঙ্গ তাহার ইচ্ছা। বিক্রিত বস্তু বিক্রেতা যেরূপ বাতাইয়াছে সেইরূপই পাইয়া থাকুক অথবা উহার বিপরীত, সর্ব অবস্থাতেই দেখার পর সে বিক্রয় ফছখ বা ভঙ্গ করিতে পারে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা দেখার পূর্বেই নিজের সম্মতি প্রকাশ করিল অথবা বলিয়া দিল যে, আমি আমার খিয়ার বাতিল করিয়া দিলাম এ অবস্থায়ও দেখার পর ফছখ করার অধিকার থাকিবে। কেননা দেখার সময়ই খিয়ার আসে দেখার পূর্বে খিয়ারই ছিল না। অতএব উহা বাতিল করার কোন অর্থ হয় না। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে রুইয়াতের জন্য এমন কোন সময় নাই যাহা চলিয়া গেলে খিয়ার বাকী থাকিবে না। বরং এই খিয়ার দেখার উপরে যখন দেখিবে এবং দেখার পর ফছখ বা ভঙ্গ করার অধিকার আসে ঐ সময় পর্যন্ত বাকী থাকে যতক্ষণ প্রকাশ্যে অথবা লক্ষণে সম্মতি পাওয়া না যায়। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে রুইয়াত চার স্থানে হইয়া থাকে। (১) কোন নির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের ভিতর। (২) ইজারা। (৩) তাকছীম বা বন্টন। (৪) মালের দাবী ছিল এবং নির্দিষ্ট বস্তুর উপর আপোষ হইয়া গেল। যদি কেছাছের বা মৃত্যুদণ্ডের দাবী হয় এবং কোন বস্তুর উপর আপোষ হয়, ইহার ভিতর খিয়ারে রুইয়াত নাই। দেনার ভিতর খিয়ারে রুইয়াত নাই। টাকা আশরাফীর ভিতরও খিয়ারে রুইয়াত নাই। তবে সোনা চান্দির কোন পাত্র হইলে উহার ভিতর খিয়ারে রুইয়াত হইবে। বায়য়ে সলমের মূলধন যদি কোন বস্তু হয় তবে যাহাকে দেওয়া হইবে তাহার জন্য খিয়ারে রুইয়াত ছাবেত হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- বিভিন্ন পদের বস্তুগুলি যদি শরীকগণের মধ্যে হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ভিতর খিয়ারে রুইয়াত, খিয়ারে শর্ত এবং খিয়ারে আয়েব তিনটাই হইতে পারে। এবং নজীর বিশিষ্ট বস্তু সমূহের বন্টনের ভিতর শুধু খিয়ারে আয়েব হইবে। বাকী অন্য দুইটি খিয়ার হইবে না। এবং নজীরবিহীন বস্তু যদি এক পদের হয় যেমন এক কেসেমের কাপড়, অথবা গাভীসমূহ অথবা বকরী সমূহ। ইহাদের মধ্যে তিন প্রকারের খিয়ার হইতে পারে। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- অন্যে দেখা বস্তু ক্রয় করিয়াছে, দেখার পূর্বেও উহার বিক্রয় ভঙ্গ

করিতে পারে। কেননা এই বিক্রয় ক্রেতার উপর লাযেম নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা বিক্রিত বস্তু কবজা করিল এবং দেখার পর প্রকাশ্যে বা লক্ষণ দ্বারা সম্মতি জাহের করিল। অথবা উহার ভিতর কোন রকমের আয়েব সৃষ্টি হইল অথবা এমন হস্তক্ষেপ করিয়াছে যাহা ফছখের উপযোগী নহে, যেমন আজাদ করিয়া দিয়াছে, অথবা উহার ভিতর অপরের হক সৃষ্টি হইয়াছে যেমন অপরের নিকট খিয়ারের শর্ত ছাড়া বিক্রয় দিয়াছে, অথবা রেহেন রাখিয়াছে, অথবা ইজারা দিয়াছে। এই সব অবস্থায় খিয়ারে রুইয়াত চলিয়া গিয়াছে। এখন বিক্রয় নষ্ট করিতে পারিবে না। তবে যদি অন্যের নিকট খিয়ারে শর্তের সহিত বিক্রয় দিয়া থাকে অথবা বিক্রয়ের জন্য মূল্য সাব্যস্ত করিয়াছে অথবা হেবা দিয়াছে কিন্তু কবজা দেয় নাই। এই সব দেখার পর কবজা করিয়াছে, ইহাতে লক্ষণ দ্বারা সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। এখন বিক্রয় ফছখ করিতে পারিবে না। তবে দেখার পূর্বে হইয়া থাকিলে খিয়ার বাকী আছে। দেখার পর বিক্রিত বস্তুর কবজা করাও সম্মতির প্রমাণ। (আলমগীরী, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- খরিদা বস্তুর কবজা করিয়া দেখার পূর্বে বিক্রি দিল। তৎপর আয়েবের কারণে দ্বিতীয় খরিদ্দার মালটা ফেরত দিল। যদিও এই ফেরত কাজীর রায় দ্বারা দেওয়া হইয়া থাকে অথবা রেহেন রাখার পর উহা ছাড়াইয়া লইল অথবা ইজারা দিয়া ইজারা ভঙ্গ করিল। এই সব কারণে তাহার খিয়ারে রুইয়াত যে নষ্ট হইয়াছে পুনঃ খিয়ারে রুইয়াত হাছেল হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- খরিদা বস্তুর কোন অংশ হাত ছাড়া হইয়া গেল, অথবা উহাতে কম বা বেশী হইল, যে ধরনেরই বেশী হউক জড়িত বা বিচ্ছিন্ন ইহাতে খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। (আলমগীরি)

মাসয়ালাঃ- একখানা ঘর ক্রয় করিল। কিন্তু এখনও দেখে নাই, উহার পার্শ্বে একখানা ঘর বিক্রি হইল। ক্রেতা শোফয়ার দাবীতে উহা লইয়া ফেলিল ইহার পরও প্রথম ঘর সম্বন্ধে খিয়ারে রুইয়াত বাকী থাকিবে। দেখার পর ইচ্ছা করিলে বিক্রি ফছখ করিতে পারে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা যতক্ষণ খিয়ারে রুইয়াত নষ্ট না করিবে, বিক্রেতা তাহার থেকে মূল্য তলব করিতে পারিবে না। (ফতহুল কাদীর)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা ক্রয়ের পর মরিয়া গেল। এই অবস্থায় ওয়ারিসগণ মিরাছ সূত্রে খিয়ারে রুইয়াতের অধিকারী হইবে না। অর্থাৎ ওয়ারিসগণ বিক্রয় ফছখ করিতে পারিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যে বস্তু প্রথম দেখিয়াছে যদি উহার ভিতর কিছু পরিবর্তনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে উহাতে খিয়ারে রুইয়াত থাকিবে। যদি পূর্বের মতই থাকিয়া থাকে তবে খিয়ার থাকিবে না। অবশ্য আকদ বা ইজাব কবুলের সময় যদি তাহার মালুম না থাকে যে, সে সেই বস্তুই ক্রয় করিতেছে তবে খিয়ার থাকিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বিক্রেতা বলে যে, যেমন তুমি দেখিয়াছ মালটা সেইরূপই রহিয়াছে, উহার ভিতর পরিবর্তন আসে নাই। কিন্তু ক্রেতা বলে পরিবর্তন আসিয়াছে। এই অবস্থায় ক্রেতার সাক্ষী দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে যে, উহার ভিতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি সাক্ষী হাজির করিতে না পারে তখন কসমের সহিত বিক্রেতার কওল গ্রহণযোগ্য হইবে। ইহা ঐ সময় যখন ক্রেতার দেখার যামানা বেশী দিন না হয় যাহাতে পরিবর্তন আসিতে পারে। যদি যামানা এত দিন চলিয়া যাইয়া থাকে যে, স্বভাবত ইহার ভিতর পরিবর্তন আসিয়াই যায়। যেমন দাসী বিশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছে, সেই সময় দাসী যুবতী ছিল। এই অবস্থায় ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হইবে। বিক্রেতা বলে যে, ক্রয়ের সময় তুমি দেখিয়াছিলে। ক্রেতা বলে দেখি নাই, এই অবস্থায় কসমের সহিত ক্রেতার কথা মানা যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- যবেহকৃত বকরীর কলিজা খরিদ করিল। এখনও উহার চামড়া খোলা হয় নাই। এই বেচা শুদ্ধ হইয়াছে। বিক্রেতার উপর কর্তব্য কলিজা বাহির করিয়া দেওয়া এবং ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত থাকিবে; এবং বকরী যদি যবেহ না হইয়া থাকে তখন কলিজা বেচা দুরস্ত হইবে না। যদিও বিক্রেতা বলে যে, আমি যবেহ করিয়া কলিজা বাহির করিয়া দিতেছি। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- দুই থান কাপড় ভিন্ন ভিন্ন দুই খানা কাপড়ের ভিতর মোড়াইয়া আনিল এবং খরিদ্দারকে বলিল গতকল্য যে দুইথান কাপড় দেখাইয়াছিলাম ইহা তাহাই। ক্রেতা বলিল এই থান দশ টাকায় ক্রয় করিলাম এবং এই থানও দশ টাকায় ক্রয় করিলাম। তবে ক্রয়ের সময় দেখিল না, ইহাতে খিয়ারে রুইয়াত হাছেল হইবে না। অবশ্য দুই থান ভিন্ন ভিন্ন দামে ক্রয় করিয়া থাকিলে খিয়ার হাছেল থাকিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- দুই ব্যক্তি একটা বস্তু ক্রয় করিল। কেহই উহা দেখিয়াছিল না। এখন দেখিয়া একজন সম্মতি প্রকাশ করিল এবং অপর জন ফেরত দিতে চায়। এখানে সে একা ফেরত দিতে পারিবে না। উভয় একমত হইয়া ফেরত দিতে পারে। একজন দেখিয়াছিল কিন্তু অপর জন দেখে নাই, যে দেখিয়াছিল না সে দেখিয়া ফেরত দিতে চান। এখানেও উভয় একমত হইয়া ফেরত দিতে পারে। যিনি দেখিয়াছে সে অপর জনের পূর্বেই বলিয়াছিল যে, আমি বিক্রয় সাব্যস্ত করিলাম। এই অবস্থায় অপর জনের খিয়ার বাতিল হইবে না। তবে সম্পূর্ণ খরিদ বস্তু ফেরত দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- এক থান দেখিল বাকী থান দেখে নাই। কিন্তু ক্রয় করিয়াছে সবগুলি। এই অবস্থায় খিয়ার থাকিবে, তবে ফেরত দিতে চাইলে সবই ফেরত দিতে হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারে রুইয়াতের কারণে ফেরত দিতে কাজীর রায় বা বিক্রেতার সম্মতি কোনটারই প্রয়োজন নাই। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারের কারণে বায় ফছখ করার জন্য শর্ত হল এই যে, বিক্রেতার জানা দরকার যে ফছখ হইয়াছে অন্যথা তার ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- খরিদা বস্তু দেখার অর্থ এই যে, সবই দেখিতে হইবে উহার সব

অংশই দেখিতে হইবে এমন নহে বরং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটা দেখা যথেষ্ট তাহাই দেখিলে চলিবে। যেমন খরিদা বস্তু অনেক এবং ইহার ভিতর পার্থক্য নাই, সবই একই ধরনের। যেমন শস্যের স্তুপ উহার বাহ্যিক অংশ দেখাই যথেষ্ট তবে ভিতরকার অংশ যদি ঐরূপ না হয় বরং আয়েবদার হয় তখন ক্রেতার খিয়ারে আয়েব এবং খিয়ারে রুইয়াত দুইটারই অধিকার আছে। যদি আয়েবদার না হয় বরং কম শ্রেণীর হয় তখন খিয়ারে আয়েব নহে, খিয়ারে রুইয়াত এর অধিকারী হইবে। ঐরূপ কতিপয় বস্তুর ভিতর শস্য পূর্ণ রহিয়াছে। একটার থেকে কিছু দেখাই যথেষ্ট যখন বাকীগুলির ভিতর উহার চাইতে কমশ্রেণীর মাল না হয়। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা বলে আমি যাহা দেখিয়াছি বাকীগুলি সেইরূপ নহে। কিন্তু বিক্রেতা বলে যে সেইরূপই। এই অবস্থায় যদি নমুনা মওজুদ থাকে অভিজ্ঞ লোকদিগকে উহা দেখাইবে। তাহারা যাহা বলিবে তাহাই গ্রহণযোগ্য হইবে। এবং নমুনা না থাকিলে ক্রেতার সাক্ষী হাজির করিতে হইবে। অন্যথা বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। ইহা ঐ সময় যখন শস্য সেখানেই বস্তায় পূর্ণ। তবে শস্য যদি সেখানে না হয় বরং বিক্রেতা শুধু নমুনা হাজির করিয়াছে এবং বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এবং নমুনাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎপর বিক্রেতা বাকী শস্য আনিয়াছে এবং এই মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইলে খরিদ্দারের কথাই গ্রহণযোগ্য। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- সওয়ারীর জানওয়ারের চেহারা এবং পাছা দেখাই যথেষ্ট। শুধু চেহারা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে না। পা ও খুরা এবং লেজ ও কেশর দেখার প্রয়োজন নাই।

(আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- পালিবার জন্য বকরী ক্রয় করিল। উহার সমস্ত শরীর এবং স্তন দেখা প্রয়োজন। ঐরূপ গাভী, মহিষ দুধের জন্য ক্রয় করলে স্তন দেখা প্রয়োজন এবং গোশতের জন্য বকরী ক্রয় করিলে তাহা হইলে উহার সর্বাঙ্গীণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। দূরের থেকে দেখিলে খিয়ারে রুইয়াত থাকিয়া যাইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ কাপড় যদি বাহির ভিতর এক রকম হয়। যেমন- মলমল, লাটা, মারকিন ইত্যাদি। যাহার নমুনা উপস্থিত করা হয়। ইহার থানের উপর দিয়া দেখানই যথেষ্ট খুলিয়া ভিতরটা দেখার প্রয়োজন নাই; বরং এই ধরনের কাপড়ের একথান দেখাই যথেষ্ট। সব থান দেখার প্রয়োজন নাই। তবে যদি ভিতরে খারাপ বাহির হইয়া পড়ে। অথবা আয়েব হয় তাহা হইলে খিয়ারে রুইয়াত অথবা খিয়ারে আয়েবের অধিকার হইবে। যদি বিক্রিত বস্তু বিভিন্ন রকমের থান হয়, তবে প্রত্যেক রকমের এক এক থান দেখা প্রয়োজন হইবে এবং থানের সব হিস্যা যদি এক রকমের না হয় যেমন চিকন গুল বদনের থান, বেনারসী শাড়ী ও বুটাদার যাহার উপরের হিস্যায় বুটা বেশী হয় এবং ভিতরে কম তাহা হইলে খুলিয়া সব দেখিতে হইবে, শুধু উপরের হিস্যা দেখিলে চলিবে না। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- কার্পেটের উপরটা দেখা প্রয়োজন। নীচের দিক দেখিলে খিয়ারে রুইয়াত বাতিল হইবে না। এবং শতরঞ্জি ও অন্যান্য বিছানার সমস্তটা দেখাই প্রয়োজন। রেযায়ী, লেপ, জুব্বা এবং কোট যাহার আস্তর থাকে এই সবগুলির বাহিরের ভাজ দেখা জরুরী, আস্তর দেখা জরুরী নহে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ঘরের বাহির, ভিতর, নীচ, উপর, পায়খানা, পাকের ঘর সবই দেখা দরকার। কেননা এই সব বিভিন্ন ধরনের হওয়ার কারণে মূল্যও বিভিন্নরূপ হইয়া যায়, বাগানের বাহির থেকে দেখাই যথেষ্ট নহে। ভিতরের হিস্যাও দেখিতে হইবে এবং গাছ যদি বিভিন্ন ধরনের হয় তবে প্রত্যেক কেসেমের গাছ দেখা এবং ফলগুলির মিষ্টি, তিক্ততা দেখারও প্রয়োজন। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালা- খাওয়ার বস্তু হইলে আস্বাদন গ্রহণ করাই যথেষ্ট এবং ঘ্রাণ লওয়ার বস্তু হইলে ঘ্রাণ লইতে হইবে। যেমন আতর, সুগন্ধিযুক্ত তৈল। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ডিম, আখরোট সমূহের কতেক দেখাই যথেষ্ট যখন বাকীগুলি উহার চাইতে খারাপ এবং কম দরজার না হয়। যে সব বস্তু জমিনের ভিতরে যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, আলু যাহা ওজন করিয়া বেচা হয়, ইহা হইতে খুদিয়া কিছু দেখাই যথেষ্ট। যখন বাকীগুলি উহার চাইতে কম দরজার না হয়, ইহা যখন বিক্রেতা নিজেই খুদিয়া দেখায়, অথবা ক্রেতা বিক্রেতার এজাযতে খুদিয়া দেখে। ক্রেতা বিক্রেতার এজাযত ছাড়াই যদি খুদিয়া দেখে অথবা এতটা খুদিয়া বাহির করিয়াছে যাহার কিছু মূল্য হয় তাহা হইলে খিয়ারে রুইয়াত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং ঐসব বস্তু যদি গণনা দ্বারা বেচা যায়। যেমন-মুলা, ইহার কতেক দেখাই যথেষ্ট হইবে না যখন বিক্রেতা উত্তোলন করিয়াছে, অথবা ক্রেতা বিক্রেতার এজাযতে। এবং ক্রেতা যদি বিক্রেতার এজাযত ছাড়াই উত্তোলন করিয়া থাকে এবং উহা এত যে, উহার কম মূল্য হইতে পারে। তবে খিয়ার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- এমন বস্তু বিক্রয় করিল যাহা জমিনের ভিতর রহিয়াছে। বিক্রেতা বলে যে, আমি খুদিয়া যদি বাহির করি এবং তুমি উহা পছন্দ করিলে না, তাহা হইলে আমার ক্ষতি হইবে, এবং ক্রেতা বলে যে, তোমার এজাযত ছাড়া যদি আমি খুদি এবং আমার কাজের না হয় তাহা হইলে উহা ফেরত দিতে পারিব না এবং বেচা লাযেম হইয়া যাইবে। এই রকম অবস্থায় উভয়ের কেহ যদি নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভাল, অন্যথা কাজী বেচা ফছখ বা ভঙ্গ করিয়া দিবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বোতলের ভিতর তৈল ছিল। এই অবস্থায় বোতলটা দেখিল, ইহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তৈল দেখা হইল না। ঐরূপ আয়না দেখিল এবং খরিদ্দার বস্তুর ছুরত উহাতে দেখা পাইল ইহাতে খরিদা বস্তু দেখা হল না এবং মাছ পানির ভিতর এমনিভাবে আছে যাহা বিনা ক্লেশে ধরা যায় উহা ক্রয় করিল, এবং পানির মধ্যেই দেখিয়া লইল। কতেক আলেমের মতে এই অবস্থায় খিয়ারে রুইয়াত বাকী থাকিবে না। কেননা

বিক্রিত বস্তু দেখিয়াছে; এবং কতেক ফকীহ বলিয়াছেন যে, খিয়ার বাকী আছে। কেননা পানির ভিতর আসল অবস্থা জানা যায় না। যতটা তাহার চাইতে বড় বুঝা যায়।

(রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা কাহাকেও কবজা করার জন্য উকীল বানাইল, এই উকীলের দেখাই যথেষ্ট, উকীল দেখার পর পছন্দ করিলে উকীল মোয়াক্কেল কেহরই ফছখ করার অধিকার থাকে না। যদি কবজা করার সময় উকীল খরিদা বস্তু দেখিয়া থাকে। যদি কবজা করার সময় উক্ত বস্তু লুক্কায়িত থাকে পরে উহা খুলিয়া দেখায় তাহা হইলে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হইবে। তবে এই দেখা এবং পছন্দ করা ক্রেতার খিয়ার বাতিল করিবে না এবং ক্রয় করার জন্য যদি উকীল নিযুক্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে উকীলের দেখাই যথেষ্ট। উকীল দেখিয়া পছন্দ করিলে বা ক্রয়ের পূর্বে উকীল দেখিয়াছে। এখন উকীল, মুয়াক্কিল কেহই ফছখ করিতে পারিবে না। ইহা ঐ সময় যখন অনির্দিষ্ট বস্তু ক্রয়ের জন্য উকীল বানান হয়। তবে মুয়াক্কিল ক্রয়ের জন্য যদি বস্তু নির্দিষ্ট করিয়া থাকে যে, অমুক বস্তু যেমন অমুক গোলাম অমুক গাভীটা অথবা অমুক বকরীটা তাহা হইলে উকীলের খিয়ারে রুইয়াত হাছেল হইবে না। (রদ্দে মোহতার, আলমগীরী, হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তি না দেখিয়া কোন বস্তু ক্রয় করিয়া কেউকে উহা দেখার জন্য উকীল নিযুক্ত করিল যে, সে দেখিয়া পছন্দ বা না পছন্দ করিবে। উকীলে দেখিয়া পছন্দ করিল। এখন বেচা হইয়া গেল এবং না পছন্দ করিয়া থাকিলে ফছখ করিতে পারে। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা একজনকে কবজা করার জন্য বার্তা বাহক বানাইয়া পাঠাইল অর্থাৎ তাহাকে বলিল যে, বিক্রেতার নিকট যাইয়া বল যে, ক্রেতা আমাকে পাঠাইয়াছে বিক্রিত বস্তু আমার নিকট দিয়া দিন, ইহার দেখা যথেষ্ট নহে। অর্থাৎ ক্রেতা দেখিয়া যদি না পছন্দ করে তাহা হইলে বেচা ফছখ করিতে পারে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালা- উকীল বিক্রিত বস্তুটা ওকালত প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে দেখিয়াছে উহার পর উকীল হইয়া ক্রয় করিল। এই অবস্থায় তাহার খিয়ারে রুইয়াত হাছেল থাকিবে।

(আলমগীরী)

অন্ধের বেচা-কেনা এবং তাহার খিয়ার থাকিবে কি না

মাসয়ালাঃ- অন্ধের বেচা, কেনা উভয়টাই জায়েয। যদি কোন বস্তু বিক্রি করে তবে খিয়ার হাছেল হইবে না। তবে যদি ক্রয় করে খিয়ার হাছেল হইবে এবং খরিদা বস্তু উলটাইয়া পাল্টাইয়া অনুসন্ধান করাই দেখার হুকুম রাখে। অনুসন্ধান করিয়া পছন্দ করিলে খিয়ার নষ্ট হইয়া যাইবে এবং যে সব বস্তু অনুসন্ধান করা, আস্বাদন বা ঘ্রাণ দ্বারা চিনা যায় না যেমন-জমিন, ঘর, গাছ, দাস-দাসী। এই সব স্থানে ইহার গুণাবলী বর্ণনা করিতে হইবে। সে সব গুণাগুণ বর্ণনা করা গিয়াছে খরিদা বস্তুর ভিতর উহা পাওয়া গেলে

ফছখ করিতে পারিবে না, অন্যথা ফছখ করিতে পারিবে। অন্ধ ক্রেতা কাউকে ক্রয় অথবা কবজা করার জন্য উকীল বানাইয়া দিতে পারে। উকীলের দেখাই তার দেখার জন্য যথেষ্ট হইবে। অন্ধ কোন বস্তু নিজের জন্য ক্রয় অথবা অন্যের জন্য যেমন কেউ অন্ধকে উকীল নিযুক্ত করিল, উভয় অবস্থায়ই খিয়ার হাছেল হইবে।

(আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- অন্ধের নিকট বিক্রিত বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল অথবা সে অনুসন্ধান করিয়া মালুম করিয়া পছন্দ করিল। তৎপর সে দৃষ্টিমান হইয়া গেল। এখন তাহার জন্য খিয়ারে রুইয়াত হাছেল হইবে না। চক্ষুস্মান ব্যক্তি ক্রয় করিল এবং খরিদা বস্তু দেখার পূর্বেই অন্ধ হইয়া গেল। এখন ইহার জন্য ঐ অন্ধেরই হুকুম যিনি ক্রয়ের সময় অন্ধ ছিল।

মাসয়ালাঃ- নির্দিষ্ট বস্তু নির্দিষ্ট বস্তুর পরিবর্তে বিক্রি হল। যেমন- কিতাব কাপড়ের পরিবর্তে বিক্রি হইল। এই অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই খিয়ারে রুইয়াত হাছেল থাকিবে কেননা এখানে উভয়েই ক্রেতাও বটে। (দুররুল মোখতার)

খিয়ারে আয়েবের বর্ণনা

হাদীস- (১) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আয়েবদার বস্তু বিক্রয় করিল এবং উহা জাহের করিল না। সে সর্বদা আল্লাহর নারাজীর মধ্যে থাকিবে, অথবা ফরমাইয়াছেন সর্বদা ফেরেশ্‌তা তাহার উপর লাআ'নত করে। (ইবনে মাজা)

হাদীস- (২) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। যখন মুসলমান নিজের ভাইয়ের নিকট কোন কিছু বিক্রয় দেয় যাহার ভিতর আয়েব আছে তাহা হইলে যতক্ষণ উহা বর্ণনা না করিবে উহা বিক্রি করা হালাল নহে। (ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা, হাকেম)

হাদীস - (৩) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শস্যের স্তুপের নিকট পৌঁছিলেন। উহার ভিতর হাত দিলেন এবং আঙ্গুলের ভিতর হুযুরের আদ্রতা অনুভব হইল। এরশাদ করিলেন- হে শস্যওয়ালা! ইহা কি? সে আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহার উপর বৃষ্টির পানি পড়িয়াছিল। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন- তুমি ভিজাগুলিকে উপরে করিয়া দেওনাই কেন? তাহা হইলে লোকেরা দেখিত। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস- (৪) হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, বিক্রয়ের দুগ্ধে পানি মিশ্রিত করিও না। এক ব্যক্তি (পূর্ব যামানায় যখন শরাব হারাম ছিল) এক জায়গায় শরাব লইয়া গিয়াছিল পানি মিশাইয়া উহা দ্বিগুণ করিয়াছিল, তৎপর সে একটা বানর ক্রয় করিল এবং দরিয়ায় সফর করিল। যখন গভীর পানির ভিতর পৌঁছিল

বানরটি আশরাফীর থলিয়া লইয়া মাস্তুলের উপর দিয়া থলিয়া খুলিয়া এক আশরাফী পানিতে নিক্ষেপ করিতেছিল এবং ঐ নৌকায় এইভাবে সে আশরাফীগুলি আধাআধি ভাগ করিয়া ফেলিল। (বায়হাকী)

আয়েব কাহাকে বলে

মাসয়ালাঃ- শরীয়তের পরিভাষায় আয়েব যাহার কারণে খরিদা বস্তু ফেরত দিতে পারে তাহা হইতেছে এমন আয়েব যাহার কারণে ব্যবসায়ীদের নিকট মালটার মূল্য কমিয়া যায়। সামান্য আয়েব যাহা ধর্তব্য নহে, ব্যবসায়ীরা যে দোষে মালের মূল্য কমায় না তাহা আয়েব বলিয়া গণ্য হইবে না।

মাসয়ালাঃ- বিক্রয়ের বস্তুর ভিতর আয়েব থাকিলে উহা জাহের করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। গোপন করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ। ঐরূপ মূল্যের আয়েব জাহের করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব। আয়েব জাহের না করিয়াই মালটা বিক্রি দিল তবে মালুম হওয়ার পর ফেরত দিতে পারে, ইহাকে খিয়ারে আয়েব বলা হয়। খিয়ারে আয়েবের জন্য ইজাব কবুলেরই সময় "আয়েব হইলে ফিরাইয়া দিব" ইহা বলা দরকার করে না। বলুক বা নাই বলুক আয়েব মালুম হওয়ার পর ক্রেতার ফিরাইয়া দেওয়ার অধিকার থাকিবে। জানার পর ইচ্ছা হয় পুরা দামে লইতে পারিবে অথবা ফেরত দিবে। ফিরাইয়া না দিয়া মূল্য কমাইয়া লইতে পারিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কবজার পূর্বেই ক্রেতা আয়েবের সন্ধান পাইয়াছে। এই অবস্থায় ক্রেতা নিজেই আকদ ফছখ করিতে পারে। কাজীর হুকুমের প্রয়োজন করে না, বিক্রেতার সাক্ষাতে শুধু এতটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, আমি আকদ ফছখ করিলাম বা রদ করিলাম অথবা বাতিল করিলাম। বিক্রেতা রাজী থাকুক বা নাই থাকুক, আকদ ফছখ হইয়া যাইবে। তবে খরিদা বস্তু কবজা করিয়া থাকিলে বিক্রেতার সম্মতি অথবা কাজীর হুকুম ছাড়া ফছখ হইবে না। (হেদায়া, আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা খরিদা বস্তু কবজা করিলে পর আয়েবের সন্ধান মিলিল এবং বিক্রেতার সম্মতিক্রমে আকদ ফছখ হইল, ইহা এই দুইজনের মধ্যকার ফছখ বটে এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ইহা নূতন বিক্রিরূপে সাব্যস্ত হইবে। এই ফছখের পর বিক্রিত বস্তুর ঘর অথবা জমিন হইলে শোফয়ার দাবী করা যায়। তবে কাজীর হুকুমে ফছখ হইয়া থাকিলে সবের জন্যই ফছখ, শোফয়ার দাবী চলিবে না। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- খিয়ারের আয়েবের জন্য এই সব শর্ত রহিয়াছে। (১) খরিদা বস্তুর ভিতর আয়েবটি আকদ অর্থাৎ বিক্রির ইজাব কবুলের সময়ই থাকিতে হইবে অথবা ইজাব কবুলের পর ক্রেতার কবজার পূর্বে আয়েব সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ক্রেতার কবজার পর যদি আয়েব সৃষ্টি হয় সেই জন্য খিয়ার হাছেল হইবে না। (২) ক্রেতা কবজা করিল তখনও তাহার নিকট উক্ত আয়েব বাকী থাকা। এখানে যদি উক্ত আয়েব না থাকে খিয়ার

থাকিবে না। (৩) আকদ অথবা কবজার সময় আয়েবের খবর ক্রেতার অজানা থাকা, আয়েবদার জানিয়া ক্রয় করিলে অথবা কবজা করিলে খিয়ার থাকিবে না। (৪) বিক্রেতা আয়েব হইতে নিজকে মুক্ত করে নাই যদি সে বলিয়া থাকে যে, আমি উহার কোন আয়েবের জিম্মাদার নহি। খিয়ার ছাবেত হইবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- গরু, মহিষ ইত্যাদি প্রাণী দুই তিন বার পলায়ন করিলে আয়েব নাই। ইহার চাইতে বেশী পলায়ন করা আয়েব। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- গরু, মহিষ, বকরী দুধ দেয় না অথবা নিজের দুধ নিজেই পান করে, এই সব আয়েব। জানোয়ারের কম খাওয়াও আয়েব, কাজের সময় গরু শুইয়া পড়ে ইহাও আয়েব। গাধা ক্রয় করিলে সে আস্তে আস্তে চলে উহাতে ফেরত দিতে পারিবে না। তবে যদি দ্রুত চলার শর্ত করিয়া থাকে তবে ফেরত দিতে পারে। মোরগ ক্রয় করিল কিন্তু সেইটা অসময় ডাক দেয়। এই দোষে ফেরত দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বকরী ক্রয় করিয়া দেখিল যে, উহার কান কাটা ইহা আয়েব। ঐরূপ কোরবানীর জন্য কোন জানোয়ার ক্রয় করিল, যাহার কান কাটা অথবা উহার ভিতর এমন কোন আয়েব আছে যাহার কারণে কোরবানী হয় না, উহা ফেরত দিতে পারে। তবে কোরবানীর জন্য না হইলে ফেরত দিতে পারিবে না। তবে যদি উহা আয়েব বলিয়া প্রথা থাকে ফেরত দিতে পারিবে। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হইলে ক্রেতা বলে আমি কোরবানীর জন্য ক্রয় করিয়াছি কিন্তু বিক্রেতা এনকার করে। ঐ সময়টা যদি কোরবানীর হয় এবং ক্রেতা কোরবানী দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হয় তবে ক্রেতার কওলই গ্রহণযোগ্য। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- গরু অথবা বকরী নাজাসাত (পায়খানা) খায়। যদি ইহা উহার অভ্যাসে পরিণত হয় তবে ইহাও আয়েব। সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার মাত্র হইয়া থাকে তবে ইহা আয়েব নহে। কোন প্রাণী মাছি খায় যদি কোন কোন সময় ইহা হয় তাহা আয়েব নহে এবং অধিকাংশ সময় খাইলে আয়েব। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- জানোয়ারের পা দুইটা নিকটে নিকটে কিন্তু রাণের মধ্যে ফাছেলা, ইহা আয়েব। দড়ি ছিড়া অথবা কোনরূপ গলা হইতে ভগ্‌ঘা বাহির করিয়া ফেলা আয়েব। ঘোড়া অবাধ্য, খাড়া হইয়া যায়, লম্ফ দেয়, লেগাম লাগানোর সময় ঔদ্ধত্য করে, লাগাইতে দেয় না, চলার সময় উভয় পায়ের গোছা অথবা পা দুইখানা ঘর্ষণ খায় এই সবই আয়েব। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ঘোড়া ক্রয় করিয়া দেখিল যে, উহার বয়স বেশী খিয়ারে আয়েবের কারণে উহা ফেরত দিতে পারে না। তবে কম উমরের শর্ত করিয়া থাকিলে ফেরত দিতে পারে। গরু ক্রয় করিল কিন্তু উহা ক্রেতার নিকট থেকে ভাগিয়া বিক্রেতার নিকট চলিয়া যায়। ইহা আয়েব নহে। অর্থাৎ বেশী যদি না ভাগে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- মোজা অথবা জুতা ক্রয় করিল। উহা পায় লাগে না, ইহাতে ফেরত

দিতে পারে। ছোট বা রাগ জুতা ক্রয় করিল, বিক্রেতা বলিল পরে ঠিক হইয়া যাইবে। ইহার একদিন পর পরিল কিন্তু ঠিক হল না এখন সে ফেরত দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- নাপাক কাপড় ক্রয় করিল, তবে নাপাকের কথা ক্রেতার মালুম ছিল না, এখন মালুম হইল। কাপড়টা ধুইলে যদি খারাপ না হয় ফেরত দিতে পারিবে না। খারাপ হইলে ফেরত দিতে পারিবে। কাপড়ে তৈলের চিকনাই লাগিয়া থাকিলে সর্বাবস্থায়ই ফেরত দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- খরিদা ঘরের দরওয়াজার উপর লেখা দেখিল যে, এই ঘর অমুক মসজিদের জন্য ওয়াকফ। শুধু এতটুকু লেখার দ্বারা ফেরত দিতে পারিবে না। যতক্ষণ অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা ওয়াকফের প্রমাণ না হয়। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ঘর ও জমিন ক্রয় করিল লোকেরা উহাকে মনহুছ (অশুভ) বলে ইহাতে ফেরত দিতে পারে। যদিও এই ধরনের খিয়ালের কোন এ'তেবার নাই। কিন্তু এহেন বস্তুর বিক্রির সময় ক্রেতার অভাব হয়, অতএব ইহাও আয়েব। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ফল অথবা তরকারীর টুকরা ক্রয় করিল উহার নীচে ঘাস পূর্ণ পাইলে ফেরত দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- কুরআন মজিদ অথবা কিতাব খরিদ করিল। কতেক স্থানে অক্ষর লেখা হয় নাই, ছাপাও উঠে নাই। ইহাতে উহা ফেরত দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- আয়েবের সন্ধান পাওয়ার পর ক্রেতা খরিদা বস্তুর ভিতর মালিকানা হস্তক্ষেপ করিলে তাহার ফেরত দেওয়ার হক থাকে না। পশু ক্রয় করিল, সেইটা রুগ্ন ছিল উহার চিকিৎসা করিল, অথবা নিজের কাজের জন্য উহার পিঠে আরোহণ করিল, ইহাতে ফেরত দিতে পারিবে না। একটা রোগ ছিল বিক্রেতা যাহার জিম্মাদারী গ্রহণ করে নাই উহার চিকিৎসা করিল এবং অন্য আর একটা রোগ যাহার উল্লেখ ছিল না প্রকাশ পাইল। শুধু ইহার কারণে ফেরত দিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ফেরত দেওয়ার জন্য পশুটার উপর সওয়ার হইল, অথবা উহার উপর সওয়ার হইয়া পানি পান করানোর জন্য নিয়া গেল। অথবা উহার খাদ্য ক্রয়ের জন্য গেল, যদি ঠেকার কারণে উহাতে বাধ্য ছিল তবে আয়েবের সম্মতি ধরা যাইবে না। অন্যথা সম্মতি বুঝা যাইবে। ফেরত দিতে পারিবে না। খরিদা ঘরে আয়েবের সন্ধান পাওয়ার পরও বসবাস করিল। অথবা উহার মেরামত করিল অথবা উহা ভাঙ্গিয়া দিল এখন ফেরত দিতে পারিবে না। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা খরিদা বস্তু বিক্রি দিল, অথবা আজাদ করিয়া দিল অথবা হেবা দিয়া কবজা করাইয়া দিল। ইহার পর আয়েবের সন্ধান পাইল, এই অবস্থায় উহা ফেরত দিতে পারিবে না, ক্ষতিপূরণও লইতে পারিবে না। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- বকরী অথবা গাভী খরিদ করিয়া উহার দুধ দোহাইয়া ব্যবহার করিল। তৎপর আয়েবের সন্ধান মিলিল। এখন ফেরত দিতে পারিবে না। তবে ক্ষতিপূরণ

লইতে পারিবে। গরু, বকরী বাচ্চাসহ ক্রয় করিল এবং আয়েবের সন্ধান পাইল, ইহার পর বাচ্চায় দুধ পান করিল, বাচ্চা নিজে নিজে পান করুক অথবা উহা ছাড়িয়া দিয়াছিল পর পান করিয়া থাকুক ফেরত দিতে পারিবে। তবে ক্রেতা যদি দুধ দোহাইয়া থাকে চাই সে দুধ নিজে পান করুক বা বাচ্চাকে পান করাইয়া থাকুক খরিদা পশুটা ফেরত দিতে পারিবে না। কেননা আয়েবের সন্ধান পাওয়ার পর দোহান সম্মতিরই প্রমাণ।

(আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- শস্য ক্রয় করিয়া উহা হইতে কিছু খাইল অথবা বিক্রি দিল। তৎপর আয়েবের সন্ধান মিলিল যাহা খাইয়াছে উহার ক্ষতিপূরণ লইবে বাকীটা ফেরত দিবে। কিন্তু যাহা বিক্রি দিয়াছে উহার ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না। আটা ক্রয় করিয়া উহা হইতে কিছু আটা মজিয়া রুটি পাকাইল। তৎপর জানা হইল যে, উহা তিতা যাহা পাকাইয়াছে উহার ক্ষতি লইতে পারে বাকীটা ফেরত দিতে পারে। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- কাপড় খরিদ করিয়া কাটাইল এবং সিলাইর পূর্বেই উহার আয়েব জানা হইল। এই অবস্থায় উহা ফেরত দিতে পারিবে না; বরং ক্ষতিপূরণ লইতে পারে। তবে বিক্রেতা কাটা অবস্থায় ফেরত লইতে যদি রাজী হয়। তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না; এবং ক্রয় করিয়াই যদি বিক্রি দিয়া দেয় তাহা হইলে কিছুই লইতে পারিবে না; এবং কাটার পর সিলাইয়াও থাকিলে পর আয়েব মালুম হইল এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ লইতে পারে। বিক্রেতা ক্ষতিপূরণ না দিয়া যদি ফেরত লইতে চায় তবুও ফেরত লইতে পারিবে না। (হেদায়া)

মাসয়ালাঃ- কাপড় খরিদ করিয়া নাবালেগ বাচ্চার জন্য কাটাইল এবং আয়েব মালুম হইল। এই অবস্থায় ফেরত দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ লওয়া কোনটাই পারিবে না। তবে বালেগ ছেলের জন্য কাটাইয়া থাকিলে ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে।

(হেদায়া, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতার নিকট বিক্রিত বস্তুর ভিতর কোন নূতন আয়েবের সৃষ্টি হইল। উক্ত আয়েব ক্রেতার কর্মে হউক বা আসমানী বিপদের কারণেই হউক ফেরত দিতে পারিবে না। অবশ্য ক্ষতির বিনিময় লইতে পারে; এবং বিক্রেতার দ্বারা যদি উক্ত নূতন আয়েব সৃষ্টি হয় তখনও ফেরত দিতে পারিবে না; বরং পূর্বের এবং পরের উভয় আয়েবের দ্বারা যাহা ক্ষতি হইয়াছে উহার বিনিময় আদায় করিতে পারিবে; এবং তৃতীয় কোন লোকের দ্বারা যদি উক্ত আয়েবের সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে প্রথম আয়েবের ক্ষতি বিক্রেতা হইতে লইবে এবং নূতন আয়েবের ক্ষতি উক্ত লোকের থেকে আদায় করিবে। বিক্রির পর কবজার পূর্বে বিক্রেতার দ্বারা অথবা বিক্রিত বস্তুর নিজেরই দ্বারা অথবা আসমানী বিপদের কারণে যদি নূতন আয়েবের সৃষ্টি হয় তখন ক্রেতার ইচ্ছা হয় সে বিক্রয় বাতিল করিয়া দিবে। অথবা লইয়া উহার ভিতর যাহা ক্ষতি হইয়াছে উহার বিনিময়ে মূল্য কিছু কমাইয়া দিবে এবং তৃতীয় লোকের দ্বারা যদি উক্ত আয়েবের সৃষ্টি

হয় তখনও খরিদা বস্তু গ্রহণ করা বা না করা তাহার ইচ্ছা। যদি উহা গ্রহণ করে তাহা হইলে উহার ক্ষতি উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির থেকেই গ্রহণ করিতে পারে। তবে ক্রেতার কর্মদ্বারা যদি উক্ত আয়েবের সৃষ্টি হয় তবে পুরা মূল্য দিয়া উহা লইতে হইবে এবং ক্ষতির দাবী করিতে পারিবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যে বস্তু ফেরত দেওয়াতে মজদুরী দিতে হয় সেই রকমের মাল ফেরত দিতে যেখানে আকদ বা ইজাব কবুল হইয়াছে সেইখানে পৌছাইয়া দেওয়া ক্রেতার কর্তব্য। সেখানে পৌছাইতে যত মযদুরী লাগে তাহা ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- পশু ক্রয় করিয়া যবেহ করার পর দেখিল যে, উহার নাড়ী-ভুড়ি খারাপ হইয়াছিল। ইহাতে ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না এবং যবেহের পূর্বে জানা হইলে পর যবেহ করিয়া থাকিলেও ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না। তবে যদি বুঝে যে, যবেহ না করিলে মরিয়া যাইবে এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ লইতে পারে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- খরিদা বস্তুর ভিতর কিছু বাড়াইয়া দিল যেমন কাপড় ছিল উহা সিলাই করিল, অথবা রং দিল, অথবা ছাতুর সঙ্গে ঘি চিনি ইত্যাদি বিক্রি করিল, অথবা জমিনে গাছ লাগাইল, ঘর তৈয়ার করিল অথবা উহা বিক্রি দিল; যদিও আয়েব জানার পর বিক্রি দিয়া থাকে অথবা খরিদা বস্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এইসব অবস্থায় ক্ষতিপূরণ লইতে পারে কিন্তু ফেরত দিতে পারিবে না। ফেরত এর উপর যদি উভয়েই সম্মতও হয় তবুও কাজী ফেরত দেওয়া হুকুম দিতে পারিবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ডিম খরিদ করার পর ভাঙ্গিয়া দেখিল যে, উহা পচা সম্পূর্ণ দাম ফেরত লইবে। খরবুজা, তরমুজ, খিরা খরিদ করার পর কাটিয়া দেখিল যে, উহা খারাপ, অথবা বাদাম আখরোট ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া দেখিল যে, উহা খারাপ, তবে খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কাজের উপযুক্ত অন্ততঃ পশুকে উহা খাওয়ান যাইতে পারে। এই অবস্থায় ফেরত দিতে পারিবে না। ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে। তবে বিক্রেতা কাটা বা ভাঙ্গা অবস্থায় যদি ফেরত নিতে রাজী হয়, তাহা হইলে ফেরত দিবে ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না এবং আয়েব দেখার পরও যদি কিছু খাইয়া ফেলে তখনও ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে না এবং যদি মাত্র আস্বাদন করিয়া থাকে এবং আয়েব মালুম হওয়ার পর রাখিয়া দিল কিছুই খাইল না এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ লইতে পারে এবং কাটা বা ভাঙ্গার পূর্বেই যদি ক্রেতার আয়েব মালুম হইল তখন ঐ অবস্থায় ফেরত দিবে, কাটিলে ভাঙ্গিলে ফেরত দিতে পারিবে না এবং কাটা, ভাঙ্গার পর মালুম হইল যে, এইসব বস্তু একেবারে অকেজো। যেমন- খিরা তিক্ত, বাদাম আখরোটের ভিতর শাঁস নাই, তরমুজ-খরবুজা পচা তাহা হইলে সম্পূর্ণ দাম ফেরত লইবে, বায়ে বাতিল। (রদ্দে মোহতার, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- গম ইত্যাদি শস্য ক্রয় করিয়া দেখে যে, উহা মাটি মিশ্রিত সাধারণতঃ মাটি যাহা থাকে যদি তাহাই হয় ফেরত দিতে পারিবে না এবং উহার চাইতে

বেশী হইলে সমস্তই ফেরত দিবে। গম রাখিয়া শুধু মাটিগুলি ফেরত দিতে পারিবে না।

(আলমগীরী, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- গমের সঙ্গে কিছু মাটি ছিল যাহা উড়িয়া যাওয়ার কারণে ওজনে কিছু কম হইল, অথবা গমের ভিতর আদ্রতা ছিল শুকাইয়া ওজন কমিয়াছে, ফেরত দিতে পারিবে না। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা খরিদা বস্তু কবজা করার পর আয়েবের দাবী করিল। এই অবস্থায় মূল্য আদায়ের জন্য তাহাকে মজবুর (বাধ্য) করিতে পারিবে না বরং আয়েব প্রকাশের সাক্ষী ক্রেতার থেকে চাওয়া হইবে এবং সাক্ষী না হইলে বিক্রেতাকে কছম দেওয়া হইবে এবং বিক্রেতা যদি আয়েব না থাকার কসম করে তখন মূল্য দেওয়ার হুকুম হইবে। ক্রেতা যদি প্রথমে বলে যে, আমার সাক্ষী নাই তারপর বলে যে, সাক্ষী হাজির করিব এই অবস্থায় কবুল করা হইবে এবং ক্রেতার নিকট যদি সাক্ষী না থাকে এবং বিক্রেতা কসম করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আয়েব আছে বলে হুকুম হইবে। (রদ্দে মোহতার, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতার সাক্ষী অথবা বিক্রেতার হলফ-এর দরকার হইবে, যখন আয়েবটা গোপনীয় হয়, যেমন পলায়ন করা, চুরি করা। তবে যদি আয়েবটা প্রকাশ্য হয় যেমন বধীর, বোবা, বয়রা হয় অথবা উহার আঙ্গুল অতিরিক্ত বা কম। এই অবস্থায় সাক্ষী এবং কসমের প্রয়োজন নাই। তবে বিক্রেতা যদি বলে যে, ক্রয়ের সময় ক্রেতার ইহা জানা ছিল। অথবা ক্রয়ের পর সে আয়েবের উপর সম্মত হইয়াছিল। অথবা আমি আয়েব হইতে জিম্মা খালাছ করিয়াছিলাম। এই অবস্থায় ইহার পরও বিক্রেতার সাক্ষী হাজির করিতে হইবে। সাক্ষী হাজির করিতে না পারিলে ক্রেতাকে কসম দিতে হইবে। কসম খাইলে ফেরত দেওয়া যাইবে, অন্যথা ফেরত দিতে পারিবে না।

(দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- যে সব আয়েবের সন্ধান করিতে চিকিৎসকের দরকার। যেমন-প্লীহা ইত্যাদি কোন গোপনীয় রোগ। একজন সৎ চিকিৎসক যদি এই রোগ হইয়াছে বলে বর্ণনা দেয়, তবে ইহা গ্রহণযোগ্য। তবে উক্ত রোগ বিক্রেতার নিকট থাকিতে ছিল কিনা, উহার জন্য দুইজন সৎ চিকিৎসকের সাক্ষীর দরকার হইবে এবং যে সব আয়েবের সন্ধান মেয়েলোকেরাই দিতে পারে, সেখানে একজন মেয়েলোকের কথার দ্বারাই আয়েবের প্রমাণ হইয়া যাইবে। তবে বায়ে ফছখ করার জন্য দরকার হইবে বিক্রেতাকে হলফ দেওয়া, সে যদি কসম করে যে, আমার নিকট এই আয়েব ছিল না, তাহা হইলে ফেরত দিতে পারিবে না, কসম না করিলে ফেরত দিবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- যদি প্রকাশ্য আয়েব হয় এবং বিক্রির মুদ্দতের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে এমন স্থানেও সাক্ষী এবং হলফের প্রয়োজন হয় না। তবে এই মুদ্দতের মধ্যে যদি সৃষ্টি হইতে পারে এমন আয়েব হয় এবং বিক্রেতা বলে যে, আমার

এখানে এই আয়েব ছিল না তখন সাক্ষী এবং হলফের দরকার হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- বিক্রিত বস্তুর কোন অংশের কেউ দাবী করিয়া নিজের হক প্রমাণ করিল। ক্রেতা যদি কবজা করিয়া না থাকে, তবে বাকী অংশ লওয়া না লওয়ার ভিতর তাহার এখতিয়ার থাকিবে। কবজা করিয়া থাকিলে মালটা কিমতী বা মেছলী যাহার তুল্য পাওয়া যায়, কোন ধরনের দেখিতে হইবে। যদি কিমতী হয় তখনও তাহার ইখতিয়ার রাখে বা ফেরত দেয় এবং সেই বস্তুটা যদি মিছলী হয় যাহার তুল্য দেশে পাওয়া যায় তাহা হইলে বাকীটা ফেরত দিতে পারিবে না; বরং যাহা হিস্যা তাহা লইবে এবং যাহা অন্য হকদারের সে তাহা লইয়া যাইবে; এবং দুইটা বস্তু ক্রয় করিয়া কবজা করিল অথবা এখনও কোন একটার কবজা হয় নাই। এই অবস্থায় কেউ একটার ভিতর নিজের কবজা সপ্রমাণ করিল। তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে সে অপরটাও লইতে পারে এবং বর্জন করিতেও পারে; এবং উভয়টার কবজা হইয়া থাকিলে তখন ইখতিয়ার থাকিবে না অর্থাৎ অপরটাও লওয়া জরুরী, ফেরত দিতে পারিবে না। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা পশুটা ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়া আসিল এবং ইহার জখম আছে, আমি উহা রাখিব না। বিক্রেতা বলে যে, ইহা ঐ জখম নহে যাহা আমার নিকট ছিল। সেইটা ভাল হইয়া গিয়াছে ইহা আর একটা। এই অবস্থায় ক্রেতার কওলই গ্রহণযোগ্য হইবে। (রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- দুইটা বস্তু একই আকদ দ্বারা ক্রয় করিল। যদি প্রত্যেক বস্তু একা একাই কাজে আসে যেমন দুইজন গোলাম, দুইখানা কাপড় এবং এখনও দুইখানা কবজা করে নাই। ইতিমধ্যেই একখানার আয়েবের সন্ধান পাওয়া গেল। এই অবস্থায় হয় দুইখানা ফেরত দিবে, না হয় দুইখানা গ্রহণ করিবে। তবে বিক্রেতা যদি একখানা ফিরাইয়া নিতে রাজী হয় তাহা হইলে একখানাও ফেরত দিতে পারে এবং উভয়খানা যদি কবজা করিয়া থাকে তবে যাহাতে আয়েব সেইটাই কবজা করিতে পারে। দুইখানা ফেরত দিতে হইলে বিক্রেতার সম্মতি দরকার হইবে এবং কবজার পূর্বে একটার আয়েবদার হওয়া মালুম হয় এবং সেইটাই কবজা করে তাহা হইলে দ্বিতীয়টা লওয়াও জরুরী হইবে। এবং দ্বিতীয়টা কবজা করিয়া থাকিলে তাহার ইখতিয়ার চাই উভয়টা গ্রহণ করুক অথবা উভয়টা ফেরত দেউক। যদি দুইটা এমন বস্তু যাহা এক সঙ্গে কাজে আসে শুধু একটা দ্বারা কাজ হয় না। যেমন- মোজা, জুতার জোড়া। এই অবস্থায় দুইটা কবজা করুক বা একটাই কবজা করুক উভয় অবস্থায় একই হুকুম। লইলে দুইটা লইবে, ফেরত দিলে দুইটা ফেরত দিতে হইবে।

(খানিয়া, ফতহুল কাদীর, দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- কোন বস্তু বিক্রয় করিল এবং বিক্রেতা বলিয়াছিল যে, আমি প্রত্যেক আয়েব হইতে (برئ الزمه) বা অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলাম। এইরূপ বায় শুদ্ধ এবং

উক্ত বিক্রিত বস্তুর ফেরত দেওয়ার হক বাকী থাকে না। ঐরূপ বিক্রেতা যদি বলিয়া দেয় যে, যদি লইতে হয় লও ইহার ভিতর যত রকমের আয়েব আছে, ইহা মাটি অথবা ইহা ভালভাবে দেখিয়া লও যেমনই হউক আমি ফেরত লইব না। ইহা দ্বারা আয়েব হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। এখন ক্রেতা সর্বরকমের আয়েব হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। চাই আয়েবটা আকদ বা ইজাব কবুলের সময় থাকুক বা বিক্রয়ের পর কবজার পূর্বেই হউক।

(দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- বকরী, গরু, মহিষের দুধ দুই এক দিন না দোহাইয়া ঐটা এই বলিয়া বিক্রি দিল যে, উহার দুধ বেশী এবং দোহাইয়া দেখাইয়াও দিল। ক্রেতা খাইয়া ক্রয় করিয়া দুধ দোহাইয়া দেখিল যে, এতটা নহে, এখন ঐটা ফেরত দিতে পারিবে না। তবে যাহা ক্ষতি হইয়াছে বিক্রেতা হইতে লইতে পারিবে। (দুররুল মোখতার)

মাসয়ালাঃ- ক্রেতা ফেরত দিতে চাহিল। তখন বিক্রেতা বলিল ফেরত দিও না। আমার থেকে এত টাকা লইয়া যাও এবং ইহার উপর আপোষ হইল, ইহা জায়েয। ইহার অর্থ হইল এই যে, বিক্রেতা মূল্য হইতে অতটা কম করিয়া দিল। বিক্রেতা ফেরত লইতে অস্বীকার করিল তখন ক্রেতা বলিল যে, এত টাকা আমার থেকে লও এবং বিক্রিত বস্তু ফেরত লও এই আপোষ নাজায়েয। এই টাকা বিক্রেতার জন্য সুদ এবং ঘুষ হইবে। তবে ক্রেতার এখানে যদি কোন নূতন আয়েবের সৃষ্টি হয় অথবা বিক্রেতা উক্ত আয়েব তাহার কাছে ছিল না দাবী করে এ অবস্থায় এই আপোষ জায়েয। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে যে, আয়েব দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আদায় করিবে। উহার ছুরত এই যে, উক্ত বস্তুটা যাহার দ্বারা পরীক্ষা করিবে তাহাদের নিকট হাজির করিবে, তাহারা উহার মূল্য ঠিক করিবে যে, আয়েব না থাকিলে উহার মূল্য ছিল এত, এখন আয়েব থাকার কারণে হইবে এত। দুইটা মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ক্রেতা বিক্রেতার থেকে আদায় করিবে। যেমন- আয়েবের কারণে মূল্য আট টাকা এবং যদি আয়েব না হইত তবে উহার মূল্য হইত দশ টাকা। এখানে দুই টাকা বিক্রেতার থেকে আদায় করিবে।

মাসয়ালাঃ- খরিদা পশু কবজার পর আয়েবের সন্ধান পাইল উহা বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য লইয়া চলিল, ইতিমধ্যে রাস্তায় উহা মারা গেল। এখানে ক্রেতারই পশু মারা গিয়াছে। অবশ্য সাক্ষী দ্বারা যদি আয়েব প্রকাশ করিয়া দেয়, তবে আয়েবের ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। (আলমগীরী)

মাসয়ালা- এক ব্যক্তি গাভীন গরুর পরিবর্তে বলদ ক্রয় করিল এবং প্রত্যেকেই কবজাও করিল, গাভীন গরুটার বাচ্চা পয়দা হইল এবং অপর জন দেখিল যে, বলদ গরুটার ভিতর আয়েব রহিয়াছে। সেইজন্য সে উহা ফেরত দিল। ওদিকে গাভীটার বাচ্চা পয়দা হওয়ার কারণে উহা বৃদ্ধি হওয়াটা ফেরত দেওয়া হইবে না বরং গাভীটার

মূল্য যাহা হইবে তাহাই ফেরত দেওয়া হইবে। (আলমগীরী)

মাসয়ালাঃ- জমিন ক্রয় করিয়া সেইখানে মসজিদ বানাইল। তারপর আয়েবের সন্ধান মিলিল। এই অবস্থায় উহা ফেরত দিতে পারিবে না। যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহাই লইবে। জমিন ওয়াকফ করিলে তখনও হুকুম ইহাই। ফেরত দিতে পারিবে না। ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে। (খানিয়া)

মাসয়ালাঃ- কোন বস্তু গাবনে ফাহেশের সহিত ক্রয় করিল। উহার ছুরত দুইটা ধোকা দিয়া ক্ষতি করিয়াছে অথবা ধোকায় নহে। গাবনে ফাহেশের সাথে ধোকাও যদি দিয়া থাকে, তবে ফেরত দিতে পারিবে, অন্যথা নহে। গাবনে ফাহেশের অর্থ এই যে, উহার ভিতর এতই লোকসান যে, মূল্য নির্দ্ধারণকারীগণের আন্দাজও বাহিরে। যেমন- এক বস্তু দশ টাকায় ক্রয় করিল কেহ উহার মূল্য পাঁচ টাকা বলে, কেহ বলে ছয় টাকা এবং কেউ বলে সাত টাকা, এই অবস্থায় দশ টাকায় কিনিলে গাবনে ফাহেশ হইল। তবে যদি উহার মূল্য কেহ বলে আট টাকা, কেহ বলে নয় টাকা, আবার কেহ বলে দশ টাকা তাহা হইলে ইহা গাবনে ফাহেশ হইবে না বরং "গাবনে ইয়াসীর" বা অল্প লোকসান হইবে। ধোকার ছুরত তিনটা। কখন কখন বিক্রেতা ক্রেতাকে ধোকা দেয়, পাঁচ টাকার বস্তু দশ টাকায় বিক্রি দেয় এবং কখন কখন ক্রেতা বিক্রেতাকে ধোকা দেয়, যেমন দশ টাকার বস্তু পাঁচ টাকায় ক্রয় করে। আবার কখন কখন দালালগণ ধোকা দেয়। এই তিন ছুরতেই যাহার গাবনে ফাহেশের সহিত ক্ষতি হইয়াছে সে ফেরত দিতে পারে। আজনবী নূতন বা তৃতীয় লোকে যদি ধোকা দিয়া থাকে তাহা হইলে ফেরত দেওয়া যাইবে না। (দুররুল মোখতার, রদ্দে মোহতার)

মাসয়ালাঃ- কেহ জমিন অথবা ঘর ক্রয় করিল এবং বিক্রেতাকে ধোকা দিয়া ক্ষতি করিয়াছে। যেমন- হাজার টাকার বস্তু পাঁচ শত টাকায় ক্রয় করিল। এই অবস্থায় হক্কে শোফয়ার দাবীতে উক্ত বস্তু শফী ক্রেতার থেকে নিয়া গেল। এই অবস্থায় বিক্রেতা শফী হইতে ফেরত লইতে পারিবে না। কেননা শফী তাহাকে ধোকা দেয় নাই-ধোকা দিয়াছে ক্রেতা। (রদ্দে মোহতার)

পঞ্চদশ অধ্যায়

[হজ্জের মাসয়ালা]

হজ্জের দাওয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ الاية

হযরত নূহ (আঃ) এর যমানার তুফানে যখন সমগ্র পৃথিবী বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখন বায়তুল্লাহকে (আল্লাহর ঘরকে) আল্লাহ তায়ালা আসমানে উঠাইয়া নিয়াছিলেন। তখন হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যমানা পর্যন্ত ২৬৪০ বৎসর যাবত বায়তুল্লাহ ও উহার স্থান নিশ্চিহ্ন ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) কে সঙ্গে নিয়া আল্লাহ তায়ালার হুকুমে বায়তুল্লাহর পুনঃ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিয়া আল্লাহর হুকুমে পৃথিবীর সকলকে বায়তুল্লাহর হজ্জের দাওয়াত দিয়াছিলেন। তিনি 'ছবীর' নামক মতান্তরে আবু কোবায়েছ পাহাড়ের চুড়ায় উঠিয়া তখন পৃথিবীতে যত লোক ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা আসিবে সকলকে উচ্চৈস্বরে দাওয়াত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা সকলে বায়তুল্লায় হজ্জ করিতে আস।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াত সকল লোক এমনকি যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসিবে সকলে আলমে আরওয়াহে বসিয়া শুনিয়াছিল। যাহারা তাঁহার এই দাওয়াত যতবার লাব্বায়েক বলিয়া জওয়াব দিয়াছিল তাহারা ততবার বায়তুল্লার হজ্জ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। (কাশশাফ, হাক্কানী , আইনী ও শরহে বুখারী শরীফ)

হজ্জের ফজীলত

হজ্জ ইসলামী শরীয়তের একটি প্রধান রোকন বা স্তম্ভ। ইহার ফজিলত অসংখ্য। হজ্জের দ্বারা হজ্জকারীর পূর্বকৃত গুনাহ সমূহ মাফ হইয়া যায়।

ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আমর বিন আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা আমার মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে হাত দিয়া এখনই ইসলাম গ্রহণ করিব। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হাত আমার দিকে প্রসারিত করিলে আমি আমার হাত গুটাইয়া নিলাম। এতদ্দর্শনে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, হে আমর! কি করিলে? তখন আমি বলিলাম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একটি শর্ত করিতে চাই। হুযুরে পাক ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যে কোন শর্ত ইচ্ছা কর তাহা করতে পার। আমি বলিলাম আমার পূর্বকৃত সকল গুনাহ যেন মাফ হইয়া যায়। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- হে আমর! তুমি কি জান না? ইসলাম পূর্বের যাবতীয় গুনাহ মিটাইয়া দেয় এবং হিজরত পূর্বকৃত সকল গুনাহ মোচন করিয়া দেয় এবং হজ্জ পূর্বকৃত যাবতীয় গুনাহ ধ্বংস করিয়া দেয়।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- "বেহেশ্‌তই মাব্‌রূর (মকবুল) হজ্জের প্রতিদান।"

হজ্জে মাব্‌রূর (মকবুল)

যে হজ্জ আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়াছে তাহাকেই হজ্জে মাব্‌রূর বলে। কেহ বলিয়াছেন, যে হজ্জ আদায় করার মধ্যে কোন প্রকার গুনাহের কার্য না হয় তাহাকে হজ্জে মাব্‌রূর বলে। আবার কেহ বলিয়াছেন, যে হজ্জের ভিতরে রিয়া ও ছোম্‌য়া না হয়। অর্থাৎ লোক দেখান ভাব ও সুনাম অর্জন উদ্দেশ্য না থাকে এবং যে হজ্জে কোন রকম অশ্লীল কথা-বার্তা ও গুনাহের কার্য সংঘঠিত না হয়, তাহাকেই হজ্জে মাব্‌রূর বলে। কাহারও মতে, যে হজ্জের পরে কোন প্রকার গুনাহের কার্য করা হয় নাই উহাকেই হজ্জে মাব্‌রূর বলা হয়। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া হজ্জ আদায় করতঃ প্রত্যাবর্তন করাকেই হজ্জে মাব্‌রূর বলে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা পৌনে পৌনিক হজ্জ ও ওমরা আদায় করিও। কেননা কর্মকারের দমা যে প্রকার স্বর্ণ রোপ্য ও লৌহকে পোড়াইয়া পরিস্কার ও খাঁটি করিয়া দেয় তদ্রূপ হজ্জ ও ওমরা মানুষের দারিদ্র ও গুনাহ সমূহকে বিদূরিত করিয়া দেয়। এবং বেহেশ্‌তই হইতেছে হজ্জে মাব্‌রূরের প্রতিদান বা পুরস্কার। (তিরমিজী)

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস ও তৎসম্পর্কীয় কথা-বার্তা ও সর্ব প্রকার গুনাহের কার্য হইতে বিরত থাকিয়া হজ্জ আদায় করে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির পূর্বকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। (তিরমিজী)

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস ও যাবতীয় গুনাহের কার্য হইতে বিরত থাকিয়া হজ্জ আদায় করিল, সে যেন সদ্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। (মুসলিম)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হজ্জ আদায়কারীর যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং সে যিলহজ্জ, মহরম, ছফর ও রবিউল আউয়ালের ২০ তারিখ পর্যন্ত যাহাদের জন্য মা'ফী চাহিবে তাহাদের গুনাহও মা'ফ হইয়া যাইবে। (এহইয়াউল উলুম)

হজ্জ কাহার প্রতি ফরজ

পঞ্চম হিজরীতে মতান্তরে ষষ্ঠ অথবা নবম হিজরীতে হজ্জ ফরজ হইয়াছে। জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরজ। যাকাতের মত হজ্জ ফরজ হইবার জন্য কোন নির্দ্ধারিত নেছাব নাই; বরং যে যেখানে বসবাস করে সেখান হইতে মক্কা শরীফ যাইয়া হজ্জ আদায় করিয়া প্রত্যাবর্তন সময়কাল পর্যন্ত পোষ্যদের ভরণ পোষণের খরচ বাদে যাতায়াতের সঙ্গতি ও সামর্থ থাকিলেই তাহার প্রতি হজ্জ আদায় করা ফরজ হয়।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

হজ্জ ফরজ হইবার জন্য ছহীহ কওল মতে শর্ত সাতটি। যাহার ভিতরে এই শর্তগুলি পাওয়া যাইবে, তাহার জন্য হজ্জ করা ফরজ। আর যাহার মধ্যে এই শর্তাবলী পাওয়া যাইবে না তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ নহে।

১ম শর্তঃ মুসলমান হওয়া। **২য় শর্তঃ** বালেগ হওয়া। **৩য় শর্তঃ** সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া অথাৎ উম্মাদ বা পাগল না হওয়া। **৪র্থ শর্তঃ** স্বাধীন হওয়া, যেহেতু ক্রীত দাস-দাসীর উপর হজ্জ ফরজ হয় না। **৫ম শর্তঃ** মক্কা শরীফ যাতায়াতের ধন-সম্পদ ও যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা। **৬ষ্ঠ শর্তঃ** হজ্জের সময় হওয়া। **৭ম শর্তঃ** হজ্জ ফরজ হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া। অতএব যে মুসলমান ব্যক্তি দারুল হরবে থাকিয়া হজ্জ ফরজ হওয়া সম্পর্কে জানিতে পারে নাই তাহার উপর হজ্জ ফরজ নহে। কিন্তু দারুল ইসলামে থাকিয়া অজ্ঞতার কারণে তাহার ওজর গৃহীত হইবে না।

উপরোক্ত সাতটি শর্ত সম্পূর্ণ যে পুরুষ বা নারীর মধ্যে পাওয়া যাইবে, তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত সমূহের আনুষঙ্গিক মাসায়েল

মাসয়ালাঃ- কোন অমুসলমান হজ্জ করিয়া মুসলমান হইলে উক্ত হজ্জ ধর্তব্য হইবে না। হজ্জের শর্তাবলী তাহার ভিতরে পাওয়া গেলে পুনঃ হজ্জ করিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- যদি কোন মুসলমান তাহার ফরজ হজ্জ আদায় করিয়া কাফের হইয়া যায় এবং পুনরায় মুসলমান হয়, তবে তাহার মধ্যে হজ্জের শর্তাবলী পুনঃ পাওয়া গেলে তাহার এই ফরজ হজ্জ আবার আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন এক ব্যক্তির নিকট ঋণ পরিশোধ করার ও পরিবার বর্গের খোরপোষ বাদ দেওয়ার পর মক্কায় যাতায়াতের জন্য নগদ টাকা থাকে না। কিন্তু অনেক ঘর, মাল-পত্র, জমি ও বিক্রেয়োপযোগী দ্রব্যাদি থাকে যথা ব্যবসার দ্রব্য ও কৃষিজাত মৌজুদ মাল। এখন ঐ ব্যক্তির মৌজুদ দ্রব্যাদি হইতে তাহার আবশ্যকীয় ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাব-পত্র, স্বীয় জীবন যাপন উদ্দেশ্যে অবলম্বিত পেশা সংক্রান্ত

আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও জীব-জন্তু এবং আলেম হইলে দ্বীনি কিতাবাদী ও যে পরিমাণ জমির ফসলে বার্ষিক খোরপোষ চলিতে পারে সে পরিমাণ জমি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা বিক্রয় করিলে যদি হজ্জের আবশ্যক পরিমাণ টাকা হয়, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ।

মাসয়ালাঃ- যে ব্যক্তি আলেম নয় কিন্তু তাহার নিকট অনেক কিতাব মৌজুদ আছে যাহা বিক্রি করিলে হজ্জের খরচ পরিমাণ টাকা সংগ্রহ হয়, তবে তাহার প্রতি হজ্জ করা ফরজ হইবে।

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তির নিকট হজ্জের মওসুমে হজ্জের খরচ পরিমাণ নগদ টাকা নাই। তাহার এত পরিমাণ জমি-জমা আছে যে, তাহা হইতে কতক জমি বিক্রি করিলে তাহার হজ্জের খরচ হইয়া যায় এবং যে পরিমাণ জমি অবশিষ্ট থাকে তাহাতে আয়ের দ্বারা তাহার ও পরিবারের সকলের জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে; এবং তাহাকে জমি বিক্রি করিয়া হজ্জ আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- হারাম উপার্জন দ্বারা মালদার হইলে ঐ মালদ্বারা হজ্জ ফরজ হইবে না। তবে কেহ হারাম মালদ্বারা ফরজ হজ্জ আদায় করিলে উহাতে তাহার ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।

মাসয়ালাঃ- হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য হজ্জের মৌসুম হওয়ার যে একটি শর্ত আছে উহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনকে হজ্জের মওসুম বলে অথবা মক্কা শরীফের বহির্দেশ বাসীগণ দূরত্ব হিসাবে সাধারণত ঃ যে সময় হজ্জের জন্য রওয়ানা হইয়া থাকে সেই সময়ই তাহাদের জন্য হজ্জের মওসুম। যথা- পাকিস্তানী, হিন্দুস্তানী ও বাংলাদেশী হজ্জ গমনেচ্ছুগণ সাধারণতঃ রমজানের পূর্বে শাবান মাস হইতে যিলক্বদ মাস পর্যন্ত জাহাজযোগে হজ্জ করিতে রওয়ানা হইয়া থাকে। এই সময়ই তাহাদের জন্য হজ্জের মওসুম ধরা হইবে।

মাসয়ালাঃ- হজ্জ গমনেচ্ছুদের কাফেলা চলিয়া যাওয়ার পর কিংবা হজ্জে যাওয়ার জন্য জাহাজের সিট সংগ্রহ করার নিয়মিত সময় চলিয়া যাওয়ার পর কেহ মালদার হইলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ নহে।

মাসয়ালা- অর্থাভাবে কোন লোক পদব্রজে মক্কা শরীফ পৌছিল অথচ তখন হজ্জের মওসুম আসে নাই; এমতাবস্থায় তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। কিন্তু হজ্জের মওসুম পর্যন্ত তথায় থাকিলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন মালদার ব্যক্তি হজ্জের মওসুম ব্যতীত অন্য সময় মক্কা শরীফ পৌছিলেও তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। তবে হজ্জের মওসুম পর্যন্ত তথায় থাকিলে হজ্জ ফরজ হইবে।

মাসয়ালাঃ- কাহারো উপর এই বৎসরই হজ্জ ফরজ হইয়াছে। সে যদি এই

বৎসরই হজ্জে রওয়ানা করিয়া পথে মরিয়া যায়, তবে তাহার জিম্মায় হজ্জ রহিল না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে হজ্জের জন্য তাহার অসিয়ত করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু যদি এই বৎসরের পূর্বে হজ্জ ফরজ হইয়া থাকে তবে মৃত্যুর সময় অসিয়ত করিয়া যাওয়া তাহার প্রতি ওয়াজিব। কারণ তাহার জিম্মায় হজ্জ থাকিয়া গেল।

মাসয়ালাঃ- হজ্জের মওসুমে কোন ব্যক্তি মালদার থাকিলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে। মওসুমের পূর্বে মালদার থাকিয়া ঠিক মওসুমের সময় গরীব হইয়া পড়িলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।

মাসয়ালাঃ- হজ্জের মওসুমে হজ্জের খরচ পরিমাণ অর্থ সম্বল থাকিলে হজ্জ না করিয়া উহা অন্য কোন কাজে ব্যয় করিতে পারিবে না, করিলে তাহার উপর ফরজ হজ্জ থাকিয়া যাইবে।

মাসয়ালাঃ- হজ্জের মওসুম আসার পূর্বে হজ্জের খরচ পরিমাণ অর্থ সম্পদ হইলে, উহা যে কোন কাজে ব্যয় করা দোষের নয়। তবে যদি সে তাহার নিজের উপর হজ্জ ফরজ হইতে না দেওয়ার নিয়তে মওসুমের পূর্বে অন্য কাজে ব্যয় করে তবে মাকরূহের গুনাহ হইবে।

মাসয়ালাঃ- যদি কাহারও নিকট হজ্জের মওসুমে হজ্জের খরচ পরিমাণ টাকা হয়, অথচ তাহার ঘর নির্মাণ করা, জায়গা জমি খরিদ করা অথবা বিবাহ করার আবশ্যক হয়, তবে আগে হজ্জ করিতে হইবে। আর যদি বিবাহ না করিলে হারামীতে লিপ্ত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ টাকা দ্বারা আগে বিবাহ করিবে।

মাসয়ালা- হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য বাড়ী হইতে মক্কা শরীফ ও আরাফাত পর্যন্ত যাতায়াতের খরচ পরিমাণ অর্থ সম্বল থাকা শর্ত। মদীনা শরীফ যাতায়াতের খরচ থাকা শর্ত নহে।

মাসয়ালাঃ- মুয়াল্লিম ও উকীলের ফিস এবং সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত অন্যান্য ট্যাক্স হজ্জের খরচের মধ্যে ধর্তব্য হইবে।

মাসয়ালা- মক্কা শরীফ হইতে হাদিয়া, তোহফা ও তাবাররোকাত ইত্যাদি আনার অর্থ থাকা শর্ত নহে।

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যক্তি শুধু তাহার দোকান বা ব্যবসায়ের লভ্যাংশ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। যদি সে তাহার ব্যবসায়ের মাল ও নগদ টাকা হইতে হজ্জের খরচ পরিমাণ বাহির করিয়া লয় এবং অবশিষ্ট দ্বারা জীবন যাপন উপযোগী ব্যবসায় চলিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে। তাহাকে উক্ত ব্যবসা হইতে হজ্জের খরচ পরিমাণ টাকা লইয়া হজ্জ করিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যবসায়ীর কয়েকটি কারখানা আছে। যথা- সেলাইর কল, প্রেস, চাউলের কল, তৈলের কল, সুর্কি ভাঙ্গা কল ও ভাড়া দেওয়ার জন্য নৌকা বা বাড়ীঘর ইত্যাদি। উহার মধ্য হইতে যে কয়টির আয় দ্বারা তাহার ও তাহার

পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্টগুলি বিক্রয় করিলে যদি হজ্জের খরচ পরিমাণ টাকা হয়, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে।

মাসয়ালাঃ- এক ব্যক্তির নিকট এই পরিমাণ অর্থ আছে, যাহা দ্বারা সে নিজ দেনা পরিশোধ না করার দরুন আটক হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায়ও তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যক্তির হজ্জ ফরজ হইয়াছিল কিন্তু সে হজ্জ করে নাই; অতঃপর সে গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় যদি তাহার ধারণা হয় যে, কর্জ করিয়া হজ্জ করিলে পরে তাহার কর্জ পরিশোধ করিতে পারিবে। তবে তাহাকে কর্জ করিয়াই হজ্জ করিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন ব্যক্তিকে অন্য লোক হজ্জের পরিমাণ টাকা দান করিতে চাহিতেছে, উক্ত টাকা গ্রহণ করতঃ হজ্জ করা তাহার উপর ফরজ নহে। কিন্তু যদি সে উহা গ্রহণ করে, তবে তাহার উপর হজ্জ আদায় করা ফরজ হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন এক ব্যক্তির হজ্জের খরচ পরিমাণ টাকা আছে। কিন্তু উহা মওসুমের পূর্বে অন্যকে ধার দিয়াছে বা কারবারে খাঁটিতেছে কিংবা ব্যাংকে জমা রাখিয়াছে। কিন্তু যখন হজ্জের মওসুম উপস্থিত হইয়াছে তখন উক্ত টাকা হস্তগত করিতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়া রহিল।

মাসয়ালাঃ- স্কুল মাদ্রাসায় যে শিক্ষকের নামে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা স্কুল কমিটির একাউন্টে জমা হয়, উহার এক অংশ শিক্ষকের বেতন হইতে তাহার সম্মতিক্রমে জমা হইয়া থাকে। আর একাংশ শিক্ষকের চাকুরী শেষে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কমিটির পক্ষ হইতে জমা হয়। এই দুই অংশের মধ্য হইতে কমিটি প্রদত্ত অংশে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। কেননা এখন পর্যন্ত শিক্ষককে উহার মালিক করিয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু শিক্ষকের বেতন হইতে প্রদত্ত অংশের টাকা যদি হজ্জের খরচের পরিমাণ হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে। কেননা উহা শিক্ষকের বেতন হইতে তাহার সম্মতিতে জমা হইয়াছে বলিয়া উহাতে তাহার মালিকানা বা স্বত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং এই অংশের টাকা শিক্ষক ইচ্ছা করিলে কমিটির নিকট হইতে উত্তোলন করিতে পারে।

মাসয়ালাঃ- কোন এক ব্যক্তি ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে এমন সময় মক্কা শরীফ উপস্থিত হইল যে, সে এখন রওয়ানা করিয়া ছোবহে ছাদেকের পূর্বে আরাফাতে পৌছিতে পারে, তবে তাহাকে বিলম্ব না করিয়া আরাফাতে যাইয়া অকুফ করিতে হইবে। আর যদি সময় এতই সংকীর্ণ হয় যে, এশার নামায পড়িলে ছোবহে ছাদেকের পূর্বে আরাফাতে অকুফ করিতে সক্ষম হয় না। আর এশার নামায না পড়িলে অকুফ করিতে সক্ষম হয়, তবে সে ব্যক্তি এশার নামায তরক করতঃ আরাফাতে গিয়া অকুফ করিবে এবং পরে এশার নামাযের কাজা আদায় করিবে।

মাসয়ালাঃ- জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। অর্থ সম্বল না থাকার দরুন যাহার উপর হজ্জ ফরজ হয় নাই, সে যদি পদব্রজে বা অন্য কোন উপায় মক্কা শরীফ পৌছিয়া ফরজ নিয়তে হজ্জ আদায় করে (নফল নিয়তে নহে) তবে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। পরে মালদার হইলেও তাহাকে পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে না। কেননা মক্কা শরীফ পৌছার দরুন তাহার উপরে হজ্জ ফরজ হইয়াছিল।

মাসয়ালা- যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ করিতে মান্নত করে, তাহা হইলে উহা আদায় করা ওয়াজিব।

মাসয়ালাঃ- যদি কাহারও উপর হজ্জ ফরজ হয় এবং সে কোন মকছুদের জন্য হজ্জ মান্নত করিয়া থাকে তবে তাহাকে এই দুই হজ্জ দুই বৎসরে আদায় করিতে হইবে এবং পরের বৎসর মান্নত আদায় করিবে।

হজ্জ আদায় করা ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

পূর্বে উল্লেখিত ৫ নম্বরে হজ্জ ফরজ হওয়ার যে ৭টি শর্ত লিখা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ যাহার মধ্যে পাওয়া গেল, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছে। এখন এই ৭ নম্বরের বর্ণিত শর্তাবলী পাওয়া গেলেই উক্ত ফরজ হজ্জ তাহার নিজের আদায় করিতে হইবে।

হজ্জ আদায় করা ফরজ হওয়ার শর্ত পাঁচটি-

১। সুস্থকায় হওয়া অর্থাৎ রুগ্ন, বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীন ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ না হওয়া।

২। হজ্জে যাতায়াতের রাস্তা জান মালের জন্য নিরাপদ থাকা।

৩। কারারুদ্ধ ও সরকার কর্তৃক বাঁধা প্রাপ্ত না হওয়া।

৪। স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার স্বামী কিংবা বিশ্বস্ত মোহাররম সঙ্গে থাকা। (যাহার সহিত কস্মিন কালেও বিবাহ জায়েয নাই তাহাকে মোহাররম বলে। মোহাররম ব্যক্তি বালেগ বা করীবুল বুলুগ হওয়া চাই।)

৫। স্ত্রীলোকের ইদ্দত মুক্ত হওয়া। কেননা কুরআন শরীফে ইদ্দতাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। ৪নং ও ৫নং শুধু মেয়েলোকদের জন্য)

হজ্জ আদায় করা ফরজ হওয়ার শর্তাবলীর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

মাসয়ালাঃ- ৫নং ও ৭নং এ বর্ণিত সম্পূর্ণ শর্ত সমূহ যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, তাহাকে স্বয়ং হজ্জ আদায় করিতে হইবে। অপরের দ্বারা হজ্জ করাইলে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইবে না।

মাসয়ালাঃ- উভয় প্রকার শর্ত সমূহ পাওয়া যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি হজ্জ না করিয়া মরিয়া গেল, সে হজ্জ আদায় না করার গুনাহ লইয়া মরিল।

মাসয়ালাঃ- যে বৎসর হজ্জ আদায় করা ফরজ হইল, সেই বৎসরই হজ্জ করিতে হইবে। না করিলে বিশুদ্ধ কওল মোতাবেক হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত গুনাহগার থাকিবে। পরে হজ্জ আদায় করিলে বিলম্বের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। ফরজ হজ্জ আদায় না করতঃ মরিয়া গেলে সকল ইমামদের মতে হজ্জ তরকের দরুন সে গুনাহগার হইবে।

মাসয়ালাঃ- যদি কাহারও ভিতরে ৫নং এ বর্ণিত হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত সমূহ পাওয়া না যায় তাহা হইলে সে ইচ্ছা করিলে অপরের দ্বারা তাহার নায়েবী হজ্জ করাইতে পারে। এবং নায়েবী হজ্জ করাইবার পর ৭নং এর শর্তাবলী পাওয়ার পূর্বে যদি সে মরিয়া যায় তবে ঐ নায়েবী হজ্জ দ্বারাই তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি নায়েবী হজ্জ করাইবার পর ৭নং এর শর্তাবলী সম্পূর্ণ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে স্বয়ং পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে। পূর্বেকৃত নায়েবী হজ্জের দ্বারা তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইবে না। আর ইচ্ছা করিলে সে ঐ অবস্থায় নায়েবী হজ্জ আদায় না করাইয়া স্বয়ং হজ্জ আদায় করার মানসে ৩নং এর শর্তাবলী পাওয়ার অপেক্ষা করিতে পারে। তবে মৃত্যু সময়ের নিশ্চয়তা নাই বলিয়া নায়েবী হজ্জ করাইবার অসিয়ত করিয়া রাখা তাহার প্রতি ওয়াজিব। বিনা অসিয়তে মরিয়া গেলে তাহার জিম্মায় ফরজ হজ্জ থাকিয়া যাইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন চিররোগী মালদার হইলে অথবা কোন মালদার চিররোগী হইলে, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে। কিন্তু যদি সে শেষ জীবন পর্যন্ত সুস্থ না হয় ও তদ্রূপ হজ্জ করিতে না পারে, তবে সে অপরের দ্বারা বদলী হজ্জ করাইবে অথবা মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ্জ করাইবার জন্য অসিয়ত করিয়া যাইবে। অন্যথায় হজ্জ তরকের জন্য গুনাহগার হইবে।

মাসয়ালাঃ- অন্ধ ও খোড়া লোক চিররোগীর ন্যায় মালদার হইলে ছহীহ কওল মতে তাহাদের উপর হজ্জ ফরজ হইবে। এবং অপরের দ্বারা বদলী হজ্জ করাইবে। জীবিত অবস্থায় বদলী হজ্জ না করাইলে মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ্জের অসিয়ত করিয়া যাইবে। অন্যথায় গুনাহগার হইবে। মালদার হইবার পরে অন্ধ বা খোড়া হইলে, তাহার উপরও এই হুকুম।

মাসয়ালাঃ- কোন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মালদার হইলে কিংবা মালদার ব্যক্তি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইলে তাহার বদলী হজ্জ করাইবে বা বদলী হজ্জের অসিয়ত করিয়া যাইতে হইবে। (ওয়াজিব)

মাসয়ালাঃ- যুদ্ধ বিগ্রহ বা চুরি ডাকাতি ইত্যাদি কারণে যদি রাস্তা নিরাপদ না থাকে এবং তজ্জন্য হজ্জ করিতে না পারে তবে গুনাহগার হইবে না। কিন্তু রাস্তা নিরাপদ হইবার পূর্বে মৃত্যু উপস্থিত হইলে বদলী হজ্জের অসিয়ত করিয়া যাইবে। অন্যথায় গুনাহগার হইবে।

মাসয়ালা- কারারুদ্ধ কিংবা সরকার কর্তৃক হজ্জে বাঁধাপ্রাপ্ত মালদার ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্বে বদলী হজ্জের অসিয়ত করিয়া যাইবে। (ওয়াজিব)

মাসয়ালাঃ- অসুস্থতার দরুন কিংবা রাস্তা নিরাপদ না থাকার দরুন কিংবা সরকার কর্তৃক বাঁধা প্রদত্ত হওয়ার দরুন তাহার স্বয়ং হজ্জ আদায় করা ফরজ নহে, সে যদি কষ্ট ক্লেশ করিয়া কিংবা অন্য কোন উপায় বা কৌশল অবলম্বন করিয়া নিজে হজ্জ আদায় করে, তবে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

মাসয়ালাঃ- সফরের দূরত্ব অর্থাৎ ৪৮ মাইলের দূরত্ব হইতে কোন মেয়েলোক হজ্জে গমন করিতে চাহিলে তাহার সঙ্গে তাহার স্বামী কিংবা একজন বিশ্বস্ত দায়েমী মোহাররম থাকা ওয়াজিব। ৪৮ মাইলের কম দূর হইতে হজ্জ করিলে সমধিক ছহীহ কওল মতে বর্তমান যমানায় মোহাররম ব্যতীত হজ্জে গমন করা মাকরূহ তাহরীম।

মাসয়ালাঃ- যাহাদের সহিত কোন সময় বিবাহ জায়েয নাই। যথা- পিতা, ভাই, মামা প্রভৃতি তাহারাই দায়েমী মোহাররম।

মাসয়ালাঃ- মোহাররম ব্যক্তি পাগল, নাবালেগ, ফাসেক ও দুশ্চরিত্র না হওয়া আবশ্যক।

মাসয়ালাঃ- কোন মালদার স্ত্রীলোকের যদি স্বামী বা কোন মোহাররম না থাকে, তবে তাহার প্রতি হজ্জে যাওয়ার জন্য কাহারও নিকট বিবাহ বসা ওয়াজিব নহে। তাহাকে অপরের দ্বারা নায়েবী হজ্জ করাইতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- গায়ের মোহাররম কিংবা অন্য কোন স্ত্রীলোকের সাথী হইয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে হজ্জে যাওয়া নিষিদ্ধ।

মাসয়ালাঃ- মোহাররম বা স্বামী যদি নিজ খরচে যাইতে না চায় তবে স্ত্রীলোককে তাহার খরচ দিতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- যে স্ত্রীলোকের প্রতি হজ্জ ফরজ হইয়াছে, তাহাকে তাহার স্বামী কোন মোহাররমের সঙ্গে হজ্জে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবে না। কিন্তু নফল হজ্জে যাইতে নিষেধ করিতে পারে।

মাসয়ালাঃ- কোন স্ত্রীলোক হজ্জ মান্নত করিয়া থাকিলে স্বামীর অনুমতি নিয়া উহা আদায় করিবে। অনুমতি না দিলে মৃত্যুর পূর্বে হজ্জের অসিয়ত করিয়া যাইতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন স্ত্রীলোক ফরজ হজ্জে যাওয়ার জন্য কোন মোহাররম বা স্বামীকে পাইতেছেনা, কিংবা স্বামী বা মোহাররমকে সঙ্গে নেওয়ার খরচ চালাইতে পারিতেছে না, এমতাবস্থায় তাহার ফরজ হজ্জ নিজে আদায় করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে অপরের দ্বারা বদলী হজ্জ করাইতে হইবে অথবা হজ্জের অসিয়ত করিয়া যাইতে হইবে। নচেৎ গুনাহগার হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন স্ত্রীলোক স্বামী বা মোহাররম সঙ্গে না নিয়া একাকিনী হজ্জ করিলে তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু গুনাহ হইবে।

মাসয়ালাঃ- কোন স্ত্রীলোক হজ্জের মওসুমে তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা স্বামীর মৃত্যুর প্রভৃতির দরুন ইদ্দত পালন করিতেছে। এমতাবস্থায় তাহার ফরজ হজ্জ তাহার স্বয়ং আদায় করা ওয়াজিব নহে। বরং সে ইদ্দত মুক্ত হইয়া পরের বৎসর হজ্জ আদায় করিবে। আর যদি ইহার ভিতরে মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে হজ্জের অসিয়ত করিয়া যাইবে। অন্যথায় গুনাহগার হইবে। যদি সে ইদ্দত অবস্থায় হজ্জ আদায় করে তবে তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু গুনাহগার হইবে।

ফরজ হজ্জ তরক করার অনিষ্ট

সূরা মুনাফিকূনের এই আয়াতের وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ الاية

ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, যে মুসলমান হজ্জ ও যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও উহা আদায় করে নাই, সে মৃত্যুকালে (হজ্জ ও যাকাত তরক করার দরুন ভীষণ আযাব দেখিয়া হজ্জ ও যাকাত আদায় করার নিমিত্ত) পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করিবে। (তাফসীরে কুরআন)

হাদীস- যে ব্যক্তি অর্থ সম্বল থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে নাই তাহার মৃত্যু ইয়াহুদী কিংবা নাছারার মৃত্যুর শামিল হইবে। (তিরমিজী)

হাদীসে কুদছী- রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার যে বান্দাকে সুস্থকায় রাখিয়াছি এবং জীবন যাপনে প্রশস্ততা দান করিয়াছি। অথচ একে একে পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হইতেছে এখন পর্যন্ত সে আমার ঘরের হজ্জ আদায় করে নাই সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মাহ্‌রূম।

(তিবরানী ও ইবনে মাজা)

মাসয়ালা- মালদারের প্রতি জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। এই কথা যে অস্বীকার করে সে কাফের।

মাসয়ালাঃ- যে বৎসর হজ্জ ফরজ হয়, সেই বৎসরই হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব। হজ্জ ফরজ হওয়ার পর একাদিক্রমে তিন বৎসর হজ্জ করিতে বিলম্ব করিলে সে ফাসেক হইবে। তাহার সাক্ষ্য শরীয়তে অগ্রাহ্য।

হজ্জ করা কাহার জন্য নিষিদ্ধ

মাসয়ালাঃ- সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অসৎ উপায় অর্জিত অর্থ দ্বারা হজ্জ করা মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ- বৃদ্ধ বা রুগ্ন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর খেদমত করা যাহার প্রতি ওয়াজিব, সে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত হজ্জে যাইবে না। যদি তাহাদের খেদমতের আবশ্যক না হয়, তবে তাহাদের অনুমতি ব্যতীতও হজ্জ করিতে পারিবে।

মাসয়ালাঃ- কাহারও নাবালেগ সন্তান-সন্ততি আছে এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের আর কেহই নাই এমতাবস্থায় তাহাদিগকে ফেলিয়া হজ্জে যাইবে না।

মাসয়ালাঃ- করজদার ব্যক্তি করজ পরিশোধ না করিয়া করজ দাতার অনুমতি ব্যতীত হজ্জে যাওয়া মাকরূহ।

মাসয়ালাঃ- যে বালকের দাঁড়ি গোফ এখনও উঠে নাই এবং ফেৎনার সম্বাবনা আছে তাহাকে তাহার অভিভাবক হজ্জে যাইতে নিষেধ করিতে পারে।

মাসয়ালাঃ- যাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছে এবং সে উহা আদায় করে নাই তাহার পক্ষে অন্যের বদলী হজ্জ করা নিষিদ্ধ। (মাকরূহ তাহরীম)

মাসয়ালা- যাহাদের উপর হজ্জ করা নিষিদ্ধ বা মাকরূহ, এতদসত্ত্বেও যদি তাহারা হজ্জ করে তাহা হইলে তাহাদের হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু গুনাহগার হইবে।

হজ্জের আহকাম ও প্রকারভেদ

হজ্জ কাহাকে বলে?

বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া হজ্জের নিয়ত করতঃ কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজ সমাধা করাকে হজ্জ বলে।

হজ্জ তিন প্রকার যথা- ১। হজ্জে এফরাদ। ২। হজ্জে তামাত্তো, ৩। হজ্জে কেুরান।

হজ্জে এফরাদ- শুধু হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের কার্যাবলী সমাধা করাকে হজ্জে এফরাদ বলে।

হজ্জে তামাত্তো- হজ্জের মাস সমূহের (শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন) মধ্যে প্রথমতঃ শুধু ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া ওমরাহর কার্যাবলী সমাধা করতঃ ঐ সনেই পুনরায় হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের কার্যাবলী সমাধা করাকে হজ্জে তামাত্তো বলে।

হজ্জে কেুরান- ওমরা এবং হজ্জ উভয়ের একত্রে এহরাম বাঁধিয়া প্রথমতঃ ওমরাহর কার্যাবলী সমাধা করতঃ এহরাম না ছাড়িয়া হজ্জের কার্যাবলী সমাধা করাকে হজ্জে কেুরান বলে।

হানাফী মাযহাব মতে হজ্জে কেুরান উত্তম। অতঃপর তামাত্তো, অতঃপর এফরাদ।

হজ্জের ফরজ সমূহ

হজ্জের ফরজ তিনটি। যথাঃ- ১। এহরাম বাঁধা। ২। ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর হইতে পরবর্তী ছোবহে ছাদেকের মধ্যে আরাফাত ময়দানে কিছু সময় অবস্থান করা, ৩। তাওয়াফে যিয়ারত অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ ছোবহে ছাদেকের পর হইতে জীবনে কোন এক সময় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা।

হজ্জের ওয়াজিব সমূহ

হজ্জের ওয়াজিব ৬টি, যথাঃ- ১। মোজদালেফায় ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে ছোবহে ছাদেকের পর কিছু সময় অবস্থান করা, ২। ছাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী বা গমনা-গমন করা, ৩। মিনাতে ১০ই যিলহজ্জ হইতে ১২ই যিলহজ্জ কিংবা ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত তিন জোমরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা, ৪। হজ্জে কেুরান ও হজ্জে তামাত্তোকারীর দমে শোকর অর্থাৎ হজ্জের কোরবানী আদায় করা, ৫। মাথা মুণ্ডন করা বা মাথার চুল কাটা, ৬। মিকাতের বহির্দেশের হাজীদের পক্ষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফে বেদা বা বিদায়ী তাওয়াফ করা।

হজ্জের সুন্নাত সমূহ

হজ্জের মধ্যে বহু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আছে। তন্মেধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নে লিখিত হইল, ইনশা আল্লাহ বাকীগুলি যথাস্থানে বর্ণনা করা হইবে।

১। মিকাতের বহির্দেশস্থ হজ্জে এফরাদকারী ও হজ্জে কেুরানকারীর জন্য বায়তুল্লাহর তাওয়াফে কুদূম বা আগমনি তাওয়াফ করা, ২। তাওয়াফে কুদূমের মধ্যে

অথবা তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যে রমল করা, ৩। ৮ই যিলহজ্জ সকালে মক্কা শরীফ হইতে মিনায় গিয়া তথায় জোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া এবং রাত্রে মিনাতে থাকা, ৪। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হইতে আরাফাতে রওয়ানা হওয়া, ৫। ৯ই যিলহজ্জ সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর আরাফাত হইতে মোজদালেফার দিকে রওয়ানা হওয়া, ৬। ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে মোজদালেফাতে রাত্রি যাপন করা, ৭। আরাফাতে অকুফ করার জন্য জোহরের পূর্বে গোসল করা, ৮। ১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পরে মোজদালেফা হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া, ৯। ১০ই দিবাগত রাত্রে মিনাতে অবস্থান করা। আর যে ব্যক্তি ১৩ই যিলহজ্জ সেখানে থাকিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে চায় তাহার জন্য ১২ই দিবাগত রাত্রিও তথায় যাপন করা, ১০। মিনা হইতে মক্কা শরীফ ফিরিবার সময় 'মোহাচ্ছাব' নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা। এতদভিন্ন হজ্জের মুস্তাহাব ও মাকরূহ প্রভৃতি হজ্জের বয়ানের মধ্যে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে।

ওমরাহ্

মীকাত অথবা হরমের বর্হিদেশ হইতে এহরাম বাঁধিয়া নির্দ্ধারিত নিমানুযায়ী বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা ও ছাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতঃ মস্তক মুণ্ডন বা চুল কাটাকে 'ওমরাহ' বলে। ওমরাহকে ছোট হজ্জ বলা হয়। হজ্জ ফরজ হওয়ার যে সাতটি শর্ত আছে তন্মধ্যে হইতে হজ্জের সময় হওয়া শর্তটি ব্যতীত বাকী ছয়টি শর্ত যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে তাহার জন্য জীবনে একবার ওমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

ওমরাহর ফরজ- ওমরাহর মধ্যে ফরজ ২টি, যথা- ১। এহরাম বাঁধা, ২। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা।

ওমরাহর ওয়াজিব-ওমরাহর মধ্যে ওয়াজিব ২টি, যথা- ১। ছাফা ও মারওয়া পর্বত দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ান, ২। মাথার চুল মুণ্ডন করা বা কর্তন করা।

ওমরাহর মাসায়েল

১। ওমরাহ সারা বৎসরে ৯ই যিলহজ্জ হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত এই পাঁচ দিন ব্যতীত যখন যতবার ইচ্ছা করিতে পারে। উক্ত পাঁচ দিনের মধ্যে ওমরাহ মাকরূহ তাহ্রীম। কিন্তু এই পাঁচ দিনের পূর্বে এহরাম বাঁধিয়া থকিলে ঐ পাঁচ দিনের মধ্যে ওমরাহ করা মাকরূহ নহে।

২। মক্কা শরীফ, মীকাত ও মীকাতের অন্তর্দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা হজ্জ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে হজ্জের মাস সমূহের মধ্যে ওমরাহ করা মাকরূহ তাহ্রীম। তাহারা ১৩ই যিলহজ্জের পর ওমরাহ করিবে। আর যাহারা হজ্জ করিতে না চায়, তাহাদের জন্য হজ্জের মাস সমূহের ভিতরে ওমরাহ করা জায়েয আছে।

৩। কোন আফাকী হজ্জের মাস সমূহের পূর্বে (যথা-রমজান মাসে) মক্কা শরীফ পৌছিয়া ওমরাহ করিয়াছে, এখন সে মক্কাতে মুকীম হউক কিংবা মুসাফির থাকুক উভয় অবস্থায় ১লা শাওয়াল হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মক্কীদের ন্যায় সেও আর ওমরাহ করিতে পারিবে না।

৪। যে আফাকী, হজ্জের মাস সমূহের মধ্যে (শাওয়াল মাস হইতে) ওমরাহ করিয়াছে এবং হজ্জের অপেক্ষায় মক্কাতে মুকীম হইয়াছে কিংবা মুসাফির অবস্থায় রহিয়াছে, সে হজ্জের এহরামের পূর্বে যতবার ইচ্ছা ওমরাহ আদায় করিতে পারিবে। (মানসেকে মোল্লা আলী, বাবে তামাত্তো)

৫। মক্কা শরীফে থাকিয়া কেহ ওমরাহ করিতে চাহিলে, তাহাকে হরমের সীমানার বহির্দেশ হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিতে হইবে। নচেৎ ওমরাহ্ শুদ্ধ হইবে না। তানয়ীম নামক স্থানে গিয়া ওমরাহর এহরাম বাঁধা উত্তম।

৬। মীকাতের বহির্দেশের কোন লোক যদি ওমরাহর এহ্রাম বাঁধিয়া মক্কা শরীফে আসিতে চায়, তবে সে মীকাত হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিবে। যদি সে মীকাতের অন্তর্দেশে আসিয়া এহরাম বাঁধে, তবুও এহরাম ও ওমরাহ শুদ্ধ হইবে। বিনা এহরামে মীকাত অতিক্রম করার জন্য তাহাকে একটি দম দিতে হইবে।

৭। কোন মুসাফির কোন স্থানে অন্ততঃ ১৫দিন অবস্থান করার নিয়ত করিলে সে মুকীম হইবে।

৮। রমজান মাসে ওমরাহ্ করা মুস্তাহাব ও উত্তম। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রমজান মাসের একটি ওমরাহ আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমতুল্য। (মুসলিম শরীফ)

৯। তিনটি ওমরাহ একটি হজ্জের সমান এবং ওমরাহ দ্বারা গুনাহ সমূহ মাফ হইয়া যায়। বেশী সংখ্যায় ওমরাহ করায় কোন দোষ নাই বরং মুস্তাহাব।

(এতদ্ব্যতীত ওমরাহর যাবতীয় মাসায়েল ও আদায় করার পদ্ধতি হজ্জে তামাত্তোর বয়ানে বিস্তারিত উল্লেখ আছে)

এহরামের প্রস্তুতি

হাজীবাহী ষ্টীমার বা জাহাজ 'কামরান' নামক স্থান অতিক্রম করিলে এহরামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। 'কামরান' লোহিত সাগরের পূর্বতীরে অবস্থিত একটি বন্দরের নাম। কোন কোন সময় জাহাজ ঐ বন্দরে লাগায়। প্রথমতঃ মাথার চুল ও মোচ যথাসম্ভব ছোট করিয়া কাটিবেন। অথবা মাথা মুণ্ডন করিতে পারেন। কিন্তু ছোট করিয়া কাটাই উত্তম। হাত পায়ের নখ কাটিবেন। বোগল ও গুপ্ত স্থানের পশম মুণ্ডন করিবেন (সুন্নাত)। নিজ স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে এবং শরয়ী প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে স্ত্রী সঙ্গম করিতে পারেন (মুস্তাহাব)। এহরাম বাঁধার পর আর স্ত্রী সহবাস করিতে পারিবেন না (হারাম)।

অতঃপর এহরাম বাঁধার জন্য গোছল করিবেন (সুন্নাত)। গরম পানি বা সাবান দ্বারা শরীরের ময়লা দূর করা মুস্তাহাব। ওজর বশতঃ গোসল করিতে অক্ষম হইলে মেসওয়াক সহকারে অজু করিয়া লইবেন। গোসলের পর তৈল ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। চিরুনী দিয়া মাথার চুল ও দাড়ি আচড়াইবেন। নাবালেগ ও হায়েজ নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকগণও উপরোক্ত নিয়মে গোসল করিলে তৈল ও সুগন্ধি লাগাইবে এবং মাথার চুল আচড়াইবে। সেলাই করা জামা-কাপড়, টুপী-মুজা শরীর হইতে খুলিয়া এহরামের একখানা নূতন কাপড় পরিধান করিবে এবং একখানা নূতন কাপড় শরীরে দিবেন। পাক-পবিত্র, পরিষ্কার পুরাতন কাপড়ও এহরামে ব্যবহার করিতে পারেন। তবে নূতন ও সাদা কাপড় এহরামের জন্য উত্তম। তবে নীল, সবুজ ও কাল বর্ণের কাপড়ও ব্যবহার করা জায়েয আছে। এহরামের জন্য এইরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

এহরাম ও ইয়ালম্লম্

এহরাম অর্থ কোন বস্তুকে বা কর্মকে হারাম (নিষিদ্ধ) করা। ওমরাহ্ বা হজ্জ পালনকারী এহরামের মাধ্যমে এমন কিছু বিষয় বা কার্য নিজের উপর হারাম করিয়া নেয় যাহা তাহার জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল ছিল। এই জন্যই এহরামকে এহরাম বলা হয়।

এহরামের জন্য তৈয়ার হইয়া আপনি ইচ্ছা করিলে বাড়ী হইতে কিংবা মক্কা শরীফ রওয়ানা করার যান বাহনে উঠিবার পূর্বে অথবা চট্টগ্রাম বা ঢাকা হইতেও এহরাম বাঁধিতে পারেন। যাহারা বাংলাদেশ হইতে বিমানযোগে হজ্জের জন্য মক্কা শরীফে যাইবেন, তাহারা বিমানে(উড়ো জাহাজে) আরোহণ করিবার পূর্বে ঢাকাতে অবস্থিত ক্যাম্প হইতে এহরাম বাঁধিয়া লইতে পারেন। বিমানে হজ্জ যাত্রীদের জন্য ঢাকাতে এহরাম বাঁধিয়া লওয়া উত্তম। কিন্তু 'কামরান' অতিক্রম করার পর লোহিত সাগরের পূর্বতীরে যে ইয়ালমলম নামক একটি পাহাড় আছে, ষ্টীমার বা উড়োজাহাজ লোহিত সাগর কিংবা তাহার উপর দিয়া ঐ পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই এহরাম বাঁধিতেই হইবে। আপনার বিনা এহরাম অবস্থায় যেন জাহাজ বা বিমান ইয়ালমলম পাহাড় অতিক্রম না করে। যদি আপনার এহরাম বাঁধার পূর্বে জাহাজ ইয়ালমলম অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে মক্কা শরীফ পৌঁছিয়া আপনাকে একটি 'দম' (ছাগল বা মেষ কোরবানী) দিতে হইবে (ওয়াজিব)। কেননা এতদ্দেশীয় হজ্জ যাত্রীদের জন্য এহরাম বাঁধিবার মীকাত ইয়ালমলম পাহাড়। হরম শরীফে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের পক্ষে হজ্জ বা ওমরাহর এহরাম ব্যতিরেকে মীকাত অতিক্রম করা না জায়েয। অতিক্রম করিলে 'দম' ওয়াজিব হইবে। ঘটনাক্রমে এইরূপ হইয়া পড়িলে অবশ্য 'দম' দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তখনই এহরাম বাঁধিবেন, পরে মক্কা শরীফ পৌঁছিয়া 'দম' দিবেন। ইহাতে এহরাম শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

মীকাত

মক্কা শরীফ গমনেচ্ছু বহির্দেশীয় (আফাকী) মুসলমানদের যে স্থানে পৌছিয়া হজ্জ বা ওমরাহর এহরাম বাঁধিতে হয় তাহাকে মীকাত বলে। মীকাত ৫টি যথা-

১। হরম শরীফের পূর্ব সীমানার বহির্দেশে ক্করণ নামক স্থান একটি মীকাত; ২। হরম শরীফের পশ্চিম সীমানার বহির্দেশে জোহফা নামক স্থান একটি মীকাত; ৩। হরম শরীফের উত্তর সীমানার বহির্দেশে মদীনা শরীফের দক্ষিণে যুলহোলায়ফাহ্' নামক স্থান একটি মীকাত; ৪। হরম শরীফের দক্ষিণ সীমানার বহির্দেশে দুই মঞ্জিল দূরে ইয়ালমলম, পাহাড় একটি মীকাত;(ইহা এতদ্দেশীয় মুসলমানদের জন্য মীকাত) ৫। হরম শরীফের বহির্দেশে পূর্ব উত্তর কোণে দুই মঞ্জিল দূরে 'জাতে এরক' নামক স্থানে একটি মীকাত। উক্ত মীকাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত স্থানকে দাখেলে মীকাত বলে এবং ইহার বাহিরের পৃথিবীর সকল স্থানকে খারেজে মীকাত বলে। এবং খারেজে মীকাতের সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে আফাকী বলে। আফাকীদের মধ্য হইতে হরমের সীমানার ভিতরে গমনেচ্ছু কোন মুসলমান নর-নারীর জন্য হজ্জ বা ওমরাহর এহরাম ছাড়া মীকাত বা মীকাতের সোজাসুজি কোন সীমানা অতিক্রম করা জায়েয নাই। অতিক্রম করিলে গুনাহগার হইবে; তজ্জন্য একটি 'দম' দিতে হয়। একটি ছাগল বা দুম্বা কিংবা একটি ভেড়া কোরবানী করিয়া দেওয়াকে দম বলে।

(হেদায়া ও মোকাদ্দামায়ে হেদায়া)

১। করণ- ইহা নজদ হইতে আগমনকারীদের জন্য মীকাত।

২। জোহফা- মিশর ও সিরিয়াবাসী এবং পাশ্চাত্য দেশীয় আগত হাজীদের জন্য মীকাত।

৩। জুল হোলায়ফা- মদীনা শরীফ হইতে আগমনকারী হাজীদের জন্য মীকাত।

৪। ইয়ালমলম- বাংলাদেশ, ইয়ামন, পাকিস্তান, ভারত, মালয়েশীয়া, ইন্দোনেশীয়া, চীন, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি পূর্বদেশীয় অধিবাসীদের জন্য মীকাত।

৫। যাতে এরক- ইরাক ও ঐ দিক হইতে আগত হাজীগণের জন্য মীকাত।

মীকাতের মাসায়েল

আফাকী- মীকাতের বহির্দেশের সমগ্র দুনিয়ার অধিবাসীদিগকে 'আফাকী' বলে।

মীকাতী-মীকাতের অধিবাসীদিগকে 'মীকাতী' বলে।

হেল্লী- মীকাত ও হরমের মধ্যবর্তী অধিবাসীগণকে 'হেল্লী' বলে।

মক্কী বা হরমী- মক্কা শরীফ ও হরমের অধিবাসীগণকে 'মক্কী বা হরমী' বলে।

১। যদি কোন আফাকী হজ্জ বা ওমরাহর ইচ্ছা ব্যতীত ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্য কোন কাজে মক্কা শরীফ কিংবা হরমের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়, তবে তাহাকে হজ্জ কিংবা ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করিতে হইবে। বিনা

এহরামে অতিক্রম করিলে তাহাকে একটি দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব) অথবা কোন মীকাতে যাইয়া এহরাম বাঁধিয়া আসিতে হইবে। তাহা হইলে দম মাফ হইয়া যাইবে।

২। মক্কা শরীফ কিংবা হরমে গমনেচ্ছু আফাকীদের জন্য বিনা এহরামে কোন ক্রমেই মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নহে।

৩। মক্কা বা হরম গমনেচ্ছু কোন আফাকী বিনা এহরামে মীকাত অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু হরমের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এমতাবস্থায় তাহার প্রতি শুধু একটি দম ওয়াজিব হইবে। আর যদি সে বিনা এহরামে হরমের সীমানায় প্রবেশ করে, তবে তাহাকে বিনা এহরামে মীকাত অতিক্রম করার দমটিত দিতেই হইবে তদুপরি ওমরাহ ও হজ্জ এতদুভয়ের কোন একটি তাহার উপর ওয়াজিব হইবে।

৪। এতদ্দেশীয় কোন (আফাকী) লোক ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্য কোন কার্যোপলক্ষে জেদ্দা যাইতেছে। তাহাকে ইয়ালমলম অতিক্রম করিতে এহরাম বাঁধিতে হইবে না। জেদ্দা যাইবার পর যদি সেই ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরাহর উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে মক্কা শরীফ যাইতে চায়, তবে এহরাম ছাড়া মক্কা শরীফে ঢুকিতে পারিবে। (কোন গুনাহ হইবে না) কিন্তু হজ্জ বা ওমরাহর উদ্দেশ্য থাকিলে বিনা এহরামে হরমের সীমানায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৫। কোন মক্কী, হরমী বা হেল্লী অথবা মীকাতী মীকাতের বহির্দেশে আসিয়াছে। এখন তথা হইতে মক্কা শরীফ বা হরমে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে আফাকীদের ন্যায় এহরাম বাঁধিতে হইবে। (ওয়াজিব)

৬। যদি কোন হেল্লী ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরাহর নিয়তে মক্কা শরীফ যাইতে চায়, তবে তাহাকে হরমের বাহির (হেল) হইতে এহরাম বাঁধিতে হইবে (ওয়াজিব)। এহরাম না বাঁধিয়া হরমে ঢুকিলে তাহার প্রতি একটি 'দম' ওয়াজিব হইবে। পুনঃ সে হেল্লে যাইয়া এহরাম বাঁধিয়া আসিলে উক্ত 'দম' মাফ হইয়া যাইবে।

৭। যদি কোন হেল্লী হজ্জ বা ওমরাহর নিয়ত ব্যতীত কোন কার্যোপলক্ষে হেল হইতে হরমে কিংবা মক্কা শরীফে প্রবেশ করে তবে তাহার প্রতি এহরাম বাঁধা ওয়াজিব নহে।

৮। কোন মক্কী কিংবা মক্কা শরীফে মুকীম-আফাকী বা মুকীম-হেল্লী হরমের বাহিরে (হেল্লে) পঞ্চ মীকাতের অভ্যন্তরে গিয়াছে। পুনঃ তাহাকে মক্কা শরীফ বা হরমে ঢুকিতে এহরাম বাঁধিতে হইবে না। যথা- কোন মক্কী বা মক্কার মুকীম ব্যক্তি জেদ্দায় আসিয়াছে, এখন সে হজ্জ বা ওমরাহ করিতে না চাহিলে বিনা এহরামে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিতে পারে।

এহরাম শুদ্ধ হওয়ার ফরজ সমূহ

এহরাম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ২টি যথা- ১। মুসলমান হইতে হইবে, ২। এহরামের নিয়ত করতঃ তালবীয়া পাঠ করা।

এহরামের নিয়ত করা ও একবার তালবিয়া পাঠ করা উভয়ই এহরামের শর্ত, সুতরাং যদি কেহ শুধু এহরামের নিয়ত করে আর তালবিয়া না বলে কিংবা বিনা নিয়তে শুধু তালবিয়া বলে, তবে তাহার এহরাম শুদ্ধ হইবে না।

এহরামের ওয়াজিব- এহরামের ওয়াজিব ২টি। যথা- ১। মীকাত অতিক্রমের পূর্বে এহরাম বাঁধা। ২। এহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ নিষিদ্ধ উহা হইতে বিরত থাকা।

এহরামের সুন্নাত সমূহ

১। শরীরের ময়লা দূর করা, ২। নখ কাটা, ৩। বগল পরিষ্কার করা, ৪। নাভীর নীচে পরিষ্কার করা, ৫। এহরামের নিয়তে গোসল করা, ৬। সাদা রংগের চাদর ব্যবহার করা, ৭। চপ্পল পরা, চপ্পল এমনভাবে পরিবে যেন পায়ের তিন চতুর্থাংশ উন্মুক্ত থাকে, ৮। মুখে এহরামের নিয়ত উচ্চারণ করা, ৯। নামায পড়িয়া বসা অবস্থায় নিয়ত করা, ১০। মীকাতের পূর্বেই এহরাম বাঁধা।

এহরামের মাসায়েল

১। যেই যেই সময় নফল নামায পড়া মাকরূহ সেই সময় এহরাম বাঁধিলে এহরামের সুন্নাত নামায পড়িবে না।

২। ওয়াক্তিয়া নামাযের পরক্ষণে এহরাম বাঁধিলে, এহরামের সুন্নাত নামায না পড়িলেও হইবে।

৩। এহরামের নিয়ত মুখে না পড়িয়া শুধু মনে মনে করিলেও এহরাম শুদ্ধ হইবে। কিন্তু নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব।

৪। কেহ হজ্জে তামাত্তোর জন্য ওমরাহর নিয়ত দেলে দেলে করিয়াছে কিন্তু মুখে হজ্জের নিয়ত পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার দেলের নিয়ত ধর্তব্য।

৫। নিয়তের সঙ্গে সঙ্গেই তালবিয়া পড়িবে। যখন তালবিয়া পড়িবে তখন তিনবার পড়িবে। তালবিয়া মুখে শুদ্ধ করিয়া পড়িতে হইবে। মনে মনে পড়িলে এহরাম শুদ্ধ হইবে না।

৬। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা বিদায় লইতে, দাঁড়াইতে, বসিতে, চলিতে, থামিতে, নীচু স্থান হইতে উঁচুতে উঠিতে কিংবা উঁচু স্থান হইতে নীচে নামিতে বার বার তালবিয়া শব্দ করিয়া পড়িবে।

৭। তালবিয়া পড়ার পরে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং নিজের দুনিয়া ও

আখেরাতের জন্য দোয়া করিবে। অতঃপর নিম্নের দোয়া পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ-

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি ও বেহেশ্ত প্রার্থনা করিতেছি এবং আমি তোমার দোযখ এবং গজব হইতে মুক্তি কামনা করিতেছি।

৮। যদি কেহ এহরাম বাঁধিবার পূর্বে উপরোক্ত তিন প্রকার হজ্জের কোনটি করিবে তাহা ঠিক না করিয়া থাকে তবে সে অনির্দিষ্ট ভাবে এহরাম বাঁধিবে। এবং মক্কা শরীফ পৌছিয়া তাওয়াফ করিবার পূর্বে যে প্রকারের হজ্জ করিতে তাহার নিয়ত আছে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লইবে।

৯। পুরুষগণ তালবিয়া উচ্চঃস্বরে বলিবে। আর স্ত্রীলোকগণ উহা আস্তে আস্তে পড়িবে।

১০। যদি কেহ সেলাই করা কাপড় পরিহিত অবস্থায় এহরাম বাঁধে তবে তাহার এহরাম শুদ্ধ হইবে। কিন্তু এহরাম বাঁধা শেষ হওয়া মাত্র উহা খুলিয়া এহরামের কাপড় পড়িবে। যদি উহা না খুলিয়া ছোবহে ছাদেক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিহিত অবস্থায় থাকে, তবে তাহাকে একটি দম দিতে হইবে। এক দিনের কম সময় হইলে ছদকায়ে ফিতরা পরিমাণ দান করিবে।

১১। এইরূপে সন্ধ্যা হইতে ছোবহে ছাদেক পর্যন্ত পরিহিত অবস্থায় থাকিলে, তাহাকেও উক্তরূপ দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব)

বেহুঁশ ও পীড়িত ব্যক্তির এহরাম

১। যদি এহরাম বাঁধিবার পূর্বে কেহ অজ্ঞান বা বেহুঁশ হইয়া পড়ে বা কোন রুগ্ন ব্যক্তি নিদ্রামগ্ন হয়, তবে তাহার কোন সাথী বা অন্য কেহ তাহার পক্ষে এহরাম বাঁধিলে ছহীহ হইবে। ইহাতে তাহাদের কোন অনুমতি লইতে হইবে না। ঐ সাথী ব্যক্তিই নিজের এহরামের পূর্বে বা পরে যখন ইচ্ছা, ইহাদের পক্ষ হইতে এহরাম বাঁধিবে। এহরাম বাঁধার সময় অজ্ঞান ও রুগ্ন ব্যক্তির শরীর হইতে সেলাইকৃত কাপড় না খুলিয়া এহরাম বাঁধিলে শুদ্ধ হইবে। কিন্তু এহরামের পর সেলাই করা কাপড় খুলিতে হইবে। নচেৎ 'দম' দিতে হইবে।

২। বেহুঁশ বা রুগ্ন ব্যক্তি ঐ অবস্থায় যদি এহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ করিয়া বসে তবে তাহাকেই উহার কাফ্ফারা দিতে হইবে। যে সাথী ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে এহরাম বাঁধিল, তাহাকে কিছুই দিতে হইবে না। তবে সাথী ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ কার্য করিলে তাহার নিজের এহরামের দরুন সে নিজের তরফ হইতে ইহার কাফ্ফারা দিবে। যাহার পক্ষ হইতে সে এহরাম বাঁধিয়াছে তাহার প্রতি কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

৩। এহরাম বাঁধার পর যদি বেহুঁশ ব্যক্তি হুশপ্রাপ্ত হয় বা রুগ্ন ব্যক্তির নিদ্রা ছুটিয়া যায় তবে, হজ্জ ও ওমরাহর অবশিষ্ট কার্যাবলী তাহাকেই আদায় করিতে হইবে। আর হুঁশ না হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে যে এহরাম বাঁধিয়াছে, তাহাকেই সকল কার্যাবলী করিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজ তাহাকে ডবল করিতে হইবে।

৪। যদি এহরাম বাঁধিবার পর বেহুঁশ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সাথী তাহার পক্ষ হইতে সকল কার্যাবলী আদায় করিবে। তাহাতে সেই বেহুঁশ ব্যক্তিকে প্রত্যেক কার্যস্থলে সাথীর সঙ্গে রাখিতে হইবে। এমনকি আরাফাতেও নিয়া যাইতে হইবে।

নাবালেগ বালক বালিকার এহ্‌রাম

১। সুবোধ নাবালেগ বালক বালিকা বালেগের ন্যায় এহরামের কাপড় পরিধান করতঃ নিজেই এহরাম বাঁধিবে এবং হজ্জ ও ওমরাহর কার্যাবলী নিজেই আদায় করিবে। তাহার পক্ষ হইতে অলী এহরাম বাঁধিলে এবং হজ্জ ও ওমরাহর কার্যাবলী আদায় করিলে শুদ্ধ হইবে না।

২। অবোধ নাবালেগ শিশুর পক্ষ হইতে তাহার অলী এহরাম বাঁধিবে এবং অলী শিশুকে কোলে নিয়া হজ্জ ও ওমরাহর কার্যাবলী তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিবে। কিন্তু তাওয়াফের নামায অলীকে শিশুর পক্ষ হইতে আদায় করিতে হইবে না।

৩। অবোধ শিশুর পক্ষ হইতে অলী এহরাম বাঁধিলে, অলী শিশুর শরীর হইতে সেলাইকৃত কাপড় খুলিয়া এহরামের কাপড় পরিধান করাইবে এবং শিশুকে এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী হইতে বিরত রাখিবে। কিন্তু যদি শিশু কর্তৃক কোন নিষিদ্ধ কার্য সংগঠিত হয়, তবে উহার জন্য অলীর বা শিশুর উপর কোন 'দম' ওয়াজিব হইবে না।

৪। নাবালেগের হজ্জ ও ওমরাহ নফল হইবে, ফরজ হইবে না।

৫। হজ্জ ও ওমরাহর কার্যাবলী যতটুকু সুবোধ নাবালেগ নিজে করিতে পারিবে, তাহা সে নিজেই আদায় করিবে। তাহার পক্ষ হইতে অলী আদায় করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। আর যে সকল কাজ সে নিজে করিতে অক্ষম হইবে, উহা অলী আদায় করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে।

৬। অবোধ নাবালেগ শিশুর পক্ষ হইতে অলী এহরাম বাঁধিল এবং অলী নিজের এহরামও বাঁধিল। এমতাবস্থায় অলী কর্তৃক কোন নিষিদ্ধ কার্য সংঘটিত হইলে সে নিজে কাফফারা দিবে। নাবালেগের পক্ষ হইতে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৭। অলী শিশুর পক্ষ হইতে যে হজ্জ ও ওমরাহর কার্যাবলী আদায় করিবে, অলীকে উহা দুইবার করিতে হইবে না; বরং শিশুকে তাহার সঙ্গে রাখিয়া সে তাহার নিজের কার্যাবলী আদায় করিয়া গেলেই উহা দ্বারা তাহার ও শিশুর হজ্জ ও ওমরাহ আদায় হইয়া যাইবে।

৮। যদি নাবালেগ এহরাম বাঁধিয়া হজ্জ বা ওমরাহর কার্যাবলী সম্পূর্ণ আদায় না করে

কিংবা আংশিক আদায় করে অথবা স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি দ্বারা হজ্জ বা ওমরাহ্ নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে তাহার কখনও উক্ত হজ্জ বা ওমরাহর কাজা করিতে কিংবা কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

৯। কোন নাবালেগ হজ্জের এহরাম বাঁধার পর অকুফে আরফার পূর্বে বালেগ হইল। এমতাবস্থায় যদি সে অকুফে আরফার পূর্বে নূতন করিয়া ফরজ হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইবে। নচেৎ নফল হজ্জ আদায় হইবে।

১০। কোন নাবালেগ হজ্জের এহরাম বাঁধার পর আরাফাতে পৌছিল এবং তথায় বালেগ হইল। এমতাবস্থায় যদি সে অকুফের সময় শেষ হওয়ার পূর্বে নূতন করিয়া ফরজ হজ্জের এহরাম বাঁধে তবে বিশুদ্ধ কওল মতে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইবে।

পাগলের এহরাম

১। পাগলের মাসয়ালা এহরাম ও অন্যান্য কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবোধ শিশুর ন্যায়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এহরাম বাঁধার পর পাগল হয়,তবে এহরামের নিষিদ্ধ কার্যাবলীর যাহা সংঘটিত হইলে কাফ্ফারা দিতে হয়, উহার কাফ্ফারা দেওয়াই উত্তম।

২। কোন পাগল অকুফে আরফার সময় শেষ হওয়ার পূর্বে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইল, এখন যদি সে ফরজ হজ্জের নূতন করিয়া এহরাম বাঁধে এবং অকুফ করে তবে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

স্ত্রীলোকের এহরাম

স্ত্রীলোকের এহরামও পুরুষের ন্যায়। কিন্তু ৭টি বিষয় সে পুরুষ হইতে ভিন্নঃ ১। স্ত্রীলোক সেলাই করা জামা কাপড় পরিধান করিতে পারিবে, ২। মুজা ও হাত মুজা ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু হাত মুজা ব্যবহার না করা তাহার জন্য উত্তম। ৩। পর্দার জন্য এমনভাবে মুখ ঢাকিবে যেন কাপড়ের কোন অংশ মুখমণ্ডলের সাথে না লাগে; সুতরাং একখানা কাগজের পিচবোর্ড বা অন্য কোন শক্ত দ্রব্য মাথার উপরে বাঁধিয়া সম্মুখের দিকে একটু বাড়াইয়া রাখিবে এবং উহার উপর দিয়া নেকাব (মাথার কাপড়) সম্মুখের দিকে ঝুলাইয়া রাখিবে যেন, মুখমণ্ডল অন্য লোকের নজরে না পড়ে এবং কাপড়ের কোন অংশ মুখমণ্ডলের সাথে না লাগে। ৪। মাথা ঢাকিয়া রাখিবে। (ইহা শুধু পর্দার জন্য এহরামের জন্য নহে) সুতরাং মাথায় একখানা রুমাল বা কাপড় (ওড়না) দ্বারা বাঁধিয়া রাখা ভাল। তাহা হইলে উক্ত পিচবোর্ডখানা সরিয়া যাওয়া ও মাথার চুল এলোমেলো হইয়া ছিড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ৫। স্ত্রীলোক তালবিয়া উচ্চঃস্বরে বলিবে না। নিজে শুনিতে পায় এমনভাবে আস্তে আস্তে বলিবে। ৬। স্ত্রীলোক এহরামের পূর্বে পর্দা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ কাপড়, জামা ও ওড়না ইত্যাদি পরিধান করিত, এহরাম অবস্থায়ও তদ্রূপ কাপড় জামা ইত্যাদি পরিধান করিবে, যাহাতে পর্দার ব্যাঘাত না হয়। সুগন্ধিযুক্ত রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড়াদি পরিধান করিতে পারিবে না। ৭। রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতে পারিবে।

এহরাম অবস্থায় মাকরূহ কার্যাবলী

১। শরীরের ময়লা দূর করা।

২। মাথা, দাড়ি ও শরীরের কোন অঙ্গে সাবান লাগান কিংবা শরীর মর্দন করা।

৩। মাথা, দাড়ি বা শরীর এমনিভাবে চুলকান যাহাতে পশম দাড়ি বা চুল ছিড়িয়া বা উঠিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়।

৪। গলায় চাদর বাঁধা।

৫। সেলাই করা আবা, কাবা, জুব্বা ও জামা ইত্যাদির আস্তিনে হাত না ঢুকাইয়া স্কন্ধের উপর ফেলিয়া রাখা।

৬। এহরামের কাপড়ে ও চাদরে গিরা দেওয়া কিংবা বোতাম, সেপ'টি পিন বা কাটা দ্বারা উহা আটকাইয়া রাখা।

৭। মাথা ও দাড়ি চিরুনী দিয়া আচড়ান।

৮। সুগন্ধি স্পর্শ করা, উহার ঘ্রাণ লওয়া, আতরের দোকানে বা সুগন্ধির নিকটে ঘ্রাণের উদ্দেশ্যে যাওয়া বা বসা।

৯। খুশবুদার ফল, ফুল বা ঘাসের ঘ্রাণ লওয়া।

১০। মাথা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের কোন অঙ্গে বিনা ওজরে পট্টি বাঁধা।

১১। সাজ সজ্জা করা।

১২। কা'বার গেলাফের ভিতরে মাথা, মুখমণ্ডলের কোন অংশ ঢুকাইয়া দেওয়া।

১৩। কাপড়াদি দ্বারা নাক, চিবুক কিংবা গাল ঢাকা।

১৪। বালিশের উপরে উপুড় হইয়া শয়ন করা। কিন্তু বালিশের উপরে চিত বা কাত হইয়া শয়ন করিলে মাকরূহ হইবে না।

নসীহত- মাকরূহ কাজ হজ্জের ভিতর করিবেন না। যদি কোন মাকরূহ কাজ আপনার দ্বারা সংঘটিত হয় তবে আপনি তওবা করিয়া লজ্জিত হইবেন এবং উহা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিবেন।

এহরাম অবস্থায় জায়েয কার্যাবলী

১। পানি অথবা সাবান মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করা।

২। পানিতে ডুব দেওয়া।

৩। গোসলখানায় প্রবেশ করা ও গরম পানি দ্বারা অজু, গোসল করা।

৪। নাপাকি দূর করিবার জন্য কিংবা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কাপড় চোপড় ধৌত করা।

৫। আংটি ব্যবহার করা এবং কোমরে বেল্ট ও টাকার খুতী বাঁধা।

৬। শরীরে বন্দুক ও তলোয়ার ইত্যাদি ধারণ করা।

৭। শরীয়ত মোতাবেক শত্রুর মোকাবেলা করা।

৮। ছাতা ব্যবহার করা ও তাবু, ঘর, পাহাড় ও গাছ ইত্যাদির ছায়ায় আশ্রয় লওয়া।

৯। খুশবু বিহীন সুরমা ব্যবহার করা, আয়না দেখা ও মেসওয়াক করা।

১০। দাঁত ও ভাঙ্গা নখ ফেলিয়া দেওয়া।

১১। ফোড়া বা ফোসকা গলাইয়া দেওয়া।

১২। মাথায় ও গালের উপরে হাত রাখা।

১৩। এমন জুতা, স্যানডেল ব্যবহার করা, যাহা দ্বারা পায়ের পাতার উপরি ভাগের উঁচু হাড় ঢাকিয়া না যায়।

১৪। চিবুকের নিম্নভাগের দাড়ি ঢাকিয়া রাখা।

১৫। লেপ, কাঁথা, কম্বল বা চাদর দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্বশরীর ঢাকিয়া রাখা।

১৬। এইরূপ টাইট বাঁধা বোঝা মাথায় বহন করা, যাহাতে মাথা ঢাকিয়া না যায়।

১৭। হালাল ব্যক্তি হরমের বাহির হইতে কোন শিকার যবেহ করিয়া দিলে তাহা খাওয়া।

১৮। রান্না করা খুশবুদার খানা খাওয়া।

১৯। পরিপক্ক খানার সহিত সুগন্ধি মিশ্রিত করিয়া খাওয়া।

২০। হরমের বাহিরের গাছপালা ও ঘাস কাটা, যথা- আরাফাতের গাছ ও লতাপাতা কাটিতে পারিবে।

২১। ভাঙ্গা, মচকা ও ক্ষতস্থানে তৈল দেওয়া।

২২। নেকাহ ও বিবাহ করা বা দেওয়া।

২৩। গৃহপালিত উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, মোরগ ও হাঁস ইত্যাদি হরমের ভিতরে ও বাহিরে যবেহ করা ও উহা খাওয়া, কিন্তু কবুতর, হরিণ গৃহপালিত হইলেও যবেহ করা নিষিদ্ধ।

২৪। হরমের ভিতরের ও বাহিরের সাপ, বিচ্ছু, মাছি, মশা, ছারপোকা, কীটপতঙ্গ, পিপীলিকা, কাক, চিল, ইঁদুর, ভিমরুল, টিকটিকি, হিংস্র ও অনিষ্টকর জন্তু মারা।

২৫। হরম ও হরমের বাহিরে আত্মরক্ষার্থে গৃহপালিত বা বন্য যে কোন আক্রমণকারী পশু, পাখী হত্যা করা।

২৬। জলচর প্রাণী, যথা- জলহস্তী, কুম্ভীর, বেঙ, কাকড়া ও সর্বপ্রকার মৎস্য শিকার করা ও মৎস্য খাওয়া।

২৭। ঘী, তৈল ও চর্বি খাওয়া।

২৮। নরমভাবে মাথা, দাড়ি ও শরীর অঙ্গুলীর পেট দ্বারা চুলকান।

২৯। ইনজেকশন, সিঙ্গা দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে শরীরের কোন অংশ হইতে রক্ত বাহির করা। কিন্তু পশম বা চুল বিদূরীত করা নিষেধ।

৩০। অন্যায়ের জন্য চাকর নওকরকে প্রহার করা।

৩১। ইনজেকশন বা টিকা লওয়া।

৩২। ডেকচী, হাঁড়ি ও পাতিল প্রভৃতি কোন শক্ত দ্রব্য মাথায় বহন করা।

৩৩। পরিধেয় কাপড়ে টাকা, ঘড়ি অথবা কলম ইত্যাদি রাখার নিমিত্ত পকেটাদি তৈয়ার করা।

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী এবং উহা সংঘটিত হইলে তাহার কাফ্‌ফারা

১। স্ত্রীর সহিত সঙ্গম অথবা পুরুষে পুরুষে মিলন করিলে।

কাফ্‌ফারা- (ক) হজ্জের এহরাম অবস্থায় আরাফাতে অকুফের পূর্বে উক্ত নিষিদ্ধ কার্য সংঘটিত হইলে হজ্জ ফাসেদ (নষ্ট) হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় তাহাকে হজ্জের বাকি কার্যাবলী করিতে হইবে এবং একটি দম দিতে হইবে। ইহা ছাড়া পরবর্তী বৎসর এই হজ্জ কাজা করিতে হইবে। কিন্তু অকুফে আরাফাতের পরেও মস্তক মুণ্ডন এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে উহা সংঘটিত হইলে হজ্জ ফাসেদ হইবে না। কিন্তু একটি উট কাফ্‌ফারা স্বরূপ কোরবানী করিতে হইবে। আর তাওয়াফে যিয়ারতের পরে মস্তক মুণ্ডনের পূর্বে অথবা মস্তক মুণ্ডনের পরে ও তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সংঘটিত হইলে একটি দম দিতে হইবে।

(খ) ওমরাহর এহরাম অবস্থায়, ওমরাহর তাওয়াফের চারি চক্করের পূর্বে সংঘটিত হইলে, ওমরাহ ফাসেদ হইবে। এবং ওমরাহর অবশিষ্ট কাজ সমাধা করতঃ একটি 'দম' দিবে; এবং পুন উক্ত ওমরাহ কাজা করিবে। কিন্তু চার চক্করের পরে ও মাথা মুণ্ডনের পূর্বে ঘটিলে ওমরাহ ফাসেদ হইবে না। কিন্তু একটি 'দম' দিতে হইবে।

২। সঙ্গমের প্রেরণা দানকারী কার্যাবলী। যথা- কামভাবে চুম্বন, স্পর্শন, আলিঙ্গন ও মোবাশারাতে ফাহেশা ইত্যাদি করিলে।

কাফ্‌ফারা- ইহাতে বীর্যপাত হইলেও হজ্জ ফাসেদ হইবে না। কিন্তু প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া দম দিতে হইবে।

৩। অশ্লীল কথাবার্তা, কামোদ্দীপক আলোচনা, মিথ্যা কথা, শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করা বা ঝগড়া ফাসাদ বা মারামারি ও গালাগালি ইত্যাদি করিলে।

কাফ্‌ফারা- এই জাতীয় কাজ এহরাম ব্যতীত অন্য সময়ও নিষিদ্ধ। এহরাম অবস্থায় ইহা করিলে কঠিন গুনাহ হয়। তাওবাহ ইস্তেগফার করিয়া উহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৪। শরীরের কোন পশম বা চুল যে কোন উপায়ে ফেলিয়া দিলে।

কাফ্‌ফারা- (ক) মাথা দাড়ির চুল অথবা শরীরের যে কোন অঙ্গের পশম এক হইতে তিন গাছ পর্যন্ত ফেলিলে প্রত্যেক চুল বা পশমের পরিবর্তে একটি খেজুর অথবা এক টুকরা রুটি মিসকীনকে দান করিবে।

(খ) তিন গাছের বেশী ও এক -চতুর্থাংশের কম ফেলিলে ছদকায় ফিতরের পরিমাণ দান করিবে। (ওয়াজিব)

(গ) এক-চতুর্থাংশ বা উহার বেশী চুল বা পশম ফেলিলে একটি দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব)

(ঘ) কোন চুল বা পশম বিনা মর্দনে বা বিনা স্পর্শে আপনা হইতে পড়িয়া গেলে কোন কাফ্ফারা লাগিবে না।

(ঙ) শরীরের কোন অঙ্গে অপারেশন করিলে বা সিঙ্গা লাগাইলে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। যদি উহাতে পশম উঠিয়া যায়, তবে উল্লিখিত নিয়মে কাফ্ফারা দিতে হইবে।

(চ) শরীরের কোন চামড়া কাটিয়া উঠাইয়া ফেলিলে, উহাতে যে চুল বা পশম উঠিয়া যাইবে, সেইজন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

৫। নিজের বা অপরের মাথার চুল, দাড়ি বা মোচ অথবা কোন অঙ্গের লোম কর্তন, মুণ্ডন ও যে কোন উপায় উহা ফেলিয়া দিলে।

কাফ্ফারা- (ক) মস্তকের চুলের কিংবা দাড়ির এক চতুর্থাংশ বা তাহার বেশী মুণ্ডন, কর্তন করিলে একটি 'দম' দিবে। আর এক চতুর্থাংশের কম কর্তন বা মুণ্ডন করিলে ছদকা ওয়াজিব হইবে। এবং স্ত্রীলোক এক অঙ্গুলী পরিমাণ অথবা ততোধিক চুল কর্তন বা মুণ্ডন করিলে একটি দম দিবে।

(খ) মোচের কোন অংশ কিংবা সম্পূর্ণ কর্তন বা মুণ্ডন করিলে একটি ছদকাহ দিবে। (ওয়াজিব)

(গ) ঘাড়ের বা বগলের কিংবা নাভীর নিচের সম্পূর্ণ লোম মুণ্ডন করিলে একটি দম দিবে। আর আংশিক মুণ্ডন করিলে ছদকাহ দিবে। (ওয়াজিব)

(ঘ) এহরামধারী অপর এহরামধারীর মাথা মুণ্ডন করিলে, মুণ্ডনকারীর একটি ছদকাহ এবং মুণ্ডিত ব্যক্তির একটি দম দিতে হইবে।

(ঙ) এহরামধারী এহরাম বিহীন ব্যক্তির মাথা মুণ্ডন করিলে মুণ্ডনকারীর কিছু ছদকাহ দিতে হইবে।

(চ) এহরাম বিহীন ব্যক্তি এহরামধারীর মস্তক মুণ্ডন করিলে মুণ্ডিত ব্যক্তি একটি দম দিবে ও মুণ্ডনকারী একটি ছদকায় ফিতর পরিমাণ দান করিবে।

৬। হাত পায়ের নখ কাটিয়া বা ছিড়িয়া ফেলিলে।

কাফ্ফারা- (ক) এক হাতের বা এক পায়ের অথবা উভয় হাতের বা উভয় পায়ের কিংবা চার হাত পায়ের নখ এক বৈঠকে কাটিলে একটি মাত্র দম ওয়াজিব হইবে। কিন্তু চার বৈঠকে কাটিলে চারটি দম দিতে হইবে।

(খ) যদি এক বৈঠকে একটি হাতের ও দ্বিতীয় বৈঠকে অপর হাতের নখ কাটে, তবে দুইটি দম দিতে হইবে।

(গ) যদি এক হাতের বা এক পায়ের পাঁচ নখের কম কাটে কিংবা একাধিক অঙ্গ হইতে পাঁচটি নখ কাটে,তবে এই সকল অবস্থাতে প্রতিটি নখের পরিবর্তে একটি ছদকায় ফিতর পরিমাণ দান করিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত নখের ছদকাহ সমূহ যদি একটি দমের মূল্যের সমান হয়, তবে উহা হইতে কিছু কমাইয়া ছদকাহ আদায় করিবে যেন

ছদকাহ দমের মূল্যের সমান না হয়।

(ঘ) যদি কাহারও হাত, পা বা উহার অঙ্গুলী কাটিয়া পৃথক হইয়া যায়, তবে নখসহ হাত, পা অঙ্গুলী পৃথক হওয়ার দরুন কোন দম বা ছদকাহ দিতে হইবে না।

(ঙ) এহরামধারী অন্য এহরামধারীর বা এহরাম বিহীন ব্যক্তির নখ কাটিলে কিংবা এহরাম বিহীন ব্যক্তি এহরামধারীর নখ কাটিলে ৫নং দফায় উল্লেখিত ঘ, ঙ ও চ এর হুকুমের ন্যায় হুকুম হইবে। (কাঁচা নখ ছিড়িয়া ফেলিলে তাহার হুকুমও নখ কাটার ন্যায়)

৭। পুরুষে সেলাই করা কাপড় পরিধান করিলে।

কাফ্ফারা- (ক) সেলাই করা কাপড়, জামা ও গেঞ্জি প্রভৃতি পূর্ণ একদিন বা পূর্ণ এক রাত্রি কিংবা দিবা রাত্রে মোট এক দিবস বা এক রজনী পরিমাণ সময় পরিধান করিলে একটি দম দিতে হইবে। ইহার কম নিম্নে এক ঘন্টা পরিমাণ সময় পরিধান করিলে একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান করিবে। আর এক ঘন্টার কম সময় পরিধান করিলে এক মুষ্টি গম দান করিবে।

(খ) একাধিক দিন পরিধান করিয়া থাকিলেও একটি দম দিতে হইবে। একদিন পরিয়া রাত্রে খুলিয়া রাখিলে, পরে আবার দিনে পরিধান করিলেও একটি দম দিতে হইবে।

(গ) একদিন পরিয়া আর পরিবে না নিয়ত করতঃ উহা খুলিয়া ফেলিল, পুনরায় এক দিবস বা এক রাত্রি পরিমাণ সময় বা ততোধিক সময় পরিধান করিল, এমতাবস্থায় দুইটি দম দিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, ছোবহে ছাদেকের প্রারম্ভ হইতে দিবসের হিসাব ধরিতে হইবে এবং সূর্যাস্ত হইতে ছোবহে ছাদেকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সময় শরয়ী রাত ধর্তব্য হইবে।

৮। পুরুষের পক্ষে পাগড়ী, টুপী, পট্টি বা কাপড় ইত্যাদি দ্বারা মস্তক আবৃত করা, জুতা অথবা স্যাণ্ডেল ব্যবহার করা যদ্বারা পায়ের পাতাদ্বয়ের উপরিভাগের মধ্যস্থিত উঁচু হাড় ঢাকিয়া যায়; মোজা, পায়তাবা বা হাতমোজা ব্যবহার করা এবং পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে পট্টি বাঁধা কিংবা উহা ঢাকিয়া রাখা, কিংবা মস্তকে এমন কোন বোঝা বহন করা যাহাতে মস্তক ঢাকিয়া যায়।

কাফ্ফারা- যদি একদিন বা একরাত্রি বা তাহার অধিক সময় এহরামধারী পুরুষ সম্পূর্ণ মস্তক বা মুখমণ্ডল কিংবা উহার এক-চতুর্থাংশ কাপড় ইত্যাদি দ্বারা ঢাকিয়া রাখে অথবা স্ত্রীলোক উক্তরূপ তাহার মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখে, তবে একটি 'দম' ওয়াজিব হইবে। এক-চতুর্থাংশের কম ঢাকিলে অথবা এক দিবস বা এক রাত্রির কম সময় ঢাকিলে ছদকাহ ওয়াজিব হইবে। পুরুষে এক দিবস বা এক রজনী হাতমোজা পরিধান করিলে বা পায়ের পাতার উপরিস্থিত উঁচু হাড্ডী ঢাকিয়া জুতা, মোজা, স্যাণ্ডেল, ইংলিশ জুতা, ডার্বি, পাম্পসু, কাবুলী স্যাণ্ডেল বা পায়তাবা পরিধান করিলে একটি 'দম' দিবে। উহার কম সময় হইলে একটি ছদকাহ ওয়াজিব হইবে। অস্বাভাবিক উপায় মস্তক,

মুখমণ্ডল, বা পায়ের উল্লিখিত হাড্ডি ঢাকিলে, যথা- বাসন, পেয়ালা, পাথর, ঝুড়ি, লাকড়ি, কাচ প্রভৃতি দ্বারা মস্তক, মুখমণ্ডল, পায়ের পাতার উঁচু হাড় ঢাকিলে এবং কাঁথা কম্বল বা লেপ ইত্যাদি দ্বারা পদদ্বয়ের উঁচু হাড্ডিদ্বয় ঢাকিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। এহরামধারী ব্যক্তির নিদ্রাবস্থায় অন্য কেহ বিনা ওজরে মস্তক চাপিয়া দিলে, এহরামধারীর প্রতি দম ওয়াজিব হইবে। ওজর বশতঃ হইলে-১। দম, ২। ছয়জন মিসকীনকে ছয়টি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান ও ৩। তিনটি রোযা। এই তিন দফার যে কোন একটি আদায় করিবে।

৯। শরীরে বা জামা কাপড়ে খুশবু লাগান ও খুশবুযুক্ত কাপড় চোপড় পরিধান করা, শরীরের কোন অঙ্গ, চুল বা দাড়িতে সুগন্ধি খেজাব লাগান কিংবা মাথার চুলে ঘন খেজাব লাগান ও সুগন্ধি ভক্ষণ করা বা সুগন্ধি মিশ্রিত অপরিপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করা। যথা- এলাচি, দারচিনি, জাতিফল বা সুগন্ধি মশল্লা, মৌরী বা জর্দা দিয়া পান খাওয়া, গোলাপ কেওড়া বা অন্য কোন সুগন্ধি মিশ্রিত শরবত পান করা ও খুশবুদার পান, যথা- ছাচী পান খাওয়া।

কাফ্ফারা- সর্বশরীরে বা শরীরের যে কোন এক অঙ্গে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে বেশী পরিমাণ সুগন্ধি লাগাইলেই একটি দম দেওয়া ওয়াজিব। উক্ত দম ওয়াজিব হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শরীর ধৌত করিয়া সুগন্ধি দূর করিয়া ফেলিবে। দম আদায় করিবার পরেও যদি শরীরে সুগন্ধি থাকে তবে পুনঃ আর একটি দম দিতে হইবে। শরীরে সুগন্ধি লাগাইবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিদূরিত করিলেও দম দেওয়া ওয়াজিব হইবে। সুগন্ধিযুক্ত ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইলে ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ আদায় করিতে হইবে। কয়েকবার লাগাইলে একটি দম দিতে হইবে।

(খ) পুরুষের কাপড়ে বা স্ত্রীলোকের জামা কাপড়ে খুশবু লাগাইলে অথবা পুরুষে খুশবু যুক্ত কাপড় ও স্ত্রীলোক খুশবু যুক্ত জামা কাপড় এক দিবস পরিধান করিলে একটি দম দিতে হইবে। এক দিবসের কম সময় পরিধান করিলে একটি ছদকাহ দিতে হইবে। কাপড় চোপড়ে খুশবু লাগামাত্র উহা দূর করিয়া ফেলিলে দম বা ছদকা কিছুই দিতে হইবে না।

এক বর্গবিঘত খুশবুদার কাপড় এক দিবস পরিধান করিলে একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ আদায় করিবে। ইহার কম সময় ব্যবহার করিলে এক মুষ্টি গম গরীব মিসকীনকে দান করিবে। খুশবুদার সুরমা বারংবার লাগাইলে একটি দম দিতে হইবে এবং একবার বা দুইবার লাগাইলে একটি ছদকাহ আদায় করিবে।

(গ) বেশী পরিমাণে সুগন্ধি মুখ অবয়বের অধিকাংশ স্থানে লাগাইলে, পানাহার করিলে একটি দম ওয়াজিব হইবে। মুখ অবয়বের কম স্থানে লাগাইলে ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান করিবে। সুগন্ধি যুক্ত পরিপক্ক দ্রব্য কিংবা পরিপক্ক দ্রব্যের সহিত সুগন্ধি মিশাইয়া খাইলে দম বা ছদকাহ কিছুই দিতে হইবে না। অপরিপক্ক দ্রব্যের সহিত সুগন্ধি

মিশাইয়া খাইলে যদি সুগন্ধির পরিমাণ বেশী হয়, তাহা হইলে একটি দম দিতে হইবে। চা অথবা পান কিংবা শরবতের সহিত সুগন্ধি মিশ্রিত করিয়া পানাহার করিলে যদি সুগন্ধির ঘ্রাণ পূর্বের মত থাকে তবে একটি দম দিতে হইবে। আর যদি মিশ্রণের পর সুগন্ধির ঘ্রাণ কমিয়া যায় তবে ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান করিতে হইবে। তবে কয়েকবার পান করিলে একটি দম দিতে হইবে।

(ঘ) দাড়িতে বা হাতে অথবা মাথার এক-চতুর্থাংশে বা পূর্ণ এক অঙ্গে এক দিবস বা এক রজনী মেহেন্দি বাটিয়া লাগাইলে, পুরুষের জন্য অঙ্গ ঢাকা ও খুশবু লাগান হেতু দুইটি 'দম' দিতে হইবে এবং স্ত্রীলোক একটি 'দম' দিবে। এক দিবসের কম সময় পরিমাণ লাগাইয়া রাখিলে একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ ও একটি 'দম' আদায় করিতে হইবে। মেহেন্দি পাতলা (তরল) হইলে এক দিবসের জন্য একটি দম ও এক দিবসের কম হইলে মাত্র একটি ছদকাহ দিবে।

১০। তৈল ব্যবহার করিলে-

কাফ্‌ফারা- (ক) সুগন্ধি তৈল চুলে কিংবা শরীরে বা কোন পূর্ণ অঙ্গে ব্যবহার করিলে একটি দম দিতে হইবে। এক পূর্ণ অঙ্গের কম স্থানে ব্যবহার করিলে একটি ছদকাহ দিতে হইবে।

(খ) সুগন্ধিবিহীন তৈল অধিক পরিমাণে মনের প্রফুল্লতার জন্য ব্যবহার করিলে একটি দম দিতে হইবে। কিন্তু ঔষধ রূপে ব্যবহার কিংবা ভক্ষণ করিলে বা পায়ের ফাটলে ও জখমে উহা লাগাইলে অথবা উহার নাস টানিলে বা উহা কানের মধ্যে ঢালিয়া দিলে কোন কাফ্‌ফারা লাগিবে না। অল্প ব্যবহার করিলে একটি ছদকাহ দিবে।

(গ) ঘী, চর্বি শরীরে বা কাপড়ে লাগাইলে বা খাইলে কোন কাফ্‌ফারা লাগিবে না।

১১। হরমের বহির্দেশ ও হরমের স্থলচর বন্য প্রাণী অর্থাৎ পশু-পাখী যথা- হরিণ, বন্য গাধা ও গরু, খরগোশ, কবুতর, টিড্ডি, উটপাখী ইত্যাদি শিকার করা, উহা যবেহ করা, অপরকে শিকারের উদ্দেশ্যে উহা দেখাইয়া দেওয়া, শিকারে সাহায্য করা কিংবা শিকারের প্রাণীকে তাহার স্বীয় স্থান হইতে অনাবশ্যক তাড়াইয়া দেওয়া বা উহা ক্রয়-বিক্রয় করিলে।

কাফ্‌ফারা- (ক) হরমের বা হরমের বহির্দেশের বন্য পশু-পাখী অনাহত ও জীবন্ত শিকার করিলে তৎক্ষণাত উহা ছাড়িয়া দিবে এবং তাওবাহ ইস্তেগফার করিবে। আর আহত করতঃ শিকার করিলে আহত করা হেতু উক্ত প্রাণীর যে পরিমাণ মূল্য কমিয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ মিসকীনকে দান করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি শিকার আহত অবস্থায় মরিয়া যায় কিংবা মারিয়া শিকার করে অথবা যবেহ করে, তবে উহার পূর্ণ দণ্ড দেওয়া ওয়াজিব। শিকারের মূল্য নির্ধারণ বিশেষজ্ঞ দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান উহার মূল্য নির্ধারণ করিবে। (১) একটি দম দেওয়া, (২) ঐ মূল্য পরিমাণ গম বা আটা ময়দা দেওয়া; (৩) ঐ মূল্যে যে কয়টি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ হয় সেই কয়টি রোযা

রাখা। এই তিন প্রকার কাফ্ফারার যে কোন এক প্রকার আদায় করিতে হইবে। যদি শিকারের মূল্য দমের মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তবে শিকারের মূল্যের পরিমাণ ছদকায়ে ফিতর দান করিবে। অথবা ঐ মূল্যে যে কয়টি ছদকায়ে ফিতর হয় সেই কয়টি রোযা রাখিবে। এক একটি ছদকায়ে ফিতরের পরিবর্তে এক একটি রোযা রাখিতে হইবে এবং আংশিক ছদকায়ে ফিতরের জন্য একটি রোযা রাখিতে হইবে। আর ছদকায়ে ফিতর আদায় করিবার বেলায় প্রত্যেক মিসকীনকে একটি ছদকায়ে ফিতরের কম বা অধিক দান করিতে পারিবে না। একজন মিসকীনকে পূর্ণ একটি ছদকায়ে ফিতরই দান করিতে হইবে। উক্তরূপ দানের পর যদি একটি পূর্ণ ছদকায়ে ফিতরের কম অবশিষ্ট থাকে, তবে উহাই অন্য আর একজন মিসকীনকে দান করিবে। আর যদি শিকারের মূল্য একটি ছদকায়ে ফিতরের চেয়ে কম হয়, তবে উহা একটি মিসকীনকে দান করিয়া দিবে অথবা একটি রোযা রাখিবে।

(খ) মোহরেমের শিকার মোহরেম স্বয়ং অথবা গায়ের মোহরেম ব্যক্তি যবেহ করিলে কিংবা গায়ের মোহরেমের শিকার মোহরেম ব্যক্তি যবেহ করিলে উভয় অবস্থাতেই উক্ত শিকার ভক্ষণ করা সকলের জন্যই হারাম।

(গ) মোহরেম ব্যক্তি অপর মোহরেমকে শিকার দেখাইয়া দিল এবং সে উহা শিকার করিয়া মারিয়া ফেলিল। এমতাবস্থায় উভয় মোহরেমের প্রতি দুইটি দণ্ড ওয়াজিব হইবে। আর যদি কোন মোহরেম ব্যক্তি কোন হালাল ব্যক্তিকে শিকার দেখাইয়া দেয় বা সাহায্য করে এবং শিকারটি মারিয়া ফেলে, তবে মোহরেমের উপর একটি দণ্ড ওয়াজিব হইবে। অর্থাৎ একটি শিকারের মূল্য তাহার প্রতি দান করা ওয়াজিব হইবে।

(ঘ) কোন মোহরেম ব্যক্তি যদি কোন বন্য পশুপক্ষী তাহার স্বীয় স্থান হইতে অনাবশ্যক তাড়াইয়া দেয়, তবে মোহরেম ব্যক্তি গুনাহগার হইবে। যদি বিতাড়িত প্রাণী ভয়ে কোন গাছ বা পাথরে ধাক্কা খাইয়া মরিয়া যায় বা আহত হয়, তবে উক্ত প্রাণীর দণ্ড পূর্ববৎ আদায় করিবে। আর যদি না মরিয়া থাকে, তবে প্রাণীটিকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিজের হেফাজতে রাখিবে ও সুস্থ হইলে ছাড়িয়া দিবে। সুস্থ হওয়ার পর মরিয়া গেলে কোন দণ্ড লাগিবে না। (দণ্ডের বিবরণ নিষিদ্ধাবলীর ১১ 'ক' দফায় দ্রষ্টব্য)

(ঙ) মোহরেম ব্যক্তি হরমে বা হরমের বহির্দেশে জীবন্ত বা যবেহকৃত কোন শিকার কেনা-বেচা করিলে উহা শরীয়ত অনুসারে বাতিল হইবে। যদি উক্ত প্রাণী মোহরেম ক্রেতার হাতে মারা যায়, তবে উভয়কে দুইটি দণ্ড দিতে হইবে।

১২। নিজের মাথার, শরীরের উকুন মারা, শরীর হইতে উকুন দূর করা, অন্য কাহাকেও উহা মারিতে বলা, কিংবা নিজের উকুনযুক্ত কাপড় ও উকুন দূর করার নিমিত্ত রৌদ্রে দেওয়া বা ধৌত করা এবং টিড্ডি মারিলে।

কাফ্ফারা- (ক) মাথার, দাড়ির, শরীরের একটি উকুন মারিলে অথবা ফেলিয়া দিলে, তাহার পরিবর্তে এক টুকরা রুটি দান করিবে। দুই তিনটি উকুনের পরিবর্তে এক

মুষ্টি আটা.ময়দা দান করিবে। তিনটির অধিক উকুনের বদলে একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ মিসকীনকে দান করিবে।

(খ) মোহরেম কোন গায়ের মোহরেমকে তাহার উকুন দূর করিতে বা মারিতে আদেশ অথবা ইঙ্গিত করিলে অথবা তাহার উকুনযুক্ত কাপড় উকুন বিদূরিত করিতে কিংবা মারিয়া ফেলিতে গায়ের মোহরেমকে দিলে, সে তাহার আদেশ অনুযায়ী উহা করিল। এমতাবস্থায় 'ক' বিবরণ মোতাবেক মোহরেম উকুন বিনষ্ট করানোর দরুন ছদকাহ আদায় করিবে।

(গ) উকুন বিনষ্ট করার মানসে মোহরেম স্বীয় কাপড় রৌদ্রে কিংবা পানিতে রাখিল বা উহা ধৌত করিল, এমতাবস্থায়ও তাহাকে 'ক' এর বিবরণ মত ছদকাহ দিতে হইবে। আর যদি উকুন বিনষ্ট করার মানসে উহা না করিয়া থাকে, তবে তাহাতে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। মোহরেম অন্য কাহারও উকুন মারিলে বা দূর করিলে তাহাতে দোষ হইবে না।

মাসয়ালা- যদি কোন মোহরেম মাটির উপর অথবা অন্য কোন স্থানে উকুন দেখিয়া মারিয়া ফেলে, তবে তাহাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

(ঘ) উপরে বর্ণিত উকুনের কাফ্ফারার ন্যায় টিড্ডিরও কাফ্ফারা দিতে হইবে।

১৩। চুলে ঘন আঠাল কোন দ্রব্য লাগান যথা- কাদামাটি, আঠাল ক্রীম, বাটা চন্দন ও মেথী লাগাইলে।

কাফ্ফারা- সুগন্ধিযুক্ত ঘন আঠাল কোন দ্রব্য দ্বারা মোহরেম ব্যক্তি স্বীয় মাথার চুলের এক-চতুর্থাংশে অথবা উহার অধিক পরিমাণ চুলে এক দিবস কিংবা এক রজনী প্রলেপ দিয়া রাখিলে। এমতাবস্থায় সে উহা দূর করতঃ দুইটি 'দম' দিবে। এক দিবস বা এক রজনীর কম সময় প্রলেপ দিয়া রাখিলে একটি দম ও একটি ছদকাহ আদায় করিবে। কিন্তু মোহরেম স্ত্রীলোক উল্লিখিত সর্বক্ষেত্রে মাত্র একটি দম আদায় করিবে।

আঠাল দ্রব্য সুগন্ধিযুক্ত না হইলে এক দিবস বা এক রজনীর জন্য শুধু মোহরেম পুরুষ একটি 'দম' দিবে এবং ইহার কম সময়ের জন্য একটি ছদকা আদায় করিবে। স্ত্রীলোকের কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

১৪। হরমের এলাকার কোন বৃক্ষ, তরুলতা বা ঘাস কর্তন কিংবা মূলচ্ছেদন করা বা ছিড়িয়া ফেলিলে। (মোহরেম ও গায়রে মোহরেম সকলের পক্ষে)

কাফ্ফারা- হরম শরীফের গাছপালা, তরুলতা ও ঘাস ইত্যাদি চারি প্রকার- (১) মানব কর্তৃক চাষ, রোপণ ও বপন করা হয়। যথা- কৃষিজাত উদ্ভিদ। (২) যাহা মানব কর্তৃক রোপণ করা হইয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ উহার চাষ রোপণ করা হয় না। যথা- বাবুল গাছ ও অন্য কোন তরুলতা। (৩) যাহা আপনা হইতে জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু মানব কর্তৃক ঐ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মান হয়। যথা- মেসওয়াকের গাছ ও অন্য কোন তরুলতা।

মোহরেম বা গায়ের মোহরেম ব্যক্তি উপরোক্ত তিন শ্রেণীর গাছপাতা বা তরুলতা কিংবা উহার শাখা প্রশাখা কর্তন করিলে বা সম্পূর্ণ গাছটির মূলোৎপাটন করিলে বা অন্য কোন উপায় বিনষ্ট করিলে কিংবা উহা কাজে লাগাইলে, তাহাদের কোন কাফ্ফারা লাগিবে না। কিন্তু গাছের যদি কোন মালিক থাকে, তবে তাহাকে উহার মূল্য দিতে হইবে।

(৪) (ক) যে সকল উদ্ভিদ স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে মানব যখন উহা জন্মায় না; যথা- উম্মে সায়লান গাছ। মোহরেম বা গায়ের মোহরেম ব্যক্তি উক্ত শ্রেণীর গাছ কাটিলে পুড়িয়া বা ছিড়িয়া ফেলিলে অথবা মূলোচ্ছেদ করিলে উহার মূল্য ছদকাহ করিয়া দিবে। কিন্তু এই শ্রেণীর শুকনা গাছ কাটিলে কোন কাফ্ফারা লাগিবে না। এইরূপ স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন "এজখের" নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস যাহা কবরের উপর ও ঘরের ছাদে ব্যবহার করা হয়, তাহা কাঁচা হইলেও কাটিতে পারিবে। কোন কাফ্ফারা লাগিবে না।

(খ) যে যে শ্রেণীর গাছপালা ও তরুলতা কাটিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, উহা যদি কাহারও দখলিকৃত হয় তবে কর্তনকারিকে দিগুণ মূল্য দিতে হইবে। এক ভাগ মালিককে ও অপর ভাগ মিসকীনকে দিবে।

(গ) তাম্বু বা খিমা গাড়িতে, চুলা খুদিতে, নিজে বা সওয়ারী চলিবার কালে কোন তরুলতা ও ঘাসপাতা উৎপাটিত হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে কোন কাফ্ফারা লাগিবে না।

(ঘ) হরমের কোন কাচা ডাল দ্বারা মেসওয়াক বানাইতে পারিবে না।

কাফ্ফারার আনুষঙ্গিক মাসায়েল

১। মোহরেম উপরোক্ত নিষিদ্ধ কার্যাবলী স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভুলবশতঃ জ্ঞাতসারে, শয়নে, জাগ্রতাবস্থায়, অন্যের অনুরোধে বা চাপে, হুঁশ অবস্থায় বা বেহুঁশ অবস্থায় অর্থাৎ যে কোন কারণে করিয়া থাকুক না কেন, তাহাকে অবশ্যই বর্ণিত বিবরণ মোতাবেক কাফ্ফারা ও দণ্ড (ক্ষতিপূরণ) দিতে হইবে।

২। বিনা ওজরে এহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করিলে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী কাফ্ফারা আদায় করিবে এবং স্বেচ্ছাকৃত গুনাহ হইতে তাওবাহ করিবে।

৩। ওজর বশতঃ কোন নিষিদ্ধ কাজ পূর্ণভাবে করিলে (ক) একটি 'দম', (খ) তিনটি রোযা, (গ) ছয়জন মিসকীনকে ছয়টি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান, - এই তিনটি কাফ্ফারার যে কোন একটি আদায় করিতে হইবে। আর যদি আংশিকভাবে কোন নিষিদ্ধ কাজ করে, তবে তাহাকে (১) তিনটি রোযা, (২) ছয়জন মিসকীনকে ছয়টি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান, এতদুভয় কাফ্ফারার একটি আদায় করিতে হইবে।

৪। কতকগুলি শরীয়ত সমর্থিত ওজর নিম্নে দেওয়া হইল। যথা- (১) বিভিন্ন প্রকারের জ্বর, (২) ভীষণ শীত, (৩) ভীষণ গরম, (৪) জখম, (৫) ফোঁড়া, (৬) পূর্ণ

মাথা বেদনা, (৭) আংশিক মাথা বেদনা, ৯৮) মাথায় সাংঘাতিক উকুন পড়া ইত্যাদি।

৫। এক বৎসর বয়স্ক একটি ছাগল, ভেড়া বা একটি দুম্বা দ্বারা কোরবানীর ন্যায় মাত্র একটি 'দম' আদায় হইবে। একটি গরু বা উট দ্বারা সাতটি 'দম' দেওয়া চলিবে। দুই বৎসর বয়স্ক গরু ও পাঁচ বৎসর বয়স্ক উট দ্বারা 'দম' দিতে হইবে। নচেৎ উহা আদায় হইবে না।

৬। নিষিদ্ধ কার্য সমূহের কাফ্ফারা সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব নহে। তবে সাথে সাথে উহা আদায় করিয়া দেওয়া ভাল। শেষ বয়স পর্যন্ত কেহ আদায় না করিয়া থাকিলে মৃত্যুর পূর্বে তাহার অসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব। পরে অসিয়ত মোতাবেক কেহ আদায় করিলে উহা আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে রোযা রাখা জায়েয নহে।

৭। কাফ্ফারার 'দম' যবেহ করতঃ গরীব মিসকীনকে দিতে হইবে। জীবন্ত দিলে কাফ্ফারা আদায় হইবে না। মিসকীন পাওয়া না গেলে কাফ্ফারার নিয়ত করতঃ যবেহ করিলেই উহা আদায় হইয়া যাইবে।

৮। কাফ্ফারার 'দম' হরম শরীফের সীমানার ভিতরে যবেহ করিতে হইবে। হরম শরীফের বাহিরে, যথা- আরাফাত, জেদ্দা ও মদীনা শরীফে বা বাড়িতে আসিয়া যবেহ করিলে উহা আদায় হইবে না।

৯। দমের গোশত ও ছদকাহ মিসকীনের হক, উহা দমদাতা তাহার মা-বাপ, সন্তান-সন্তুতি স্ত্রীলোক হইলে তাহার স্বামী কিংবা অন্য কোন মালদারের পক্ষে গ্রহণ করা জায়েয নাই। ভ্রাতা, ভগ্নি, ফুফু, মামু, মিসকীন হইলে তাহাদিগকে দেওয়া জায়েয আছে।

১০। কাফ্ফারা আদায়কালীন উহার নিয়ত করিতে হইবে। নচেৎ কাফ্ফারা আদায় হইবে না।

১১। রোযা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করিলে কিসের কাফ্ফারা আদায় করিতেছে তাহার নিয়ত ছোবহে ছাদেকের পূর্বে করিতে হইবে। নচেৎ কাফ্ফারা আদায় হইবে না।

১২। কাফ্ফারার রোযা রমজান মাস, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা ও আইয়্যামে তাশরীক ব্যতীত অন্য সময় যেখানে খুশি থাকিয়া আদায় করিতে পারিবে।

১৩। কাফ্ফারার রোযা ধারাবাহিকভাবে রাখিতে হইবে না, তবে ধারাবাহিক রাখা উত্তম।

১৪। হজ্জে ক্বেরানকারী কোন নিষিদ্ধ কার্য করিলে তাহাকে দুইটি কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। কেননা, সে ওমরাহ ও হজ্জের দুইটি যুক্ত এহরাম বাঁধিয়াছে।

১৫। যেখানে শুধু 'ছদকাহ' শব্দ লিখা হইয়াছে, সেখানে একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

১৬। কেহ এহরাম, তওয়াফ, ওমরাহ এবং অন্যান্য কার্যাবলীর সম্বন্ধীয় কোন কাফ্-ফারার 'দম' আদায় না করতঃ বাড়ীতে আসিল। এমতাবস্থায় তাহকে স্বয়ং পুনঃ হরমের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতঃ 'দম' যবেহ করিতে হইবে। অথবা লোক মারফত পাঠাইয়া তথায় যবেহ করিয়া দিতে বলিবে। নচেৎ গুনাহ্গার হইবে।

হজ্জে তামাত্তো

হজ্জে তামাত্তো'তে প্রথমত ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া ওমরাহর কার্যাবলী সমাধা করতঃ এহরাম খুলিতে হয়। অতঃপর পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের মানাসেক (কার্যাবলী) সম্পন্ন করিতে হয়।

ওমরাহর এহরামের কার্যাবলীঃ আপনি এহরামের একখানা কাপড় পরিধান করিবেন। আর একখানা গায় দিবেন যেন আপনার উভয় স্কন্ধ ঢাকা থাকে। এক বগলের নীচ হইতে উঠাইয়া গায় দিবেন না। অতঃপর এহরামের দুই রাকয়াত সুন্নাত নামায পড়িবেন। এই নামায পড়িবার সময় মাথা টুপী বা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লইবেন। প্রথম রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকয়াতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ পড়িবেন। নামাযের সালাম ফিরাইয়া ঐ বৈঠকে কিবলামুখী থাকিয়া মাথার টুপি বা চাদর ফেলিয়া নিম্নরূপে ওমরাহর এহরামের নিয়তে পাঠ করিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ- نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল ওমরাতা ফাইয়াচ্ছেরহা লী ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী, নাওয়াইতুল ওমরাতা ও আহরামতু বিহা লিল্লাহি তায়ালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ করিতে চাই। তুমি উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং উহা আমার তরফ হইতে কবুল কর। আমি ওমরাহর নিয়ত করিলাম এবং আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে উহার এহরাম বাঁধিলাম।

এই নিয়ত পড়িবার পরক্ষণেই নিম্নলিখিত "তালবীয়া" দোয়াটি অন্ততঃ তিনবার উচ্চঃস্বরে পড়িবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকগণ "তালবীয়া" আস্তে আস্তে পড়িবে।

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ- اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ-

উচ্চারণ- লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নেয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।

অর্থ- আমি তোমার গোলাম, তোমার ডাকে হাজির হইয়াছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, তোমার ডাকে হাজির হইয়াছি। আমি তোমার গোলাম, তোমার ডাকে হাজির হইয়াছি। তোমার কোন শরীক নাই। আমি তোমার গোলাম, তোমার ডাকে হাজির হইয়াছি। প্রশংসা সবই তোমার জন্য এবং নেয়ামত সমূহও তোমার। এবং তুমিই সকলের মালিক তোমার কোন শরীক নাই।

হজ্জে তামাত্তো'র ওমরাহর তাওয়াফ

হজ্জে তামাত্তো আদায়কারী ব্যক্তি এহরাম বাঁধার পরে মক্কা শরীফ পৌছিয়া প্রথমে ওমরাহর কার্যাবলী আদায় করিতে হইবে। সর্ব প্রথমে আপনি মসজিদে হরমে দাখিল হইয়া ওমরাহর ফরজ তাওয়াফ করিবেন। এই তাওয়াফে আপনাকে 'এজতেবা' ও 'রমল' করিতে হইবে।

এজতেবা-গায়ের চাদরখানার মধ্যস্থল ডান বগলের নীচে রাখিয়া উহার উভয় মুখ বাম স্কন্ধের উপর ফেলিয়া ডান স্কন্ধ খোলা রাখিবেন। ইহাকেই 'এজতেবা' বলে। যে তাওয়াফের পর আপনাকে সায়ী করিতে হইবে, সেই তাওয়াফের সম্পূর্ণ চক্করে আপনি এজতেবা করতঃ তাওয়াফ করিবেন (সুন্নাত)। তাওয়াফ শেষ হইলে এজতেবা ছাড়িয়া উভয় স্কন্ধ ঢাকিয়া চাদর গায়ে দিবেন এবং তাওয়াফের ওয়াজিব নামায পড়িবেন। প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রীলোকগণ এজতেবা করিবে না।

রমল- যে তাওয়াফের পরে আপনাকে সায়ী করিতে হইবে সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে আপনাকে রমল করিতে হইবে (সুন্নাত)। আর শেষের চার চক্করে স্বাভাবিক ভাবে চলিবেন।

রমল- প্রথম তিন চক্করে কাঁধ হেলাইয়া বীর পুরুষের মত স্বজোরে ঘন ঘন পা ফেলিয়া একটু কুদিয়া কুদিয়া চলাকে 'রমল' বলে। মুয়াল্লিমগণ রমল করিবার কায়দা দেখাইয়া থাকেন, তাহাদিগকে দেখিয়া সেইরূপ করিবেন।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্করে রমল করিতে হয়। যদি আপনি প্রথম ও দ্বিতীয় চক্করে রমল করিতে ভুলিয়া যান, তবে শুধু তৃতীয় চক্করে রমল করিবেন। আর প্রথম তিন চক্করে রমল করিতে ভুলিয়া যান, তবে পরবর্তী কোন চক্করে আর রমল করিবেন না। ভুলে রমল না করিলে তাহাতে কোন দম ওয়াজিব হইবে না। ভীড়ের মধ্যে রমল করিতে অসুবিধা হইলে রমল ত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকগণ রমল করিবে না।

তাওয়াফ করিবার নিয়মঃ আপনাকে এখন ওমরাহর তাওয়াফ করিতে হইবে। হাতীম সহ বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে চক্কর দিয়া ঘুরিয়া আসাকে তাওয়াফ বলে। সাত চক্কর ঘুরিলে এক তাওয়াফ হয়, হাতীম সহ বাইতুল্লাহর সংলগ্ন চতুর্দিকে গোলাকার ঢালু মর্মর পাথর বিছান স্থানকে 'মাতাফ' বলে। এই মাতাফের মধ্যে তাওয়াফ করিতে হয়। ওমরাহর তাওয়াফ একটি রোকন (ফরজ)।

হাজরে আসওয়াদ হইতে মোছাল্লায়ে হাম্বলীর দিকে মাতাফের মধ্যে যে সোজা এক সারি কাল পাথর বসান আছে উহা তাওয়াফ আরম্ভ করিবার স্থান। ওমরাহর তাওয়াফ আরম্ভ করিবার পূর্বে আপনি এজতেবা করিয়া লইবেন। অতঃপর আপনি বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া হাজরে আসওয়াদ ও উপরোক্ত কাল পাথরের সারি আপনার শরীরের সম্পূর্ণ ডান দিকে রাখিয়া মাতাফের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাওয়াফের নিম্নরূপ নিয়ত পড়িবেন। কিন্তু এই সময় নামাযের তাহরীমার ন্যায় হাত উঠাইবেন না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ- سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ-
طَوَافَ الْعُمْرَةِ- فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ-

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফা বাইতিকাল হারামি সাব্আ'তা আশ্ ওয়াত্বিন, ত্বাওয়াফাল ওমরাতি, ফাইয়াচ্ছিরহু লী ওয়া তাক্বাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্র ঘরের সাত চক্কর ওমরাহর তাওয়াফ করিতে মনস্থ করিয়াছি। তুমি উহা আমার প্রতি সহজ করিয়া দাও এবং কবুল কর।

অতঃপর হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হইয়া নামাযের তাহরীমার ন্যায় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাইবেন এবং নিম্নরূপ তাকবীর বলিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ- وَالصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِ اللّٰهِ- اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ- وَوَفَاءً
بِعَهْدِكَ- وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অতঃপর নামাযের সিজদার ন্যায় হাজরে আসওয়াদের মধ্যে উভয় হাত রাখিয়া উভয় হাতের মধ্যবর্তী স্থানে হাজরে আসওয়াদে মুখ রাখিয়া বা লাগাইয়া নিঃশব্দে চুম্বন করিবেন এবং সিজদার ন্যায় উহাতে তিনবার কপাল লাগাইবেন। লোকের ভিড়ের দরুন চুম্বন করিতে না পারিলে কাহাকেও ধাক্কা দিয়া চুম্বন করিতে যাইবেন না। বরং হাতের তালু দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করিয়া হাতের তালু চুম্বন করিবেন। আর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করিতে না পারিলে দূর হইতে উভয় হাতের তালু হাজরে আসওয়াদের দিকে প্রসারিত করিয়া তালুদ্বয় চুম্বন করিবেন। অতঃপর বাইতুল্লাহকে আপনার বাম পার্শ্বে রাখিয়া ডান দিক দিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, প্রথম তিন চক্করে আপনাকে 'রমল' করিতে হইবে। তাওয়াফ আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক চক্করে নিম্নলিখিত দোয়াগুলি পাঠ করিবেন।

তাওয়াফের দোয়াঃ ১। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতঃ তাওয়াফ আরম্ভ করিয়া পড়িবেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ
وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ-

২। রোকনে এরাকীর নিকটে পৌঁছিয়া পড়িবেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ-

وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ-

৩। মীজাবের সোজাসুজি পৌঁছিয়া পড়িবেন-

দ্রষ্টব্যঃ বৃষ্টির সময় আল্লাহর ঘরের ছাদের পানি যে নালা দিয়া নীচে হাতীমের ভিতরে পতিত হয় উহাকে 'মীজাব' বলে।

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ- وَلَابَاقِىْ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَّاظْمَاءَ بَعْدَهَا اَبَدًا-

৪। রুকনে শামীর নিকট পৌঁছিয়া পড়িবেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ- يَاعَالِمَ مَافِى الصُّدُوْرِ- اَخْرِجْنِىْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ-

৫। রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করিতে এই দোয়া পড়িবেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ-

৬। রুকনে ইয়ামানী হইতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া এক চক্কর শেষ করিবেন-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ- وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ-

এতদ্ব্যতীত মুয়াল্লিমগণ প্রত্যেক চক্করে ভিন্ন ভিন্ন লম্বা দোয়া পড়াইয়া থাকেন। আপনিও মুয়াল্লিমের সঙ্গে সঙ্গে সেই দোয়া পড়িবেন।

মাসায়েলে তাওয়াফ

১। তাওয়াফ আরম্ভ করার পর সাত চক্কর শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন রোকনের নিকট বা মাতাফের অন্য কোন স্থানে থামিবেন না।

২। রুকনে ইয়ামানীকে তাওয়াফকালীন হস্তদ্বয় কিংবা ডান হাত দ্বারা শুধু স্পর্শ করিবেন, কখনও চুম্বন করিবেন না। ভীড়ের দরুন স্পর্শ করিতে না পারিলে, হাত দ্বারা

উহার দিকে ইশারা করিবেন না বরং সোজা চলিয়া যাইবেন।

৩। প্রত্যেক চক্কর শেষ করতঃ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করিয়া পরবর্তী চক্কর আরম্ভ করিবেন।

৪। প্রথম চক্কর আরম্ভ করিবার পূর্বে নিয়তের পরক্ষণে যেরূপ কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হয়, পরবর্তী চক্কর সমূহ আরম্ভ করিবার পূর্বে আর ঐরূপ হাত উঠাইতে হইবে না।

৫। উপরোক্ত নিয়মে সাত চক্কর ঘুরিলে এক তাওয়াফ পূর্ণ হইবে।

৬। তাওয়াফের সময় হাতীমের বহির্দেশ হইতে তাওয়াফ করিবেন। তাওয়াফের সময় হাতীম ও বাইতুল্লাহর মধ্যবর্তী স্থান দিয়া ঘুরিলে তাওয়াফ শুদ্ধ হইবে না।

৭। নাপাক, বিনা অজুতে ও হায়েজ-নেফাছ অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষেধ। করিলে একটি দম দিতে হইবে।

৮। ওমরাহর এহরামে ওমরাহর তাওয়াফ শুরুকালীন প্রথম হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা মাত্রই তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করিতে হইবে।

৯। সাত তাওয়াফের প্রথম চার চক্কর ফরজ এবং বাকী তিন চক্কর ওয়াজিব।

১০। যদি কেহ তিন চক্করের অধিক কিংবা সাত চক্কর তরক করে, তবে তাহাকে উহা পূর্ণ করিতে হইবে।

১১। যদি কেহ এক বা ততোধিক তিন চক্কর পর্যন্ত তরক করে তবে তাহাকে একটি দম দিতে হইবে। কিন্তু উহা পূর্ণ করিলে দম দিতে হইবে না।

১২। বেহুঁশ মাজুরকে তাহার পক্ষ হইতে নিয়ত করতঃ তাহাকে বহন করতঃ তাওয়াফ করাইলে উহা শুদ্ধ হইবে না।

১৩। এইরূপ মাজুর ব্যক্তি যদি সাওয়ারীর সাহায্যে তাওয়াফ করে তবে তাহার তাওয়াফ শুদ্ধ হইবে।

১৪। তাওয়াফের সময় বেহুদা কথাবার্তা, ক্রয়-বিক্রয়, এক চক্করের পর পরবর্তী চক্কর ঘুরিতে অধিক সময় থামা, একাধিক তাওয়াফের নামায এক সময় পড়া, কিছু ভক্ষণ করা, পেশাব পায়খানার বেগ নিয়া তাওয়াফ করা যে তাওয়াফে এজতেবা ও রমল আছে সেই তাওয়াফে উহা তরক করা ও নাপাক কাপড় পরিয়া তাওয়াফ করা ইত্যাদি মাকরূহ।

১৫। যে যে সময় নামায পড়া মাকরূহ তখন তাওয়াফ করিতে পারে। তবে তাওয়াফের নামায মাকরূহ ওয়াক্তের পরে পড়িতে হইবে।

১৬। তাওয়াফের সময় বৈধ জরূরী কথা বলা, সালাম করা, মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা বা উহার জওয়াব দেওয়া, জরুরাতের জন্য তাওয়াফ ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া, কিছু পান করা, পাক পবিত্র জুতা ব্যবহার করা, কোন যিকর ও দোয়া ব্যতীত তাওয়াফ করা, মনে মনে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, ভাল কবিতা বা কাছীদাহ আবৃত্তি করা এবং ওজর বশতঃ সাওয়ারীতে কিংবা কাহারও স্কন্ধে চড়িয়া তাওয়াফ করা ইত্যাদি সকলই জায়েয আছে।

১৭। কেহ তাওয়াফ করিতে যাইয়া আট চক্কর ঘুরিয়া বসিলে তাহাকে আরও সাত চক্কর ঘুরিয়া দুই তাওয়াফ পূর্ণ করিতে হইবে। (ওয়াজিব)

তাওয়াফের নামায

উপরোক্ত রূপ সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করতঃ আপনাকে মাকামে ইব্রাহীমে কিংবা উহার নিকটস্থ কোন স্থানে দাঁড়াইয়া বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া দুই রাকয়াত তাওয়াফের ওয়াজিব নামায পড়িতে হইবে। নামাযের সময় এজতেবা ছাড়িয়া উভয় স্কন্ধ ঢাকিয়া চাদর গায় দিবে। উক্ত নামাযের প্রথম রাকয়াতে ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা ইখলাছ পড়িবেন। নামায শেষ করিয়া তথায় বসিয়া আল্লাহর নিকট যেই দোয়া ইচ্ছা করিবেন। ইহা দোয়া কবুল হইবার একটি স্থান।

তাওয়াফের নামাযের মাসায়েল

১। তাওয়াফের নামায জামায়াতে পড়া নিষিদ্ধ।

২। এই নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়িবে না। মাকরূহ ওয়াক্তের পরে পড়িবে।

৩। খুৎবাহ পাঠ করার সময় অথবা ইমাম ফরজ নামায আরম্ভ করিলে, তখন তাওয়াফের নামায পড়া নিষিদ্ধ।

৪। এহরামধারী খোলা মাথায় নামায পড়িবে।

৫। তাওয়াফের বাদে নামায না পড়িলে উহা পড়িতে হইবে। দেরীর জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। তবে গুনাহ্গার হইবে।

৬। প্রত্যেক তাওয়াফের পরে (সাত চক্করের পরে) দুই রাকয়াত তাওয়াফের নামায পড়া ওয়াজিব। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল তাওয়াফের পরেও দুই রাকয়াত নামায পড়া ওয়াজিব।

৭। মসজিদে হরমে নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করা জায়েয আছে। কিন্তু সিজদাহর স্থানের অভ্যন্তর দিয়া যাতায়াত করা একেবারে নিষিদ্ধ।

৮। মসজিদে হরমে বসিয়া কা'বা ঘরকে সম্মুখে রাখিয়া নামায আদায় করিতে হইবে। নতুবা নামায ছহীহ্ হইবে না।

যমযম কূপের পানি পান করা ও ফজীলত

তাওয়াফের নামায শেষ করতঃ যমযম কূপের নিকট যাইয়া বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করতঃ দাঁড়াইয়া যমযম কূপের পানি পেট ভরিয়া পান করিবেন; এবং সেখানেও দোয়া করিবেন। এই স্থানও দোয়া কবুল হইবার স্থান। বেশী পরিমাণে যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব। বেশী পরিমাণে যমযমের পানি পান করা কামেল ঈমানের চিহ্ন। যমযম আনন্দদায়ক, কষ্ট দূর করার একটি শরবত। যমযমের প্রতি দৃষ্টি করা ইবাদত।

তাবাররোকান এই পানি দ্বারা অজু গোসল জায়েয আছে। ইহা দ্বারা এস্তেঞ্জা করা এবং কাপড় কিংবা শরীর হইতে নাপাকী দূর করা নিষেধ। উহা নাপাক স্থানে ফেলা

নিষেধ। বরকতের জন্য এবং হাদিয়া দেওয়ার জন্য কিছু যমযমের পানি সাথে বাড়ীতে নিয়া আসা সুন্নাত। পানি পান করার পরক্ষণে 'মোলতাজামে' আসিবেন। 'মোলতাজাম' বলা হয় বাইতুল্লাহ শরীফে অবস্থিত হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে। হস্তদ্বয় প্রসারিত করতঃ উহা জড়াইয়া ধরিয়া এবং বুক ও মুখ মিলাইয়া কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিবেন। বাইতুল্লাহর দরজার চৌকাঠের উপরও হাত রাখিয়া দোয়া করিবেন। ইহাও দোয়া কবুল হইবার একটি স্থান।

ওমরাহর সায়ী

ওমরাহর তাওয়াফ, তাওয়াফের নামায ও দোয়ার পরেই বিলম্ব না করিয়া ওমরাহর সায়ী করিতে যাইবেন। যাইবার সময় পুনরায় হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করিয়া বাবুচ্ছাফা হইতে বাহির হইবেন। মসজিদে হারাম হইতে বাহির হইবার সময় প্রথমতঃ বাম পা বাহিরে রাখিবেন এবং ছাফা পাহাড়ের দিকে যাইতে যাইতে পড়িবেন-

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ وَرَسُوْلُهٗ- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ-

অতঃপর ওমরাহর সায়ীর নিয়ত নিম্নোক্ত নিয়ত াড়িবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَسْعٰى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ سَعْىَ الْعُمْرَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى

এবং ছাফা পাহাড়ের উপর ২/১ সিঁড়ি চড়িবেন যেন বাইতুল্লাহ দেখা যায়। বাইতুল্লাহ নজরে না আসিলেও উহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন এবং কাঁধ পর্যন্ত এমনিভাবে দুই হাত উত্তোলন করিবেন যেন হাতের তালু আকাশের দিকে থাকে। অতঃপর নিম্নলিখিত দোয়া পড়িবেন-

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ-

এতদ্ব্যতীত এখানে দাঁড়াইয়া আরও দোয়া দরূদ পড়িবেন; এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের ও সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করিবেন। ইহাও দোয়া কবুল হইবার একটি নির্দিষ্ট স্থান।

ইহার পর পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া দোয়া ও যিকির করিতে করিতে মারওয়া পাহাড়ের দিকে স্বাভাবিক ভাবে হাটিয়া রওয়ানা হইবেন। (ছাফা পাহাড় দক্ষিণ দিকে ও

মারওয়া পাহাড় উত্তর দিকে পাঁচ শত হাত দূরে অবস্থিত) ছাফা হইতে কিছু দূরে রওয়ানা হইয়া কিছু দূরে উত্তর দিকে মারওয়া অভিমুখে চলিলে বাম হাতের দিকে মসজিদে হারামের দেওয়ালের সঙ্গে সবুজ বর্ণের একটি স্তম্ভ দেখিতে পাইবেন। সেই স্তম্ভের ৫/৬ হাত দক্ষিণে থাকিতে কিছু বেগে দৌড়াইতে শুরু করিবেন (সুন্নাত)। সেখান হইতে আনুমানিক একশত হাত উত্তরে ঐ প্রকার আর একটি স্তম্ভ মসজিদে হারামের দেওয়ালের গায় লাগান আছে। সেই স্তম্ভ পর্যন্ত ঐরূপ বেগে দৌড়াইতে থাকিবেন। তারপর আবার স্বাভাবিক গতিতে হাটিবেন। ছাফা হইতে মারওয়া পর্যন্ত পথকে 'মাছয়া' বলে। এই পথ দোয়া কবুল হইবার স্থান। এই স্থানে মনে ও মুখে যত দোয়া ইচ্ছা আল্লাহর কাছে করিবেন। এইখানে কোন খাছ দোয়া নাই। তবে এই দোয়াটি অবশ্যই পড়িবেন-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ-

যখন আপনি মারওয়া পাহাড়ে যাইবেন তখন ছাফার মতই মারওয়ার ২/১ সিঁড়ি উপরে চড়িবেন এবং ছাফার উপর যেভাবে দোয়া ও তাকবীর বলিয়াছেন এখানেও সেইভাবে বলিবেন এবং কাকুতি মিনতি করতঃ কিবলামুখী হইয়া এখানেও দোয়া করিবেন। ইহাও একটি দোয়া কবুলের স্থান। এইখানে আপনার এক দৌড় শেষ হইল। এইরূপে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত দৌড় দৌড়াইয়া সপ্তম দৌড় আপনার মারওয়ার উপর গিয়া শেষ হইবে। সেখানে কাকুতি মিনতি সহকারে দোয়া করিয়া সায়ী শেষ করিবেন। সায়ীর মধ্যে আসিতে ও যাইতে যখনই উপরোক্ত স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিবেন, তখনই কিছু বেগে দৌড়াইবেন। সায়ীর সময় এদিক ওদিক তাকাইবেন না। অজু রাখিয়া ছতর ঢাকিয়া আল্লাহর দিকে মন রাখিয়া দোয়া করিতে করিতে দৌড়াইবেন। এই ওমরাহর সায়ী শেষ হইলে মারওয়া হইতে অবতরণ করিয়া মাথা মুণ্ডাইবেন। অতঃপর মসজিদে হারামে গিয়া দুই রাকয়াত নামায পড়িবেন। (মুস্তাহাব)

সায়ীর মাসায়েল

১। ওমরাহর সায়ী ওয়াজিব। উহা নিজেই আদায় করিবেন।

২। বেহুঁশ ব্যক্তির পক্ষ হইতে অন্য কেহ সায়ী করিলে উহা আদায় হইবে।

৩। মাজুর বা রুগ্ন ব্যক্তি যদি সাওয়ারীর সাহায্যে অথবা কাহারও স্কন্ধে চড়িয়া সায়ী করে, তবে উহা ছহীহ হইবে।

৪। ওমরাহর সায়ী তাওয়াফের পরে করিতে হইবে, আগে করিলে শুদ্ধ হইবে না।

৫। ছাফা হইতে প্রথম সায়ী আরম্ভ করিয়া মারওয়ায় সপ্তম সায়ী শেষ করিতে হইবে।

৬। মারওয়া পর্বত হইতে সায়ী শুরু করিলে এই দৌড় ধর্তব্য হইবে না।

৭। তাওয়াফ করার পরক্ষণেই সায়ী করা সুন্নাত। বিনা ওজরে দেরী করিবেন না।

৮। অজু গোসল করতঃ পাক পবিত্র হইয়া সায়ী করা মুস্তাহাব।

৯। সায়ীর নিয়ত করা শর্ত নহে বরং উহা মুস্তাহাব।

১০। সায়ীর মধ্যে বৈধ কথাবার্তা, পানাহার করা, ফরজ নামায অথবা জানাযার নামায পড়িতে যাওয়া জায়েয আছে।

১১। সায়ীর মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করা ও অনাবশ্যক কথাবার্তা বলা মাকরূহ।

১২। ওমরাহর সায়ীর মধ্যে তালবিয়া পড়িবে না।

১৩। নফল সায়ী করিতে পারিবে না। নফল তাওয়াফ করিলে অসীম ছওয়াব পাওয়া যায়।

১৪। সায়ীর সাত দৌড় সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ দৌড় তরক করিলে ওমরা ও হজ্জ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু উহা কাযা করিবে অথবা একটি দম দিবে।

১৫। ওজর বশতঃ সায়ী তরক করিলে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

১৬। সায়ীর এক হইতে তিন দৌড় পর্যন্ত তরক করিলে প্রত্যেক দৌড়ের পরিবর্তে একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দিতে হইবে। তবে যদি ছদকাহগুলি একটি দমের মূল্যের সমান হয় তাহা হইলে ইচ্ছা করিলে একটি 'দম' অথবা ছদকাহ থেকে কিছু কমাইয়া কাফ্‌ফারা দিবে।

১৭। বিনা ওজরে পূর্ণ বা অধিকাংশ সায়ী সাওয়ারী ইত্যাদির সাহায্যে সমাধা করিলে একটি দম দিতে হইবে এবং এক হইতে তিনটি পর্যন্ত দৌড় অপরের সাহায্যে আদায় করিলে প্রত্যেক দৌড়ের পরিবর্তে একটি ছদকাহ দিতে হইবে।

১৮। কোন ব্যক্তি যদি ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানের এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়া দুই-তৃতীয়াংশ সায়ী করে, এইরূপ সাতটি সায়ী করিল, তবে তাহার সায়ী আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু তাহাকে একটি দম দিতে হইবে।

ওমরাহর সায়ীর পরে মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করা

যখন আপনি ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার দৌড় শেষ করতঃ মারওয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিবেন, তখন একটু দক্ষিণ দিকে রাস্তার পার্শ্বে হাজ্জাম আপনার মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিয়া দিতে ডাকিবে। আপনি একজন হাজ্জামের নিকট বসিয়া আপনার মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিয়া লইবেন। তবে পুরুষের জন্য চুল মুণ্ডন করানই উত্তম। হাজ্জাম মাথার চুল মুণ্ডন করিয়া সাধারণতঃ কিছু রেয়াল পারিশ্রমিক বাবদে নিয়া থাকেন। আপনি তাহাকে সন্তুষ্টচিত্তে উহা দিয়া দিবেন। কিন্তু স্ত্রীলোক শুধু তাহার চুলের অগ্র ভাগ হইতে এক অঙ্গুলী পরিমাণ নিজে কর্তন করিবে অথবা তাহার স্বামীর দ্বারা কর্তন করাইবে। ইচ্ছা করিলে আপনি আপনার থাকিবার ঘরে গিয়াও কোন গায়ের মোহরেম দ্বারা চুল মুণ্ডন বা কর্তন করাইতে পারেন। মুণ্ডন বা কর্তন করিবার পরে আপনি হালাল হইলেন। আপনার জন্য এহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ছিল, তাহা এখন করা জায়েয হইবে। যদি দুইজন মোহরেম ওমরাহর কার্যাবলী সম্পন্ন করিয়া একে অন্যের চুল মুণ্ডন বা কর্তন করে, তবে উভয়ই হালাল হইয়া যাইবে। ইহাতে

কাহারও কাফ্ফারা দিতে হইবে না। এইরূপে মোহরেম নিজের মাথা নিজে মুণ্ডন বা কর্তন করিলেও কোন দোষ হইবে না; বরং হালাল হইয়া যাইবে।

আপনি কিবলামুখী হইয়া আপনার মাথার ডান দিক হইতে মুণ্ডন বা কর্তন কার্য আরম্ভ করাইবেন। মুণ্ডন বা কর্তনের সময় নিজের, পিতা-মাতা, পীর , ওস্তাদ ও আমাদের জন্য দোয়া করিবেন এবং চুল মাটির নীচে দাফন করিয়া রাখিবেন। (মুস্তাহাব)

মাসয়ালা- মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন না করিয়া অন্য কোন স্থানে চুল বা পশম দূর করিলে উহা দ্বারা হালাল হইবে না। হালাল হইতে মাথার চুলই মুণ্ডন বা কর্তন করিতে হয়।

মাসয়ালা- সম্পূর্ণ মস্তকের চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিতে হইবে (সুন্নাত)। এক-চতুর্থাংশ করিলে সুন্নাত তরকের জন্য মাকরূহ হইবে। এক-চতুর্থাংশ মুণ্ডন করিলে অথবা এক-চতুর্থাংশের এক অঙ্গুলী পরিমাণ চুল কর্তন করিলে ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে এবং এহরাম ছুটিয়া যাইবে।

মাসয়ালা- মাথায় বিশেষ কোন রোগের দরুন চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিতে না পারিলে বিনা মুণ্ডনে বা কর্তনে সে হালাল হইবে। তাহাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

মাসয়ালা- যাহার মাথায় চুল নাই সে মাথায় ক্ষুর চালাইলেই হালাল হইবে, (ওয়াজিব)।

মাসয়ালা- মুণ্ডন বা কর্তন হরমের সীমানার মধ্যে করিতে হইবে। বাহিরে করিলেও হালাল হইবে। কিন্তু একটি দম দিতে হইবে।

হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকের এহরাম এবং তাহার হজ্জ ও ওমরাহর মাসায়েল

১। হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় এহরাম বাঁধা জায়েয আছে।

২। এহরাম বাঁধার পরে স্ত্রীলোকের হায়েজ বা নেফাস হইলে, এহরাম নষ্ট হইবে না।

৩। হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মসজিদে হরমে, এমন কি যে কোন মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

৪। ওমরাহর এহরামে হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক পাক হইয়া বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করিবে। পরে সায়ী করতঃ মাথার চুলের অগ্রভাগ হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণ কর্তন করিয়া ওমরা সম্পন্ন করিবে। আর যদি আরাফাতে যাওয়ার সময় হইয়া থাকে, (এখনও পাক হয় নাই) তবে ওমরাহর এহরাম ছাড়িয়া নূতন ভাবে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া সোজা মিনা ও আরাফাতের দিকে চলিয়া যাইবে এবং একটি দম দিবে, (ওয়াজিব)। হজ্জের পর ওমরাহর কাজ করিবে।

৫। হজ্জে কেরানের এহরাম বাঁধিয়া থাকিলেও উক্তরূপ মিনা ও আরাফাতে চলিয়া যাইবে। আরাফাতে অকুফ করার দরুন তাহার ওমরাহ বাতিল হইয়া তাহার হজ্জ, হজ্জে এফরাদে পরিণত হইবে। অতএব তাহাকে হজ্জে কেরানের দমে শোকর দিতে হইবে না। তবে হজ্জ সমাধা করতঃ পাক হইয়া এই ওমরাহর কাজা করিবে এবং একটি দম

দিবে, (ওয়াজিব)। হজ্জে এফরাদের এহরাম বাঁধিয়া থাকিলেও তাওয়াফে কুদুম না করতঃ আরাফাতে যাইবে। এফরাদ কারিনীর প্রতি হায়েজ ও নেফাসের দরুন কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

৬। আরাফাত ও মিনার সমস্ত কার্যাবলী হায়েজ ও নেফাসওয়ালী অবাধে আদায় করিতে পারিবে। উহার জন্য তাহাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

৭। হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক তাওয়াফে জিয়ারত ও তাওয়াফে কুদুম ব্যতীত হজ্জের সমস্ত কার্যাবলী আদায় করতঃ পাক হইয়া তাওয়াফে যিয়ারত করিবে। তাওয়াফে কুদুম তরকের দরুন কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

ওমরাহর পর হজ্জ পর্যন্ত কর্তব্য

আপনি এখন ওমরাহর কাজ সম্পন্ন করতঃ এহরাম ছাড়িয়া হালাল হইয়াছেন। এখন যদি মদীনা শরীফ না যাইয়. মক্কা শরীফই অবস্থান করেন, তবে আপনি যে কয়টি দিন হাতে পাইবেন, উহাকে আপনি অতি মূল্যবান মনে করিবেন। হরম শরীফ, মক্কা শরীফ, ও বাইতুল্লাহর আদব রক্ষা করিয়া চলিবেন। মনের সাধ মিটাইয়া আন্তরিক ভক্তি সহকারে যত পারেন নফল তাওয়াফ করিবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায হরম শরীফে যাইয়া জামায়াতের সহিত পড়িবেন। কখনও জামায়াত তরক করিবেন না। আর এই সময় আপনি যতবার ইচ্ছা ওমরাহ করিতে পারেন। তানয়ীম নামক স্থানে গিয়া ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া উপরোক্ত নিয়মে ওমরাহ করিবেন। তিনটি ওমরায় একটি হজ্জের ছওয়াব হইবে; এবং মসজিদে হরমে বসিয়া আপনার মনের ইচ্ছামত আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মোনাজাত করিবেন।

দোয়া কবুল হইবার স্থান সমূহ

১। মাতাফ, ২। মোলতাজাম, ৩। মীজাবে রহমতের নীচে, ৪। বাইতুল্লাহর ভিতরে, ৫। জমজম কূপের কিনারায়, ৬। মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে, ৭। ছাফা পাহাড়ে, ৮। মারওয়া পাহাড়ে, ৯। মাসয়াতে (সায়ী করিবার স্থানে) ১০। আল্লাহর ঘরের উপরে নজর পড়িলে, ১১। হাতীমের ভিতরে, ১২। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে, ১৩। আরাফাত ময়দানে, ১৪। মোজদালেফাতে, ১৫। মিনাতে, ১৬। কঙ্কর মারিবার জোমরা(স্থান) সমূহে।

দিনওয়ারী হজ্জের করণীয় কার্য সমূহ

৭ই যিলহজ্জ-এই দিন জোহরের নামাযের পর ইমামুল হজ্জ (হজ্জের নেতা) **কা'বা শরীফে প্রথম খুৎবাহ** দিবেন। এই খুৎবায় হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি এবং আগামী পাঁচ **দিনের কার্যাবলীর কর্মসূচী** উল্লেখ করিবেন।

৮ই যিলহজ্জ ও হজ্জের এহরাম- এই দিন সকালে অথবা তৎপূর্বে আপনি অজু গোসল করতঃ হজ্জের এহরামের জন্য ওমরাহর এহরামের ন্যায় তৈয়ার হইয়া মসজিদে হরমে প্রবেশ করিবেন। সর্বপ্রথমে আল্লাহর ঘর সাত চক্কর তাওয়াফ করতঃ দুই রাকয়াত তাওয়াফের ওয়াজিব নামায পড়িবেন। অতঃপর হাতীমের মধ্যে, অপারগ হইলে অন্য স্থানে যাইয়া দুই রাকয়াত এহরামের সুন্নাত নামায আদায় করিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া হজ্জের এহরাম বাঁধিবেন। দোয়া-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ- وَاَعِنِّىْ عَلَيْهِ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ- نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهٖ لِلّٰهِ تَعَالٰى-

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা, ফাইয়াচ্ছিরহু লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী, ওয়া আ'ন্নী আলাইহি, ওয়া বারেক লী ফীহে, নাওয়াইতুল হাজ্জা ওয়া আহরামতু বিহী লিল্লাহি তায়ালা।

হজ্জে সায়ী- আপনার (আফাকীর) জন্য মিনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার দৌড় 'সায়ী' (হজ্জের ওয়াজিব) আদায় করা উত্তম। অতএব এখন আর একবার এজতেবা ও রমলের সহিত আল্লাহর ঘরে নফল তাওয়াফ করিবেন। অতঃপর তাওয়াফের দুই রাকয়াত ওয়াজিব নামায আদায় করিয়া হজ্জের উক্ত ওয়াজিব সায়ী আদায় করিবেন। আর আপনি ইচ্ছা করিলে এই সায়ী আরাফাত হইতে ফিরিয়া তাওয়াফে যিয়ারতের পরেও আদায় করিতে পারিবেন। তাহাতেও কোন দোষ হইবে না।

মিনায় গমন- ইয়াওমুত্তারবিয়া অর্থাৎ ৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মক্কা শরীফ হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হইবেন। মিনা ও আরাফাতে যাইতে নিজের সঙ্গে ভারী বোঝা বা অধিক মাল আসবাব নিবেন না। নিজের সাথে এহরামের কাপড় তিনখানা এবং এহরাম খোলার পর পরিধান করার জন্য লুঙ্গি, জামা, টুপি লইবেন। একটি হালকা সতরঞ্চি বা বিছানার চাদর এবং শীতের মওসুম হইলে আবশ্যক মত কিছু শীতের কাপড় একটি ব্যাগে ভরিয়া লইবেন। তাহা হইলে ব্যাগটি বালিসের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

আপনি যাহাদের সঙ্গে কাফেলা করিয়াছেন, তাহাদেরকে সহ ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত পাঁচ দিনের খোরাকী চাউল, ডাল, আলু, তৈল, মসল্লাদি, হাড়িপাতিল, থালা, পেয়ালা, পানির টিন, কেতলী, ছাতা ও চাকু সঙ্গে লইবেন। তাহা হইলে মিনা, আরাফাতে ও মোজদালেফায় আবশ্যক মত রান্না করতঃ খাইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মোকামের বাজারে রুটি, দুধ, চিনি ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাইবে। কোন সময় রান্না করিতে অসুবিধা হইলে রুটি খাইয়াও থাকা যায়; খবরদার না খাইয়া শরীর দুর্বল হইতে দিবেন না।

মিনা মক্কা শরীফ হইতে চার, পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। আপনি ইচ্ছা করিলে পায় হাটিয়া অথবা মোটর গাড়ীযোগে তথায় যাইতে পারেন। মিনাতে মসজিদে খায়েফের নিকট কোন এক স্থানে অবস্থান করিবেন। ৮ই যিলহজ্জ জোহর হইতে ৯ই যিলহজ্জ ফজরের নামায পর্যন্ত এই মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায এইখানে আদায় করিবেন (সুন্নাত)। ৮ই যিলহজ্জ জুমআবার হইলে এখানে জুমআর নামায পড়িবেন।

৮ই যিলহজ্জ মিনাতে আপনার আর কোন কাজ নাই। নামায পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে আদায় করিবেন। কুব্বাতুল মেহরাবেও তাবাররোকান নামায পড়িবেন। এই মেহরাবে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িয়াছিলেন। এই মসজিদে খায়েফের স্থানে সত্তরজন নবীর মাজার আছে। কথিত আছে যে, এই জায়গায় হযরত আদম (আঃ) এর কবর শরীফ আছে।

৯ই যিলহজ্জের কার্যাবলী

মিনাতে ফজরের নামায জামায়াতের সহিত পড়িয়া সালাম ফিরাইবার পরক্ষণে একবার নিম্নের তাকবীরে তাশরীক পড়িবে (ওয়াজিব); তিনবার পড়া সুন্নাত।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

৯ই যিলহজ্জ ফজর হইতে ১৩ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরক্ষণে উক্তরূপ তাকবীর বলিতে হইবে। এবং বার বার তালবীয়া পড়িবেন।

৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পরে কিছু নাস্তা করতঃ শান্তভাবে একাগ্রচিত্তে তালবীয়া, তাকবীর, তাহলীল ও দোয়া দরূদ পড়িতে পড়িতে মোজদালেফা অতিক্রম করতঃ আরাফাতের দিকে রওয়ানা হইবেন। মিনা হইতে আরাফাত, সাত, আট মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত।

শক্তি থাকিলে আপনি পায় হাটিয়াও আরাফাতে যাইতে পারেন। হাটিয়া যাওয়ায় অনেক ফজীলত আছে। যাহাদের হাটিতে কষ্ট হয় বা তাড়াতাড়ি যাইতে চায়, তাহারা মোটর গাড়ীযোগে যাইবেন। খুব জওক শওকের সহিত আল্লাহর দিকে দেল রুজু করিয়া ধীর স্থির ভাবে রাস্তা অতিক্রম করিবেন। পথে কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিবেন না। এইভাবে আরাফাত ময়দানের সীমানায় ঢুকিয়া পড়িবেন এবং ময়দানের কোন এক স্থানে সঙ্গীদের নিয়া নামিবেন। জাবালে রহমতের পাদদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের নিকট অবস্থান করা উত্তম। অসুবিধা হইলে আরাফাতে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিবেন। আর আপনার মুয়াল্লিমের তাবু খুজিয়া পাইলে উহাতেই অবস্থান করিবেন।

অতঃপর দ্বিপ্রহরের পূর্বে গোসল সমাধা করিবেন (সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ) অপারগ হইলে শুধু অজু করিয়া লইবেন। তারপর পানাহার করিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইবেন এবং পূর্ববর্তী দোয়া দরূদ ও তালবীয়া অনবরতঃ পড়িতে থাকিবেন। যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিবে, তখনই বিলম্ব না করিয়া ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে মসজিদে নামেরার দিকে রওয়ানা হইবেন। মসজিদে নামেরায় জোহরের আযান হইলে হুকুমাত কর্তৃক নিযুক্ত ইমাম জুমআর নামাযের ন্যায় দুইটি খুৎবাহ দিবেন। আপনি মনোযোগের সহিত উহা শুনিবেন।

৯ই যিলহজ্জের জোহর ও আছরের নামায

ইমাম ৯ই যিলহজ্জ মসজিদে নামেরাতে জোহর ও আছরের নামায জোহরের ওয়াক্তে পড়িবেন, আপনিও ইমামের সঙ্গে সঙ্গে জোহর ও আছর পড়িবেন। খুৎবাহর পর একামত বলা হইলে ইমাম জোহরের নামাযে দাঁড়াইবেন। আপনিও সেই সঙ্গে একতেদা করিবেন। ইমাম হাম্বলী বা মালেকী মাযহাবের হইলে জোহর ও আছরে কছরের নিয়ত করতঃ দুই দুই রাকয়াত পড়িয়া থাকেন। যদি আপনি মক্কা শরীফ ৮ই যিলহজ্জের পূর্বে একামতের নিয়ত করতঃ পনর দিন অবস্থান না করিয়া থাকেন কিংবা মোটেই একামতের নিয়ত না করিয়া থাকেন, তবে আপনিও ইমামের সহিত দুই রাকয়াত কছর পড়িয়া সালাম ফিরাইবেন। আর যদি আপনি একামতের নিয়ত করতঃ অন্ততঃ পরন দিন মক্কাতে অবস্থান করিয়া থাকেন, তবে আপনি মুকীম। সুতরাং ইমামের সালাম ফিরাইবার পর আপনি দাঁড়াইয়া চার রাকয়াত পুরা করিবেন। এইদিন জোহরের পূর্বের ও পরের সুন্নাত ও আছ্রের পূর্বে সুন্নাত ও নফল নামায পড়া মাকরূহ এবং অতঃপর আছরের জন্য পুনরায় একামত বলা হইবে এবং আছরের নামায শুরু করিবেন। আপনিও ইমামের সঙ্গে জোহরের অনুরূপ আছরের নামায পড়িবেন। তাকবীরে তাশরীক পৃথক ভাবে দুই নামাযে বলা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে এহ্তিয়াতের জন্য জোহরের সালামের পরে এবং আছরের সালামের পরে তাকবীর বলিবেন।

নামায শেষ করিয়া জাবালে রহমতের নিকট আসিবেন এবং তালবীয়া ও দোয়া দরূদ পড়িতে পড়িতে আপনার গুনাহের জন্য মায়াফী চাহিতে থাকিবেন। যদি আপনি মসজিদে নামেরার জামায়াতে শামিল হইয়া জোহর ও আছর একই সময় পড়িবার সুযোগ না পান, তবে আপনি ময়দানে যেখানে সেখানে জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছরের ওয়াক্তে আছর পড়িবেন। একত্রে জোহর আছর পড়িবেন না। আর যদি আপনি তাবুতে থাকেন এবং সেখানে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ থাকে তবে জামায়াতেও নামায পড়িতে পারেন। ৯ই যিলহজ্জ জুমআবার হইলে, এখানে জুমআ পড়িতে হইবে না। কেননা আরাফাতে জুমআ জায়েয নাই। বরং উক্তরূপ জোহর পড়িবেন।

আরাফাতে অকুফ

আরাফাতে 'অকুফ' করা হজ্জের একটি প্রধান রুকন বা ফরজ। এই 'অকুফ' বা অবস্থান করিবার সময়, ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পরক্ষণ হইতে পরবর্তী ছোবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়ের যে কোন এক মুহূর্ত আরাফাতের সীমানার মধ্যে অবস্থান করিলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর হইতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের পরেই আরাফাত হইতে মোজদালেফার দিকে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত।

মাসয়ালা- যদি কেহ ওজর বশতঃ দ্বিপ্রহরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফাতে অকুফ করিতে না পারে, তবে সূর্যাস্তের পর ছোবহে ছাদেক পর্যন্ত সময়ের যে কোন মুহূর্ত আরাফাতে অকুফ করিলে তাহার হজ্জ শুদ্ধ হইয়া যাইবে। ওজর বশতঃ ওয়াজিব তরকের দরুন কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু বিনা ওজরে এরূপ অকুফ করিলে তাহাকে একটি দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব)

মাসয়ালা- এইরূপ হজ্জ বা ওমরাহর কোন ওয়াজিব বিনা ওজরে তরক করিলে একটি 'দম' দেওয়া ওয়াজিব হইবে। ওজর বশতঃ তরক করিলে কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

মাসয়ালাঃ- সূর্য অস্তের পূর্বে আরাফাত হইতে আসিলে একটি দম দিতে হইবে (ওয়াজিব)। শরয়ী ওজরে আসিলে কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

মাসয়ালা- এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে নিষিদ্ধ কার্যাবলীর কাফ্ফারা মাসায়েলে শরয়ী ওজরের তাফছীল দেওয়া হইয়াছে। উহা দেখিয়া লইবেন।

অকুফের সময়ের কার্যাবলী

আরাফাতের যে স্থানেই অবস্থান করিবেন উহা দ্বারা আপনার অকুফে আরাফাতের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। জোহরের নামায আদায় করতঃ সূর্যাস্তের পরক্ষণ পর্যন্ত জিকির আযকার, তাসবীহ, তাহলীল, তালবিয়া, দোয়া ও দরূদ বিনয় ও এনকেছারীর সহিত অধিক পরিমাণে পড়িতে থাকিবেন (মুস্তাহাব)। আল্লাহর দরবারে নিজের পিতা-মাতার, ওস্তাদগণের, আত্মীয়- স্বজনদের ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য মাগফেরাত কামনা করিবেন।

মুয়াল্লিম সাহেব আপনাদিগকে আরাফাতে লম্বা দোয়া পড়াইবেন। উহা তাহার সহিত পড়িবেন। নিজের গুনাহসমূহ স্মরণ করিয়া সর্বদা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিতে থাকিবেন। কান্নাকাটি ও রোনাজারী করা দোয়া কবুল হওয়ার আলামত জানিবেন। আরাফাতের দিন শক্তি থাকিলে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আরাফাতে রৌদ্রে অবস্থান করা মুস্তাহাব। যদি কষ্ট হয় তবে ছায়ায় অবস্থান করিবেন।

আপনাদের মুয়াল্লিম আপনাদের জন্য আরাফাতে ও মিনাতে তাবুর ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন। যদি আপনি আপনার মুয়াল্লিমের সহিত আরাফাতে না যান তবে তাহাকে বলিয়া রাখিবেন যে, সে যেন আপনাকে মসজিদে নামেরার দরওয়াজার নিকট হইতে ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পূর্বে অথবা নামাযান্তে আপনাদিগকে তাহার তাবুতে নিয়া যায়। আপনিও নির্দিষ্ট স্থানে মুয়াল্লিম বা তাহার লোকজনের অপেক্ষা করিবেন। মুয়াল্লিমের নাম লিখিত নিশান নিয়া আপনাদের তালাশে লোক আসিবে। আপনি তাবুতে গিয়া আবশ্যকীয় কার্যাদি সমাধা করতঃ উপরে বর্ণিত নিয়ম কানুন অনুসারে মুয়াল্লিমের সাথে পরামর্শ করিয়া আরাফাতে সম্পূর্ণ আহকাম আদায় করিবেন।

আরাফাতের ময়দানে মুয়াল্লিম অথবা তাহার লোকজনের সাথে যাওয়া উচিৎ। আরাফাতের ময়দানে যদি আপনি একবার হারাইয়া যান, তাহা হইলে আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করা মুয়াল্লিম বা সঙ্গীদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যদি ঘটনাক্রমে হারাইয়া যান তবে এদিক সেদিক খোঁজ না করিয়া সোজা মসজিদে নামেরার দরওয়াজার সন্নিকটে আসিয়া বসিয়া থাকিবেন। মসজিদে নামেরার মিনারা সমগ্র আরাফাত ময়দান হইতে আপনি দেখিতে পাইবেন। সেখান হইতে আপনাকে আপনার মুয়াল্লিম বা সঙ্গী লোকজণ খোঁজ করিয়া নিয়া যাইবেন। এই কথা পূর্বেই তাহাদিগকে জানাইয়া রাখিবেন। বর্তমানে আরাফাতে অনেক রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। উহার সাহায্যেও আপনি আপনার তাঁবুর স্থান ঠিক রাখিতে পারেন। সরকার কর্তৃক আরাফাতে বিনা মূল্যে পানি বিতরণ করা হয়। আপনি আবশ্যক মতে আপনার টিনে পানি আনিয়া লইবেন।

১০, ১১. ১২, ১৩ যিলহজ্জের জন্য আপনার মুয়াল্লিম মিনাতেও আপনাদের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা রাখিবেন। আপনি উহা খোঁজ করিয়া না পাইলে মসজিদে খায়েফের মাঝে কোব্বাতুল মেহরাবে আসিয়া থাকিবেন। সেখান হইতে আপনার সঙ্গীরা বা মুয়াল্লিম খোঁজ করিয়া নিবেন ইহাও তাহাদিগকে পূর্বেই জানাইয়া রাখিবেন।

সাবধান! এত ভীড়ের ভিতরে সঙ্গীয় ২/১ জন ব্যতীত একাকী বাহিরে যাইবেন না। কোন্ দিকে কোন্ পথে যাইতেছেন তাহা ঠিক রাখিবেন ঐ পথে ফেরত আসিবেন।

মোজদালাফায় রওয়ানা

সূর্যাস্তের পরক্ষণেই মাগরিবের নামায না পড়িয়া শান্তভাবে তালবীয়া ও দোয়া দরূদ পড়িতে পড়িতে মোজদালাফার দিকে রওয়ানা হইবেন। গোসল করিয়া মোজদালাফায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব। মাশয়ারে হারাম বা কোজাহ পাহাড়ের সন্নিকটে মসজিদের পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। রাস্তার উপরে অবস্থান করা মাকরূহ। মোজদালাফাতে আযান ও একামত বলিয়া প্রথমতঃ মাগরিব অতঃপর বিনা আযান ও একামতে এশার নামায জামায়াতের সহিত আদায় করিবেন। আর জামায়াত করিতে না পারিলেও উক্তরূপ উভয় নামায এশার ওয়াক্তে পড়িবেন। মাগরিবের ওয়াক্তে কোন স্থানে এই দিনের মাগরিব বা এশা পড়িলে উহা আদায় হইবে না। পড়িলে পুনঃ এশার ওয়াক্তে উক্ত নিয়মে উভয় নামায পড়িতেই হইবে। মাগরিব ও এশার ফরজ নামাযের মাঝে অন্য কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়িবেন না। মাগরিবের ও এশার সুন্নাত ও বেতের নামায এশার ফরজের বাদে পড়িবেন।

মাসয়ালাঃ- মোজদালাফায় মাগরিব ও এশা একা পড়িলেও উভয় নামায এশার ওয়াক্তে পড়িতে হইবে।

মাসয়ালাঃ- মাগরিব ও এশার ওয়াক্তে ছোবহে ছাদেকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে কোন সময় মোজদালাফাতে পড়িতে পারিবেন। বিনা ওজরে এই নামাযদ্বয় মোজদালাফার

বাহিরে পড়া নিষিদ্ধ।

মাসয়ালাঃ- কোন হাজী ওজর বশতঃ আরাফাতে অথবা পথিমধ্যে রহিয়া গেল। এমতাবস্থায় ছোবহে ছাদেক হওয়ার পূর্বে যেখানে থাকিবে, সেখানে বসিয়া মাগরিব ও এশার নামায পড়িতে হইবে। নামায তরক করিবে না।

মাসয়ালাঃ- এশার পূর্বে মোজদালাফায় প্রবেশ করিলেও এশার ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাগরিব ও এশার নামায পড়িতে পারিবে না। পড়িলে পুনঃ উহা এশার ওয়াক্তে দোহরাইতে হইবে।

মোজদালাফায় রাত্রি যাপন

৯ই দিনগত রাত্রে (১০ই রাত্রে) সূর্যোদয় পর্যন্ত মোজদালাফায় অবস্থান করা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। মোজদালাফায় প্রবেশ করতঃ সারারাত্রি সজাগ থাকিয়া আরাফাতের ন্যায় দোয়া দরূদে মশগুল থাকিবেন। কুরআন তেলাওয়াত, নামায, তালবিয়া ও জিকির আযকারে রাত্রি কাটাইবেন। মোজদালাফা দোয়া কবুলের একটি স্থান।

এখান হইতে মিনার তিন জোমরায় নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। (মুস্তাহাব)

ছোবহে ছাদেকের পরে অন্তত এক মুহূর্তকাল মোজদালাফায় অবস্থান (অকুফ) করা ওয়াজিব। বিনা ওজরে এই ওয়াজিব অকুফ (অবস্থান) তরক করতঃ ছোবহে ছাদেকের পূর্বে মোজদালেফা ত্যাগ করিলে একটি দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব) ওজর বশতঃ তরক করিলে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না। ফজরের নামাযের পরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এখানে থাকা সুন্নাত। মিনার রাস্তায় বা মিনাতে অসম্ভব ভীড় হওয়ার দৃঢ় আশংকার দরুন যদি কোন মেয়েলোক বা পুরুষ মোজদালাফার ওয়াজিব অকুফ তরক করে, তবে তাহার প্রতি কোন 'দম' বা কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

১০ই যিলহজ্জের কার্য সমূহ

১০ই যিলহজ্জ মোজদালাফা হইতে মিনায় পৌঁছিয়াই ইচ্ছা করিলে আপনি তৎক্ষণাত মক্কা শরীফ গিয়া তাওয়াফে যিয়ারত (হজ্জের ফরজ তাওয়াফ) করিয়া আসিতে পারেন এবং পূর্বে হজ্জের সায়ী না করিয়া থাকিলে উহাও করিয়া আসিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ করা মাকরূহ।

অতএব অদ্য তারিখ শুধু আপনি প্রথমতঃ জোমরায়ে আকাবায়ে সাত কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে পারেন। তৎপর দমে শোকর (হজ্জের কোরবানী) আদায় করিবেন। অতঃপর মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিবেন এবং পরে আপনি ইচ্ছা করিলে মক্কা শরীফ গিয়া তাওয়াফে যিয়ারাতাদি করিয়া পুনঃ মিনায় আসিয়া ১১, ১২ তারিখের কঙ্করাদি নিক্ষেপ করিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে ১১, ১২ তারিখে মিনার কাজ সারিয়া ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কা শরীফ গিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করিতে পারেন। তাওয়াফে যিয়ারতের বিস্তারিত মাসায়েল পরে লিখা হইবে।

মিনাতে জুমআ ও ঈদুল আজহার নামায

১। আপনি যদি মক্কা শরীফে মুকীম হইয়া মিনাতে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে মিনাতে থাকাকালীন জুমআবার হইলে, জুমআর নামায অবশ্যই পড়িবেন আর মুকীম না হইলে জুমআর নামায তরক করিলে গুনাহগার হইবেন না। তবে জুমআ পড়া উত্তম।

২। আপনি মুকীম হউন কিম্বা মুসাফির হউন মিনাতে আপনাকে ঈদুল আজহার নামায পড়িতে হইবে না। হাজীদের আসানীর জন্য উহা মাফ করা হইয়াছে।

১০ই যিলহজ্জ জোমরায়ে আকাবায় পাথর মারিবার মাসায়েলঃ

১। মিনায় পৌছিয়া সর্ব প্রথমে শুধু জোমরায়ে আকাবায় পাথর মারিতে হইবে। অন্য দুই জোমরায় অদ্য পাথর মারিতে হইবে না।

২। জোমরায়ে আকাবা মিনার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। মিনার জোমরায়ে পাথর নিক্ষেপণকে আরবী পরিভাষায় 'রমী' বলে।

৩। পাথর মারিবার সময় জোমরায়ে আকাবার দক্ষিণ পার্শ্বে জোমরাকে সম্মুখে রাখিয়া পাঁচ হাত দূরে এমনিভাবে দাঁড়াইবেন, যেন মিনা স্বীয় ডান দিকে ও কাবা শরীফ বাম দিকে থাকে। অতঃপর একে একে সাতখানা পাথর পৃথকভাবে নিক্ষেপ করিবেন।

৪। প্রথম পাথর খানা রমী করার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পড়া বন্ধ করিবেন; এবং ইহার পরে আর কখনও তালবীয়া পড়িতে হইবে না।

৫। বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা পাথর ধরিয়া রমী করিতে হইবে। (মুস্তাহাব)

৬। স্বীয় হাত দ্বারা অন্য কোন কায়দায় রমী করিলেও কোনরূপ দোষ হইবে না।

৭। জোমরার উপরে পাথর না ফিঁকিয়া, রাখিয়া বা ঢালিয়া দিলেও রমী আদায় হইবে। তবে এই রকম রমী সুন্নাতের খেলাফ।

৮। জোমরায়ে আকাবার রমী ছওয়ার হইয়া করা উত্তম।

৯। পাঁচ হাত বা তাহার চেয়ে দূরে থাকিয়া রমী করিবে।

১০। ডান হাত এমনভাবে উত্তোলন করিয়া রমী করিবে যেন, বগলের তলদেশ দৃষ্ট হয় (মুস্তাহাব)।

১১। ১০ই তারিখের ছোবহে ছাদেকের পরক্ষণ হইতে পরবর্তী রাত্রের ছোবহে ছাদেকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে কোন সময় পাথর নিক্ষেপ করিলে রমী শুদ্ধ হইবে। কিন্তু আউয়াল ফজর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত 'রমী' জায়েয। তৎপরে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত (মুস্তাহাব) অতঃপর সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত জায়েয এবং সন্ধ্যা হইতে ছোবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত রমী করা মাকরূহ।

১২। কঙ্কর মারার পরে দমে শোকর আদায় করিবেন।

দমে শোকর ও রোযা

১। হজ্জে তামাত্তোকারীর প্রতি একটি দমে শোকর আদায় করা ওয়াজিব। এইরূপে কেরানকারীরও একটি দমে শোকর আদায় করা ওয়াজিব। এফরাদকারীর প্রতি এই দম দেওয়া মুস্তাহাব।

২। দমে শোকর আদায় করিতে অসমর্থ হইলে ১০টি রোযা ওয়াজিব হইবে। তন্মধ্যে তিনটি রোযা আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে রাখিবে। বাকী সাতটি রোযা হজ্জের কার্যাবলী আদায় করার পরে মক্কা শরীফে অথবা বাড়ীতে আসিয়া রাখিবে। এই তিন রোযা কেরানকারী কেরানের এহরামের মধ্যে এবং তামাত্তোকারী ওমরাহর এহরামের মধ্যে রাখিবে। এই রোযাগুলির নিয়ত ছোবহে ছাদেকের পূর্বে করিতে হইবে। পরে করিলে শুদ্ধ হইবে না।

৩। যে জানোয়ার দ্বারা কোরবানী করা জায়েয আছে, সেইরূপ জানোয়ার দ্বারা দমে শোকরও জায়েয আছে।

৪। মালদার হিসাবে যে কোরবানী করিতে হয় উহা মুকীমের প্রতি ওয়াজিব। মুসাফিরের প্রতি ওয়াজিব নহে। তবে আদায় করিলে ছওয়াব পাইবে।

৫। দমে শোকর এবং হজ্জ ও ওমরাহর কাফ্‌ফারাদির দম হরমের সীমানার মধ্যে আদায় করিবে। বাহিরে আদায় করিলে পুনরায় উহা হরমে আদায় করিতে হইবে।

৬। দমে শোকর ১০/১১/১২ তারিখের মধ্যে আদায় করিবে। পরে করিলে তাহাকে আরও একটি দম দিতে হইবে।

৭। মুকীম মালদারের ওয়াজিব কোরবানী, হজ্জের দমে শোকর দ্বারা আদায় হইবে না। দমে শোকর ও কোরবানী পৃথক ভাবে আদায় করিতে হইবে।

৮। সামর্থ্য থাকিলে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে কোরবানী করিবে। তিনি তাহার উম্মতের নামে এখানে কোরবানী দিয়াছেন।

কোরবানীর জানোয়ার খরিদ

মিনার মসজিদে খায়েফের উত্তর পূর্ব দিকে পর্বতের পাদদেশে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ আছে। ইহার চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা। হাজীগণকে এইখানে যাইয়া কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিতে হয়। প্রাচীরের ভিতরে কোরবানীর জানোয়ার বিক্রয় হইয়া থাকে। আপনি নিজে দরদাম করিয়া প্রয়োজনমত কোরবানীর জন্তু খরিদ করিতে পারেন। না পারিলে কোন বিশ্বস্ত লোকের কিংবা ছবির সাহায্য নিয়া খরিদ করিতে পারেন।

অতি সতর্কতার সহিত এখানে ক্রয়-বিক্রয় ও চলাফিরা করিবেন। কোরবানী নিজের হাতে জবেহ করিবেন। অসমর্থ হইলে কিছু মজুরী দিয়া কোরবানী করাইবেন। কিন্তু মনে রাখিবেন জবেহর মজুরি কোরবানীর গোশত কিংবা চামড়া দ্বারা দিলে কোরবানী আদায় হইবে না। সাবধান! কোরবানীর জানোয়ার নিজে হাজির থাকিয়া জবেহ করাইয়া আসিবেন। অপরের হাওয়ালা করিয়া আসিবেন না। কারণ সে যদি উহা যবেহ করিয়া না দেয়; তবে আপনার দম আদায় হইবে না।

হজ্জের এহরাম খুলিতে মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করা

১। দমে শোকর আদায় করার পর মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিবে, (ওয়াজিব)। মুণ্ডন ও কর্তনকে আরবীতে হলক ও কছর বলে।

২। হলক ও কছরের নিয়ম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। হজ্জের এহরাম খুলিতে মস্তকের চুল মুণ্ডন বা কর্তনের পূর্বে ও পরে তাকবীর বলিবেন।

৪। মাথার মুণ্ডন কার্য ১০/১১/১২ ই যিলহজ্জ এই তিন দিনের যে কোন সময় হরমের সীমানার ভিতরে করিতে হইবে, (ওয়াজিব)। ১২ই যিলহজ্জের পর হলক বা কছর করিলে একটি দম দিতে হইবে।

৫। তামাত্তো ও ক্বেরানকারী কোরবানীর পূর্বে মস্তকের চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিলে অথবা রমীর পূর্বে কোরবানী করিলে একটি দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব)

৬। এফরাদ, ক্বেরান বা তামাত্তোকারী রমীর পূর্বে মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিলে তাহাকেও একটি দম দিতে হইবে।

৭। এফরাদ, ক্বেরান বা তামাত্তোকারী রমী ও মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত (হজ্জের ফরজ) আদায় করিলে তাহাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না, তবে এইরূপ করা মাকরূহ।

৮। ১০ই যিলহজ্জ পর্যন্ত পূর্বোল্লিখিত যাবতীয় হজ্জের কার্যাবলী আদায় করার পর মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিলে আংশিকভাবে এহরাম ছুটিয়া যাইবে। আর যদি ইতিপূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করিয়া থাকে তবে পূর্ণভাবে এহরাম ছুটিয়া যাইবে।

৯। কোন হাজী ১০ই যিলহজ্জ মিনাতে আসিয়া জোমরাতুল আকাবাতে রমী করিয়াছে। অতঃপর দমে শোকর আদায় করতঃ মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করিয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে তাওয়াফে যিয়ারত করে নাই। এমতাবস্থায় তাহার এহরাম আংশিকভাবে ছুটিয়া গেল। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ এহরাম অবস্থায় হারাম ছিল তাহা এখন হালাল হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্ত্রী এখন পর্যন্ত হালাল হয় নাই। মক্কা শরীফে আসিয়া তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করিলে স্ত্রী হালাল হইবে। আর স্ত্রীলোক হইলে স্বামী হালাল হইবে।

১০। ওমরাহর এহরাম হউক কিংবা হজ্জের এহরাম হউক, ওমরাহ ও হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সমাধা করা সত্ত্বেও হলক বা কছর ব্যতিরেকে উহা (এহরাম) হইতে হালাল হওয়া যাইবে না।

১১ই যিলহজ্জের কার্যসমূহ

১। ১১ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর তিন জোমরায় ৭ খানা করিয়া মোট ২১ খানা কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে হইবে। দ্বিপ্রহরের পূর্বে করিলে উহা শুদ্ধ হইবে না।

২। দ্বিপ্রহরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় রমী করা সুন্নাত এবং সূর্যাস্ত হইতে ছোবহে ছাদেকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে কোন সময় রমী করিলে ছহীহ হইবে। কিন্তু এই সময় রমী করা মাকরূহ।

৩। এই দিন জোহরের নামায পড়িয়া রমী করিতে রওয়ানা হইবে। মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী প্রথম জোমরায় উলার নিকট গিয়া কিবলামুখী হইয়া জোমরার পাঁচ হাত দূরে দাঁড়াইয়া ডান হাত দ্বারা ৭ খানা কঙ্কর পূর্বে বর্ণিত নিয়মে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর একটু সরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কিবলামুখী অবস্থায় থামিয়া নিজের ও সকলের জন্য দোয়া করিবে।

৪। অতঃপর জোমরায়ে ওসতার (২য় জোমরার) নিকট আসিয়া ঐরূপ কিবলামুখী হইয়া ৭ খানা পাথর ৭ বারে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলিয়া নিক্ষেপ করিবে। তারপর একটু সরিয়া পূর্ববত থামিয়া দোয়া ইস্তেগফার করিবে।

৫। অতঃপর জোমরায়ে আকাবা বা শেষ জোমরার নিকট গিয়া ১০ই যিলহজ্জের কঙ্কর নিক্ষেপের ন্যায় ৭ খানা কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে এবং সেখানে না থাকিয়া দোয়া করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া তাবুতে ফিরিয়া আসিবে।

৬। ঐ দিন ইচ্ছা করিলে মক্কা শরীফ গিয়া তাওয়াফে যিয়ারত ও সায়ী করিয়া আসিতে পারে।

১২ই যিলহজ্জের কার্য সমূহ

১। ১২ই যিলহজ্জ যে ব্যক্তি মিনার কার্য সমূহ সম্পন্ন করিয়া মিনা ত্যাগ করতঃ মক্কা শরীফ যাইতে চায় তাহার জন্য ছোবহে ছাদেক হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্বেও এই দিনের রমী জায়েয আছে। কিন্তু দ্বিপ্রহরের পরে রমী করা আফজাল বা উত্তম। (মানাসেকে মোল্লা আলী কারী, এরশাদুচ্ছায়ী, ফতওয়ায়ে জহিরিয়া, মবছুত, জিয়াউল আবছার, শরহুত্তাহাবী, তাফসীরে একলীল, জাওউল মুনীর, মুস্তাকা, বাহারে আমীক ও আনীসুল মুসাফেরীন কিতাবে বর্ণিত আছে।)

২। এই তারিখে রমীও ১১ই তারিখের রমীর নিয়মে করিতে হইবে।

৩। এই দিনের রমী করিয়া মিনা ত্যাগ করতঃ মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন করিলে কোন দোষ হইবে না। প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে আর ১৩ তারিখের রমী করিতে হইবে না।

৪। এই দিন মিনা ত্যাগ করিতে চাহিলে সূর্যাস্তের পূর্বে করিবে। সূর্যাস্তের পর হইতে ছোবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত মিনা ত্যাগ করিলে মাকরূহ হইবে। আর ছোবহে ছাদেক হইয়া গেলে ১৩ই তারিখ রমী করা ওয়াজিব হইবে।

১৩ই যিলহজ্জের কার্য সমূহ

কেহ ১৩ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করিলে তাহাকে দ্বিপ্রহরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিন জোমরায় ৭ খানা করিয়া কঙ্কর পূর্বোল্লিখিত নিয়মে মারিতে হইবে। ১৩ই তারিখ ছোবহে ছাদেকের পর হইতে কঙ্কর মারা জায়েয আছে। কিন্তু মাকরূহ হইবে।

মাসয়ালা- ১১/১২/১৩ তারিখের রমী ধারাবাহিকভাবে করিবে, অর্থাৎ প্রথম জোমরা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত দ্বিতীয় ও তৃতীয় জোমরায় কঙ্কর মারিবে- (সুন্নাত)। যদি কেহ উহার বিপরীত করে অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় জোমরার কঙ্কর মারার পর প্রথম জোমরায় কঙ্কর মারে তবে সুন্নাতের খেলাফ হইবে। কোন কাফ্ফারা লাগিবে না।

মাসয়ালা- নিক্ষিপ্ত কঙ্কর জোমরার অন্ততঃ তিন হাত কাছে পড়িলে রমী শুদ্ধ হইবে। অন্যথায় রমী শুদ্ধ হইবে না।

মাসয়ালা- সাতখানা কঙ্কর পৃথক পৃথক না মারিয়া এক সঙ্গে মারিলে একটি কঙ্কর নিক্ষেপ বলিয়া ধর্তব্য হইবে। বাকী কঙ্কর তাহাকে পুনরায় নিক্ষেপ করিতে হইবে।

মাসয়ালা- কোন ওজর বশতঃ নিজে রমী করিতে না পারিলে অপরের দ্বারা রমী করাইবে। সে পথমতঃ নিজের রমী শেষ করিয়া অপরের বদলী রমী করিবে। যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে না তাহাকেই মাজুর বলা যাইবে। তাহাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

মাসয়ালা- ভীড়ের দরুন স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে অপরে রমী করিলে জায়েয হইবে না। যদি কোন স্ত্রীলোক ভীড়ের কারণে রমী করিতে না পারে তবে তাহাকে কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে।

মাসয়ালা- প্রত্যেক জোমরায় সাতটির অধিক কঙ্কর মারা মাকরূহ। সন্দেহ স্থলে বেশী মারিলে ক্ষতি হইবে না।

মাসয়ালা- উপরোক্ত হিসাবে কঙ্কর মারার পর যদি কাহার নিকট অতিরিক্ত কঙ্কর থাকিয়া যায় তবে আবশ্যক হইলে উহা অপরকে দিবে। অন্যথায় উহা কোন পাক স্থানে ফেলিয়া দিবে।

মাসয়ালা- যে কঙ্কর একবার নিক্ষেপ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা পুনঃ রমী করা মাকরূহ।

রমীর কাফ্ফারা

১। যদি কেহ পূর্ণ এক দিনের রমী না করে তবে উহাকে রমীর দিনগুলির মধ্যে কাজা করিতে হইবে (ওয়াজিব)। তদুপরি একটি দম দিতে হইবে (ওয়াজিব)। কিন্তু ৪র্থ দিন (১৩ই যিলহজ্জ) সম্পূর্ণ রমী বা অধিকাংশ দিন মিনায় থাকা সত্ত্বেও তরক করিয়া থাকিলে তাহাকে উহা কাজা করিতে হইবে না। তবে উহার জন্য তাহাকে একটি দম

দিতে হইবে।

২। কোন ব্যক্তি ১০ তারিখের সাতটি কঙ্করের অধিকাংশ নিক্ষেপ করে নাই। এখন সে কঙ্কর নিক্ষেপের পরবর্তী দিনগুলির মধ্যে অনাদায়ী কঙ্করগুলি কাজা করিবে এবং একটি দম দিবে (ওয়াজিব)।

৩। ১১ বা ১২ তারিখের নির্ধারিত কঙ্করগুলি অধিকাংশ তরক করিলে, উহা কাজা করতঃ একটি দম দিবে (ওয়াজিব)।

৪। কোন দিনের নির্দ্ধারিত রমীর অর্ধেকের কম সংখ্যক তরক করিলে তরককৃত প্রত্যেক কঙ্করের পরিবর্তে একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান করিতে হইবে। আর ছদকাসমূহ একটি দমের মূল্যের সমান হইলে কিছু কমাইয়া দান করিয়া দিবে।

৫। রমীর নির্ধারিত দিন চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ রমী তরক করিলে একটি মাত্র দম আদায় করিতে হইবে। (ওয়াজিব)

তাওয়াফে যিয়ারত

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের একটি ফরজ। এই ফরজটি আদায় না করতঃ কতক হাজী ছাহেবান বাড়ীতে চলিয়া আসেন। তাওয়াফে যিয়ারত অকুফে আরাফাতের পরে করিতে হয়। অকুফে আরাফাতের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করিলে উহা শুদ্ধ হইবে না। আরাফাত ও মোজদালেফা হইতে মিনা হইয়া যখন হাজীগণ মক্কা শরীফে আসেন, তখন অনেকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। আবার অনেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ছফরের নানা প্রকার কষ্টের দরুন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। হয়ত কেহ কেহ আবার মদীনা শরীফ যান না। অথবা হজ্জের পূর্বেই মদীনা শরীফ যিয়ারত করিয়া আসিয়াছেন। এদিকে জিদ্দায় তাহাদের বাড়ীতে রওয়ানা করিবার জন্য জাহাজের তারিখ ঘোষণা করা হয় ইত্যাদি কারণে অনেকেই তাওয়াফে যিয়ারত না করিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসেন।

পাঠকগণ! যাহারা মিনা হইতে মক্কা শরীফে আসিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করেন নাই, তাহারা দুনিয়া ও আখেরাতে কত যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত মাসায়েল পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াক্ত

১। ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে (১০ই রাত্রের) ছোবহে ছাদেকের পরক্ষণ হইতে তাওয়াফে যিয়ারতের ওয়াক্ত হইয়া থাকে, ইহার পূর্বে তাওয়াফ করিলে উহা শুদ্ধ হইবে না। "বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করিতেছি"বলিয়া তাওয়াফ করিলে এই তাওয়াফ শুদ্ধ হইবে। নিয়তের ভিতরে নির্দিষ্টভাবে "তাওয়াফে যিয়ারত" বাক্যটি না বলিলেও তাওয়াফে যিয়ারত ছহীহ হইবে।

২। ১০ই যিলহজ্জ ছোবহে ছাদেক হইতে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই তিন দিন ও দুই রাত্রের মধ্যে যে কোন সময় তাওয়াফে যিয়ারত করিলে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

৩। ১০ই যিলহজ্জ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোন সময় তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা যায়। তবে ১২ই তারিখের পরে উহা আদায় করিলে গুনাহগার হইবে। এমতাবস্থায় তাওয়াফ আদায় করতঃ গুনাহ হইতে তাওবাহ করিয়া একটি দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব)

৪। তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার সুন্নাত তরিকা নিম্নরূপ- ১০ই যিলহজ্জ প্রথমতঃ জোমরায়ে আকাবায় সাতখানা কঙ্কর মারিবে, পরে দমে শোকর আদায় করিবে। তৎপর হলক বা কছর করিবে। অবশেষে এই দিনই অথবা ১১ই কিংবা ১২ই যিলহজ্জের সন্ধ্যার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করিবে। এই তাওয়াফ আদায় না করিলে হজ্জের একটি ফরজ তরক হওয়ার দরুন হজ্জ অসম্পূর্ণ থাকিবে। মৃত্যুর পূর্বে যে কোন সময় উহা আদায় করতঃ একটি দম দিবে ও তাওবাহ করিবে।

৫। কোন শরয়ী ওজর বশতঃ ১২ই যিলহজ্জের মধ্যে এই তাওয়াফ করিতে না পারিলে পরে উহা আদায় করিবে। দেরীর কারণে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের তরীকা

১। বাবুসসালাম হইতে মসজিদে হরমে দাখিল হইয়া পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে তাওয়াফ আরম্ভ করিতে হইবে। আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে যদি হজ্জের ওয়াজিব ছাফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়) আদায় না করিয়া যাইয়া থাকে তবে তাহাকে এই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করিতে হইবে। অবশিষ্ট চার চক্কর রমল ব্যতীত করিবে, (সুন্নাত)। পরে তাওয়াফের দুই রাকয়াত ওয়াজিব নামায পড়িয়া ছাফা ও মারওয়ার সায়ী করিবে। তাওয়াফে যিয়ারতে এজতেবা করিতে হয় না। কেননা সাধারণতঃ মিনাতে এহরামের কাপড় খুলিয়া স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতঃ এই তাওয়াফ আদায় করিতে হয়। অতএব হলকের পূর্বে এহরামের কাপড় পরিধান করতঃ তাওয়াফ করিলে এজতেবা করিবে না। তাওয়াফে যিয়ারতের শুরুতে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ طَوَافَ
الزِّيَارَةِ فَرْضَ الْحَجِّ- فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ-

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ! আমি হজ্জের ফরজ তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্কর তোমার ঘর তাওয়াফ করিতে এরাদা করিয়াছি। তুমি উহা আমার প্রতি সহজ করিয়া দাও এবং কবুল কর।

২। তাওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর আদায় করিলে হজ্জের ফরজ তাওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট তিন চক্কর আদায় করা ওয়াজিব। উহা তরক করিলে একটি দম দিতে হইবে। (ওয়াজিব)

৩। তাওয়াফে যিয়ারত স্বয়ং নিজে করিবে। অন্যের দ্বারা আদায় করাইলে উহা আদায় হইবে না। তবে এহরামের পূর্ব হইতে কেহ বেহুঁশ অবস্থায় থাকিলে তাহার তরফ হইতে তাহার সঙ্গী তাওয়াফ করিলে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে।

৪। পায়ে হাঁটিয়া নিজে তাওয়াফ করিবে। ওজর বশতঃ সওয়ারীর সাহায্যে অথবা অন্যের কোলে উঠিয়া কিংবা পিঠে চড়িয়া তাওয়াফ করিলে উহা শুদ্ধ হইবে।

৫। রমী, হজ্জের কোরবানী হলক বা কছর না করিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করিলে উহা আদায় হইয়া যাইবে। তবে সুন্নাতের খেলাফ হওয়ার জন্য উহা মাকরূহ হইবে।

৬। তাওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর ফরজ। ইহা আদায় না করিলে তাহার জিম্মায় ফরজ থাকিয়া যাইবে। এই ফরজের পরিবর্তে ছাগল, দুম্বা, গরু অথবা উট এক কথায় সর্বস্বও কোরবানী করিলে ইহার কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। তাহার জিম্মায় ফরজ রহিয়াই যাইবে। পরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাকে মক্কা শরীফে যাইয়া এই ফরজ তাওয়াফ আদায় করিয়া আসিতে হইবে। অবশিষ্ট তিন চক্কর তরক করিলে একটি 'দম' দিতে হইবে। এই ফরজ তাওয়াফ আদায় না করিয়া বাড়ীতে আসিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতদিন যাবত পুনঃ মক্কা শরীফ গিয়া তাওয়াফ আদায় না করিবে, ততদিন সে তাহার পূর্ব এহরাম হইতে সম্পূর্ণরূপে হালাল হইবে না। এই এহরাম নিয়াই তাহাকে স্বয়ং মসজিদে হরমে প্রবেশ করতঃ তাওয়াফ করিতে হইবে। নূতন করিয়া এহরাম বাঁধিতে হইবে না।

তাওয়াফে যিয়ারত তরককারী ও তাহার স্ত্রী

১। ১০ই যিলহজ্জ রমী, দমে শোকর ও হলক বা কছর আদায় করার পর আংশিক ভাবে এহরাম খুলিয়া যায়। এখন সে সেলাই করা কাপড় ও জামা, খুশবু ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে। পায়ের নখ কাটিতে ও উকুন মারিতে পারিবে। এক কথায় এহরাম অবস্থায় যাহা কিছু হারাম ছিল তাহা সম্পূর্ণ এখন তাহার জন্য হালাল হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রী সহবাস বা সহবাসের প্রেরণা দানকারী কোন কাজ যথা- (চুম্বন, স্পর্শন ও আলিঙ্গন ইত্যাদি) তাহার জন্য এখন পর্যন্ত হালাল হয় নাই। উহা পূর্ববৎ হারাম রহিয়াছে। যত দিন বা যত সময় পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর নিজে আদায় না করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহার প্রতি তাহার স্ত্রী সহবাস হারাম থাকিবে। এবং হজ্জকারী স্ত্রীলোক হইলে তাহার প্রতি তাহার স্বামী সহবাস হারাম থাকিবে। তাওয়াফে যিয়ারত আদায় না করা পর্যন্ত সঙ্গমাদি হালাল হওয়ার আর কোন পন্থা নাই।

এইভাবে হলক ও কছরের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করিলে, হলক বা কছর

ব্যতীরেকে এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলীর একটিও তাহার পক্ষে হালাল হইবে না।

২। কেহ তাওয়াফে যিয়ারতের চার চক্কর না করিয়া বাড়ীতে আসিলে যতদিন সে স্বয়ং কা'বা শরীফ যিয়ারত না করিবে ততদিন তাহার স্ত্রী সহবাস হারাম থাকিবে এবং হজ্জ অসম্পূর্ণ থাকিবে। সুতরাং এই ফরজ তাওয়াফ আদায় না করা পর্যন্ত তাহাকে স্ত্রী হইতে পৃথক থাকিতে হইবে। তাওয়াফে যিয়ারতের অধিকাংশ চক্কর ঘুরিয়া বাড়ীতে আসিলে স্ত্রী সহবাস হারাম হইবে না। সে একটি দম স্বয়ং অথবা লোক মারফত হরমের মধ্যে যবেহ করিয়া দিবে। (ওয়াজিব)

৩। তাওয়াফে যিয়ারত তরককারী মৃত্যুর পূর্বে স্বয়ং তাওয়াফ আদায় করিবে। এমতাবস্থায় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার অসম্পূর্ণ হজ্জ কাফ্ফারা দ্বারা পূর্ণ করিতে অসিয়ত করিয়া যাইবে (ওয়াজিব)। সে মতে তাহার মৃত্যু বাদে একটি উট বা একটি গরু কাফ্ফারা স্বরূপ হরমের ভিতরে যবেহ করিয়া দিলে তাহার হজ্জ বৈধ ও পূর্ণ হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পূর্বে কাফ্ফারা দিলে শুদ্ধ হইবে না।

৪। তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্ণ সাত চক্কর অথবা অধিকাংশ চক্কর ১২ই যিলহজ্জের মধ্যে আদায় না করিলে একটি দম দিতে হইবে। এবং ১/২/৩ চক্কর ১২ তারিখের পরে করিলে প্রতি চক্করের জন্য একটি ছদকায়ে ফিতর পরিমাণ দিতে হইবে।

জুনুব ও হায়েজ বা নেফাসওয়ালীর তাওয়াফে যিয়ারত

১। জুনুব, (নাপাক) হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করিলে, সে গুনাহগার হইবে। এবং কাফ্ফারা স্বরূপ একটি উট বা একটি গরু কোরবানী দিতে হইবে। এই অবস্থায় সে হলক বা কছর করিয়া থাকিলে তাহার এহরাম পুরাপুরি ছুটিয়া যাইবে। পাক হইয়া পুনঃ তাওয়াফ করিলে কাফ্ফারা মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু নাপাক অবস্থায় তাওয়াফের জন্য তাওবাহ করিবে।

২। হায়েজ ও নেফাসের জন্য কোন স্ত্রীলোক ১২ই যিলহজ্জের ভিতরে তাওয়াফে যিয়ারত করিতে পারে নাই। পাক হওয়ার পরে তাওয়াফ করিলে তাহার প্রতি কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

৩। ১২ই যিলহজ্জের দিন সন্ধ্যার পূর্বে চার চক্কর তাওয়াফ করিতে পারে, এমন সময় কোন স্ত্রীলোক হায়েজ বা নেফাস হইতে গোসল করিয়া পাক হইয়া যদি তাওয়াফ না করে তাবে তাহাকে একটি 'দম' দিতে হইবে।

৪। কোন হায়েজ বা নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকের কাফেলা চলিয়া যাইতেছে. জাহাজ ছাড়িবার সময় হইয়াছে অথবা জরুরী কোন ওজর উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহাকে এখনই মক্কা শরীফ ত্যাগ করিতে হইবে। অথচ সে (স্ত্রীলোক) এখন পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত করে নাই। এই অবস্থায় স্ত্রীলোকটি হরম শরীফে ঢুকিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করিবে এবং একটি গরু অথবা উট কাফ্ফারা স্বরূপ আদায় করিবে (ওয়াজিব)। ঐ স্ত্রীলোক

তাওয়াফে বিদা করিবে না এবং তাহার জন্য কোন কাফফারা দিতে হইবে না।

তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ

১। আফাকী হাজীদের জন্য তাওয়াফে বিদা করা ওয়াজিব। মক্কা শরীফ হইতে বিদায়ের সময় এই তাওয়াফ করিতে হইবে যাহারা শুধু ওমরাহ করিয়াছে তাহাদের জন্য তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব নয়। এই প্রকারে মক্কী, হরমী, হেল্লী মিকাতীদের জন্য হজ্জ ও ওমরাহর পরে বিদায়ের সময় তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব নয়।

২। তাওয়াফে যিয়ারতের পরে তাওয়াফে বিদা করিবে, উহার পূর্বে করিলে শুদ্ধ হইবে না। তাওয়াফে বিদার জন্য কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই। জীবনে যখন ইচ্ছা তখন তাওয়াফে বিদা আদায় করা যায়। দেরীর কারণে কোন কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

৩। তাওয়াফে যিয়ারতের পরে নফল তাওয়াফ করিলেও উহা দ্বারা তাওয়াফে বিদা আদায় হইয়া যাইবে। তাওয়াফে বিদাতে এজতেবা ও রমল করিবে না এবং উহার পরে সায়ী করিবে না।

৪। মক্কা শরীফ হইতে বিদায়ের অনেক পূর্বে এই তাওয়াফ করিলেও তাওয়াফে বিদা আদায় হইয়া যাইবে। তবে মক্কা শরীফের যাবতীয় কাজ সমাধা করতঃ মক্কা শরীফ ত্যাগ করিবার সময় এই তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।

৫। কোন আফাকী মক্কা শরীফে কয়েক বৎসর থাকার নিয়তে মুকীম হইয়া থাকিলেও তাহাকে তাওয়াফে বিদা আদায় করিতে হইবে। (ওয়াজিব)

৬। তাওয়াফে বিদা তরক করতঃ মীকাত অতিক্রম করিয়া না থাকিলে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাওয়াফে বিদা আদায় করিবে। আর মীকাত অতিক্রম করিলে ফিরিয়া আসা ওয়াজিব নহে। হরমের মধ্যে একটি দম যবেহ করিয়া দিতে হইবে।

৭। শরয়ী ওজরে তাওয়াফে বিদা তরক করিলে কোন দোষ হইবে না এবং কোন কাফ্ফারাও দিতে হইবে না।

তাওয়াফে বিদা দ্বারা তাওয়াফে যিয়ারতের ক্ষতিপূরণ

১। যিলহজ্জের ১২ তারিখের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারত করে নাই। কিন্তু তাওয়াফে বিদা করিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার তাওয়াফে বিদা দ্বারা তাওয়াফে যিয়ারত আদায় হইয়া যাইবে। তাওয়াফে বিদা তরকের জন্য একটি দম দিবে। যদি সে ব্যক্তি পুনঃ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে,তবে এই তাওয়াফ তাওয়াফে বিদা হইয়া যাইবে। এবং তাহাকে আর উক্ত দম দিতে হইবে না।

২। কোন এক ব্যক্তি আরাফাতের পর হইতে ১২ তারিখের মধ্যে কোন তাওয়াফ করে নাই। ১২ তারিখের পর সে তাওয়াফে বিদা করিল, ইহাতে তাহার তাওয়াফে যিয়ারত আদায় হইয়া যাইবে এবং একটি দম আদায় করিবে। আর পুনঃ তাওয়াফে বিদা না করিলে তাওয়াফে বিদা তরকের দরুন আর একটি দম দিবে।

৩। আরাফাত হইতে আসার পর কোন হাজী দুইটি নফল তাওয়াফ করিয়াছে, এমতাবস্থায়ও তাহার তাওয়াফে যিয়ারত ও তাওয়াফে বিদা আদায় হইয়া গিয়াছে। কেননা এই

দুই তাওয়াফে নির্দিষ্ট করিয়া কোন নিয়ত করিতে হয় না।

তাওয়াফে বিদা আদায় করিবার নিয়ম

এই কিতাবে পূর্বে বর্ণিত তাওয়াফ সম্পর্কীয় মাসায়েল অবগত হইয়া তাওয়াফে বিদা আদায় করিবেন। বিদায়ী তাওয়াফে এহরাম বাঁধিতে হয় না এবং এজতেবা ও রমল করিতে হয় না। তাওয়াফ শেষে দুই রাকয়াত তাওয়াফের ওয়াজিব নামায পড়িবেন। মাকরূহ ওয়াক্ত হইলে পরে নামায পড়িবেন। নামাযান্তে জমজম কূপের নিকটে যাইয়া বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া নিজ হাতে পেট ভরিয়া পানি পান করিবেন।

এরপর বাইতুল্লাহর ভিতরে আসিয়া গিলাফ ধরিয়া আল্লাহর দরবারে আযীযী এনকেছারীর সহিত অনেক সময় ধরিয়া কান্নাকাটি করিবেন। তাসবীহ তাহলীল পড়িয়া বায়তুল্লাহর প্রতি তাকাইতে তাকাইতে ক্ষুণ্ন হৃদয়ে উলটা পায়ে পিছনের দিকে হাটিয়া বাবুল বিদা নামক দরওয়াজা দিয়া বাহির হইবেন।

হায়েজ বা নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক তাওয়াফে বিদা করিবে না এবং মসজিদে হরমেও ঢুকিবে না। উপরন্তু সে বাবুল বিদার সম্মুখে দাড়াইয়া দোয়া করতঃ ক্ষুণ্ন মনে মক্কা শরীফ ত্যাগ করিবে।

হজ্জে তামাত্তোর সংক্ষিপ্ত সার

ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া মক্কা শরীফে আসিয়া প্রথমতঃ শাওয়াল, যিলকদ মাসের ৯ই তারিখের মধ্যে হজ্জের পূর্বে ওমরাহ শেষে হালাল হইয়া সেই বৎসরই পুনঃ হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে তামাত্তো বলে। তামাত্তোকারীকে মোতামাত্তে বলে। এই কিতাবে পূর্বে হজ্জে তামাত্তোর নিয়ম কানুন ও মাসায়েল বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল।

হজ্জে তামাত্তো হজ্জে এফরাদ হইতে উত্তম। আপনি যদি তামাত্তো করিতে এরাদা করিয়া থাকেন, তবে হজ্জের মাস সমূহের মধ্যে মীকাত হইতে শুধু ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পড়িতে পড়িতে মক্কা শরীফে ঢুকিয়া এজতেবা ও রমলের সহিত ওমরাহর ফরজ তাওয়াফ করতঃ তাওয়াফের দুই রাকয়াত ওয়াজিব নামায পড়িবেন। তাওয়াফের প্রারম্ভে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করিয়া তাওয়াফ শুরু করিতেই তালবিয়াহ পড়া বন্ধ করিয়া দিবেন। অতঃপর ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করিবেন। অবশেষে মাথার চুল হলক বা কছর করিয়া ওমরাহর এহরাম খুলিয়া ফেলিবেন। এখন আপনি হজ্জের এহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত সেলাই করা কাপড়াদি পরিধান করিতে এবং স্ত্রী সহবাসাদি করিতে পারিবেন। ইত্যাবসরে হজ্জের এহরাম বাঁধার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যহ যতবার ইচ্ছা তানয়ীমে গিয়া ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া ওমরাহ আদায় করিতে পারিবেন এবং অবসর সময় তাওয়াফ করিতে থাকিবেন।

আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে ৭ই অথবা ৮ই যিলহজ্জ মক্কা শরীফ হইতে পুনরায়

হজ্জের এহরাম বাঁধিবেন ও তালবিয়াহ পড়িতে থাকিবেন। মীকাতের বহির্দেশীয় হাজীদের পক্ষে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হইবার পূর্বেই ছাফা ও মারওয়ার হজ্জের সায়ী আদায় করা উত্তম। অতএব সায়ী করিয়া মিনা হইয়া আরাফাতের দিকে যাইবেন। ৯ই দ্বিপ্রহরের পরে মসজিদে নামেরাতে সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত ইমামের সহিত জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছর পড়িয়া সূর্য অস্তের পরক্ষণ পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করিবেন। ইমামের সাথে জোহর আছর পড়িতে না পারিলে জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আছরের ওয়াক্তে আছর নিজ তাবুতে পড়িবেন। সন্ধ্যার পর আরাফাত হইতে মোজদালেফায় আসিয়া এশার ওয়াক্তে মাগরিব ও এশার নামায জামায়াতে বা একাকী পড়িবেন। সূর্যোদ্বয়ের পরে মোজদালাফা হইতে রওয়ানা হইয়া মিনাতে আসিয়া প্রথমতঃ জোমরায় আকাবায় ৭টি কঙ্কর মারিবেন। প্রথম কঙ্কর মারিতেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করিয়া দিবেন। অতঃপর দমে শোকর আদায় করিয়া হলক বা কছরের দ্বারা এহরাম খুলিবেন। পারিলে অদ্যই মক্কা শরীফ গিয়া তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করতঃ পরে মিনাতে আসিবেন এবং ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে মিনায় অবস্থান করিলে পূর্বোল্লিখিত নিয়মে তিন জোমরায় পাথর মারিবেন। মনে রাখিবেন যে, ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করিতেই হইবে এবং ১২ তারিখের মধ্যে দমে শোকর অবশ্য আদায় করিয়া সর্বশেষে হলক বা কছর করিতে হইবে। ১১ অথবা ১২ তারিখের দমে শোকর অবশ্য আদায় করিয়া সর্বশেষে হলক বা কছর করিতে হইবে। ১১ অথবা ১২ তারিখে দমে শোকর আদায় করতঃ হলক করিলেও কোন দোষ নাই। তবে ১০ তারিখে দমে শোকর আদায় ও হলক বা কছর করা উত্তম।

হজ্জে তামাত্তো'র তালিকা

১। ওমরাহর কার্যাবলীঃ

কাজঃ	হুকুম
(ক) ওমরাহর এহরাম বাঁধা (মীকাত হইতে)	ফরজ
(খ) ওমরাহর তাওয়াফ করা (এজতেবা ও রমল সহ)	ফরজ
(গ) তাওয়াফের পর নামায পড়া (মাকামে ইব্রাহীমে)	ওয়াজিব
(ঘ) ওমরাহর সায়ী	ওয়াজিব
(ঙ) মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা	ওয়াজিব

২। হজ্জের কার্যাবলী:

(ক) পুনরায় এহরাম বাঁধা (তালবিয়া সহ ৭ই বা ৮ই জ্বিলহজ্জ)	ফরজ
(খ) হজ্জের সায়ী	ওয়াজিব
(গ) অকুফে আরাফাত (৯ই জ্বিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর হইতে)	ফরজ

(ঘ) অকুফে মোজদালেফা (১০ই জ্বিলহজ্জ ছোবহে ছাদেকের পর) ওয়াজিব

(ঙ) শুধু জোমরায়ে আকাবাতে রমী করা (১০ই জ্বিলহজ্জ) ওয়াজিব

(চ) কোরবানী করা (দমে শোকর) ওয়াজিব

(ছ) মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা (১০ই জ্বিলহজ্জ হইতে ১২ইর মধ্যে) ওয়াজিব

(জ) তাওয়াফে যিয়ারত (১০ই জ্বিলহজ্জ হইতে ১২ই জ্বিলহজ্জের মধ্যে) ফরজ

(ঝ) ১১ই জ্বিলহজ্জ ও ১২ই জ্বিলহজ্জ (তিন জোমরার প্রত্যেকটিতে ৭টি করিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করা।) ওয়াজিব

(ঞ) ১৩ই জ্বিলহজ্জ তিন জোমরায় রমী (মীনায় ১৩ই অবস্থান করিলে)ওয়াজিব

(ট) বিদায়ী তাওয়াফ (আফাকীর জন্য) ওয়াজিব

বিঃ দ্রঃ মক্কাবাসী ও মক্কার নিকটবর্তী স্থানের লোকদের জন্য হজ্জে তামাত্তো' করা জায়েয নহে।

হজ্জে ক্বেরানের সংক্ষিপ্ত সার

ওমরাহ ও হজ্জের এহরাম একত্রে বাঁধিয়া হজ্জের মাস সমূহের মধ্যে প্রথমতঃ ওমরাহ আদায় করতঃ এহরাম না খুলিয়া এই এহরামে হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে ক্বেরান বলে। ক্বেরানকারীকে ক্বারেন বলা হয়।

মনে রাখিবেন যে, হজ্জে ক্বেরান হজ্জে তামাত্তো' ও এফরাদ হইতে উত্তম। হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ম হিজরীতে যে হজ্জ করিয়াছিলেন উহা হজ্জে কেরান ছিল। যদি পারেন তবে আপনিও এই সর্বোত্তম হজ্জ করিবেন। কেরানের এহরামও মীকাত হইতে বাঁধিতে হয়। আর ইচ্ছা করিলে আপনি বাড়ী হইতেও উহার এহরাম বাঁধিতে পারেন।

অতঃপর তালবিয়া পাঠ করিয়া প্রথমতঃ ওমরাহর কার্যাবলী আদায় করতঃ এহরাম না খুলিয়া তাওয়াফে কুদুমের পরে হজ্জের সায়ী আদায় করিয়া ৮ই তারিখে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হইবেন।

তাওয়াফে কুদুমের নিয়ম

মক্কা শরীফে পৌঁছিয়াই ক্বেরানকারী ওমরাহ আদায় করার পর এই তাওয়াফ করিতে হয়। ইহা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। হজ্জের কোন রোকন নয়। এই তাওয়াফকে আগমনি তাওয়াফ বা তাওয়াফে কুদুম বলা হয়।

ক্বেরানকারীকেও মোতামাত্তের ন্যায় মিনাতে কঙ্কর মারিতে হয়। দমে শোকর দিতে হয়। অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারত ও হলক বা কছর করিয়া হজ্জ সমাধা করিবেন।

ক্বারেন কর্তৃক সংঘটিত নিষিদ্ধাবলীর কাফফারা

১। এহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ করা নিষেধ, ক্বারেন কর্তৃক যদি উহা সংঘটিত হয় তবে তাহাকে প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া কাফফারা দিতে হইবে। কেননা সে ওমরাহ ও হজ্জের দুইটি এহরাম একত্রে বাঁধিয়াছে।

২। এই কিতাবে পূর্বে সংঘটিত নিষিদ্ধাবলীর কাফফারার বিষয় বিস্তারিত লিখা হইয়াছে। সেখানে কাফফারার সংখ্যা বা পরিমাণ যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে ক্বারেন তাহার দ্বিগুণ আদায় করিবে। কিন্তু ১২টি ক্ষেত্রে ক্বারেনও মোতামাত্তে এবং মোফরেদের ন্যায় একটি করিয়া কাফফারা দিবে-

(১) বিনা এহরামে মিকাত অতিক্রম করতঃ ক্বেরানের নিয়ত বাঁধিলে, (২) হরমের সীমানার মধ্যের কোন গাছপালা কাটিলে, (৩) হজ্জ অথবা ওমরাহ পদব্রজে আদায় করার মান্নত করতঃ ক্বেরান করিয়া সওয়ারীর সাহায্যে আদায় করিলে। (৪) ওমরাহর তাওয়াফ অথবা তাওয়াফে যিয়ারত জুনুব কিংবা বে-অজু অবস্থায় করিলে, (৫) সূর্য অস্তের পূর্বে বিনা ওজরে আরাফাত হইতে আসিলে, (৬) মোজদালেফার অকুফ বিনা ওজরে তরক করিলে, (৭) দমে শোকরের পূর্বে হলক করিলে, (৮) যিলহজ্জের ১২ তারিখের পরে হলক করিলে, (৯) যিলহজ্জের ১২ তারিখের পরে দমে শোকর জবেহ করিলে, (১০) রমী তরক করিলে, (১১) হজ্জ অথবা ওমরাহর সায়ী তরক করিলে এবং (১২) তাওয়াফে বিদা' তরক করিলে।

হজ্জে ক্বেরানের তালিকা

কাজঃ	হুকুম
১। ওমরাহ ও হজ্জের যুক্ত এহরাম (তালবিয়া সহ)	ফরজ
২। ওমরাহর তাওয়াফ (এজতেবা ও রমল সহ)	ফরজ
৩। তাওয়াফের নামায (মাকামে ইব্রাহীমে)	ওয়াজিব
৪। ওমরাহর সায়ী	ওয়াজিব
৫। তাওয়াফে কুদুম, এজতেবা ও রমল সহ (আফাকীর জন্য)	সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
৬। তাওয়াফের নামায (মাকামে ইব্রাহীমে)	ওয়াজিব
৭। হজ্জের সায়ী	ওয়াজিব
৮। অকুফে আরাফাত (৯ই দ্বিপ্রহরের পর)	ফরজ
৯। অকুফে মোজদালাফা (১০ই ছোবহে ছাদেকের পর)	ওয়াজিব
১০। শুধু জোমরায়ে আকাবার রমী করা (১০ই তারিখে)	ওয়াজিব
১১। কোরবানী (দমে শোকর, ১০ই হইতে ১২ইর মধ্যে)	ওয়াজিব
১২। মাথা মুণ্ডন বা কর্তন করা (১০ই হইতে ১২ইর মধ্যে)	ওয়াজিব
১৩। তাওয়াফে যিয়ারত (১০ই হইতে ১২ইর মধ্যে)	ফরজ

১৪। তিন জোমরায় ৭টি করিয়া কঙ্কর মারা (১১ই ও ১২ই) ওয়াজিব
১৫। ১৩ই তিন জোমরায় কঙ্কর মারা (মিনায় ১৩ই অবস্থান করিলে) ওয়াজিব
১৬। বিদায়ী তাওয়াফ (আফাকীর জন্য) ওয়াজিব

বিঃ দ্রঃ মক্কাবাসী ও মক্কার নিকটবর্তী স্থানের লোকদের জন্য হজ্জে ক্বেরান করা জায়েয নাই।

হজ্জে এফরাদের সংক্ষিপ্ত সার

শুধু হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া উহার কার্যাবলী সমাধা করাকে হজ্জে এফরাদ বলে এবং এফরাদকারীকে 'মোফরেদ' বলা হয়।

নিয়তঃ ইয়া আল্লাহ! আমি হজ্জ করিতে এরাদা করিতেছি, তুমি উহা আমার প্রতি সহজ করিয়া দাও এবং কবুল কর। আমি হজ্জের নিয়ত করতঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে উহার এহরাম বাঁধিলাম।

অতঃপর আপনি মক্কা শরীফ যাইয়া তাওয়াফে কুদুম আদায় করিয়া এহরাম অবস্থায় থাকিবেন। ইত্যাবসরে আপনি যত ইচ্ছা নফল তাওয়াফ করিতে পারেন। ওমরাহ করিতে পারিবেন না। হজ্জের সায়ী করিয়া ৮ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিকে রওয়ানা হইবেন এবং হজ্জে তামাত্তো'র মোতাবেক হজ্জের কার্যাবলী আদায় করতঃ হজ্জ সমাধা করিবেন। হজ্জে এফরাদে দমে শোকর করা মুস্তাহাব। যিলহজ্জের ১৩ তারিখের পরে আপনি আপনার ইচ্ছামত ওমরাহ করিতে পারিবেন।

হজ্জে এফরাদের তালিকা

১। হজ্জের এহরাম বাঁধা ফরজ
২। তাওয়াফে কুদুম (আফাকীর জন্য এজতেবা ও রমলসহ) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
৩। তাওয়াফের দুই রাকয়াত নামায (মাকামে ইব্রাহীমে) ওয়াজিব
৪। হজ্জের সায়ী ওয়াজিব
৫। অকুফে আরাফাত (৯ই যিলহজ্জ) ফরজ
৬। অকুফে মোজদালাফা (১০ই ছোবহে ছাদেকের পর) ওয়াজিব
৭। শুধু জোমরায়ে আকাবায় ৭টি কঙ্কর মারা (১০ই) ওয়াজিব
৮। কোরবানী (দমে শোকর ১০ই হইতে ১২ই মধ্যে) মুস্তাহাব
৯। মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করা (১০ই হইতে ১২ইর মধ্যে) ওয়াজিব
১০। তাওয়াফে যিয়ারত (১০ই হইতে ১২ইর মধ্যে) ফরজ
১১। তিন জোমরায় ৭টি করিয়া কঙ্কর মারা (১১ই ও ১২ই) ওয়াজিব
১২। তিন জোমরায় ১৩ই জ্বিলহজ্জ কঙ্কর মারা (১৩ই মিনায় অবস্থান করিলে) ওয়াজিব
১৩। বিদায়ী তাওয়াফ (আফাকীর জন্য) ওয়াজিব

• ওমরাহ্‌র তালিকা

১। ওমরাহ্‌র এহরাম (হরমের বহির্দেশ হইতে তানয়ীমে যাইয়া)	ফরজ
২। ওমরাহ্‌র তাওয়াফ (এজতেবা ও রমলসহ)	ফরজ
৩। তাওয়াফের পর দুই রাকয়াত নামায (মাকামে ইব্রাহীমে)	ওয়াজিব
৪। ওমরাহ্‌র সায়ী	ওয়াজিব
৫। মাথার চুল মুণ্ডন বা কর্তন করা।	ওয়াজিব

নফল ওমরাহ্‌

আপনি যদি মোতামাত্তে হন, তবে ওমরাহ শেষে এহরাম খোলার পরে হজ্জের এহরাম বাঁধার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এবং ১৩ই যিলহজ্জের পরে দৈনিক যতবার ইচ্ছা নফল ওমরাহ করিতে পারেন। প্রত্যেক বার 'তানয়ীম' নামক স্থানে গিয়া তথাকার হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়া এহরামের নামাযান্তে ওমরাহ্‌র এহরাম বাঁধিয়া আসিবেন। তাওয়াফ ও সায়ী করিয়া হলক বা কছর করিলেই একটি ওমরাহ আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি আপনি ক্বারেন বা মোফরেদ হন,তবে ১৩ই যিলহজ্জের পরে ইচ্ছামত ওমরাহ করিবেন। ১৩ই যিলহজ্জের পূর্বে নফল ওমরাহ করিতে পারিবেন না।

নফল ওমরাহ্‌র নিয়ত

ইয়া আল্লাহ! আমি ওমরাহ্‌ আদায় করিবার এরাদা করিলাম, উহা আমার জন্য আসান করিয়া দাও এবং উহা কবুল কর। আমি ওমরাহ্‌র নিয়ত করিলাম, এবং সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র জন্য হারাম করিলাম।

নফল তাওয়াফ

প্রকাশ থাকে যে, আপনি মক্কা শরীফে এহরাম অবস্থায় থাকুন কিংবা বিনা এহরামে থাকুন উভয় অবস্থায় যতবার ইচ্ছা ততবার নফল তাওয়াফ করিতে পারেন। প্রত্যেক নফল তাওয়াফেও দুই রাকয়াত তাওয়াফের ওয়াজিব নামায পড়িতে হয়। প্রত্যেক নফল তাওয়াফেও সাত বার সাত চক্কর ঘুরিতে হয়।

নফল তাওয়াফের নিয়ত

হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘরের সাত চক্কর ঘুরিতে এরাদা করিতেছি। তুমি উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও ও কবুল কর।

বদলী হজ্জ বা নায়েবী হজ্জ

বদলী হজ্জের অসিয়ত-

১। যাহার প্রতি হজ্জ ফরজ হইয়াছে অথবা ফরজ হজ্জ কাজা হইয়াছে কিংবা মান্নত হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হইয়াছে। এবং উহা সে ব্যক্তি আদায় করিতে সক্ষম হওয়া

সত্ত্বেও আদায় করে নাই। এমন সময় তাহার মৃত্যুর আশংকা দেখা দিয়াছে কিংবা মৃত্যু সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহাকে বদলী হজ্জের জন্য অসিয়ত করিয়া যাইতে হইবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি ঐ হজ্জ আদায় করিতে আদৌ সক্ষম না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ্জ করাইতে হইবে অথবা অসিয়ত করিয়া যাইতে হইবে। ইহা ওয়াজিব। অসিয়ত না করা অবস্থায় মৃত্যু হইলে গুনাহগার হইবে।

২। কারারুদ্ধ ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কাহারও দ্বারা হজ্জে যাওয়া বাঁধা প্রাপ্ত লোক, কঠিন রোগগ্রস্থ ব্যক্তি, অন্ধ লোক, খঞ্জ ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ এবং যে স্ত্রীলোক তাহার স্বামী বা কোন মাহারেম ব্যক্তিকে সাথে নিতে অক্ষম, ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীলোক অথবা সে লোকের হজ্জে যাওয়ার রাস্তা নিরাপদ নয়। উপরোক্ত কারণ সমূহে সে ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে বদলী হজ্জ করাইতে হইবে বা অসিয়ত করিয়া যাইতে হইবে।

৩। যদি কোন লোক অসিয়ত করিবার পরে মারা যায়,তবে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে ওয়ারিসগণের তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা বদলী হজ্জ করাইতে হইবে।

মাসয়ালা- নিজের ফরজ হজ্জ আদায় করিবার পরে অপরের পক্ষে নায়েবী হজ্জ আদায় করা অতি উত্তম কাজ। যেহেতু এই হজ্জ দ্বারা উভয়েই উপকৃত হইয়া থাকে।

মাসয়ালা- যাহার নিকট হজ্জ করাইবার অসিয়ত করিয়া গিয়াছে তাহাকে অছী বলা হয়। যাহার পক্ষে হজ্জ করা হয় তাহাকে মুনীব বা আমের বলা হয়। আর হজ্জকারীকে নায়েব বলা হয়।

হাদীস- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, মৃতের পক্ষ হইতে বদলী হজ্জ তাহার আমলনামায় একটি হজ্জের ছওয়াব লিখা হয়। আর যে ব্যক্তি মৃতের পক্ষ হইতে বদলী হজ্জ আদায় করে, তাহার আমলনামায় সাতটি হজ্জের ছওয়াব লিখা হয়। (হজ্জ ও যিয়ারত)

ফরজ নায়েবী হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

বদলী হজ্জ (নায়েবী হজ্জ) শুদ্ধ হইবার শর্ত মোট বিশটি। এই বিশটি শর্ত মোতাবেক যদি কোন ব্যক্তি কাহারও পক্ষ হইতে বদলী হজ্জ করে, তবে যাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করা হইয়াছে, তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি এই শর্তাবলী হইতে কোন একটি শর্ত লংঘন করতঃ বদলী হজ্জ করে, তবে কোন কোন শর্ত অনুযায়ী এই হজ্জ শুদ্ধ হইবে না এবং কোন কোন শর্তানুযায়ী হজ্জকারীর নিজের তরফ হইতে শুদ্ধ হইবে। যাহার পক্ষ হইতে বদলী হজ্জ করা হইয়াছে তাহার হজ্জ আদায় হইবে না এবং হজ্জের যাবতীয় যাতায়াত খরচ যাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিয়াছে তাহাকে ফেরত দিবে। শর্তগুলি নিম্নরূপঃ

১। যে ব্যক্তি অন্য লোক দ্বারা নায়েবী হজ্জ করাইতে চায়, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হওয়া শর্ত। তাহার উপর হজ্জ ফরজ না হইলে অপরের দ্বারা নায়েবী ফরজ হজ্জ

করাইলে তাহার পক্ষ হইতে ফরজ আদায় হইবে না বরং নফল আদায় হইবে।

২। যাহার বদলী হজ্জ করান হইবে সে হজ্জ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়া। অর্থাৎ যাহার বদলী হজ্জ করান হইতেছে, বদলী হজ্জ করাইবার সময় হইতে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাহার স্বয়ং হজ্জ করিতে অক্ষম থাকা।

৩। স্বয়ং ফরজ হজ্জ আদায় না করিতে পারার ওজর বদলী হজ্জ করাইবার পূর্ব হইতেই থাকিতে হইবে।

৪। যাহার বদলী হজ্জ করিতেছে, নায়েবী হজ্জকারীকে তাহার নিকট হইতে কিংবা তাহার অছীর নিকট হইতে নায়েবী হজ্জের হুকুম প্রাপ্ত হওয়া।

৫। নায়েবী হজ্জ আদায়ের জন্য মজুরীর শর্ত না করা। নায়েবকে যাহা কিছু দেওয়া হইবে তাহার খোরাকী ও পথ খরচ হিসাবে দিতে হইবে। মজুরী বাবদ নহে।

৬। যাহার বদলী হজ্জ করিবে, তাহার মাল দ্বারা (অর্থ) হজ্জ করিতে হইবে। নিজের মাল (অর্থ) দ্বারা করিলে বদলী হজ্জ শুদ্ধ হইবে না। তবে যদি অধিকাংশ মাল মুনীবের হয় এবং কম অংশ হজ্জকারী নিজ হইতে খরচ করে, তবে নায়েবী ফরজ হজ্জ শুদ্ধ হইবে।

৭। বদলী হজ্জকারীকে সওয়ারীর সাহায্যে হজ্জ করিতে হইবে। অধিকাংশ পথ পায় হাটিয়া হজ্জ করিলে উহা শুদ্ধ হইবে না। সম্পূর্ণ টাকা মুনিবকে ফেরত দিতে হইবে। যদি সফরের অল্প পথ পায় হাটিয়া অধিকাংশ পথ সওয়ারীর সাহায্যে অতিক্রম করতঃ হজ্জ আদায় করে তবে বদলী হজ্জ শুদ্ধ হইবে।

৮। বদলী হজ্জ আদায়কারীকে মুনীবের দেশ হইতে হজ্জের সফরে রওয়ানা হইতে হইবে। কিন্তু তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক- তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা তাহার অসিয়তকৃত হজ্জ স্বদেশ হইতে রওয়ানা করান সম্ভাবপর না হইলে যে স্থান হইতে পাঠাইলে টাকায় সংকুলান হয়, সে স্থান হইতে পাঠাইতে হইবে।

৯। যাহার বদলী হজ্জ করিবে, হজ্জের এহরাম বাঁধিবার সময় কিংবা হজ্জের কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহার পক্ষ হইতে নিম্নরূপ নিয়ত করিতে হইবে। আমি অমুক ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জের নিয়ত করিলাম ও তালবিয়া পড়িলাম। অমুক স্থানে মুনীবের নাম বলিতে হইবে।

১০। নায়েবকে মুনীবের মীকাত হইতেই হজ্জের এহরাম বাঁধিতে হইবে। সুতরাং তাহাকে হজ্জে এফরাদ করিতে হইবে। মুনীবের হুকুম ছাড়া হজ্জে তামাত্তো বা হজ্জে কেরান করিতে পারিবে না। মুনীবের হুকুম ছাড়া করিলে হজ্জের সম্পূর্ণ দণ্ড দিতে হইবে।

১১। যাহাকে নায়েবী হজ্জ করিতে হুকুম করা হইল, তাহাকে স্বয়ং ঐ হজ্জ করিতে হইবে। কোন ওজর বশতঃ নায়েব স্বয়ং আদায় করিতে না পারিয়া অপরকে স্বীয় মুনীবের অনুমতি ছাড়া আদেশ করিলে হজ্জ শুদ্ধ হইবে না। মুনীবের অনুমতি নিয়া করিলে শুদ্ধ হইবে।

১২। যে নায়েবী হজ্জ করিবে, অকুফে আরাফাতের পূর্বে স্ত্রী সঙ্গমাদি দ্বারা ঐ হজ্জ নষ্ট করিতে পারিবে না। করিলে উহার সম্পূর্ণ দণ্ড দিতে হইবে।

১৩। মুনীব নায়েবকে যে প্রকারের হজ্জ করিতে আদেশ করিবে, তাহার বিপরীত সে করিতে পারিবে না। করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ খরচ দণ্ড দিতে হইবে।

১৪। শুধু একটি হজ্জের এহরাম বাঁধিতে পারিবে। যদি নায়েব নিজের জন্য এক হজ্জের নিয়ত করতঃ পরে মুনীবের জন্য অন্য এক হজ্জের নিয়ত করে ও এহরাম বাঁধে, তবে উহা শুদ্ধ হইবে না। ইহাতে নায়েবের নিজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে; সুতরাং মুনীবের সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হইবে। আর যদি প্রথমে মুনীবের জন্য এহরাম বাঁধে এবং পরে নিজের জন্য এহরাম বাঁধিয়া থাকে, তবে নিজের এহরামের নিয়ত ত্যাগ করিলে মুনীবের হজ্জ আদায় হইবে।

১৫। নায়েব শুধু এক মুনীবের নায়েবী হজ্জ করিতে পারিবে। অতএব দুই মুনীবের পক্ষ হইতে এহরাম বাঁধিলে, মুনীবদ্বয়ের কাহারও হজ্জ আদায় হইবে না এবং উভয়কে টাকা ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু এহরাম বাঁধার পর হজ্জের কার্যাবলী আরম্ভ করিবার পূর্বে নিয়ত পরিবর্তন করতঃ একজন মুনীবের জন্য এহরামের নিয়ত করিলে, সেই মুনীবের জন্য হজ্জ শুদ্ধ হইবে এবং অপর মুনীবের টাকা ফেরত দিবে।

১৬। যাহার বদলী হজ্জ করান হয় এবং যে বদলী হজ্জ করে উভয়কে মুসলমান হইতে হইবে। যাহার নিকট হজ্জ করাইবার অসিয়ত করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি অমুসলমান হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

১৭। যাহার বদলী হজ্জ করান হয় বা যাহার নিকট বদলী হজ্জ করাইবার অসিয়ত করা হয় এবং যে বদলী হজ্জ করে, তাহাদের উভয়কেই সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন হইতে হইবে। অর্থাৎ পাগল হইলে শুদ্ধ হইবে না।

১৮। কোন নাবালেগ দ্বারা নায়েবী হজ্জ করাইলে তাহাকে হজ্জের কার্যাবলী সম্বন্ধে বুঝ সম্পন্ন হইতে হইবে। অতএব সুবোধ করীবুল বুলুগ (বয়স সাবালক) দ্বারা নায়েবী হজ্জ করাইলে শুদ্ধ হইবে কিন্তু এই শর্ত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অতএব নাবালেগ দ্বারা নায়েবী হজ্জ না করানই উত্তম।

১৯। নায়েব স্বীয় অলসতা ও দুর্বলতার দরুন হজ্জ করিতে না পারিলে, তাহাকে উহার দণ্ড দিতে হইবে। আর পরের বৎসর নায়েব তাহার নিজের টাকা দ্বারা মুনীবের হজ্জ করিলে তবে মুনীবের হজ্জ শুদ্ধ হইবে। অনুরূপ নায়েব তাওয়াফে যিয়ারত তরক করতঃ বাড়ীতে আসিলে, তাহাকে নিজ খরচে পুনরায় গিয়া তাওয়াফে যিয়ারত করিয়া আসিতে হইবে।

২০। মুনীব নায়েবী হজ্জ করাইবার জন্য নায়েব নির্দিষ্ট করিয়া গেল এবং অপরের দ্বারা করাইতে নিষেধ করিয়া গেল এমতাবস্থায় তাহার দ্বারাই হজ্জ করাইতে হইবে। অপরের দ্বারা হজ্জ করাইলে শুদ্ধ হইবে না। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অপরের দ্বারা নিষেধ করিয়া না থাকিলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর অপরের দ্বারা হজ্জ করাইতে পারিবে। আর কাহাকেও নির্দিষ্ট করিয়া না থাকিলে যে কোন লোক দ্বারা নায়েবী হজ্জ করাইতে পারিবে।

বদলী হজ্জের আনুষঙ্গিক মাসায়েল

১। যাহার প্রতি হজ্জ করা ফরজ হইয়াছে, সে নিজের ফরজ আদায় না করিয়া অপরের বদলী হজ্জ করিলে মাকরূহ তাহরীম হইবে।

২। যাহার উপর হজ্জ ফরজ হয় নাই তাহার দ্বারা নায়েবী হজ্জ করাইলে কোন দোষ হইবে না। তবে যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করিয়াছে এবং হজ্জের আহকাম ভালরূপে অবগত আছে তাহার দ্বারা নায়েবী হজ্জ করান উত্তম।

৩। নায়েব আমেরের হজ্জ আদায় করতঃ মক্কা শরীফ থাকিয়া যাইবে, এমতাবস্থায় শুধু মক্কা শরীফ যাওয়ার খরচ দিয়া হজ্জ করাইলে ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

৪। কোন লোক হজ্জ করাইতে অসিয়ত করিয়া মরিয়া গেলে, এমতাবস্থায় তাহার পক্ষ হইতে শুধু হজ্জ (হজ্জে এফরাদ) করাইতে হইবে। নায়েবকে মীকাত হইতে হজ্জে এফরাদের এহরাম বাঁধিতে হইবে। যদি নায়েব হজ্জে কেরান বা হজ্জে তামাত্তো'র এহরাম বাধে, তবে হজ্জ নায়েবের হইয়া যাইবে। হজ্জের জন্য যে সমস্ত টাকা গ্রহণ করিয়াছে উহা অছীকে ফেরত দিয়া দিবে।

৫। আমের কোন এক ব্যক্তিকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করিয়া বলিল যে, আপনি হজ্জ কার্য সমাপনের যাবতীয় খরচ নিয়া আমার বদলী হজ্জ করুন। তিন প্রকার হজ্জের কোন প্রকার তাহা উল্লেখ করে নাই। এমতাবস্থায় নায়েব মীকাত হইতে শুধু হজ্জের (হজ্জে এফরাদের) এহরাম বাঁধিতে পারিবে। ওমরা অথবা অন্য কোন প্রকার হজ্জের এহরাম বাঁধিতে পারিবে না। যদি সে হজ্জে এফরাদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের এহরাম বাধে, তবে হজ্জ নায়েবের হইয়া যাইবে। আমেরের হজ্জ আদায় হইবে না। সে আমেরকে সম্পূর্ণ যাতায়াত খরচ ফেরত দিবে। আমেরকে পুনঃ হজ্জ করাইতে হইবে। নায়েব ১৩ই যিলহজ্জের পরে ওমরাহ করিতে পারিবে।

৬। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হজ্জে এফরাদের এহরাম হজ্জের যাবতীয় কার্য সমাধা করতঃ অকুফে আরফার পরে খুলিতে হয়। উপরোক্ত নায়েব ও তাহার এহরাম ১০ই যিলহজ্জ হলক তাওয়াফে যিয়ারতের পরে খুলিতে পারিবে। অতএব নায়েব হজ্জ পর্যন্ত এহরাম অবস্থায় অবস্থান করিবে। মদীনা শরীফ অথবা অন্য কোথাও যিয়ারতের জন্য গেলে এহরাম অবস্থায় যাইবে। হজ্জের পূর্বে তাহার এহরাম হইতে হালাল হইবার আর কোন পন্থা নাই।

৭। নায়েব তাহার এহরাম নষ্ট করিতে পারিবে না। নষ্ট করিলে আমেরের দেওয়া সম্পূর্ণ খরচাদি তাহাকে ফেরত দিতে হইবে।

৮। নায়েবকে মীকাত হইতে অবশ্য এফরাদের এহরাম বাঁধিতে হইবে। যদিও সে বৎসরের প্রথম ভাগে মীকাত অতিক্রম করিয়া থাকে। দীর্ঘকাল এহরাম অবস্থায় তাহার পক্ষে থাকাও অসম্ভব। দীর্ঘ সময়ের এহরাম নষ্ট হওয়ার পূর্ণ আশংকা আছে। এমতাবস্থায় এহরাম না বাঁধিয়া ইচ্ছা করিলে নিম্নোক্ত হীলা অবলম্বন করিতে পারে।

হীলা- মীকাত অতিক্রম করার পূর্বক্ষণে মক্কা শরীফ যাওয়ার নিয়ত পরিবর্তন করতঃ জেদ্দায় যাইতেছে নিয়তে বিনা এহরামে জেদ্দায় অবতরণ করিবে। এখন জেদ্দা হইতে এহরাম ব্যতিরেকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবে। অতঃপর আরাফাতে রওয়ানা হওয়ার দুই এক দিন আগে পাঁচ মীকাতের যে কোন এক মীকাতে যাইয়া বদলী হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া আসিতে হইবে।

৯। নায়েবের কর্তব্য এই যে, হজ্জে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমেরের নিকট হইতে নিম্নরূপ আদেশ লইয়া যাইবে। আমের বলিবে- আমি আপনাকে আমার বদলী হজ্জ করিতে অনুমতি দিলাম। আপনি আপনার সুবিধা মতে, হজ্জে এফরাদ, হজ্জে তামাত্তো' বা হজ্জে ক্বেরান এই তিন প্রকার হজ্জের যে কোন এক প্রকার ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন। এখন নায়েব তাহার সুবিধামত যে কোন এক প্রকার হজ্জ করিতে পারিবেন।

১০। নায়েব তাহার মান অনুসারে মধ্যম প্রকার খানাপিনা করিবে। অজু ও গোসলের পানির মূল্য এবং ঔষধপত্রের মূল্য আমেরের টাকা হইতে দিতে পারিবে না। উহা তাহার নিজের টাকা দিয়া খরিদ করিতে হইবে। উহা দ্বারা নায়েব কোন হাদিয়া তোহফা আনিতে, কাহাকেও কিছু খাওয়াইতে, কাহাকে কিছু দান খয়রাত করিতে এবং দমে শোকর অথবা নিষিদ্ধাবলীর কাফ্ফারা দিতে পারিবে না। এই টাকা নিজের টাকার সহিত মিশাইতেও পারিবে না।

১১। আমের তাহার নায়েবকে হজ্জ করিতে যত টাকা দিয়াছিল, হিসাবান্তে যদি নায়েবের নিকট কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে, তবে উহা আমেরকে ফেরত দিতে হইবে। আর যদি পাওনা হয়, তবে উহা আমের নায়েবকে দিয়া দিবে। নায়েব সফরে মাল আছবাব, এহরামের কাপড় ও যাবতীয় সরঞ্জামাদি (যাহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা) আমেরকে ফেরত দিবে।

১২। নায়েব নিজে অন্য কাহাকে নায়েব নিযুক্ত করিতে পারিবে না। অতএব আমের অথবা অসি নায়েবকে ইহাও বলিয়া দিবে যে, যদি আপনি পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত কিংবা আসমানী অন্য কোন বিপদের দরুন হজ্জ করিতে অসমর্থ হন, তবে আপনি অন্য লোক দ্বারা হজ্জ করাইয়া দিবেন। এমতাবস্থায় নায়েব অন্য লোক নায়েব নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১৩। উপরোক্ত মাসায়েল মোতাবেক পানাহার করিতে তহবীল পৃথক রাখিয়া অজু গোসলের পানি খরিদ করিতে এবং হিসাবাদি মনে রাখিয়া পূর্ণ হিসাব বুঝাইয়া দিতে নায়েবকে অবর্ণনীয় বেগ পাইতে হইবে। অতএব আমের নায়েবকে উক্ত টাকা দ্বারা কিছু দান খয়রাত, অজু, গোসল ও আবশ্যক হইলে ঔষধ পত্রাদি খরিদ করিতে এজাযত দিয়া দিবে। হজ্জ বাদে কাপড় জামা ইত্যাদি এবং কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকিলে, আমের তাহা দান (হেবা) করিয়া দেওয়ারও উকীল নায়েবকে নিযুক্ত করিয়া দিবে এবং সে নায়েবকে বলিয়া দিবে যে, সে উহা যাহাকে ইচ্ছা এমনকি নিজেকেও দান (হেবা) করিয়া দিতে পারিবে। নায়েব হজ্জ সমাপনান্তে উহা নিজের উপরে হেবা করিতে এবং নিজের উহা গ্রহণও করিতে অথবা অন্য কাহাকেও দিতে পারিবে।

যিয়ারতে রওজায়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আপনি দুই জাহানের শাহানশাহের পাক দরবারে হাজিরা দিতে রওয়ানা দিয়াছেন। একজন ভিক্ষুকের মত আদব ও অতি জওক শওকের সহিত দরূদ শরীফ পড়িতে পড়িতে রাস্তা অতিক্রম করিতে থাকিবেন। যখন দূর হইতে সোনার মদীনার সবুজ কোব্বা ও শহর দৃষ্টিগোচর হইবে তখন হুযুরের শান শওকত, মানমর্যাদা ও মহব্বত অন্তরে স্থান দিয়া প্রাণের আবেগে রোনাজারী করতঃ প্রকৃত আশেকে রাসূলের পরিচয় দিবেন।

আদবের সহিত সবুজ কোববার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং অন্তরে একিন করিবেন, আপনি যে দরবারে হাজির হইতেছেন উহা অদ্বিতীয় দরবার। শহরে ঢুকিয়া থাকিবার স্থান ঠিক করতঃ তথায় মালসামান রাখিয়া যিয়ারতের জন্য তৈরী হইবেন।

মদীনা শরীফে মক্কা শরীফের মত কোন মুয়াল্লিম বা মুয়াল্লিম ফিস নাই। তবে সেখানে মুযাব্বেরীন আছেন তাহারা সৈয়দ খান্দানের লোক। তাহারা হাজীদেরকে যিয়ারতের দোয়া ও সালাম শিক্ষা দিয়া থাকেন। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের মেহমান হইতে পারেন অথবা আলাদা ঘর ভাড়া নিয়াও থাকিতে পারেন। কিন্তু মুযাব্বের ব্যতীত যিয়ারতে যাইবেন না। যেহেতু আপনি কিছুই ঠিক পাইবেন না। উক্ত মুযাব্বের দ্বারা আপনার যিয়ারত কার্যাদি সমাধা করতঃ তাহাকে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু টাকা দিবেন। মুযাব্বেরকে সাথে নিয়া বাবে জিব্রীল (আঃ) অথবা অন্য কোন দরওয়াজা দিয়া হরমে ঢুকিয়া মাজার শরীফের দিকে অগ্রসর হইবেন।

হুযুরের মাজার শরীফ যিয়ারতের ফজীলত

১। যে ব্যক্তি মদীনা শরীফ যাইতে সক্ষম, তাহার প্রতি হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাজার শরীফ যিয়ারত করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং অনেক আলেমগণ হুযুরের মাজার শরীফ যিয়ারত করা ওয়াজিব বলিয়াছেন।

২। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হইবে।" (দারেকুতনী)

৩। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- "যে ব্যক্তি আমার এন্তেকালের পরে হজ্জ করতঃ আমার কবর যিয়ারত করিবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সহিত সাক্ষাত করিল।" (বায়হাকী)

৪। নবীয়ে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- "হজ্জ করতঃ যে মানুষ আমার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গেল, সে আমাকে অত্যাচার করিল।" (এবনে আদী)

৫। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- "যে আমার যিয়ারতে আসিবে সে কিয়ামতে আমার প্রতিবেশী হইবে।" (বায়হাকী)

রওজা পাকের ওস্তোয়ানা (খাম্বা) সমূহ ওস্তোয়ানায় হান্নানা- (ক্রন্দনকারী খাম্বা)

বিশ্ব নবীর যামানায় মসজিদে নববী পাকা ছিল না। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে খেজুর গাছের একখানা খাম্বার নিকটে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া খুৎবাহ দিতেন। অতঃপর মিম্বর তৈরী হইলে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মিম্বরে আরোহণ করিয়া খুৎবাহ আরম্ভ করিলে, উক্ত খেজুরের খাম্বাখানা হুযুরের বিচ্ছেদে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। উপস্থিত সকলে উহার ক্রন্দন শ্রবণ করতঃ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর হইতে নামিয়া উহার গাত্রে হস্ত মোবারক রাখিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। ইহাতে তাহার ক্রন্দন থামিয়া গেল। হুযুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাম্বাকে এরশাদ করিলেন- আমি তোমাকে বাগানের ভিতরে রোপন করিয়া দেই। মানুষ তোমার ফল খাইবে অথবা তোমাকে বেহেশতে রোপন করিয়া দেই। বেহেশতবাসী তোমার ফল অনাদীকাল খাইতে থাকিবে। ইহার ভিতরে তুমি যেইটি পছন্দ কর আমি উহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। খাম্বা উত্তর দিল "আমি বেহেশতে হুযুরের সঙ্গে থাকিতে চাই।" অতঃপর খাম্বাখানা মিম্বরের নীচে দাফন করা হইল। এই খাম্বার স্থানে বর্তমানে ওস্তোয়ানায় মোখাল্লাকা নামে একটি খাম্বা আছে। এইখানে এবং হুযুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহরাবে তাবাররোকান নফল নামায পড়িবেন।

ওস্তোয়ানায় তাওবাহ-এই খানে আবু লোবাবা (রাঃ)-এর তাওবাহ কবুল হইয়াছিল। বনী কোরায়জার ইহুদীগণ হুযুরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে কতল করিবেন স্থির করিলেন। আবু লোবাবা (রাঃ)-এর নিকট ইহুদীগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা কি আমাদের কিল্লার দরওয়াজা খুলিয়া দিয়া মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিব? তিনি বলিলেন হ্যাঁ বাহির হও এবং হাত দ্বারা স্বীয় গলার দিকে ইশারা করিলেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে কতল করা হইবে।

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গুপ্ত ভেদ প্রকাশ করার দরুন তিনি লজ্জিত হইয়া নিজকে এই খাম্বার সহিত বাঁধিয়া নিজ গুনাহ হইতে আল্লাহর নিকট মাফ চাহিতে লাগিলেন। শুধু পায়খানা ও প্রস্রাবের জন্য বাহিরে যাইতেন এবং বন্ধন খুলিয়া নামাযের ওয়াক্তে নামায আদায় করিতেন। এই প্রকারে সাতদিন পরে এই স্থানেই তাহার তাওবাহ কবুলের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। আপনিও এইখানে তাওবাহ করিয়া কান্নাকাটি করিবেন।

ওস্তোয়ানায় আয়েশা (রাঃ)- উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই মসজিদে একটি বরকতি খাম্বা আছে। লোকে যদি উহার মর্তবা জানিত, তবে তথায় নামায পড়ার জন্য কোরয়ার (লটারীর) ব্যবস্থা দরকার হইত। এইখানে হুযুর ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ওয়াক্ত নামায পড়িয়াছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ ভাগিনা ইবনে জোবায়েরকে (রাঃ) এই খাম্বাটি দেখাইয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হইয়াছে আয়েশার (রাঃ) খাম্বা।

ওস্তোয়ানায় ছারির- ছারির অর্থ সিংহাসন। এইখানে হুযুরের জন্য একখানা পালঙ্ক ছিল। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ'তেকাফের সময় মাঝে মাঝে এখানে আরাম ফরমাইতেন।

ওস্তোয়ানায় মোহরেছ বা আলী- হিজরতের প্রথম অবস্থায় দুশমনের আক্রমণ হইতে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাহাবাগণ পালাক্রমে এইখানে পাহারা দিতেন অথবা কাহারও মতে হযরত আলী (রাঃ) পাহারা দিতেন। এই জন্য উক্ত নামকরণ করা হইয়াছে। অবশ্য পরবর্তিতে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে এই পাহারা দিতে হইত না।

ওস্তোয়ানায় ওফুদ- ওফুদ 'ওয়াফদুন' শব্দের বহুবচন। অর্থ প্রতিনিধি দল। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের নিকট এইখানে বসিয়া ধর্মীয় তাবলীগ করিতেন ও তা'লীম দিতেন।

ওস্তোয়ানায় তাহাজ্জুদ- গভীর রজনীতে যখন সমগ্র নগরবাসী নিদ্রায় নিমগ্ন, তখন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইস্থানে জায়নামায বিছাইয়া নামায পড়িতেন।

ওস্তোয়ানায় জিব্রীল-ওলামায়ে কেরামগণ লিখেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) দুনিয়ার বুকে তাশরীফ আনার এটি একটি বিশেষ স্থান।

রওজা মোবারক যিয়ারত

বাবে জিব্রীল দিয়া মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিবেন। প্রথমে ডান পা রাখিবেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবেন-

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ- اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

তৎপর রওজা শরীফের পিছন দিয়া রওজা শরীফে উপস্থিত হইয়া মিম্বরের নিকটে প্রথম রাকয়াতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা এখলাছ দ্বারা এই দুই রাকয়াত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করিবেন। কিন্তু মাকরূহ ওয়াক্তে এই নামায পড়িবেন না। মসজিদে নববীতে প্রবেশেরপর ফরজ নামায আদায় করিয়া থাকিলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়িতে হইবে না। নামায আদায়ের পর অতি নম্র ও বিনয়ের সহিত মুনাজাত করিবেন এবং আপনি যে রওজা মোবারক যিয়ারতের সুযোগ পাইয়াছেন সে

জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিবেন।

তৎপর অতি আদব ও তা'জীমের সহিত দুনিয়াবী যাবতীয় খেয়াল পরিত্যাগ করতঃ রওজা শরীফের সম্মুখে তিন চার হাত দূরত্বে দাঁড়াইবেন এবং এইরূপ খেয়াল করিবেন যে, হুযুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতেছেন এবং আমার সালাম ও কালাম শুনিতেছেন। নিম্নমুখী হইয়া অতি আদব ও মহব্বতের সাথে মধ্যম আওয়াজে সালাম পেশ করিবেন। এবং অন্য কোন ব্যক্তি সালাম বলিয়া থাকিলে তাহাও অমুকের সালাম বলিয়া দরবারে পেশ করিবেন। অতঃপর শাফাআতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে আরজ করিবেন। এরপর ডানদিকে একটু সরিয়া প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর খেদমতে আদবের সহিত সালাম আরজ করিবেন। তারপর আরও একহাত ডানদিকে সরিয়া দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খেদমতে সালাম আরজ করিবেন। অতপর একটু বাম দিকে সরিয়া উভয় খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া সালাম বলিবেন।

তৎপর পুনঃ হুযুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'রওজা' শরীফে আসিয়া প্রথম বারের মত সালাম আরজ করিবেন। অবশেষে নিজের, মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজন, ওস্তাদগণ, সমস্ত মুসলমান ও আমাদের জন্য দোয়া করিবেন। হুযুরের দরবার শরীফে প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা (রাঃ) দ্বয়কে অছীলা ধরিয়া এবং আল্লাহ পাকের সমীপে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহকাল ও পরকালের অছীলা উল্লেখ পূর্বক নেক মকছুদের জন্য সালাম ও দোয়া পড়িয়া বার বার আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকিবেন। মদীনাবাসী কোন লোকের সহিত বেয়াদবী করিবেন না। তাহারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও ছাহাবাগণের অধিকাংশই বংশধর হইতেছেন। তাঁহাদের কোন দোষ তালাশ বা সমালোচনা করিবেন না। যেহেতু তাহারা আল্লাহর মাহবুবের প্রতিবেশী।

মদীনা শরীফের যিয়ারাতগাহ সমূহ

মসজিদে কোবা- মসজিদে নববী হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হিজরত করতঃ প্রথমতঃ হুযুর এখানে ১৪দিন ছিলেন। এই মসজিদ হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাগণকে নিয়া নিজে তৈয়ার করিয়াছিলেন। হাদীসে আছে, "বাড়ী হইতে অজু করিয়া কোবার মসজিদে দুই রাকয়াত নামায পড়িলে একটি ওমরাহর ছওয়াব পাইবে।" আর এক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি চারি রাকয়াত নামায পড়িবে, সে একটি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পাইবে।"

দুনিয়ার চারটি মসজিদ প্রধান

১। **মসজিদে হারাম** (বাইতুল্লাহ), ২। মসজিদে নববী, ৩। মসজিদে আকছা, এবং ৪। মসজিদে কোবা।

মসজিদে ফতহ্- মদীনা শরীফের পশ্চিম সীমানায় খন্দকের কাছে অবস্থিত। এখানে খন্দকের যুদ্ধে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফতহ্ অর্থাৎ জয়ী হইবার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। এখানে আরো কয়েকটি মসজিদ আছে, প্রতিটি মসজিদে দুই রাকয়াত নামায পড়িবেন।

মসজিদে যুলকেবলাতাইন

এই স্থানে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতের সহিত জোহরের নামায বাইতুল মোকাদ্দাছের দিকে ফিরিয়া পড়িতেছিলেন। নামাযের ভিতরে আল্লাহ তায়ালা অহী প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে কেবলা পরিবর্তন করতঃ পূর্ববতঃ বাইতুল্লাহ্ করা হইল। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ভিতরেই জামায়াত সহ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বর্তমানেও এখানে দুইটি মেহরাব বিদ্যমান আছে। এখানে নামায পড়িবেন, এই মসজিদ মদীনা হইতে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

প্রত্যাবর্তন

অবশেষে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাজার শরীফ পূর্ববতঃ যিয়ারত করিবেন। মউতের সময়, কবরে, হাশরের ময়দানে এবং পুলছিরাতে হুযুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীদার ও শাফায়াত নছীব হয়, এই দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে করিবেন। আরও দোয়া করিবেন, আল্লাহ যেন, তাহার হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতাদি আমল করার তৌফিক দান করেন এবং সকল মুসলমানকে দান করেন। মন ও প্রাণ মদীনাতে রাখিয়া শুধু দেহটাকে নিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিবেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

[কুরবানীর মাসয়ালা]

কুরবানী শব্দের বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ কুরবানী শব্দের অর্থ কি? এবং কুরবানী কাহাকে বলে?

উত্তরঃ কুরবানী শব্দটি আরবী। আভিধানিক দৃষ্টিকোন হইতে উহার অর্থ হইল নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে যে কোন বস্তু ব্যবহার করা। অপর দিকে শরীয়তের পরিভাষায় কুরবানী বলা হয় ঐ নির্দিষ্ট জন্তুকে যাহা একমাত্র আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে একমাত্র মহান আল্লাহর নামে জবাই করা হয়।

কুরবানীর ইতিকথা বা ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রশ্নঃ কুরবানীর প্রচলন কাহার মাধ্যমে কখন কিভাবে হইয়াছে?

উত্তরঃ সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা, তবে কুরআন, হাদীস এবং ইতিহাসের কিতাব সমূহ হইতে সংক্ষেপে যাহা জানা যায় তাহা হইল আজ থেকে প্রায় সাত হাজার ছয় শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মানব গোষ্ঠির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান হাবিল ও কাবিল এর মধ্যে তাহাদের বোন আকলিমাকে বিবাহ করা নিয়ে কলহ বিবাদ দেখা দিলে হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে তাহাদেরকে এখলাছের সহিত কুরবানী করার আদেশ দেন এবং বলেন তোমাদের মধ্যে যাহার কুরবানী গৃহীত হইবে তাহার সংগেই আকলিমার বিবাহ হইবে। এইভাবেই সর্ব প্রথম কুরবানীর প্রথা চালু হয়।

প্রশ্নঃ কুরবানী প্রচলন হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা কি?

উত্তরঃ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র দ্বয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটি আল্লামা ইবনে কাসীর তদীয় তাফসীর গ্রন্থে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত রায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

যখন আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ)-এর, প্রতি গর্ভ হইতে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান যমজ বা একই সাথে জন্ম গ্রহণ করিত তখন তাহারা পরস্পর ভাই বোন ছাড়া হযরত আদম (আঃ)-এর আর কোন সন্তান ছিলনা। অথচ ভাই বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। তাই আল্লাহ পাক উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদে হযরত আদম (আঃ)-এর শরীয়তে বিশেষ ভাবে এই নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ হইতে যে যমজ পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে তাহারা পরস্পর সহোদর ভাই বোন হিসাবে গণ্য হইবে। তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হইবে কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম

গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ কারীনী কন্যা সহোদরা ভগিনী হিসাবেগণ্য হইবে না। অতএব, তাহাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা বোন আকলিমা ছিল পরমা সুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত বোনটি ছিল কুশ্রি ও কদাকার। বিবাহের সময় হইলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত সহোদরা কুশ্রি বোন কাবিলের ভাগে পড়িল। ইহাতে কাবিল অসন্তুষ্ট হইল এবং হাবিলের শত্রু হইয়া দাড়াইল। কাবিল প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমার সহজাত বোনকে আমার সংগে বিবাহ দিতে হইবে। যাহার ফলে হযরত আদম (আঃ) মহা সমস্যায় পড়িলেন। তাহার শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর তিনি হাবিল কাবিলের মতভেদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন- তোমরা উভয়েই আল্লাহ পাকের জন্য নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যাহার কুরবানী গৃহীত হইবে সেই এই কন্যার পানি গ্রহণ করিবে অর্থাৎ তাহার সাথে বিবাহ হইবে। হযরত আদম (আঃ)-এর দৃঢ় বিশ্বাস যে উভয়ের মধ্যে যে সত্য পথে আছে একমাত্র তাহার কুরবানীই গৃহীত হইবে। এই ব্যাপারে পবিত্র কালামুল্লাহ সূরা মায়েদার ২৭ নং আয়াতে বলা হইয়াছে-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ-

অর্থাৎ "আর (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি তাহাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করিয়া শুনান যখন তাহারা উভয়েই কিছু কুরবানী করিয়াছিল তখন তাহাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হইয়াছিল এবং অপর জনের কুরবানী গৃহীত হয় নাই। সে (কাবিল) বলিল আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করিব। সে (হাবিল) বলিল আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেইতো গ্রহণ করেন। (মায়েদা-২৭)

প্রকাশ থাকে যে, তৎকালীন কুরবানী গৃহীত হইবার একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ হইতে একটি অগ্নি শিখা আসিয়া যাহার কুরবানী কবুল হইবে তাহার কুরবানীকে জ্বালাইয়া ভস্মিভূত করিয়া আবার গোপন হইয়া যাইত আর যাহার কুরবানীকে অগ্নি ভস্মিভূত করিত না তাহারটা প্রত্যাখ্যান মনে করা হইত। অর্থাৎ মনে করা হইতো এই কুরবানী কবুল করা হয় নাই। যেহেতু হাবিল ভেড়া দুম্বা ইত্যাদি পালন করিত সেহেতু সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানীর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিল। অপর দিকে কাবিল কৃষি কাজ করিত বিধায় সে কিছু শয্য ও গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করিল। নিয়মানুযায়ী আল্লাহ পাকের হুকুমে আকাশ হইতে অগ্নিশিখা অবতরণ করিয়া হাবিলের কুরবানীটি ভস্মিভূত করিয়া দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। এহেন অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে

আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যে ভাই হাবিলকে বলিয়া দিল কুরআন পাকের ভাষায় অর্থাৎ "আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করিব।" হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করিয়া একটা মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করিল যা কুরআন পাকে বলা হইয়াছে অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালার বিধান এই যে, তিনি খোদাভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন" তুমি খোদাভীতি অবলম্বন করিলে তোমার কুরবানীও কবুল হইত, তুমি তো তাহা করনাই, তাই তোমার কুরবানী গৃহীত হয় নাই। এতে আমার অপরাধ কি? (ইবনে কাছীর)

কাবিলের প্রতি হাবিলের বিনয় নম্রতা, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছাপূর্ণ বাক্য উচ্চারণে কোন সুফল হইল না বরং আমি তোমাকে হত্যা করিবই এইটাই ছিল প্রতিজ্ঞা। যাহার ফলাফল কুরআন পাকে ঘোষিত হইয়াছে। এরশাদ হইতেছে "অতঃপর কাবিলের অন্তর তাহাকে স্বীয় ভ্রাতা হত্যার জন্য সম্মত করিল আর কাবিল তাহাকে হত্যা করিল ইহাতে সে ক্ষতি গ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হইয়া গেল।" ভ্রাতা হত্যার দ্বারা কাবিল ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইহকালীন ক্ষতি পিতা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। অপর দিকে পরকালে অত্যাচার, সীমালংঘন এবং সম্পর্ক ছেদ করার কারণে আযাব পাওয়ার যোগ্য হইল। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, কেহ যদি কাহাকেও অন্যায় ভাবে হত্যা করে তবে তাহার পাপের একাংশ হযরত আদম (আঃ)-এর প্রথম সন্তানের ভাগ্যে আসে। কারণ সেই সর্ব প্রথম না হক হত্যার পথ খুলিয়াছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অবৈধ রক্তপাত হইতে হিফাজত করুন।

প্রশ্নঃ সর্ব প্রথম কুরবানী কোথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল?

উত্তরঃ সর্ব প্রথম কুরবানীর স্থান তাফসীর ও তারিখের কিতাবাদী দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকটেই হাবিল কাবিলের সর্ব প্রথম কুরবানী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কুরবানী হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বিস্ময়কর ঘটনার অনুসরণে সুন্নাতে ইব্রাহীম (আঃ)

প্রশ্নঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কুরবানীর ঘটনাটি কি?

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পরীক্ষা মূলক স্বপ্নে নির্দেশিত হইয়া তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ভাবীকালের নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানী করিয়া সৃষ্টি জগতে এক বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন ও উহার বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবের আলোকে ঘটনাটি নিম্নরূপ। এরশাদ হচ্ছে-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّي أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ- وَنَادَيْنٰهُ أَنْ يّٰإِبْرٰهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰؤُا الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ-

অর্থঃ অতঃপর যখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর পিতার সাথে চলাফেরার (নয় বৎসর) বয়সে উপণীত হইলেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয় পুত্র আমার! "আমি তোমাকে কুরবানী করিবার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়াছি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? পুত্র উত্তরে বলিলেন আব্বা! আপনি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন শীঘ্র তাহা কাজে পরিণত করুন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অর্ন্তভুক্ত দেখিতে পাইবেন। অতঃপর যখন পিতা পুত্র উভয়েই আত্মসমর্পণ করিলেন, আর পিতা পুত্রকে কুরবানী করিবার জন্য উপুৎ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলাম, হে ইব্রাহীম! সত্যিই আপনি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। আমি এই ভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরষ্কৃত করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ব্যাপারটি একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা মাত্র। আর আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাঁকে ছাড়িয়া দিলাম।

এই স্বপ্ন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে উপর্যুপরি তিন বার অর্থাৎ ৮,৯, ও ১০ই জিলহজ্জ তারিখে দেখানো হয়। (কুরতুবী)

একথা স্বীকৃত সত্য যে পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহীই বটে। তাই এই স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে জবাই করার হুকুম হইয়াছে। এই হুকুমটি সরাসরি কোন ফেরেস্তার মাধ্যমেও নাজিল করা যাইত কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হইল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ঠ অবকাশ ছিল। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ পাকের আদেশের সামনে মাথা নত করিয়া দেন।

(তাফসীরে কবীরি)

আর সাথে সাথে কুরবানীর প্রস্তুতি হিসাবে পুত্রকে সাথে নিয়া সিরিয়া হইতে মক্কা শরীফের ঐ স্থানের দিকে আগমন করেন যেখানে ১৩ বৎসর মতান্তরে ৮ বৎসর পূর্বে মা হাজেরা সহ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। মক্কা শরীফে পৌঁছাইয়া

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজেরা (আঃ) কে বলিলেন ইসমাঈলকে সাজাইয়া দাও এক স্থানে বেড়াইতে যাইব (মতান্তরে দাওয়াতে যাইব) সাজাইয়া দিলেন মা হাজেরা (আঃ) কলিজার টুকরা ইসমাঈলকে। পিতা চলিতেছেন গন্তব্য স্থানে পশ্চাদানুসরণ করিয়া চলিতেছেন পুত্র ইসমাঈল (আঃ) পথিমধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে কুরআন পাকের ভাষায় বলিলেন ইসমাঈল! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে তোমাকে কুরবানী করিতেছি। অতএব ভাবিয়া দেখ তোমার অভিমত কি? কিন্তু খলিলুল্লাহরই পুত্র ভাবী পয়গম্বর তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিলেন পিতা! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলুন এবং সাথে সাথে পিতাকে আরো আশ্বাস দিলেন ইনশাআল্লাহ! আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণ কারীদের মধ্যে পাইবেন। অপর দিকে মুসলমানের আজীবন শত্রু ইসলামের চির দুশমন ইবলীস এই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদেরকে প্রতারিত করার কাজে লাগিয়া গেল। তাফসীরের বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় শয়তান প্রথমে হযরত হাজেরা (আঃ) কে প্রতারিত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর প্রতি ছুটিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় শয়তান হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে তিন বার প্রতারণা করার চেষ্টা করিয়াছে। প্রথমে বন্ধুর বেশে জমরায়ে আকাবার নিকট তখন তিনি "আল্লাহু আকবার" ধ্বনী দিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন মতান্তরে পিতা পুত্র উভয়েই সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি হিসাবে মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের বিধান চালু আছে। যাহা শরীয়তে মোহাম্মদীতে ওয়াজিব। শয়তান সেখান থেকে বিতাড়িত হইয়া জমরায় উসতার নিকট বাধা প্রদান করে। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) সেখানেও কংকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করেন। হতাশ হইল শয়তান অবশেষে তৃতীয় বার জমরায়ে উলার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সেখানেও "আল্লাহু আকবার" বলিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিয়া চির অভিশপ্ত শয়তানকে বিতাড়িত করিলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সাথে শয়তানের তর্ক হয় এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে এই মহান কাজ হইতে বিরত রাখার জন্য সর্বশেষ চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া বলিল হে ইসমাঈল! তুমি কি জান? তোমার পিতা তোমাকে কোথায় নিয়া যাইতেছে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন বেড়াইতে যাইতেছি। তখন শয়তান বলিল তুমিতো কিছুই জান না। তোমাকে তোমার পিতা হত্যা করার জন্য নিয়া যাইতেছে। উত্তরে হযরত ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন- পিতা কি কখনো পুত্রকে হত্যা করিতে পারে? ইবলীস বলিল তাহাকে আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিয়াছেন তোমাকে কুরবানী করার জন্য তখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন ইহার চাইতে উত্তম জীবন আর কি হইতে পারে? যে জীবনকে রাব্বুল আলামীন কবুল করিয়াছেন। হে শয়তান! তোর উপর আল্লাহ পাকের অভিসম্পাত অবতীর্ণ হোক তোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এইখানেই মরদুদ নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল।

অবশেষে পিতা পুত্র উভয়েই আল্লাহর রহমতে শয়তানের ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া কুরবানীর স্থানে মীনায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আব্বাজী আর দেরী নয় এখনই বিসমিল্লাহ বলিয়া আমার গলায় ছুরি চালাইয়া দিন। তবে ইহধাম পরিত্যাগ কুরিবার পূর্ব মুহূর্তে আপনি আমার এই প্রার্থনাগুলি মঞ্জুর করিয়া নিন।

(ক) পিতা আমাকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া নিন। যাহাতে আমি ছটফট করিতে না পারি।

(খ) আপনার পরিধেয় বস্ত্র সামলাইয়া নিন। যাহাতে আমার রক্তের ছিটা তাহাতে না পড়ে।

(গ) আপনার ছুরিটা ধার দিয়া নিন এবং তাহা আমার গলায় দ্রুত চালাইবেন যাহাতে আমার প্রাণ সহজে বাহির হইয়া যায়। কারণ মৃত্যুর জ্বালা কঠিন। অন্য বর্ণনা মতে হে পিতা! আপনি যখন বাড়ী তাশরীফ নিবেন তখন আমার জনম দুঃখিনী মাকে আমার রক্তমাখা জামাটা দিবেন। হয়তো ইহাতে তিনি কিছুটা শান্তনা পাইবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এই সব কথা শুনিয়া পিতার মানসিক অবস্থা কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দৃঢ়তার পাহাড় হইয়া জবাব দিলেন বৎস আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন করার জন্য তুমি আমাকে চমৎকার সহযোগিতা করিয়াছ। অতঃপর তিনি পুত্রকে স্নেহের চুম্বন করিলেন এবং অশ্রু পূর্ণ নেত্রে তাহাকে বাধিয়া নিলেন। কুরআন পাকের ভাষায় অতঃপর তাহারা উভয়েই নত হইয়া গেলেন (অর্থাৎ আত্ম সমর্পণ করিলেন) এবং তাহাকে উপুড় করিয়া মাটিতে শোয়াইয়া দিলেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক বর্ণনায় এইভাবে শোয়ানোর কারণ বর্ণিত হইয়াছে যে, শুরুতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহাকে সোজা করিয়া শোয়াইয়া ছিলেন কিন্তু বার বার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটিতে ছিলনা। কেননা আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করিয়া দিয়া ছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করিলেন পিতা আমাকে কাত করিয়া শোয়াইয়া দিন। কারণ আমার মুখমণ্ডল দেখিয়া আপনার পৈতৃক স্নেহ উথলিয়া উঠে ফলে গলা সম্পূর্ণ রূপে কাটা হয়না তাহা ছাড়া ছুরি দেখিয়া আমিও ঘাবড়াইয়া যাই। সেই মতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাকে এইভাবে শোয়াইয়া ছুরি চালাইতে থাকেন। (মাযহারী)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) মবছুত ও কাজীখান কিতাবদ্বয় থেকে হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে বেহেস্ত হইতে একটি দুম্বা নিয়া রওয়ানা হইলেন। তাহার সংশয় হইতেছিল পৃথিবীতে পদার্পন করার পূর্বেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জবাই কাজ সম্পন্ন করিয়া ফেলিবেন। তাই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আকাশ হইতেই উচ্চঃস্বরে ধ্বনী দিতে থাকেন "আল্লাহু আকবার" হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহার আওয়াজ শুনিয়া দেখিলেন যে উপস্থিত কুরবানীর বস্তু ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে তিনি একটি দুম্বা নিয়া আসিতেছেন। তাই তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু

আকবার"। পিতার মুখে তাওহীদের অমূল্য বাণী শুনিতে পাইয়া তিনিও বলিয়া উঠিলেন "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার- ওয়া লিল্লাহিল হামদ।" তাই এই তিন মহান ব্যক্তির আমল ও কালাম গুলো দরবারে এলাহীতে এত বেশী কবুল হইল যে, কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত বাণীগুলো ঈদুল আযহায় সমস্ত মুসলিমের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে থাকিবে। আল্লাহ পাকের অসীম কুদ্‌রাতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে কুরবানী হইল একটি বেহেস্তী দুম্বা। এই ভাবেই প্রচারিত হল কুরবানীর মহান বিস্ময়কর ইতিহাস। যাহা অনন্তকাল সুন্নাতে ইব্রাহীম হিসাবে বিশ্ব মানবতার কাছে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রশ্নঃ আমরা প্রথম কুরবানী হাবিল কাবিলের অনুসরণে না হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর অনুসরণে করিয়া থাকি?

উত্তরঃ যদিও কুরবানীর প্রচলন আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ হইতে তবে আমরা জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্মরণে কুরবানী করিয়া থাকি। সে প্রসঙ্গে হাদীস পাকে আসিয়াছে অর্থাৎ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত কতিপয় সাহাবী প্রশ্ন করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুরবানী কি? তদুত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ইহা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। যদিও পরে সতন্ত্র ভাবে আমাদের উপর কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবুও সেই নির্দেশ সুন্নাতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণে দেওয়া হইয়াছে। তাই আমরা শরীয়তে মোহাম্মাদীর এই নির্দেশ সুন্নাতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্মরণে পালন করিয়া থাকি।

কুরবানীর ফজীলত

প্রশ্নঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুরবানীর গুরুত্ব ও ফজীলত।

উত্তরঃ কুরবানীর মহত্ব গুরুত্ব ও ফজীলত সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারই আলোকে এইখানে সংক্ষেপে কিছু ফজীলতের কথা তুলিয়া ধরিতেছি।

মিশকাত শরীফের ১২৯ পৃষ্ঠায় ইবনে মাজা ও আহমদ শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ - قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ -

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন কতিপয় সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কি? তদুত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তোমাদের (জাতির) পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। পুনরায় সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কুরবানীর মধ্যে কি রহিয়াছে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন কুরবানীর গরু এবং বকরীর প্রতি পশমে একটি নেকী মিলিবে। তখন সাহাবায়ে কেরাম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা হইলে দুম্বা এবং ভেড়ার প্রতি পশমের বিনিময়ে ছওয়াব মিলিবেনা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- দুম্বা এবং ভেড়ারও প্রতি পশমের বিনিময়ে ছওয়াব মিলিবে।

কুরবানীর মহত্ত্ব ও ফজীলত সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা হজ্জের ৩৭ নং আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন-

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থঃ এগুলোর (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা বরং কুরবানীর ভিতর দিয়া তোমাদের তাকওয়া-পরহেজগারী বা আল্লাহ ভীতিই আল্লাহর নিকট পৌঁছে। এমনি ভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করিয়া দিয়াছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর একারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং সৎ কর্মশীলদের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও।

তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَاقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَّوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ اِهْرَاقِ دَمٍ وَّاِنَّهُ لَيَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْابِهَا نَفْسًا - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম সন্তান কুরবানীর দিন যে সব নেকীর কাজ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হল কুরবানী করা। কাল কিয়ামতে কুরবানীর পশু তার শিং, পশম ও খুরসহ উপস্থিত হইবে (যা কুরবানী দাতার পাল্লায় দেওয়া হইবে যাহাতে নেকীর পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে) কুরবানীর পশুর রক্ত জমীনে পড়ার পূর্বেই উহা আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হইয়া যায়। অতঃএব, তোমরা এই পুরস্কারে আন্তরিক ভাবে খুশী হও।

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলাম ধর্মের একটি বড় নিদর্শন বরং উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্মৃতি রক্ষা করা এবং আল্লাহ পাকের রেজামন্দি লাভ করা।

অন্য হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কুরবানীর পশু পুলসিরাতের উপর তোমাদের বাহন হইবে। তাই তোমরা মোটা তাজা (জানোয়ার) কুরবানী কর। (বাদায়ে ১ম খঃ ৮ পৃঃ)

তাবরানী শরীফে হযরত ইমাম হাসান বিন আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সন্তুষ্ট চিত্তে খুশি হইয়া কুরবানী করিবে এ কুরবানী তাহাকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্ত রাখিবে। তাবরানী শরীফের অন্য এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত- হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কুরবানীর উদ্দেশ্যে ঐ দিনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় উহার তুলনায় অন্য কোন ব্যয়ই উত্তম নয়। অন্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কর্জ করিয়া কুরবানী করিব কিনা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হ্যাঁ করো। আল্লাহ তায়ালা কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। (দারেকুতনী ৪-২৭৭ পৃঃ)।

অন্য এক বর্ণনায় একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে ডাকিয়া এরশাদ করেন- হে ফাতেমা! তুমি তোমার কুরবানীর জন্তুর নিকটে যাও কেননা কুরবানীর জন্তু জবাই করার পর রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তোমার যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইটা কি শুধু আমার জন্য? রহমাতুল্লিল আলামীন জবাব দিলেন এইটা আমাদের জন্য ও সকল মুসলমানদের জন্য। (তারগীব)

একদিকে যেমন কুরবানীকারীর জন্য বহু প্রতিদান ও খোশ খবরি রহিয়াছে অপর দিকে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী না করা বা অবহেলা করার কুফলের কথাও বাদ দেওয়া হয় নাই। যেমন ইবনে মাযাহ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-

عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا -

অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যাহার কুরবানী করার ক্ষমতা আছে অথচ সে কুরবানী করিতেছে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ কুরআন পাকের ঘোষণা অনুযায়ী (অর্থাৎ আমার নামায, আমার কুরবানী এবং জীবন মরণ সম্পূর্ণ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্যই।) যেন আমরা আমল করিতে পারি। আমীন!

কুরবানীর হুকুম সম্পের্কে

প্রশ্নঃ- কুরবানী করা আমাদের জন্য কি?

উত্তরঃ নামায রোযার ন্যায় কুরবানী ও পূর্ববর্তী নবীদের জন্য অবশ্য করণীয় ছিল। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের করণীয় সম্পর্কে কুরআন পাকে সূরা হজ্জের ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ -

অর্থঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নির্ধারন করিয়াছি, যাহাতে তাহারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু জবেহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব, তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ! সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও।

হেদায়া কিতাবের ভাষ্য মতে স্বাধীন, বালেগ, বিত্তবান (মালেকে নেছাব) মুকীম, মুসলমানের পক্ষে তাহার নিজের কুরবানী করা ওয়াজিব। ইহা হইল ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), মুহাম্মদ (রহঃ), যুফার (রহঃ) এবং হাছান বিন যিয়াদ জুহুরী (রহঃ)-এর মত। এই ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে দুইটি রেওয়ায়েত আছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কুরবানী ওয়াজিব। অন্য এক রেওয়ায়েত মতে উহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইহাই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর কওল। (শামী)

নাবালেগ সন্তানের পক্ষ হইতে পিতার মাল দ্বারা কুরবানী দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব নহে। ইহাই জাওয়াহের রেওয়ায়েত এবং এই রেওয়ায়েত এর উপরই ফতোয়া। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে হাছান বিন যিয়াদ জুহুরী (রহঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন- নাবালেগ সন্তান এবং সন্তানের নাবালেগ সন্তান যাহার পিতা নাই উহাদের পক্ষ হইতেও কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। তবে ইহার উপর ফতোয়া হয়

নাই। (শামী) তবে ছদকায়ে ফিতর নাবালেগের পক্ষ থেকেও দেওয়া ওয়াজিব। বালেগ ছেলে মেয়েদের এবং স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের বিনা হুকুমে কুরবানী দেওয়া জায়েয নহে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয। তবে যদি পিতাকে তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতি বছর কুরবানী দেওয়ার অভ্যাস থাকে তবে ইহা তাদের অনুমতি মনে করিতে হইবে। এহেন অবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতই উৎকৃষ্ট বটে। (রদ্দুল মোহতার-৫/২৭৫)

প্রশ্নঃ- কুরবানীর হুকুম কোন সময় আমাদের উপর ওয়াজিব করা হইয়াছে?

উত্তরঃ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় যাওয়ার পর হিজরী ২য় সনে ঈদুল আযহার নামায ও কুরবানী আমাদের জন্য ওয়াজিব করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। (তিরমিজী, মিশকাত শরীফ-২২৯পৃঃ)

প্রশ্নঃ- কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ।

উত্তরঃ- শর্ত পাওয়াগেলেই আমাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। যেমনঃ

(ক) কুরবানীর দিন মালেকে নেছাব হওয়া। কাজেই গরীবের উপর কুরবানী ওয়াজিব নহে। (খ) সুস্থ মস্তিস্কের ব্যক্তি হওয়া। কাজেই বিকৃত মস্তিষ্ক তথা পাগলের উপর কুরবানী ওয়াজিব নহে। (গ) স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া। কাজেই দাস-দাসীর উপর কুরবানী ওয়াজিব নহে। (ঘ) মুসলমান হওয়া। কাজেই অমুসলিমের উপরে কুরবানী ওয়াজিব নহে। (ঙ) বালেগ হওয়া। কাজীখানের মতে নাবালেগের প্রতি কুরবানী ওয়াজিব নহে। (চ) মুকিম হওয়া অর্থাৎ নিজ বাড়ীতে অবস্থান করা। কাজেই মুসাফিরের উপর কুরবানী ওয়াজিব নহে।

প্রশ্নঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মালেকে নেছাব হওয়া শর্ত। কিন্তু মালেকে নেছাব কখন হয়?

উত্তরঃ মালেকে নেছাব হইল কেহ স্থায়ী হাজতে আছলীয়া (অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও উপার্জনের উপকরণ ইত্যাদি) বাদ দিয়া যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সারে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা উহার মূল্য বা সমমূল্যের অন্য কোন মালের মালিক হয়। অন্য কথায় প্রয়োজনীয় মাল-আসবাব ব্যতীত বর্তমান বাংলাদেশী টাকায় দশ হাজার পাঁচশত টাকা বা সেই পরিমাণ মাল থাকিলে তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

(হেদায়া-৪/৪৪৪পৃঃ, শামী ৫/১৯৮পৃঃ)

প্রশ্নঃ নেছাব পরিমাণ অর্থ মালিকের কাছে কতদিন থাকিলে তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

উত্তরঃ কুরবানীর নেছাব যাকাতের নেছাবের মত নয় বরং সদকায়ে ফিতর নেছাবের সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থাৎ যাকাতের নেছাব পরিমাণ মাল যেমন মালিকের কাছে এক বৎসর থাকা শর্ত কিন্তু কুরবানীর নেছাব পরিমাণ মাল মালিকের কাছ এক বৎসর থাকা শর্ত নয় বরং উক্ত নেছাব পরিমাণ মালের জিলহজ্জ মাসের ১০,১১,ও১২ এই তিন

দিনের যেই কোন দিন মালিক হইলে তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

(শামী ১৯৮পৃঃ)

প্রশ্নঃ কাহারও কাছে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টাই আছে কিন্তু কোনটাই নেছাব পরিমাণ নহে তবে যদি দুইটা মিলাইয়া নেছাব পরিমাণ হয় তাহার হুকুম কি।

উত্তরঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলাইয়া অথবা উহার মূল্য হিসাব করিয়া যদি রৌপ্যের নেছাব পরিমাণ হয় তাহা হইলে যাকাত কুরবানী ও সদকায় ফিতর সবই ওয়াজিব। (শামী)

প্রশ্নঃ নেছাব পরিমাণ মালের হিসাব বাংলাদেশী টাকায় দশ হাজার পাঁচশত টাকা বলিয়াছেন কিন্তু সমাজে অনেকের কাছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বা টাকার সম্পদ আছে এখন কি সকলের জন্য একটা করিয়াই কুরবানী ওয়াজিব না একাধিক কুরবানী করিতে হইবে।

উত্তরঃ এক ব্যক্তির যত সম্পদ বা নগদ অর্থ থাকুক না কেন তাহার উপর একটি মাত্র কুরবানী ওয়াজিব হইবে। (শামী)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তির কাছে নেছাব পরিমাণ অর্থ-ছিল কিন্তু বৎসর শেষে সেই ব্যক্তি যাকাত আদায় করার কারণে নেছাবের চাইতে অর্থের পরিমাণ কম হইয়া গেল এমতাবস্থায় তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব কি না?

উত্তরঃ এই ব্যাপারে দুইটা মত পাওয়া যায় যথা কতিপয় আলেমদের মতে যাকাত আদায় করার কারণে তাহার অর্থ আর নেছাব পরিমাণ নাই কাজেই সেই ব্যক্তি ছাহেবে নেছাব নাই তাই তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবেনা।

অপর দিকে শায়েখ ইমাম জাফরানীর মতে ঐ ব্যক্তি যেহেতু যাকাতের খাতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য ব্যয় করিয়াছে আর আল্লাহ পাক এই ব্যাপারে বলেন যাহা তোমাদের হাতে থাকিবে তাহা খরচ হইবে আর যাহা আল্লাহ পাকের কাছে তাহা জমা বা অবশিষ্ট। সেহেতু যাহা যাকাত দিয়াছে উহা খরচ হইয়াছে বলা যাইবেনা। তাই সেই ব্যক্তি মালেকে নেছাব রহিয়াছে অতএব তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে। তবে যদি উক্ত অর্থ তাহার পরিবারের প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় হইত তাহা হইলে তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইত না। (আলমগীরী) (৮/৪৪৫পৃঃ)

প্রশ্নঃ কোন ধনী ব্যক্তি যাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব সে যদি মাঝে মাঝে পাগল হয় আবার ভাল আবার পাগল হয় পূর্ণ ভাল হয় এই ভাবে চলিতে থাকে তবে কি তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে?

উত্তরঃ ফতোয়ায় কাজীখানের মতে উক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ বলিয়া ধরিতে হইবে এবং তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে। তাহাছাড়া ধনী পাগলের যদি বালেগ সন্তান থাকে সে তাহার পিতার পক্ষ হইতে পিতার অর্থ দিয়া কুরবানী আদায় করিবে। (আলমগীরি)

প্রশ্নঃ কোন গরীব ব্যক্তি যদি কোন মতে কুরবানীর প্রথম দিনে কুরবানী করে আর সে কুরবানীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে মালেকে নেছাব হয় তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ যদি এমনটি হয় যে, সে গরীব হিসাবে কুরবানীর প্রথম দিন কুরবানী করিল আর পরবর্তী দুই দিনের কোন একদিন সে মালেকে নেছাব হইল তবে কুরবানীর সময় হাতে থাকিলে পুনরায় তাহার কুরবানী করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ দেনাদার বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব কি না?

উত্তরঃ দেনাদার বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে যদি এমন পরিমাণ অর্থ থাকে যে, সেই ব্যক্তি তাহার ঋণ পরিশোধ করার পরে তাহার অবশিষ্ট সম্পদ যদি নেছাব পরিমাণ হয় তবে তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে। আর নেছাব পরিমাণ না হইলে কুরবানী ওয়াজিব হইবে না। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু সে ব্যক্তি কুরবানীর প্রথম দুইদিন কুরবানী করে নাই তৃতীয় দিন লোকটি মারা গেল তাহার হুকুম কি।

উত্তরঃ ঐ ব্যক্তি কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই মারা গেলে তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব নহে। তাহার ওয়ারিসগণ যদি সম্পদ পাওয়ার পরে মালেকে নেছাব হয় তবে তাহাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি কুরবানীর দিনগুলোর পরে মারা যায় তবে তাহার জিম্মায় কুরবানী থাকিয়া যাইবে। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তির ওয়াজিব কুরবানী তাহার নির্দেশ বা অনুমতি ব্যতিত হইলে উহার হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির ওয়াজিব কুরবানী তাহার নির্দেশ বা অনুমতি ব্যতিত কেহ আদায় করিলে ঐ ব্যক্তির ওয়াজিব আদায় হইবে না। বরং এইরূপ কুরবানীর অংশ যেই পশুতে শামিল করা হইবে ঐ পশুর অন্যান্য অংশীদারদের কোন ব্যক্তির কুরবানী আদায় হইবে না। (শামী ৫-২৮৫ পৃঃ)

তবে অন্যের নির্দিষ্ট পশু মালিকের অনুমতি ছাড়া কুরবানী করিয়া দিলে উহা দ্বারা মালিকের কুরবানী আদায় হইয়া যাইবে।

প্রশ্নঃ কোন গরীবলোক যদি কুরবানী করার নিয়তে পশু ক্রয় করে তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে কোন একদিন কুরবানী করার নিয়তে যদি কোন গরীব লোক পশু ক্রয় করে তবে তাহার উপর ঐ পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে।

প্রশ্নঃ কোন গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানী ব্যতীত অন্য কোন নিয়তে একটি পশু খরিদ করে অতঃপর কুরবানীর নিয়তে অন্য একটি পশু খরিদ করিয়া কুরবানী দেয় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির প্রথম ক্রয় করা পশুটি বিক্রয় করিতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ ঐ ব্যক্তির প্রথম খরিদ করা পশুটি যেহেতু কুরবানীর নিয়ত ছাড়াই খরিদ হইয়াছিল আর দ্বিতীয়টি যেহেতু কুরবানীর নিয়তে খরীদ ও কুরবানী করা হইয়াছে সেহেতু প্রথম খরিদ করা পশুটি বিক্রয় করা যাইবে।

প্রশ্নঃ কোন এক ব্যক্তির পশু অন্য কোন ব্যক্তি যদি জোরপূর্বক নিয়া নিজের জন্য কুরবানী করিয়া দেয় তবে উহার হুকুম কি হইবে?

উত্তরঃ পশুর মালিক যদি পশুটি জীবিত থাকিতে উহার মূল্য গ্রহণ করে তাহা হইলে কুরবানী কারীর কুরবানী শুদ্ধ হইবে। তবে জোর জবরদস্তী কারীকে আল্লাহপাকের দরবারে তওবা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মালিক যদি মূল্য গ্রহণ না করে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজের পশু অন্যের জন্য কুরবানী করিয়া দেয় তাহার অনুমতি থাক বা না থাক শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানী দাতাকে পশুর মালিক হইতে হয়। তাই যদি উক্ত ব্যক্তি তাহার পশুটি কুরবানীর জন্য অন্যকে দায়িত্ব দেয় তবে শুদ্ধ হইবে অন্যথায় শুদ্ধ হইবে না।

(বাহারে শারীয়াহ)

প্রশ্নঃ কোন এক ব্যক্তির কাছে অপরের একটি পশু আমানত ছিল সেই ব্যক্তি উহা নিজের জন্য কুরবানী করিয়া দিল উক্ত কুরবানী শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ পশুর মূল মালিক অথবা আমানতদার উভয়ের কাহারও পক্ষ হইতে কুরবানী শুদ্ধ হইবেনা। বরং আমানতদার ব্যক্তিকে বাজারের মূল্য অনুযায়ী পশুর মূল্য মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ দুই ব্যক্তি যদি একটি পশুর মালিক হয় তাহাদের একজন যদি ঐ পশুটি কুরবানী দেয় তবে উহা শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ উক্ত দুইজনের কাহারও কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। তবে কোন দুই ব্যক্তির সমান অংশের দুইটি পশু যদি অন্য কোন ব্যক্তির কাছে আমানত থাকে আর যদি উহা কুরবানী করা হয় এবং উভয়ের কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে উভয়ের পক্ষ হইতে কুরবানী শুদ্ধ হইবে। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্নঃ কোন এক ব্যক্তির একাধিক সন্তান আছে সেই ব্যক্তি নিজের কুরবানী সহ সকল সন্তানের সংখ্যা অনুপাতে ৭টি পশু কুরবানী করে কিন্তু কোনটা কাহার তাহা নির্ধারণ করে নাই তবে উহা শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ সকলের পক্ষ হইতে কুরবানী শুদ্ধ হইবে কিন্তু সন্তানের মধ্যে যদি বয়স্ক থাকে আর তাহাদের মধ্য হইতে যদি কেহ আপত্তি করে তবে তাহার কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। অপর দিকে ছয় সন্তান ও নিজে সাত জনে মিলিয়া যদি একটা গরু কুরবানী করে আর বয়স্ক সন্তান যদি আপত্তি করে তবে কাহারও কুরবানী শুদ্ধ হইবেনা। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ অশুদ্ধ ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যদি পশু খরিদ করা হয় তবে উহা দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ হইবে?

উত্তরঃ পশুটি কুরবানীর পূর্বেই যদি মালিকের সাথে ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ করিয়া নেওয়া হয় আর মালিক বৈধভাবে উহার মূল্য গ্রহণ করে তবে শুদ্ধ হইবে। আর পশুটি কুরবানী করা

হইয়া গেলে চামড়া খোলার পূর্বেই যদি মালিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া পশুটি নিয়া নেয় তবে কুরবানী কারী ঐ পশুর মূল্য পরিমাণ অর্থ ছদকা করিবে আর সময় থাকিলে সঠিক ভাবে অন্য একটা পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করিবে। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ যাহার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব সে যদি কুরবানী না করিয়া পশুটি বা উহার মূল্য কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে সদকা করিয়া দেয় তবে কি তাহার কুরবানীর ওয়াজিব আদায় হইবে?

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তাহার কুরবানীর ওয়াজিব আদায় হইবে না। তাহাকে অবশ্যই বিধি মোতাবেক কুরবানী করিতে হইবে। (বাহার)

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে প্রচলন আছে যাহার প্রতি কুরবানী ওয়াজিব সে নিজের তহবিল হইতে এক বৎসর নিজের নামে, পরবর্তী বৎসর স্ত্রীর নামে এই ভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে কুরবানী করিয়া থাকে এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তরঃ যাহার প্রতি কুরবানী ওয়াজিব তাহাকে কুরবানী করিতেই হইবে। নিজের কুরবানী পরিবারের অন্য কাহারও নামে করিলে আদায় হইবেনা। যদি একই পরিবারের অন্য কাহারও উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় অর্থাৎ নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তবে সতন্ত্র ভাবে তার কুরবানী ওয়াজিব হইবে। (হিন্দিয়া ৬-১৯৫০২)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি ছফরে বাহির হওয়ার পূর্বে কুরবানীর পশু খরিদ করিল এবং কুরবানীর দিনগুলো শেষ না হইতে ছফরে রওনা করিল এমতাবস্থায় তাহার হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ মুলতাকা নামক কিতাবে বলা হইয়াছে যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে পশুটি কুরবানী করিতে হইবেনা সে খরিদ করা পশুটি বিক্রয় করিতে পারিবে। অপর পক্ষে বলা হইয়াছে ঐ ব্যক্তি মালেকে নেছাব হইলে পশুটি বিক্রয় করিতে পারিবে। আর গরীব হইলে অবশ্যই তাহাকে ঐ পশুটি কুরবানী করিতে হইবে। কারণ গরীব ব্যক্তি সে তাহার নিজের উপর কুরবানী ওয়াজিব করিয়া নিয়াছে। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে কুরবানীর পশু নির্ধারণ না করিয়া কুরবানী করার দায়িত্ব দেয় তবে তাহার কুরবানী শুদ্ধ হইবে কি?

উত্তরঃ উপরোক্ত নিয়মে উকীল নির্ধারণ করিয়া কুরবানী করার দায়িত্ব দিলে কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। (বাদায়ে-আলমগীরী)

প্রশ্নঃ আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে কুরবানী দাতার করণীয় কিছু আছে কি না?

উত্তরঃ আইয়্যামে তাশরীক যদিও কুরবানীকে কেন্দ্র করিয়া উপস্থিত হয় তবুও উহাতে সতন্ত্র বিধান আছে। আর তাহা হইল ৯ই জিলহজ্জের ফজর হইতে ১৩ই জিলহজ্জ আছর পর্যন্ত প্রতিটা মুকীম বালেগ পুরুষের জন্য ফরজ নামায বাদ তাকবীর বলা

ওয়াজিব। এটা শুধু কুরবানী দাতার করণীয় নয় বরং সকল মুসলমানের দায়িত্ব। মুসলিম শরীফ ও মিশকাতের ১২৭ পৃষ্ঠায় হযরত উম্মে সালমা হইতে একখানা হাদীসে বলা হইয়াছে যে, কুরবানী দাতা কুরবানী না করা পর্যন্ত যেন নখ, চুল, ও অন্যান্য ক্ষৌরকাজ না করে। সেই হিসাবে জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন কুরবানী দাতার জন্য উক্ত কাজ গুলো না করা মুস্তাহাব।

প্রশ্নঃ মৃত্যু ব্যক্তির নামে কুরবানী করিলে জায়েয হইবে কি না বা ওয়াজিব আদায় হইবে কি না ?

উত্তরঃ যদি কোন ব্যক্তি আম্বিয়া (আঃ), আউলিয়া, পীর, ওস্তাদ, মাতা পিতা বা যে কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে কুরবানী করে তাহা হইলে এই কুরবানী শুদ্ধ হইবে। কুরবানী দাতা ধনী হইলে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাহার কুরবানীর ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে।

(শামী ২/২৮ পৃঃ কাজী খান ৩/৪৮ পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, গরীব দুই ভাই বা কয়েক ভাই যদি মিলিয়া একটি বকরী ক্রয় করে অতঃপর তাহারা কোন এক ভাইকে ঐ বকরীর মালিক বানাইয়া দেয় এবং মালিক মৃত পিতা বা মাতা বা অন্য কোন মৃত আত্মীয়ের পক্ষে ঐ কুরবানী করে তাহা হইলে মালিক ও মৃত উভয়ই কুরবানীর ছওয়াব পাইবে এবং অন্যান্য ভাইরা সাধারণ সদকার ছওয়াব পাইবে আর গোস্ত সকলেই খাইতে পারিবে।

কোন কোন জন্তু দ্বারা কুরবানী জায়েয ও সেগুলোর বয়স সীমা সম্পর্কে আলোচনা

প্রশ্নঃ কোন কোন জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয।

উত্তরঃ কুরবানীর জন্য তিন প্রকার জন্তু নির্দিষ্ট আছে। ঐ তিন প্রকার ব্যতীত অন্য জানোয়ার দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবেনা। যথাঃ

(ক) উট, উটনীও উহার মধ্যে শামিল।

(খ) গরু, এর মধ্যে মহিষ নর-মাদী সব শামেল।

(গ) ছাগল, এর মধ্যে দুম্বা ভেড়া নর-মাদী খাশী সবই অন্তরভুক্ত। উল্লিখিত জানোয়ার ব্যতীত অন্য কোন জানোয়ার দ্বারা কুরবানী জায়েয নাই। যেমন হরিণ, নীলগাই বন্য পশু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নাই। (বাদায়ে ৫/৬৯ পৃঃ হিন্দিয়া ৪/১০৩পৃঃ)

(বিঃদ্রঃ কুরবানীর পশু জবাই করার কিছুদিন পূর্বেই ক্রয় করিয়া উহা যত্ন করা এবং খাওয়াইয়া মোটাতাজা করা ভাল)

প্রশ্নঃ কোন শ্রেণীর পশুর বয়স কত হইলে কুরবানী জায়েয হইবে।

উত্তরঃ গরু, মহিষ, বলদ-গাভীর জন্য দুই বৎসর পূর্ণ হওয়া জরুরী। উট ও উটনীর পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন কম হইলে কুরবানী জায়েয হইবেনা। (রদ্দুল মুখতার ৫/২০৫পৃঃ)

অপরদিকে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, নর-মাদীর জন্য এক বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত। তবে যদি ছয়মাস বয়সের ভেড়া ও দুম্বা মোটা তাজায় এক বৎসর বয়সের ভেড়া ও দুম্বার সমতুল্য মনে হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয আছে। কিন্তু ছাগল যতই মোটা তাজা হোক এক বৎসরের একদিন কম হইলেও কুরবানী হইবে না।

(জাইয়ালী ৬/৭ পৃঃ রদ্দুল মোখতার ৫/২০১ পৃঃ)

প্রশ্নঃ যে সমস্ত কুরবানী করা জায়েয উহার প্রতি শ্রেণীর মধ্যে নর ও মাদী আছে এমতাবস্থায় কোন জাতীয় পশু কুরবানী করা উত্তম?

উত্তরঃ গরু, মহিষ ও উটের ক্ষেত্রে মাদী কুরবানী করা উত্তম। যদি উভয়ের গোস্ত ও দাম সমান হয় আর ছাগল, ভেড়ার ক্ষেত্রে খাশী করা নর কুরবানী করা উত্তম। (কাজীখান)

প্রশ্নঃ কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি পশুতে কয়জন অংশীদার হইয়া কুরবানী করিতে পারিবে।

উত্তরঃ ছাগল, ভেড়া ও দুম্বাতে এক ব্যক্তির অধিক শরীক হইয়া কুরবানী করা জায়েয নাই। অপর দিকে গরু, মহিষ ও উটের ক্ষেত্রে একের অধিক সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হইয়া কুরবানী করিতে পারিবে।

একজন সাত ভাগের একাধিক ভাগে শরীক হইতে পারিবে। কিন্তু সাত ভাগের এক অংশের কম হইলে কাহারও কুরবানী হইবে না। তবে গোস্ত ওজন করিয়া সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইতে হইবে কোনরূপ অনুমান করিয়া লইলে হইবেনা। তাহার পরেও কম বেশীর জন্য একে অপর হইতে ক্ষমা চাহিয়া দাবী ছাড়াইয়া নেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ গরু, মহিষ বা উটের অংশীদার উত্তম, না ভেড়া, ছাগল বা দুম্বা একটি জন্তু কুরবানী করা উত্তম?

উত্তরঃ গরু, মহিষ বা উটের অংশীদারির চেয়ে ছাগল ভেড়া বা দুম্বা একটি জন্তু কুরবানী করা উত্তম। যদি গরু, মহিষ বা উটের সাত ভাগের এক ভাগে একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার সমান হয়।

প্রশ্নঃ অংশীদারদের মধ্যে কেহও যদি গোস্ত খাওয়ার আশায় কুরবানী করে তবে কুরবানীর কোন ক্ষতি হইবে কি না?

উত্তরঃ অংশীদারদের মধ্যে যদি কেহ নিছক গোস্ত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে তবে কাহারও কুরবানী হইবে না। তাই পশু খরিদ করার পূর্বে অংশীদারদের নিয়ত শুদ্ধ করিতে হইবে। (শামী ৫/২০১ পৃঃ)

প্রশ্নঃ একটি গরু বা মহিষ বা উটে ছয় জন ছয় ভাগে আর অবশিষ্ট সপ্তম ভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কুরবানী করিলে জায়েয হইবে কি না ?

উত্তরঃ এইরূপ ছয় জনের ছয় ভাগে আর সপ্তম ভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর নামে কুরবানী করিলে জায়েয হইবে।

প্রশ্নঃ সাত ভাগের পশুতে মৃত পিতা-মাতা আত্মীয় বা যে কোন মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ সাত ভাগের পশুতে নবী, অলী, পীর, ওস্তাদ, পিতা, মাতা বা যে কোন মৃত ব্যক্তির নামে শরীক হইয়া কুরবানী করা যাইবে। বরং কুরবানী দাতা ধনী হইলে তাহার ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। (শামী-২/২৮পৃঃ কাজীখান ৪/৪৮)

প্রশ্নঃ সমস্ত শরীকের মধ্যে যদি একজন অমুসলিম থাকে তবে কুরবানী জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ একাধিক শরীকের মধ্যে যদি একজন অমুসলিম থাকে তবে কাহারও কুরবানী জায়েয হইবে না।

প্রশ্নঃ বন্য ও গৃহ পালিত পশুর মিলনে বাচ্চা হইলে উহা পরিণত বয়সে উপণীত হইলে উহা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ এই অবস্থায় মায়ের দিকটা প্রাধান্য পাইবে অর্থাৎ মা যদি গৃহপালিত হয় তবে উহার বাচ্চা দ্বারা কুরবানী বৈধ হইবে আর মা যদি বন্য হয় তবে উহার বাচ্চা দ্বারা কুরবানী হইবে না। (শামী ৫/২২৬ হেদায়া, আলমগীরী)

প্রশ্নঃ কুরবানীর জন্য খরিদ করা পশুর যদি বাচ্চা হয় অথবা কুরবানীর পরে পেটে বাচ্চা পাওয়া যায় উহার হুকুম কি হইবে?

উত্তরঃ কুরবানীর জন্য পশু খরিদ করার পর কুরবানীর পূর্বে যদি পশুটির বাচ্চা হয় অথবা কুরবানীর পর যদি পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে উক্ত বাচ্চাটি জবাই করিয়া শরীকদারদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হইবে এবং উহার মূল্য পরিমাণ অর্থ সদকা করিয়া দিতে হইবে। আর যদি বাচ্চাটি রাখিয়া দেওয়া হয় তবে কুরবানীর বয়স হয় তবেও উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে না বরং উহার মূল্য পরিমাণ অর্থ সদকা করিতে হইবে। (কাজীখান, আলমগীরী)

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশু দ্বারা কোন প্রকার পার্থিব উপকার লাভ করা জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা, ভাড়া দেওয়া, দুধ পান করা, পশম ব্যবহার করা, বোঝা বহন করান এবং চাষাবাদ ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা জায়েয হইবে না।

প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর উদ্দেশ্যে একটি গরু ক্রয় করে অতঃপর অন্য কয়েক ব্যক্তিকে অংশীদার করতঃ সাত ভাগে কুরবানী দেয় তবে উহা জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ মূলতঃ পশু খরিদ করার পূর্বেই ভাগ বা অংশীদার ঠিক করিয়া লওয়া উত্তম। **তবুও যদি** কোন ধনী ব্যক্তি একটি পশু ক্রয় করিয়া পরে সাত ভাগ পূর্ণ করিয়া কুরবানী **দেয় তবে উহা জায়েয** হইবে। আর যদি গরীব ব্যক্তি একাই একটা পশু কুরবানীর **নিয়তে খরিদ করিয়া** পরে সাত ভাগ পূর্ণ করে তবে তাহার কুরবানী জায়েয হইবে না।

কারণ গরীব ব্যক্তির উপর শরীয়তের পক্ষ হইতে কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং নিয়তের কারণে তার প্রতি উহা অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে তাই কোন শরীক ছাড়াই উক্ত পশু কুরবানী করিতে হইবে।

প্রশ্নঃ একই কুরবানীর পশু দ্বারা ওয়াজিব, নফল, মান্নত, অছিয়তের কুরবানী ও আকীকা দেওয়া জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ একই পশু দ্বারা ওয়াজিব, নফল, অছিয়ত বিভিন্ন প্রকারের কুরবানী দেওয়া জায়েয হইবে। যেমন, একটি গাভী কুরবানী করিতে গিয়া একজন ধনী হিসাবে ওয়াজিব আদায়ের নিয়ত করিল, আরেকজন আকীকা আদায়ের নিয়ত করিল, আরেক জন মান্নত কুরবানী আদায়ের নিয়ত করিল, আরেক জন অছিয়ত কৃত কুরবানীর নিয়ত করিল, আরেকজন নফল কুরবানীর নিয়ত করিল, আরেকজন দমে এহছার বা দমে তামাত্তোর নিয়ত করিল ইত্যাদি তাহা হইলে সকলের কুরবানী শুদ্ধ হইয়া যাইবে। কেননা সকলেরই উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা।

প্রশ্নঃ কোন এক ব্যক্তি যদি কয়েকটি পশু কুরবানী করে অথবা একটি গরুর কয়েক ভাগ অথবা পূর্ণ একটি গরু, মহিষ বা উট একাই কুরবানী করে তবে উহার হুকুম সম্পর্কে কি হইবে?

উত্তরঃ যাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব তাহার জন্য কমপক্ষে একটি বকরী বা ভেড়া কুরবানী করা অত্যাবশ্যক। হ্যাঁ, সে ইচ্ছা করিলে গরু বা উটের সাতভাগের এক ভাগে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। যদি একাই একটি গরু বা উট কুরবানী করে তাহা হইলে গোটা পশুটি ওয়াজিব কুরবানী হিসাবে আদায় হইবে। আর যদি গরুতে একাধিক অংশে ভাগী হয় তা হইলে একভাগ ওয়াজিব হিসাবে আদায় হইবে এবং বাকী অংশগুলি নফল ছদকা হিসাবে ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

ত্রুটিযুক্ত জন্তু দ্বারা কুরবানী প্রসংগে

প্রশ্নঃ পাগল জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ পাগল জন্তু যদি ঘাস পানি খায় মাঠে চরে তাহা হইলে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে অন্যথায় কুরবানী জায়েয হইবে না। (শামী ৫/২৮০ পৃঃ)

প্রশ্নঃ যে সমস্ত পশুর শিং জন্মগত ভাবে নাই কিংবা মধ্যভাগে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে উহা দ্বারা কুরবানী হইবে কি না?

উত্তরঃ যে সব পশুর শিং জন্মগত ভাবে নাই কিংবা মধ্যভাগে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে। তবে শিং যদি গোড়া হইতে একেবারে ভাংগিয়া যায় তবে তাহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে না। (শামী ৫/২৮০ পৃঃ)

প্রশ্নঃ চর্মরোগে আক্রান্ত পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয কি না?

উত্তরঃ চর্মরোগে আক্রান্ত পশু যদি শক্তিশালী ও মোটা তাজা হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা

কুরবানী জায়েয হইবে। কিন্তু চর্ম রোগের কারণে যদি এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, কুরবানীর স্থানে পৌঁছাইতে অক্ষম তাহা হইলে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে না।

(শামী ৫/২৮০ পৃঃ)

প্রশ্নঃ অন্ধ, কানা, অতি দুর্বল ও পঙ্গু ইত্যাদি জন্তু দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ অন্ধ, কানা, অতি দুর্বল (যাহার হাড়ে মগজ নাই) ও পঙ্গু পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নাই। তবে উক্ত পঙ্গু পশু যদি তিন পা দিয়া চলাচল করে এবং চতুর্থ পা দ্বারা কিছু কিছু টেক লাগাইয়া হাটিতে পারে তবে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে।

(শামী ৫/২৮১ পৃঃ)

প্রশ্নঃ জন্মগত ভাবে কান নাই বা অধিকাংশ কানকাটা, লেজকাটা ইত্যাদি পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয কি না?

উত্তরঃ যে পশুর জন্মগতভাবে একটা বা দুইটা কান সম্পূর্ণ নাই বা অধিকাংশ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ কানের এক তৃতীয়াংশের বেশী) কাটা থাকে অনুরূপ লেজেরও অধিকাংশ কাটা থাকে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে না। আর যদি উহার চাইতে কম হয় তবে কুরবানী জায়েয হইবে। অনুরূপ জন্মগত কান যদি খুব ছোটও হয় তবু কুরবানী জায়েয হইবে। (শামী ৫/২৮২ পৃঃ)

প্রশ্নঃ খাশী করা পশু বা স্বভাবগত এক অন্ডকোষ বিশিষ্ট পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ খাশী করা পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয এবং উত্তম। অনুরূপ স্বভাবগতভাবে এক অন্ডকোষ বিশিষ্ট পশুও কুরবানী জায়েয হইবে।

(শামী ৫/২৮২ পৃঃ ও ইমদাদুল ফতোয়া ৩/৪৭২ পৃঃ)

প্রশ্নঃ যে সব জন্তুর কিছু কিছু দাঁত আছে বা যাহার দাঁত মোটেই নাই উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ অধিকাংশ দাঁত বিশিষ্ট পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয তবে দাঁত মোটেই নাই যার ফলে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেনা এই ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নাই। তবে যদি দাত ক্ষয় হইয়া যাওয়ার পরেও খাদ্য গ্রহণে কোন রূপ অসুবিধা না হয় এবং সুস্থ থাকে তবে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে। (শামী ৫/২৮৩ পৃঃ) সিরাজিয়া।

প্রশ্নঃ যদি কোন পশুর পুরুষাঙ্গ কাটা হয় বা কোন মাদী পশুর স্তনের বোটা কাটা হয় বা রোগের কারণে দুধ শুকাইয়া যায় তবে উহা দ্বারা কুরবানী হইবে কি না?

উত্তরঃ যে পশুর পুরুষাঙ্গ কাটা হওয়াতে সংগমে অক্ষম এবং বৃদ্ধ হওয়াতে বাচ্চা জন্মাইতে অক্ষম উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে না। পক্ষান্তরে যে পশুর স্তনের প্রথমাংশ কাটা বা রোগের কারণে দুধ শুকাইয়া গিয়াছে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয নাই। তদ্রূপ ছাগলের স্তন হইতে দুই বোটার একটি ও গরু বা মহিষের স্তনের চারিটি বোটা হইতে যদি দুইটি কাটিয়া যায় তবে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে না। (শামী ৫/২৮৪ পৃঃ)

প্রশ্নঃ খোজা ও সমলিঙ্গ পশুর কুরবানী জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ খোজা যাহাকে প্রচলিত ভাষায় খোনছা বলে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয কিন্তু সমলিঙ্গ ওয়ালা পশুর কুরবানী জায়েয নাই। (শামী ৫/২৮৪ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশু খরিদ করার পর যদি ক্রুটিযুক্ত হয় তবে উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি ভাল পশু খরিদ করে আর উহা কুরবানীর পূর্বেই এমন ক্রুটি যুক্ত হয় যাহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হয় না এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি ধনী হয় তবে উহার পরিবর্তে আর একটি পশু খরিদ করিয়া কুরবানী দিবে আর ক্রেতা যদি গরীব হয় তবে ঐ ক্রুটি যুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানী করিবে।

অপর দিকে ভাল পশু কুরবানী করার সময় ক্রটিযুক্ত হইলে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে। ঐ সময় উঠিয়া দৌড় দিলে ধরিয়া জবেহ করিতে হইবে।

(শামী ৫/২৮৪ পৃঃ রদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার)

প্রশ্নঃ যেই পশুর জিহবা নাই বা কাটা গিয়াছে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ যেই পশুর জিহবা নাই অথবা অধিকাংশ কাটা গিয়াছে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয নাই। ফতোয়ায় তাতারখানিয়ায় বলা হইয়াছে জিহবা কাটা যাওয়ার কারণে পশুর যদি আহার করা বন্ধ হইয়া যায় তবে কুরবানী শুদ্ধ হইবে না, আহার বন্ধ না হইলে কুরবানী জায়েয হইবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বলিয়াছেন কাটা অংশ যদি এক তৃতীয়াংশ হইতে বেশী হয় তাহা হইলে শুদ্ধ হইবে না। আর কাটা অংশ যদি এক তৃতীয়াংশ বা তাহার চাইতে কম হয় তবে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে। আর ইহাই বিশুদ্ধমত।

(আলমগীরী)

প্রশ্নঃ কুরবানী করার উদ্দেশ্যে খরিদ করা পশুর পশম, লেজ ইত্যাদি কুরবানীর পূর্বে কাটা জায়েয আছে কি না?

উত্তরঃ কুরবানী করার পূর্বে উক্ত পশুর লেজ, পশম বা শরীরের কোন অংশ কাটা জায়েয নাই। কাটিলে উহা দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। জবাই করার পর পশম, লেজ বা পশম সহ চামড়া ইত্যাদি কাটিয়া নিজের কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু বিক্রয় করিয়া অর্থ নিজে গ্রহণ করিতে পারিবে না। উহার অর্থ গরীব মিসকীনদের দিতে হইবে।

(হেদায়া)

প্রশ্নঃ যে পশু বিষ্ঠা খায় উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে কি না?

উত্তরঃ যে পশু বেশী বিষ্ঠা খায় তাহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে না তবে উট হইলে ৪০ দিন, গরু হইলে ২০দিন , ভেড়া, ছাগল ১০ দিন বিষ্ঠা খাওয়া হইতে বিরত রাখিতে পারিলে উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে। অপরদিকে যে পশু ঘাস, লতাপাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে তবে মাঝে মাঝে সামান্য পরিমাণ বিষ্ঠা খায় উহা দ্বারা কুরবানী জায়েয হইবে। (তাহতাবী, শামী, আলমগীরী)

কুরবানীর পশু চুরি, হারান, বদলী এবং কুরবানীর সময় অতিবাহিত হইলে উহার হুকুম

প্রশ্নঃ এতক্ষণ ত্রুটি যুক্ত কুরবানীর পশু সম্পর্কে জানিলাম। এখন কুরবানীর উদ্দেশ্যে খরিদ করা জন্তু চুরি হইলে বা হারাইয়া গেলে উহার হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু হারাইয়া গেলে মালিক ধনী হইলে আর একটি পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করিতে হইবে। তবে যদি কুরবানীর তিন দিনের মধ্যে হারানো বা চুরি হওয়া পশুটি পাওয়া যায় তবে ধনী হইলে দুইটার যে কোন একটা কুরবানী করিলে হইবে। তবে প্রথমটা করা উত্তম যদি প্রথমটা মানগত ভাল হয়। আর যদি দ্বিতীয়টা করে তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে প্রথমটার দামের চেয়ে দ্বিতীয়টার দাম কম না বেশী কম হইলে অবশিষ্ট টাকা সদকা করিতে হইবে।

অপর দিকে মালিক যদি গরীব হয় তার জন্য আর একটি পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করা ওয়াজিব নহে। যদি সে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে আর একটি পশু খরিদ করে এবং কুরবানীর দিনগুলির মধ্যে চুরি হওয়া বা হারান পশুটি পাওয়া যায় তাহা হইলে উভয়টি পশু কুরবানী করা তাহার জন্য ওয়াজিব। আর যদি কুরবানীর দিনগুলির পরে চুরি হওয়া বা হারান পশুটি পাওয়া যায় তবে হুবহু সেই পশুটি সদকা করিতে হইবে। (বাহার)

প্রশ্নঃ কুরবানীর জন্য খরিদ করা পশু মারা গেলে উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ যদি ধনী লোকের কুরবানীর পশু মারা যায় তবে উহার পরিবর্তে আর একটি পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করিতে হইবে। আর যদি গরীব ব্যক্তির পশু মারা যায় তবে আর কুরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব নহে। (আলমগীরী-বাহার শরীয়া)।

প্রশ্নঃ চারি ব্যক্তি ৪টি ছাগল বা ভেড়া খরিদ করিয়া একই স্থানে রাখিয়া দিল। পরে দেখা গেল একটি মারা গিয়াছে। এমতাবস্থায় ইহার হুকুম কি?

উত্তরঃ যে পশুটি মারা গিয়াছে উহার মালিক কে তাহা ঠিক করিতে না পারিলে অবশিষ্ট তিনটি পশু বিক্রয় করিয়া দিবে। প্রাপ্ত মূল্য দ্বারা কুরবানী জায়েয হয়-এমন চারটি ছাগল বা ভেড়া খরিদ করতঃ একে অপরকে জবাই করিয়া দিতে বলিবে। অতঃপর তাহারা একে অপরের হইতে কম বেশী হওয়ার আশংকা দূর করার জন্য দাবী ছাড়াইয়া নিবে।

(শামী ও বাহরুর রায়েক)

প্রশ্নঃ কুরবানী করার জন্য একাধিক পশু খরিদ করিয়া এক স্থানে রাখিল এমতাবস্থায় কুরবানী দাতাদের মধ্য হইতে একজন বা একাধিক ব্যক্তি মারা গেল উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের পক্ষ হইতে কুরবানী করার অনুমতি লইতে হইবে তাহারা অনুমতি দিলে সকলের কুরবানী জায়েয হইবে। আর অনুমতি না দিলে কাহারও কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। (হেদায়া)

প্রশ্নঃ কুরবানীর জন্য খরিদ করা পশু বদলী করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানীর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যদি কুরবানীর নিয়তে পশু খরিদ করে তবে ধনী গরীব উভয়েই বদলী করিতে পারিবে। আর যদি কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে খরিদ করে তবে ধনী লোক বদলী করিতে পারিবে কিন্তু গরীব লোক বদলী করিতে পারিবে না।

(আজিজুল ফতোয়া- ৪১৯ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি যদি কুরবানীর জন্য দুইটি পশু খরিদ করে আর কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে কোনটাই কুরবানী না করে তবে উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু কুরবানী করা হয় নাই এমতাবস্থায় কুরবানী দাতা ধনী হইলে দুইটির মধ্যে উত্তমটি সদকা করিয়া দিবে। আর গরীব হইলে দুইটিই সদকা করা ওয়াজিব হইবে। (শামী ৫/২৯৭ পৃঃ)

প্রশ্নঃ ধনী ব্যক্তি কুরবানী করে নাই এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন শেষ হইয়া গিয়াছে আর সেই ব্যক্তি গরীব হইয়া গিয়াছে উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ এমতাবস্থায় কুরবানীর জন্য খরিদ করা পশু সদকা করিয়া দিতে হইবে। আর যদি কুরবানীর দিন গুলোর মধ্যে সেই ব্যক্তি গরীব হইয়া যায় তবে তাহার জন্য কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হইবে না। মোট কথা হইল কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য কুরবানীর শেষ ওয়াক্তটি গ্রহণযোগ্য। (শামী ৫/২০০-১৯৮ পৃঃ)

প্রশ্নঃ যদি কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর পশু খরিদ না করে এবং কুরবানী না করে এমতাবস্থায় কুরবানীর দিনগুলো শেষ হইয়া যায় তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ কোন ধনী ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু খরিদ না করে বা কুরবানী না দেয় এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন গুলো শেষ হইয়া যায় তবে সেই ব্যক্তি একটা মধ্যম শ্রেণীর বকরীর মূল্য সদকা করিয়া দিবে। আর পশু খরিদ করা থাকিলে সেইটিই সদকা করিতে হইবে। তবে মান্নত হইলে ধনী, গরীব উভয়েরই জন্য সদকা করিতে হইবে।

(আলমগীরী)

প্রশ্নঃ কুরবানীর দিনগুলির মধ্যে কুরবানীর নিয়ত ব্যতীত অন্য কোন পশু জবাই করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানী দাতার সাথে তুলনা করিয়া নয় একান্ত প্রয়োজনে হাঁস, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি জবাই করিতে পারে। তবে মাকরূহ হইবে। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ কয়েকজন কুরবানী দাতা ভিন্ন ভিন্ন দামে কয়েকটি পশু খরিদ করিয়া একই স্থানে রাখিলে উহা কাহার কোনটা চিনিতে না পারিলে হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সকলে মিলিয়া একমতের উপর কুরবানী করিলে শুদ্ধ হইবে। অন্যথায় কম দামের ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য সদকা করিয়া দিবে। তার পরেও একে অপরের নিকট হইতে দাবী ছাড়াইয়া নিবে। (দুররুল মুখতার)

প্রশ্নঃ রাখালী বা ভাগী দেওয়া পশু দ্বারা কুরবানীর হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ যদি কোন গরু, ছাগল বা ভেড়া ইত্যাদি কাহারও নিকট ভাগী বা রাখালী দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট হইতে যদি কেহ খরিদ করিয়া কুরবানী করে তবে তাহার কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। ক্রয় করিতে হইলে আসল মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কুরবানী করিলে উহা জায়েয হইবে।

প্রশ্নঃ চলতি বৎসর কুরবানী দাতাদের পশুতে বিগত বৎসরের কাজা আদায়কারী শরীক হইলে উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ চলতি বৎসরের কুরবানী দাতার পশুতে বিগত বৎসরের কাজা আদায় কারী অংশী হইলে চলতি বৎসর কুরবানী দাতাদের কুরবানী আদায় হইবে কিন্তু কাজা আদায় কারীর কাজা আদায় হইবে না বরং নফল কুরবানী রূপে গণ্য হইবে। যেহেতু ওয়াজিব ও নফল কুরবানী একত্রে মিলিয়া গিয়াছে সেহেতু সকলের কুরবানীর গোস্ত সদকা করিয়া দিতে হইবে। (কাজীখান দুররুল মুখতার)

মান্নত কুরবানী সম্পর্কে আলোচনা

প্রশ্নঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে মান্নত কুরবানীর হুকুম কি?

উত্তরঃ যে কোন কাজ সিদ্ধি হওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানীর মান্নত করিলে উক্ত কাজ সিদ্ধি হওয়ার পর তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে। সেই ব্যক্তি নেছাবের মালিক হোক বা না হোক। ধনী হোক বা আর গরীব হোক। কাজ সিদ্ধি না হইলে মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব হইবে না। (শামী ৫/২০৩পৃঃ)

প্রশ্নঃ মান্নত কুরবানীর পশুর হুকুম কি হইবে?

উত্তরঃ কুরবানীর পশুর মতই মান্নত কুরবানীর পশুর হুকুম অর্থাৎ কুরবানী–শুদ্ধ হওয়ার জন্য যেই সব শর্ত প্রযোজ্য যেমন পশুর বয়স পূর্ণ হওয়া, দোষ মুক্ত হওয়া, ইত্যাদি মান্নত কুরবানীর ক্ষেত্রেও ঐসব শর্ত প্রযোজ্য। (রদ্দুল মুহতার ৫/২০৩পৃঃ)

প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি পশু কুরবানী করার মান্নত করে এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন গুলো অতিবাহিত হইয়া যায় তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ যদি এমন হয় যে নির্দিষ্ট পশু কুরবানী করার মান্নত করিল আর কোন কারণ বশতঃ কুরবানীর দিন গুলো অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কুরবানী করিতে পারে নাই তবে এমতাবস্থায় উক্ত পশু দ্বারা কুরবানী হইবে না। বরং ঐ পশুটি ফকীর মিসকীনকে সদকা করিয়া দিতে হইবে। (শামী ৪/২০৮ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কোন গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর মান্নত করে আর কুরবানীর দিন গুলোর মধ্যে যে কোন দিন সে যদি নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ উল্লিখিত বর্ণনা মতে যদি সে কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যে মালেকে নেছাব হয় তবে তাহার জন্য দুইটি কুরবানী ওয়াজিব। একটি মান্নতের কারণে (যদি মান্নত পূর্ণ হয়) অপরটি মালদার হওয়ার কারণে।

প্রশ্নঃ যদি কেহ কুরবানী মান্নত করে কিন্তু কোন প্রকারের পশু বা দাম কত কিছুই নির্ধারণ না করে তবে উহার হুকুম কি জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ উল্লিখিত অবস্থায় একটি ছাগল বা একটি ভেড়া কুরবানী করিতে হইবে। অথবা গরু, মহিষ বা উটের এক সপ্তমাংশ কুরবানী দিলেও মান্নত আদায় হইবে। তবে গোস্ত নিজে খাইতে পারিবে না। সম্পূর্ণ সদকা করিয়া দিতে হইবে। (বাহার)

প্রশ্নঃ যদি কেহ মান্নত করে যে তাহার অসুখ বা বিপদ দূর হইলে বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলে তাহার একটি পুত্রকে আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানী করিবে। যদি কাজ সিদ্ধি হয় বা বিপদ দূর হয় তবে উহার হুকুম কি জানিতে ইচ্ছুক।

উত্তরঃ উক্ত রূপ মান্নত করিলে তাহার মান্নত যদি পূর্ণ হয় অর্থাৎ কাজ সিদ্ধি বা বিপদ দূর হয় তবে তাহার পক্ষ হইতে একটি ছাগল অথবা ভেড়া বা দুম্বা ইত্যাদি যাহা দ্বারা কুরবানী শুদ্ধ উহা দ্বারা মান্নত আদায় করিতে হইবে।

(দুররুল মুখতার, গায়াতুল আওতার)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি যদি একটি গরু, মহিষ বা উট কুরবানী করার জন্য মান্নত করে তবে সেই ব্যক্তি একটি ছাগল বা ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী করিলে মান্নত আদায় হইবে কি না?

উত্তরঃ ঐ ব্যক্তি যেই উদ্দেশ্যে কুরবানীর মান্নত করিয়াছে ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলে তাহাকে অবশ্যই মান্নত আদায় করিতে হইবে। তবে যদি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী করিতে চায় তবে একটি কুরবানী করিলে হইবেনা বরং ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা সাতটি কুরবানী করিতে হইবে। (গায়াতুল আওতার, আলমগীরী)

প্রশ্নঃ যদি কেহ মান্নত করে যে আমার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হইলে আমি দশটি পশু কুরবানী করিব তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলে তাহার প্রতি মাত্র দুইটি পশু কুরবানী ওয়াজিব হইবে। (কাজীখান, আলমগীরী, জাহিরিয়া)

প্রশ্নঃ মান্নত কুরবানীর গোস্ত বন্টনের হুকুম কি?

উত্তরঃ মান্নত কুরবানীর সম্পূর্ণ গোস্ত গরীব, ইয়াতিম, মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করিতে হইবে। নিজে সদকা ও যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হইলেও নিজের মান্নতের গোস্ত নিজে খাইতে পারিবে না। যদি নিজে খায় বা ধনী লোককে দেয় বা খাওয়ায় তবে উহার মূল্য সদকা করিতে হইবে। (রদ্দুল মুখতার ৫/৩০২ পৃঃ)

অছীয়ত কুরবানী সংক্রান্ত বিষয়ঃ

প্রশ্নঃ এতক্ষণ মান্নত কুরবানী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিলাম এখন অছীয়ত সম্পর্কে বিশেষ করিয়া পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কুরবানী করিতে পারে নাই উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ পিতার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কোন কারণ বশতঃ উহা আদায় করিতে পারে নাই এমতাবস্থায় তাহার জন্য অছীয়ত করা ওয়াজিব। যাহাতে তাহার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হয়। (রদ্দুল মুখতার ৫/২১৩ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কাহারও উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু কুরবানীর দিনগুলো পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে মারা গেল তবে তাহার হুকুম কি ?

উত্তরঃ এইরূপ ব্যক্তির উপর কুরবানী ও অছীয়ত কোনটাই জরুরী নয়।

(ফতোয়ায় হিন্দিয়া)

প্রশ্নঃ অছীয়ত করিয়া যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তবে তাহার অছীয়ত পূর্ণ করার হুকুম কি?

উত্তরঃ অছীয়ত করিয়া যদি কোন লোক ইন্তেকাল করেন তবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হইতে অছীয়ত পূর্ণ করিতে হইবে। (শামী ৫/২১৩ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর অছীয়ত কারীর সম্পদ না থাকিলে বা সামান্য থাকিলে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ অছীয়ত কারীর কোন সম্পদ না থাকিলে তাহার ওয়ারিসদের পক্ষ হইতে অছীয়ত আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি খুশি হইয়া আদায় করে তবে সেটা সতন্ত্র ব্যপার। অপর দিকে যত কম সম্পদ হোক উহার তৃতীয়াংশের বেশী তাহার অছীয়তের জন্য খরচ করা যাইবে না। ইচ্ছা করিলে ওয়ারিসগণ বাকী সম্পদ হইতে পূর্ণ করিতে পারে কিন্তু ওয়াজিব নহে।

প্রশ্নঃ অছীয়ত কৃত কুরবানীর পশুর হুকুম কি?

উত্তরঃ অছীয়ত কৃত কুরবানীর পশুতে ওয়াজিব কুরবানীর পশুর মতই পূর্ণ বয়স, ত্রুটি মুক্ত ও সময়ের বাধ্যকতা ইত্যাদি শর্তগুলি প্রযোজ্য হইবে।

প্রশ্নঃ অছীয়ত কৃত কুরবানীর গোস্ত বন্টনের হুকুম কি?

উত্তরঃ অছীয়তকৃত কুরবানীর গোস্ত সম্পূর্ণ ফকীর মিসকীনকে সদকা করা ওয়াজিব। অছীয়ত কারী ব্যক্তির ওয়ারিসগণ খাইতে পারিবেনা বা ধনী লোককে হাদিয়া দিতে ও খাওয়াইতে পারিবে না। তবে যদি ভাই, ভাতিজা চাচা দূরবর্তী ওয়ারিসগণ সদকা বা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয় তবে খাওয়ার অনুমতি আছে।

(ইমদাদুল ফতোয়া ৩/৫৭৩ পৃঃ)

নফল কুরবানীর বিবরণ

প্রশ্নঃ শরীয়তে নফল কুরবানীর হুকুম কি?

উত্তরঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কুরবানী করিয়া সমস্ত উম্মতকে ছওয়াব পৌছাইয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় নফল কুরবানী করিয়া উহার ছওয়াব অন্যকে পৌছানো জায়েয আছে। (ইমদাদুল ফতোয়া ৩/৫৭৪ পৃঃ)

প্রশ্নঃ অছীয়ত, মান্নত ইত্যাদির নিয়ত ছাড়াই যদি কেহ নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানী করে তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ অনুরূপ নিয়তে কুরবানী করা মুস্তাহাব। এইরূপ কুরবানী করিলে নফল কুরবানী রূপে গণ্য হইবে। আর উহার ছওয়াব সকল মৃত্যু ব্যক্তি পাইবে।

(আলমগীরী, শামী ৫/১৯৮ পৃঃ)

প্রশ্নঃ যদি কেহ জীবিত ব্যক্তির নামে নফল কুরবানী করিতে চায় তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ অনুরূপ কুরবানীর জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হইবে না। স্বেচ্ছায় জীবিত ও মৃত্যু ব্যক্তির নামে কুরবানী করিতে পারিবে। এমনকি নিজের মাল দ্বারা নিজের নামে কুরবানী করিয়া এক বা একাধিক মৃত্যু ব্যক্তির জন্য ছওয়াব পৌঁছানো জায়েয। তাছাড়া অন্যান্য কুরবানী দাতার সাথেও শরীক হইয়া কুরবানী করা বা মৃত্যু ব্যক্তিকে শরীক করা জায়েয (ইমদাদুল ফতোয়া ৩ খণ্ড)

প্রশ্নঃ নফল কুরবানীর গোস্ত বন্টনের নিয়ম কি?

উত্তরঃ নফল কুরবানীর গোস্ত বন্টনের ভিন্ন কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ ওয়াজিব কুরবানীর মত নিজে, আত্মীয়স্বজন, ধনী, গরীব সকলে খাইতে পারিবে। চামড়ারও একই হুকুম।

(শামী ৫/২০৭ পৃঃ)

কুরবানীর পশু জবাই করার সময় সংক্রান্ত বিষয়

প্রশ্নঃ আমাদের দেশের গ্রাম ও শহর বাসীদের জন্য কুরবানীর পশু জবাই করার সময় কখন হইতে শুরু হয়।

উত্তরঃ আমাদের দেশের গ্রাম ও শহর বাসীদের কুরবানীর পশু জবাই করার সময় ঈদের নামাযের পর হইতে শুরু হয়। তবে যে সমস্ত এলাকায় ঈদের নামায ও জুম্আর নামায শরীয়ত মোতাবেক ওয়াজিব নহে সেই সমস্ত এলাকার লোকদের জন্য ঈদের দিন সুবহে সাদেকের পর হইতে কুরবানীর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। আর শেষ সময় হইল তৃতীয় দিন (অর্থাৎ ১২ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত)। তবে ইমাম শাফী (রহঃ) এর মতে তের তারিখ পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয। সুতরাং শহর বাসীদের জন্য ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয হইবে না। তবে যদি কুরবানীর পশু যেইখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয় সেই স্থানে পাঠাইয়া দেয় তবে উহা নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয হইবে। (শামী ৫/২০২ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর তারিখের মধ্যে রাত্রে কুরবানী করা যাবে কি না?

উত্তরঃ যদিও ১০ই জিলহজ্জ হইতে ১২ ই জিলহজ্জ এই তিন দিন কুরবানীর সময়ের মধ্যে রাতও শামিল। তবু একান্ত ওজর ব্যতীত রাত্রিতে কুরবানী করা মাকরূহ। অপর দিকে কোন কারণ বশতঃ ১২ই জিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্বে কুরবানী করা সম্ভব না হইলে ১২ তারিখ দিবাগত রাত্রিতে কুরবানী করা হইলে তাহাও শুদ্ধ হইবে। (আলমগীরী ৫/২৯২ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর জন্য নির্ধারিত তিন দিনের কোন দিন কুরবানী করা উত্তম?

উত্তরঃ প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জ কুরবানী করা উত্তম। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন। তবে চাঁদের তারিখের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকিলে ১২ তারিখের পূর্বেই কুরবানী করা উত্তম। (আলমগীরী-বাহার)

প্রশ্নঃ যেই এলাকায় ঈদের নামায ওয়াজিব সেই খানে ১০ই জিলহজ্জে কোন শরয়ী ওজরের কারণে যদি ঈদের নামায পড়িতে পারা না যায় তখন কুরবানীর হুকুম কি?

উত্তরঃ ১০ই জিলহজ্জ তারিখে কোন শরয়ী কারণে নামায পড়া না গেলে এই দিন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া গেলে কুরবানী করিবে এবং ১১ ও ১২ তারিখ ঈদের নামায শুরু হওয়ার পূর্বেই কুরবানী করিতে পারিবে। (বাহার-দুররুল মুখতার)

প্রশ্নঃ যে সমস্ত এলাকায় একাধিক স্থানে ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় সেই এলাকার লোকদের কুরবানী করার হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ যে এলাকায় একাধিক মসজিদ ও ঈদগাহে একাধিক ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় সেই খানের যে কোন স্থানে চাই মসজিদে হোক বা ঈদগাহে হোক একটি জামায়াত শেষ হইলেই উক্ত এলাকার সকলেরই কুরবানী জায়েয হইবে। তাহাতে কুরবানী দাতা তখন নামায আদায় করিয়া থাকুক বা নাই থাকুক। (শামী ৫ খন্ড)

প্রশ্নঃ ইমাম সাহেবের ঈদের নামায শেষ হয় নাই অথবা নামায শেষ হইয়াছে খুৎবাহ বাকী এমতাবস্থায় কেহ যদি কুরবানী করে তবে তাহার হুকুম কি?

উত্তরঃ ইমামের নামায ও খুৎবাহ শেষ হওয়ার পরেই কুরবানী করার সাধারণ নিয়ম। তাই যদি কেহ নামায শেষ হইবার পূর্বেই কুরবানী করে তবে তাহা শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু নামায শেষ খুৎবাহ বাকী এমতাবস্থায় কুরবানী করিলে হইবে তবে না করা উত্তম। (আলমগীরী)

প্রশ্নঃ ঈদের দিন ইমাম সাহেব নামায আদায় করিতে বিলম্ব করিলে কুরবানীর হুকুম কি?

উত্তরঃ এমতাবস্থায় কুরবানীর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া যাইবে তখনই কুরবানী করার নিয়ম বা উচিৎ। (শামী ৫ খণ্ড)

প্রশ্নঃ ঈদুল আযহার নামায আদায় করার পর জানা গেল যে ইমামের কারণে নামায ফাসেদ হইয়াছে এমতাবস্থায় কুরবানীর হুকুম কি?

উত্তরঃ নামায ফাসেদ হইয়াছে এইটা যদি তাৎক্ষণিক জানা যায় তবে সাথে সাথে নামায দোহরাইয়া পরে কুরবানী করিতে হইবে। আর যদি মুছল্লিগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং কুরবানী

করে তবে কুরবানী শুদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়বার জামাতের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু আসাদ বিন আমর হইতে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলিয়াছেন ঐ ইমাম সাহেব মুছল্লিদিগকে একত্রিত করিয়া দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন পুনরায় নামায আদায় করিবে। ইহা ইমাম ছাহেবের কর্তব্য। (কাজীখান)

প্রশ্নঃ কিছু সংখ্যক লোক ইমামের কাছে আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে আজ ১০ই জিলহজ্জ সেই মতে ইমাম সাহেব লোকজন একত্রিত করিয়া নামায আদায় করিল এবং সকলে কুরবানী করিল। পরে বিশ্বস্থ সূত্রে প্রমাণিত হইল এই দিন ছিল আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জ এমতাবস্থায় নামায ও কুরবানীর হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনা মতে নামায ও কুরবানী দুইটাই শুদ্ধ হইবে। ইহার জন্য দ্বিতীয়বার কোনটাই আদায় করিতে হইবে না। (শামী ৫ খণ্ড)

কুরবানীর পশু জবাই করার বিবরণ

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশু জবাই করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তরঃ কুরবানী দাতা নিজের কুরবানীর পশু নিজের হাতেই জবাই করা উত্তম। যদি নিজে জবাই করিতে না চাহেন বা না পারেন তাহলে অন্যের দ্বারা জবাই করাইতে পারেন। তবে নিজে জবাই করার স্থানে উপস্থিত থাকা উত্তম। মহিলা হইলে পর্দার আড়ালে থাকিবে। (রদ্দুল মুখতার ৫/২০৮ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশু জবাই করার জন্য কি কি শর্ত আছে?

উত্তরঃ জবাইকৃত জন্তু হালাল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে উহা ব্যতীত হালাল হইবে না। যথাঃ (ক) জবাইকারী মুসলমান হওয়া (খ) কিতাবী অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। (গ) জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নাম লওয়া। (সূরা মায়েদা)

কাজেই অমুসলিম দ্বারা জবাই করাইলে হালাল হইবে না। দ্বিতীয়তঃ আহলে কিতাব দ্বারা জবাই করাইলে আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করা শর্ত।

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশু জবাইকারী যদি "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" এর স্থলে আল হামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ অথবা শুধু আল্লাহু আকবার বলিয়া জবাই করে তাহা হইলে কুরবানী শুদ্ধ হইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানীর পশু জবাইকারী আল্লাহ পাকের মহত্ব প্রকাশের নিমত্ত নয় বরং বিসমিল্লাহর নিয়তে উক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া যদি কুরবানী দেয় তবে শুদ্ধ হইবে কিন্তু "আল্লাহু মাগফিরলী" পড়িলে শুদ্ধ হইবে না। (কাজীখান)

প্রশ্নঃ জবাইকারীর সাথে অংশ গ্রহণকারীদের বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ জবাইকারীর সাথে অংশ গ্রহণ কারী সকলেই বিসমিল্লাহ বা আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ জবাইকারীর সাথে যাহারা তলোয়ার ধরিবে তাহাদের সকলকেই "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলা ওয়াজিব। তাহাদের কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া তরক করে তবে

কুরবানী শুদ্ধ হইবে না। তবে যাহারা হাত পা ও মাথা ইত্যাদি ধরিবার কাজে অংশ গ্রহণ করিবে তাহাদের জন্য বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। (কাজীখান ৪/৪৫০ পৃঃ)

প্রশ্নঃ জবাইয়ের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলার পর যদি পশু পালাইয়া যায় বা ছুরি পরিবর্তন করা হয় তবে উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ জবাইকারী "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলার পর যদি পশু পালাইয়া যায় তবে দ্বিতীয় বার বিসমিল্লাহ বলিয়া জবাই করিতে হইবে। অপরদিকে ছুরি পরিবর্তন করিলে পুনরায় "বিসমিল্লাহ" বলা জরুরী নয়। (মাজমাউল আনহুর-২/৪৯০পৃঃ)

প্রশ্নঃ মহিলা, নেশাগ্রস্ত, পাগল, বোবা, নাবালেগ ইত্যাদি দ্বারা জবাই করান যাইবে কি না?

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কুরবানী করান যাইতে পারে। যদি তাহারা জবাইর নিয়ম নীতি জানে ও বিসমিল্লাহ পড়ে। (মাজমাউল আনহুর ২/৭৮৯পৃঃ)

প্রশ্নঃ জবাইকারীর জন্য দোয়া পড়া ও নিয়ত বলা জরুরী কি না?

উত্তরঃ জবাইকারীর জন্য জবাইর পূর্বে দোয়া পড়া সুন্নাত। অপর দিকে নিয়ত করাও প্রয়োজন তবে নিয়ত মুখে উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে করিলেও শুদ্ধ হইবে।

কুরবানীর দোয়া-

اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ-

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ-

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশুতে অংশ গ্রহণ কারীদের জবাইয়ের মুহূর্তে কিছু করণীয় আছে কি না?

উত্তরঃ সকল অংশীদারকে জবাইয়ের সময় উপস্থিত থাকা উত্তম। মহিলা হইলে পর্দার আড়ালে থাকিবে। অপর দিকে একটা পশু জবাইয়ের সময় অন্য পশু উপস্থিত না করান মুস্তাহাব। (বাদায়ে)

প্রশ্নঃ জবাইয়ের মুহূর্তে জবাইকারীর করণীয় কি?

উত্তরঃ জবাইকারীর ছুরির ধার পরীক্ষা করিয়া নেওয়া আবশ্যক কারণ ধারবিহীন ছুরি দ্বারা জবাই করা মাকরূহ। সকলের নিয়ত জাচাই করা এবং কিবলা মুখি হইয়া জবাই করা। জবাইকারী কিবলামুখী হওয়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। এবং পশুকেও কিবলা মুখি করাইয়া শোয়ান ও জবাইর মুহূর্তে শক্ত করিয়া ধরা বা বাঁধিয়া লওয়া মুস্তাহাব।

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশু জবাই করার নিয়ম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর পশু তথা সকল পশু জবাই করার শরয়ী নিয়ম হইল উহার চারটি রগ কাটা। এইগুলো হইল শ্বাসনালী, খাদ্য নালী ও উহার দুই পার্শ্বে দুইটি রক্তের মোটা রগ বা শিরা। উক্ত রগ সমূহের যে কোন তিনটি কাটা গেলে বা বেশীর ভাগ রগ কাটা গেলে

পশু ভক্ষণ করা হালাল হইবে। নতুবা হারাম হইবে। তবে উটের ব্যাপারে নহর করিতে হইবে। (আলমগীরী ৪/৯২ পৃঃ, বাদায়ে ৫/৪১ পৃঃ)

(বিঃ দ্রঃ কুরবানী ছাড়াও অন্যান্য সময় পশু জবাই করার নিয়ম ইহাই)

প্রশ্নঃ উটের ব্যাপারে নহর করার বিধান কি?

উত্তরঃ উটের বেলায় নহর করা সুন্নাত অর্থাৎ পা বাঁধিয়া দাড় করাইয়া ধারালো বর্শা বা ছুরি গলোদেশ অর্থাৎ শ্বাস নালীতে ঢুকাইয়া রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া।

প্রশ্নঃ জবাইকারী জবাই করার পরে যদি বলে আমি ইচ্ছা করিয়াই বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করিয়াছি তবে উহার হুকুম কি হইবে।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় উক্ত পশুর সব কিছুই সদকা করিয়া দিতে হইবে। আর উক্ত জবাইকারী কুরবানী দাতাকে ঐ পশুর সম্পূর্ণ মূল্য দিতে বাধ্য থাকিবে। মালিক সময় থাকিলে পুনরায় পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করিবে আর সময় না থাকিলে ঐ পশুর মূল্য সম্পূর্ণ সদকা করিতে হইবে। (আলমগীরী, বাহার)

প্রশ্নঃ ঘাড়ের উপর দিয়া জবাই করা বা জবাই করিতে যাইয়া দেহ হইতে মাথা সম্পূর্ণ ভাগ হইয়া গেল উহার হুকুম কি?

উত্তরঃ ঘাড়ের উপর দিয়া জবাই করা জায়েয নাই উক্ত রুপ জবাই করা পশুর গোস্ত হারাম। তবে ঘাড়ের উপর দিয়া জবাই করার পর যদি প্রাণ বাহির হওয়ার পূর্বেই জবাইয়ের রগ সমূহ কাটিয়া দেয় তবে জায়েয হইবে কিন্তু মাকরূহ হইবে। অপর দিকে জবাই করিতে যাইয়া যদি দেহ হইতে মাথা ভাগ হইয়া যায় তবে মাকরূহ হইবে। (বাদায়ে ৫/৮০ পৃঃ)

প্রশ্নঃ জবাইকৃত পশুর চামড়া খোলার ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তরঃ আমাদের দেশে প্রচলন আছে পশু জবাই করার সাথে সাথে তাহার বিভিন্ন জায়গায় শিরা কাটিয়া দেয় এইটা ঠিক নয় বরং জবাইকৃত পশুর প্রাণ বায়ু চলিয়া গেলে পশু যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখন সতর্কতার সাথে চামড়া খোলার নিয়ম। (রদ্দুল মুখতার ১৮৮ পৃঃ)

কুরবানীর গোস্ত বন্টনের বিবরণ

প্রশ্নঃ একাধিক ব্যক্তি একটা পশুতে অংশী হইলে উহার গোস্ত নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিয়ম কি?

উত্তরঃ কয়েকজন শরীক মিলিত হইয়া কুরবানী করিলে গোস্ত ওজন করিয়া ভাগ করিতে হইবে। শুধু অনুমান করিয়া ভাগ করিলে জায়েয হইবে না। বরং কম বেশী হওয়ার ক্ষেত্রে গুনাহ হইবে এবং ইহা পারস্পরিক সন্তুষ্টি সত্ত্বেও না জায়েয।

তবে যদি গোস্তের সাথে মাথা, পা, চামড়া ইত্যাদি মিলাইয়া বন্টন করা হয় তবে যে অংশে মাথা পা কিংবা চামড়া রহিয়াছে উক্ত অংশে গোস্তকম হইলে ওজন করা জরুরী। (শামী ৮/২০২ পৃঃ দুররুল মুখতার ও হেদায়া)

প্রশ্নঃ কুরবানীর গোস্ত অপরকে দেওয়া সম্পর্কে শরীয়তের নিয়ম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করিয়া একভাগ নিজের ঘরের জন্য একভাগ আত্মীয় স্বজন ও

বন্ধু বান্ধবদের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ ফকীর মিসকীনদের মাঝে বন্টন করিয়া দেওয়া মুস্তাহাব। যদি কাহারো পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী হয় তাহা হইলে প্রয়োজন বোধে (দুইভাগ বা) সম্পূর্ণ গোস্ত নিজে রাখিতে পারিবে। (শামী ৫/২০৮ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর গোস্ত বিক্রয় করা ও বিনিময় বা ওজরত দেওয়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানীর গোস্ত বিক্রয় করা জায়েয নাই। যদি কেহ বিক্রয় করে তবে তাহার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। অনুরূপ ভাবে কুরবানীর গোস্ত দ্বারা জবাইকারী ও প্রস্তুত কারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া বা বিনিময় দেওয়া জায়েয নাই। বরং ভিন্ন ভাবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া দিবে।

(শামী ৫/২০৯ পৃঃ, আলমগীরি ৫/১০৩, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৪৫২ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর গোস্ত শুকাইয়া রাখা বা অমুসলিমকে দেওয়া সম্পর্কে হুকুম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর গোস্ত শুকাইয়া জমা করিয়া খাওয়া জায়েয, অপর দিকে অমুসলিমকেও কুরবানীর গোস্ত দেওয়া জায়েয আছে। তবে এটা যেন বিনিময় না হয়। এতদ্বসত্ত্বেও অমুসলিমকে না দেওয়া উত্তম কারণ দেওয়াটা কুরবানীর মর্যাদার খেলাফ।

(আলমগীরী ৬/২০১ পৃঃ, শামী)

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে অছীয়ত ব্যতিত বা নিজের খুশিতে মৃত্যু ব্যক্তির ছওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে কুরবানী করিলে উহার গোস্ত বন্টনের নিয়ম কি?

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় নিজের কুরবানীর গোস্তের ন্যায় উক্ত গোস্ত নিজে খাইতে পারিবে ধনী গরীব সকলকে দিতে ও খাওয়াইতে পারিবে। (শামী ৫/২০৭ পৃঃ, রদ্দুল মুখতার)

প্রশ্নঃ কুরবানীর গোস্ত বাড়ীর কর্মচারীকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কোন আপত্তি আছে কি না?

উত্তরঃ যে সমস্ত চাকর চাকরানী দিন মজুর বা বাৎসরিক মজুর, মালিকের খানা খাইয়া থাকে আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী তাহাদের এই খানা বেতনের মধ্যে গণ্য কেননা মালিকের ঘরে খানা খাইয়া মজুর যেই বেতনের রাজী হইবে; মালিক খানা না দিলে উক্ত বেতনে সে কখনো রাজী হইবে না। উহাতে প্রতীয়মান হয় যে তাহাদের এই খাদ্য বেতনের মধ্যে গণ্য। অতএব কুরবানীর গোস্ত তাহাদের খাওয়াইলে যদি বিনিময় হয় তবে জায়েয হইবে না। আর যদি অন্য তরকারীর সাথে কুরবানীর গোস্ত অতিরিক্ত হিসাবে হয় তবে বেতনের মধ্যে গণ্য হইবে না। অথবা কুরবানীর গোস্ত খাওয়াইলে তাহাদের বেতনের কিছু টাকা বেশী করিয়া দিলে বেতনের মধ্যে গণ্য হইবে না। (হেদায়া ৪/৪৪৮পৃঃ)

কুরবানীর চামড়া, রশি, গদি, পোশাক ইত্যাদির বর্ণনা

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশুর চামড়া ব্যবহারের হুকুম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর পশুর চামড়া কোন কাজের বিনিময় দেওয়া জায়েয হইবে না। কাজেই জবাইয়ের বিনিময়, গোস্ত তৈয়ারীর বিনিময়, ইমাম, মুয়াজ্জিন, শিক্ষক বা কোন কর্মচারীর বেতন হিসাবে দেওয়া জায়েয হইবে না। (জাওয়াহিরুল ফিকাহ ১/৪৪২ পৃঃ)

অতএব কুরবানীর পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে। অপরকে হাদীয়া দিতে পারিবে। ফকীর বা মিসকীনকে দান করিতে পারিবে। (জাওয়াহিরুল ফতোয়া)

প্রশ্নঃ কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা যাইবে কিনা গেলে উহা ব্যয় করার নিয়ম কি?

উত্তরঃ নিজে ভোগ করার উদ্দেশ্য না থাকিলে কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা যাইবে। তাই বিক্রয়

করিলে নিজে গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোন ধনী লোকলেও দিতে পারিবেনা এবং কোন কাজের বিনিময় প্রদান করিতে পারিবেনা। একমাত্র গরীব মিসকীন, ফকীরদের মাঝে বিতরণ করিতে হইবে। তবে গরীব ছাত্রদের দেওয়া উত্তম। কেননা উহাতে দুই প্রকার নেকীর অধিকারী হওয়া যায় (ক) গরীবকে সাহায্য করার ছওয়াব (খ) দ্বীনি ইলম প্রচার ও প্রসার করার ছওয়াব। কাজেই পয়সা হাতে আসিলে নিজে খরচ না করিয়া হুবহু দান করিয়া দিবে।

(জাওয়াহিরুল ফিকাহ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর চামড়ার টাকা ঈদগাহ মেরামত, মাদ্রাসা, মসজিদ তৈরী বা মেরামত, রাস্তাঘাট পুল ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা জায়েয আছে কি না ?

উত্তরঃ কুরবানীর চামড়ার টাকা উক্ত খাতগুলোর কোনটাতেই ব্যয় করা জায়েয হইবে না।

(শামী ৫/১০৯ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশুর রশি, গদি, পোশাক ইত্যাদি সম্পর্কে কি হুকুম?

উত্তরঃ কুরবানীর পশুর রশি, গদি, পোশাক, ইত্যাদি নিজেরা ব্যবহার করিতে পারিবে অন্যকেও হাদিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু সদকা করিয়া দেওয়া মুস্তাহাব। বিক্রয় জায়েয নাই। করিলে সম্পূর্ণ অর্থ সদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। (আলমগরী ৪/৪৩৪ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর চামড়া দ্বারা কিতাব বাধান, পুরষ্কার দেওয়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানীর চামড়া দ্বারা কিতাব বাধান ও পুরুস্কার হিসাবে কাহাকে দেওয়া জায়েয।

(ইমদাদুল ফতোয়া ৩/৫৫২ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর চামড়া কোন সমিতি বা কোম্পানীকে দেওয়া যাইবে কি না?

উত্তরঃ না, কুরবানীর চামড়া কোন সমিতি বা কোম্পানীকে দেওয়া জায়েয নাই।

(ইমদাদুল ফতোয়া ৩/৫৪০ পৃঃ)

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশুর হাড়, শিং, খুরা ইত্যাদি বিক্রয় করা যাইবে কি না?

উত্তরঃ কুরবানীর পশুর চামড়া ব্যতিত কোন কিছু বিক্রয় করা যাইবেনা বিক্রয় করিলে মূল্য সদকা করিয়া দিতে হইবে।

কুরবানীর কুসংস্কার সম্পর্কে

* কোন কোন এলাকায় জিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন হইতে কুরবানীর দিন পর্যন্ত কোন পশু জবাই করেনা এবং কোন গোস্ত খায়না এটা সম্পূর্ণ ভুল।
* কুরবানীর পশুকে মালা, পোশাক দিয়ে বিভিন্ন ভাবে সাজান হয় এটা সম্পূর্ণ কুপ্রথা।
* কোন কোন এলাকায় কুরবানীর পশুর খাদ্যনালী ঘরের সামনে টাঙ্গাইয়া রাখে ছওয়াবের আশায় এটা শরীয়ত সম্মত নয়।
* কোন কোন এলাকায় প্রচলন আছে যে, কুরবানীর গোস্ত খাইয়া হাড় যদি আম গাছে ঝুলাইয়া রাখা হয় তবে উহাতে পোকা লাগিবে না এটা একটা কুপ্রথা ছাড়া আর কিছুই নয়।
* আমাদের দেশে অনেকে কুরবানীর পশুর বয়স নির্ধারিণ করে দাঁত দেখিয়া এটা ঠিক নয় প্রকৃত বয়স দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি হিসাবে নির্ধারণ করিতে হইবে।

সমাপ্ত